কথা কল্পনা কাহিনী

(নবম স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

উৎসর্গ

চম্পাকলি, ঝিমলি, বাবুনটু

নাতি-নাতনীদের

সূচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

প্রসন্ন মধুর

এইগল্প-গ্রন্থমালায় প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি, দ্বিতীয় স্তবকে আটত্রিশটি, তৃতীয় স্তবকে সাঁইত্রিশটি, চতুর্থ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, পঞ্চম স্তবকে চৌত্রিশটি, ষষ্ঠ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, সপ্তম স্তবকে উনত্রিশটি এবং অষ্টম স্তবকে ত্রিশটি বিভিন্ন রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম স্তবক ২২, দ্বিতীয় স্তবক ৩০, তৃতীয় স্তবক ২২, চতুর্থ স্তবক ২৪, পঞ্চম স্তবক ২৪ ও ষষ্ঠ স্তবক ২৫, সপ্তম স্তবক ৩০, অষ্টম স্তবক ৩০।

তিন ঘণ্টার বেশি রামলোচনের ঘুম হয় না। এগারোটা সাড়ে-এগারোটায় যখন সবাই শুয়ে পড়ে তখন অগত্যা তাঁকেও শুতে হয় কিন্তু ঠিক তিনটি ঘণ্টা পরে ঘুম ভেঙে যায়। আগে আগে আরও কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করতেন, চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকতেন, কিন্তু আজকাল আর সে বৃথা চেষ্টা করেন না। হুঁকো·কল্‌কে ঠিক করাই থাকে, হাৎড়ে হাৎড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে টিকে ধরাবার লম্পটা জ্বালেন, তারপর কল্‌কেটা ধরিয়ে অন্ধকারেই বসে বসে নিঃশব্দে তামাক টানেন। অবশ্য যতটা সম্ভব নিঃশব্দে—হুঁকোর বেশি আওয়াজ হলে মেজকর্তা, মানে তাঁরই মেজভাই, বিষম বিরক্ত হন।

তামাক খাওয়া শেষ করে তাঁর খাটো গামছাখানি প'রে রামলোচন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। নিস্তব্ধ দালান, দালানের ওধারের দরজা খুললে তবে উঠোনে বা কলঘরে যাবার পথ। আলো জ্বেলেই যাওয়া উচিত—বুড়ো মানুষ, হোঁচট্ খাওয়া বা ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা তো পদে পদে—কিন্তু আলো জ্বালবারও হুকুম নেই। প্রথমত বেকার বড় ভাইয়ের জন্য বৃথা আলোর খরচ করতে মেজকর্তা বা ছোটকর্তা কেউ রাজী নন, তাছাড়া বাইরে আলো জ্বাললেও নাকি তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং দালানের জানালা দিয়ে এসে পড়া ক্ষীণ নক্ষত্রের আলোতেই দৃষ্টিটা সইয়ে নিয়ে সাবধানে এগোতে হয় একপা একপা করে, দেওয়াল ধরে ধরে। অবশ্য পথটা এতদিনের অভ্যাসে একরকম জানা হয়েই গেছে—কোথায় আলমারির কোণ হাতে ঠেকবে, তারপর কোথায় বাসনের সিন্দুক, তাঁর আঙুলগুলো আন্দাজে আন্দাজে ঠিক খুঁজে নেয়। একটা টর্চ আছে বটে কিন্তু তার ব্যাটারি দেয় ভাগ্নে বাদল, —সে ব্যাটারিও মাস-দুই চ'লে এক সময়ে নিঃশেষ হয়। কিন্তু বাদল তো আসে এ বাড়িতে ছ-মাস আট-মাস অন্তর, বাকি সময়টা যে-তিমিরে সে-তিমিরে।

কলঘর থেকে ফিরে আস্তে আস্তে দালানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রামলোচন থমকে দাঁড়ান। বাইরের চেয়ে ভেতরে অন্ধকার একটু বেশী গাঢ়,

সুতরাং কিছুক্ষণ ধরে দৃষ্টি সইয়ে নিতে হয়। তারপর চলে তাঁর চৌর্যবৃত্তির নিঃশব্দ অভিযান। কোথায় আনাজের ঝুড়িতে মেজবৌ ভুলে কলা ফেলে গেছেন হয়ত ; কিংবা মিট্‌সেফের মাথায় কোন বৌমা তাঁর ছেলেদের বিস্কুটের বাক্স রেখে দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়িতে ঘরে নিয়ে যেতে বা আলমারিতে তুলতে ভুলে গেছেন ; কোথাও বা তারের ঝুড়ি ঝুলোনো আছে কড়িকাঠ থেকে—তার মধ্যে আছে মেজবৌমার মেয়ের তাল-মিছরি কি ন'বৌমার মেজছেলের গুঁজিয়া ; এইগুলি ঘুরে ঘুরে হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করেন রামলোচন, টিপে টিপে পরিমাণটা বুঝে নেন, বিস্কুট হ'লে অন্ধকারেই গুনে দেখেন। চুরি করতে করতে তার 'আর্ট'টা ওঁর জানা হয়ে গেছে ; এমন-ভাবে নিতে হবে যে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। বিস্কুটের বাক্স যদি একেবারে ভর্তি থাকে তাহ'লে একখানার বেশি নেওয়া চলবে না, আবার খুব খালি হয়ে এলেও তাই। অথচ মাঝামাঝি অবস্থায় দুখানা কি তিনখানাও তুলে নেওয়া যায়, কারণ সে সময়টা অত হিসেব থাকে না। মিছরি কিংবা গুঁজিয়া যদি ঠোঙাভর্তি থাকে তো দুটো তিনটে পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেন, নইলে লোভ সংবরণ করতে হয়, একটা বা একটুক্‌রো নিয়েই ক্ষান্ত হন।

এইভাবে এদিক ওদিক হাৎড়ে চোরাই জিনিসগুলি বুকে করে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। সেগুলি বিছানার ওপর সযত্নে সাজিয়ে রাখা হলে তবে কাপড় ছাড়বার কথা মনে পড়ে। এই বস্তুগুলি তারপর অন্ধকারে বসে বসেই খাওয়া চলে, সেই শেষরাত্রেই। মিছরিটা চিবোতে পারেন না, গালে ফেলে পাক্‌লে পাক্‌লে খান। খাওয়া শেষ হ'লে আর এক কলকে তামাক টেনে আর একবার গিয়ে শুয়ে পড়েন, নিশ্চিন্ত হয়ে।

কিন্তু বোধ হয় ঠিক নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে পারেন না, কারণ কান থাকে মেজকর্তার ঘরের দোরের দিকে। মেজকর্তা ওঠেন ঠিক সাড়ে চারটেয়, তাঁর ছিটকিনি খোলার শব্দ পেলেই রামলোচনও সরকারী ভাবে শয্যাত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আওড়াতে আওড়াতে গিয়ে তামাক সাজতে বসেন। শীতকালে তখনও অন্ধকার থাকে, কিন্তু তাতেই বা কি, এখন আর আলো জ্বালতে বাধা নেই। মেজকর্তা নিজে যে সময় ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস সেইটেই ঘুম ভাঙবার প্রকৃষ্ট সময়, সুতরাং তখন আলো জ্বাললে বা কথা কইলে বিরক্ত হন না। তামাক খাওয়া শেষ করে আর একবার তাঁর খাটো গামছাখানির শরণাপন্ন হতে হয়। এবারে দালানে আলো জ্বালানোই থাকে, কারণ মেজকর্তা উঠেই কলঘরে ছোটেন, দৈবাৎ তা না থাকলে রামলোচন

সদর্পে আলো জ্বালতে জ্বালতে এগিয়ে যান। আর ভয় কাকে!

এর পর প্রাতঃকৃত্য শেষ করে পূজা-আহ্নিক সারতে সারতে বাইরে ফর্সা হয়ে যায়, গরমের দিনে রোদ উঠে পড়ে কটকটে। কিন্তু তখনও এক বড় বৌ অর্থাৎ রামলোচনের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়ে-ছেলে ওঠে না—তাদের ছেলেরা ত নয়ই। সেজকর্তা ছোটকর্তা উঠেই নিজেদের পরলোক-চর্চায় ব্যস্ত থাকেন বলে. তরুণ-তরুণীদের নিদ্রাভঙ্গের কোন কারণই ঘটে না; তা না হোক্, রামলোচন তাতে দুঃখিত নন্। সবাই উঠে পড়লে ঝামেলা, ছেলে-মেয়েরা চ্যাঁ-ভ্যাঁ শুরু করে দেয়, স্ত্রীলোক ও পুরুষে দালান-উঠোন যেন গিজ গিজ করতে থাকে। সে ভিড় অসহ্য মনে হয় তাঁর। তার চেয়ে এই ভাল। বড়-বৌ স্নান করতে যান রান্নাঘরের চাবি খুলে দিয়ে, রামলোচন সেখানে ঢোকেন স্ত্রীকে সাহায্য করতে। প্রত্যহ উনান ধরিয়ে দেওয়া তাঁর কাজ, এটা তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। বাড়ির আর কোন কাজ তাঁকে দিয়ে কেউ করাতে পারে না, এইটি ছাড়া। তার কারণ, আর কেউ ওঠবার আগে একা রান্নাঘরে ঢোকা লাভজনক। গত রাত্রির অবশিষ্ট বহু ভোজ্য নানা রকমে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, হিসাবের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে এ ঘরে নিয়ে আসা বা ওখানেই উদরস্থ করা এমন কিছু কঠিন নয়। অবশ্য দু-একবার যে ধরা পড়বার উপক্রম না হয়েছে এমন নয় কিন্তু প্রতিবারই কোনমতে সেটা এড়িয়ে গেছেন।

এরপর জামাটি গায়ে দিয়ে লাঠি হাতে প্রাতভ্রমণে বার হন। এ নাকি তাঁর ডাক্তারের উপদেশ, খুব ঝড়-জল না হ'লে ভ্রমণ বন্ধ থাকে না। কিন্তু লোকে অবাক্ হয় এই দেখে যে একেবারে লেকের গায়ে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিকে বেড়াতে যান না। তিনি যান ওধারের রাজপথ ধরে—সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় ওঠেন। এইবার উদ্দেশ্যটা বোঝা যায়, ওখানকার দোকান থেকে এক আনার জিলিপি বা সিঙাড়া কিনে বাড়ি ফেরেন। এটা হ'ল প্রকাশ্য জলখাবার। বাড়ির চায়ের পর্ব শুরু হয় একটু বেলাতেই—চাকরি ত কেউ করে না, সকলেই ব্যবসায়ী। অত বেলা অবধি থাকতে পারেন না বলে বেড়িয়ে এসেই জিলিপি দুটি খেয়ে একঘটি জল খান প্রকাশ্যে। আগে আগে ভাইপো ভাইঝিদের ছেলেমেয়েরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকৃত। এখন তারাও মানুষ চিনে নিয়েছে, বৃথা লোভ করে না।

চায়ের পাট শুরু হয় সাড়ে-সাতটা নাগাদ। তখন বিস্কুট বা টোস্ট যাহোক কিছু অদৃষ্টে জোটে, নইলে হয়ত গরম পরোটা। কিন্তু তাতেও অনেক-

দিন তাঁর হয় না, রান্নাঘরের দোরের কাছে মোড়া পেতে বসে এদিক ওদিক চেয়ে প্রশ্ন করেন, 'বড় বৌ, বাসি রুটি এক-আধখানা পড়ে আছে নাকি ?' বড় বৌ বিষম চটে যান, গালমন্দও হয়ত দেন, তবু না দিয়েও থাকতে পারেন না। প্রার্থিত বস্তু হাতে পেলে প্রশান্ত মুখে গালাগাল শুনতে রামলোচনের আপত্তি নেই।

এসবের পালা শেষ করে আর একবার বাইরে বেরোন। রোগ একরকমের নয় ; অর্শের জন্য ওল বা কচু চাই ; পেটের অসুখের জন্য গাঁদাল পাতা বা থানকুঁড়ি পাতা, ডুমুর, কচুশাক, ওলকোঁড়া, নিমপাতা—এর জন্য ঢাকুরিয়া অঞ্চলে গিয়ে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হয় এই সময়টা। গরপা বা বৈষ্ণবঘাটা পর্যন্ত এক একদিন হেঁটে যান যদি বিনামূল্যে পলতা পাওয়া যায় এই আশায়, —ধনে পলতা খেতে হবে, রক্ত পরিষ্কার করে। এরই মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি দাঁতের গোড়ার পরিচর্যার জন্য বকুলছাল বা নিমছাল কি পেয়ারা পাতা সংগ্রহ করতে ভুল হয় না। এইসব বোঝা সংগ্রহ করে দশটা এগারোটার সময় বাড়ি ফিরে বড়বৌয়ের অবসরের জন্য অপেক্ষা করেন। সংসারের জন্য সাধারণ রান্না যা হচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর এইসব রান্না করিয়ে নিতে হবে। —বড়বৌ রাগ করেন খুবই, কিন্তু না করলেও নয়, বৃদ্ধ স্বামী হাতেপায়ে ধরাধরি করেন। বাড়ির ঝালমশলা-তেল-বিশিষ্ট সমস্ত ব্যঞ্জনগুলির হিসাব কিন্তু সংগ্রহ করা থাকে রামলোচনের. খাওয়ার সময় নিজের নানা রকমের পথ্যের সঙ্গে সেগুলোও মিলিয়ে বুঝে নেন। ওঁর বিশ্বাস এই উপকারী বস্তুগুলোর সঙ্গে ওসব জিনিস খেলে আর দোষ নেই, ওর বিষক্রিয়া এতে কেটে যাবে। আবার এরই এক ফাঁকে দই আনতে ভুল হয় না চার পয়সার। সামান্য যা টাকা নিজের হাতে আছে এবং ভাইপো ও ভাগ্নেদের কাছে চেয়ে-চিন্তে যা পান, তাইতেই এই সব চলে। তাই বলে তাঁর এই সব খাদ্য থেকে কণামাত্র কাউকে তিনি দেন না, ছোটছোট ছেলেমেয়েরা একফোঁটা দই কি একটুকরো কলার জন্য কেঁদে মরে গেলেও না। উদাসীন নিস্পৃহতার সঙ্গে সে সব তিনি উপেক্ষা করতে পারেন।

দ্বিপ্রহরের এই গুরুভোজনের পরে একটু দিবানিদ্রা দিয়ে উঠেই শুরু হয় চায়ের জন্য ধন্না দেওয়া। দুপুরের আগুনের যা জের থাকে উনুনে, তাইতেই জল গরম করে নিয়ে তিনটে নাগাদ দুতিন কাপ চা তৈরী হয় মেজগিন্নী ও কোন কোন বধূর জন্য। তা থেকে ভাগ নেওয়া চাই-ই তাঁর। তারপর তামাক ও অপরাহ্নকৃত্যের পর আবার পাঁচটায় যখন সরকারী চা-জলখাবারের ব্যবস্থা

হয় তখন সেটারও পুরোপুরি সুবিধা নিতে ইতস্তত করেন না।

এর পরের ইতিহাস আরও বিচিত্র। এই সময় তিনি সত্যি সত্যিই বেড়াতে বেরোন। গলাবন্ধ কোটটির ওপর মান্ধাতার আমলের চাদর ঝুলিয়ে ছড়িটি নিয়ে বেরোন। এ অভ্যাস তাঁর নাকি বহুকালের। প্রথম বয়সে যখন কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল হাতে, যখন এই সময় চোখ দুটো রঙীন করবার ব্যবস্থা ছিল, তখন নাকি যেতেন মেয়েমানুষের কাছে। অবশ্য বড়-নজরের সঙ্গতি বা ইচ্ছা কিছুই ছিল না, খোলার ঘরের সস্তা স্ত্রীলোকের কাছেই যাতায়াত ছিল। এখন সে সামর্থ্যও নেই (বহুকাল ধরেই নেই), সুতরাং শখটা অন্য-ভাবে মেটাতে হয়। বড়রাস্তাটা যেখানে বেঁকে কলকাতার সীমা লঙ্ঘন করেছে সেখানে এবং আশেপাশে বিস্তর বস্তি আছে। সাধারণত ঝিরা ঐ সব বস্তিতেই ঘরভাড়া করে থাকে। সেখানে কিংবা ওধারের পাড়ার মধ্যে, রাস্তার কলের ধারে কি পুকুর-পাড়ে যেখানে তারা কাজ-কর্ম করে, রামলোচন ঘুর ঘুর করেন সেইখানেই। বকুল ঝি বলে—'ঠাকুর যেন ছোঁক্ ছোঁক্ করে বেড়ান।' অবশ্য এরা অধিকাংশই খারাপ নয়, স্বামী-পুত্র নিয়ে বাস করে; কিন্তু খারাপ হ'লেই বা কি, রামলোচনেরও সে বয়স নেই। শুধু মেয়েছেলের সাহচর্য লাভ করা, তার সঙ্গে দুটো আলাপ করা—এইটুকু তাঁর সাধ, এতেই তিনি কৃতার্থ। চিরকালই অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের সংস্পর্শে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। সুতরাং ঝোঁকটা ওঁর এদের দিকেই বরাবর।

বিচিত্র মানুষ রামলোচন!

পৈতৃক জমিজমা এবং সামান্য কিছু টাকা-কড়ি ছিল বৈকি! কাজকর্ম কোনদিনই করেন নি, বসে খেয়েছেন এবং নাবালক ভাইদের অংশও বেচে উড়িয়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া জানতেন না, চাকরি করার যোগ্যতা বা ব্যবসা করার মত বুদ্ধিও ছিল না। একেবারে শেষ বয়সে দোকানে খাতা লেখার কাজ বা ছোট ছোট ছেলে-পড়ানোর কাজ যোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খাতায় ভুল করার জন্য এবং ছেলেমেয়েদের ভুল শেখানোর জন্য কোন চাকরিই টেঁকেনি বেশী দিন। অবশ্য খুব বেশী প্রয়োজনও ছিল না আর—ভাই ও ভাইপোরা ভাল, কেউ ওঁকে ভাসিয়ে দেয়নি। যদিচ, অনেকে বলে সেটা ওঁর জন্য নয়, বড়বৌ-এর জন্য। বড়বৌ সুগৃহিণী, সংসারটাকে মাথায় করে আছেন, ওঁর মুখ চেয়েই তার স্বামীকে সহ্য করে ওরা। আর বড় বৌ-ও

স্বামীর সামর্থ্য জানেন বলে প্রাণপণে খেটে যান। পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি করার চেয়ে নিজের দেওর ও দেওরপোদের সংসারে খাটা ভাল—এই তাঁর বিশ্বাস। বাইরে অন্তত সম্মানটা থাকে তাতে।

ভাইরা বড় হয়ে সবাই ব্যবসা ক'রে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিলেন, সে সব ব্যবসা ভাইপোদের হাতে পড়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আসবাবের দোকান, মনোহারী, ছাপাখানা, বইয়ের দোকান—কী নেই! অভাব নেই কোথাও, তাই বড় ভাইকে সহ্য করেন। তাছাড়া মানুষটা ত নিজেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর ক-দিন! পেট খারাপ, কিছুই হজম হয় না, ছত্রিশ রকমের রোগ ও উপসর্গ দেহে জড়ানো। ডাক্তার বলে এসময় ওঁর একবেলা অল্প কিছু আহার করা উচিত, তাতেই সুস্থ থাকবেন। কিন্তু সেসব কথা উনি বিশ্বাস করেন না। শরীর যত খারাপ হয় তত খেতে চান। আহারের লোভ ত বটেই—তাছাড়া ধারণা আছে যে, যত বেশি খাবেন তত শরীর সারবে। এই করেই হজমের ক্ষমতা নষ্ট করেছেন উনি, বেশি করে খেয়ে উঠেই এমন কিছু খেতে শুরু করেছেন—হজমী বলে যার খ্যাতি আছে; আবার হজমী জিনিস খাচ্ছেন যখন, তখন শীগগিরই হজম হয়ে যাবে এই বিশ্বাসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারী খাবার খেয়েছেন।

তবু এসবও অনায়াসে ক্ষমা করা যেত যদি স্বভাবের ঐ বড় দোষটা না থাকত।

স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর বনিবনাও কোন কালে নেই, দুজনের ঘনিষ্ঠতা দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। এমন কি ওঁদের যে সন্তান হয়নি তার জন্য বড় বৌ আকারে ইঙ্গিতে স্বামীকেই দায়ী করেন। অথচ বাইরের টান ওঁর আছে প্রথম থেকে—আজ পর্যন্ত। বাড়িতে তরুণী ঝি রাখার উপায় ছিল না, তার জন্য অন্যান্য বধূদের বহু বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে বড় বৌকেই। তাতেও রক্ষা ছিল না, ঘরে না পেলে পাড়ার আশে-পাশে খুঁজে বেড়িয়েছেন।

আজ, এই এতকাল পরে, নখদন্তহীন অবস্থাতেই বা কম কি? বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোন তখন পাড়ার যতগুলি ঝির সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যেকের সঙ্গেই খানিকটা ঘনিষ্ঠতা না করে ছাড়েন না—অথচ কেউ কোনদিন শোনেনি তাঁকে ভাই-পো ভাই-ঝির বা নাতি-নাতনীদের খবর নিতে। অথচ বাইরে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড়টিতেই হয়তো থেমে গেলেন রামলোচন, 'বলি অ লক্ষ্মী, ভাল আছ? মেয়ে ভাল? শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছে মেয়ে? ওর শাশুড়ী কেমন? ··ভাল···ভাল।'

লক্ষ্মী হয়ত প্রশ্ন করে, 'আপনার শরীর কেমন দাদাঠাকুর?'

'আমার আর শরীর! খেতেই পাইনে ভাল, শরীর সারবে কি করে? যা বাজার, না দুধ না দই—কী খেয়ে বাঁচি তারই নেই ঠিক।···যাবো একদিন লক্ষ্মী তোদের বাড়ি, মেয়ের কী গয়না হ'ল দেখে আসব।'

ততক্ষণে হয়ত অন্নদা এসে পড়ল।

'এই যে অন্ন, কবে এলি? শরীর ভাল? ইস্—আবার নতুন ফুল গড়ালি যে কানের—ও কী ফুল রে?'

'পেজাপতি বাবাঠাকুর, পাখায় লাল পাথর বসানো। তাই ছত্রিশ টাকা পড়ল। কী সোনার দর হয়েছে!'

'ছ-ত্রি-শ টাকা! তা হবে বৈকি! প্রায় যে একশ' টাকা দর এখন সোনার। বেশ, বেশ, দিব্যি মানিয়েছে কিন্তু তোকে অন্ন। নতুন রসান দেওয়া ফুল, মুখখানি বেশ জম্‌জম্ করছে!'

অন্ন মানুষ চেনে। সে বাসন নামিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে বলে, 'এই গড়াতে গিয়ে হাত একেবারে খালি হয়ে গেল বাবা···দোক্তা কিন্‌ব এমন পয়সা হাতে নেই, কী টানাটানি চলছে কি বলব!'

রামলোচন পকেটে হাত পুরে একটা আনি বার করেন, 'তাইত, অন্ন, এই আনিটা রাখ্। দোক্তা কিনে নিয়ে যাস্।'···তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বলেন, 'আর বুঝলি, দরকার হ'লে চাস্, লজ্জা করিসনি!'

আজই সকালে ছোট ভাইপোর কাছ থেকে তিনটে টাকা পেয়েছেন, পকেট ভারী আছে।

ওখান থেকে এগিয়ে গিয়ে একটা পুকুরের ধারে থম্‌কে দাঁড়ান। এই বাড়িতে বীণা কাজ করে। তাঁদেরই পুরণো ঝি কাতুর মেয়ে বীণা, অল্পবয়সী, সুশ্রী মেয়েটি। শ্যামবর্ণের ওপর দিব্যি শ্রী, মুখে হাসি লেগেই থাকে বলে আরও ভাল দেখায়। বীণা এবাড়ি আসে ঠিক সাড়ে পাঁচটা ছটার সময়ে, সময়টা জানা আছে রামলোচনের। এখনই বাসন নিয়ে বেরিয়ে ঘাটে আস্‌বে মাজ্‌তে।

বীণা এসে ঘাটে বাসন নামালে রামলোচন একেবারে কাছে এসে উবু হয়ে বসেন। টেনে টেনে রস দিয়ে বলেন, 'কী লো, আজ মুখ ভারি ভারি কেন? বর বুঝি আসেনি কদিন?'

'কী যে বলেন দাদু', বীণা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'মুখের আক্‌ঢাক্ নেই! আজ একটু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই!'

লোলচর্ম, ঈষৎ-কম্পিত হাতখানা বাড়িয়ে দেন রামলোচন ওর দিকে, বীণার মসৃণ নিটোল বাহুমূলে হাত বুলিয়ে যেন ওর উন্নত যৌবনটা অনুভব করতে করতে বলেন, 'যাই বল্ বীণা, এমন হাত, একজোড়া তাগা না হ'লে মানায় না। বরকে বলতে পারিস না গড়িয়ে দিতে?'

একটা ঝাঁকানি দিয়ে বীণা হাতটা সরিয়ে নেয়, 'আমার বর ত আর বড়লোক নয়। কী যখন তখন গায়ে হাত দাও দাদু, লজ্জা করে না! আমরা না হয় খেটে খাই লোকের বাড়ি, তোমারও ত মান মর্য্যেদা আছে!'

অপ্রতিভ রামলোচন ফোক্‌লা দাঁত বের করে হাসেন বোকার মত, 'তাতে কি হয়েছে রে, হাজার হোক তুই ত নাতনী হলি লো সুবাদে!'

'তা হোক্, তুমি যাও—ওঠো এখন। কাজ করতে দাও।'

অগত্যা উঠতে হয় ওঁকে। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে অঘোর ঘরামীর দাওয়া; রামলোচন ধপাস করে সেখানে বসে পড়েন। অঘোরের মেয়ে সুকুমারীকে ডেকে বলেন, 'এক ছিলিম তামাক খাওয়াবি নাকি রে নাতনী? ছাখ্, খাওয়াস ত বসি নইলে চলে যাই।'

এমনি করে দু-তিনটে পাড়া ঘুরে সকলকার খবর নিয়ে বাড়ি ফেরেন যখন, তখন আটটা বেজে যায়। এসেই রান্নাঘরের সামনে আবার ধন্না শুরু হয়—গরম রুটি, দাল আর সামান্য একটু দুধ মিল্‌বে, সেই আশায়।

এই হ'ল তাঁর দৈনন্দিন জীবন। জীবনের যত সমস্যাই দেখা দিক চারিদিকে, যত প্রশ্নই তীব্র হয়ে উঠুক, ওঁর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রতিটি দিন এবং রাত্রি, অপর দিন ও রাত্রির সঙ্গে সমান। কোথাও কোন তফাৎ, কোন বৈচিত্র নেই।

আষাঢ়ের শেষাশেষি রামলোচন এবার বিষম রকম পড়লেন। জ্বর, তার সঙ্গে উদরাময়, ডাক্তাররা বললে খারাপ ধরণের অসুখ, বোধ হয় গ্রহণী। তিনচার দিন পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বড়বৌ সেবা করতে এসে দেখেন তোশকের নিচে কতদিনের বাসি পচা জিলিপি, ভাঙা বিস্কুট, শুকনো লুচি। কবে কোন্ দোকানের হালখাতায় এক সরা খাবার পেয়েছিলেন, কাউকে কখনও কোন খাবারেরই ভাগ দিতেন না, তবু কোন্ চক্ষুলজ্জায় লুকিয়ে এনে সরাসুদ্ধ ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলো পচে সমস্ত বাক্সটায় দুর্গন্ধ। বড় বৌ এসব সাফ করেন, গজগজ করেন আর গালাগাল দেন। তবু করতে হয় তাঁকেই; নইলে এত কে করবে আর?

প্রায় মাসখানেক ভুগে জ্বরটা গেল, পেটটাও সামান্য একটু ধরে এল, রামলোচন সজ্ঞানে আবার ভাল করে তাকালেন চারিদিকে—কিন্তু পা আর হ'ল না। উঠতে কিছুতেই পারেন না, পায়ে জোর নেই, কোমরও বোধ হয় ভেঙেছে। রামলোচনের বিলাপের শেষ নেই। কেউ তাঁকে ভাল করে ডাক্তার দেখাচ্ছে না—এ অনুযোগ ত আছেই। বড়বৌকে চুপি চুপি বলেন, 'আছি, তবু ত মাছ-ভাত পেটে যাচ্ছে দুবেলা, বড়বৌ, তুমি একটু মুখ পানে চাও। ওরা না দেখায়, বালাজোড়া বাঁধা দিয়ে ভাল ডাক্তার আনো!'

বড়বৌ উত্তর দেন, 'মরণ আর কি! কী এমন নিধি উনি তাই বালা বাঁধা দিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে! কেন, ভাইরা ডাক্তার দেখাচ্ছে না? উপযুক্ত ছেলে থাকলেও এমন চিকিচ্ছে হত না, ভাই-ভাইপো যা করলে। আর বুড়োবয়সে কি একদিনে সেরে ওঠে নাকি?'

একটু চুপ করে থেকে কাতর-কণ্ঠে বলেন, 'বড়বৌ, হাত পায়ের ফুলোগুলো কমে গেলে বোধ হয় একটু জোর পাবো। তোমার বাপের বাড়ির দেশে কী এক সুতো পাওয়া যায় না? ধারণ করলে ফুলো কমে?'

বড়বৌ বললে, 'হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে পেটে কিছু হজম হচ্ছে না, তার দরুণ রক্ত নেই বলে হাত-পা ফুলছে—লালসুতো বেঁধে উনি সে ফুলো সারাবেন!'

তবু লালসুতো এনে দু পায়ে বেঁধে দেন। আরও দুএকটা মাদুলী আসে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় হয় না, পায়ে আর জোর আসে না কিছুতেই।

সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে রামলোচনের এই পরনির্ভরতা। বিছানায় শুয়ে দৈহিক কাজগুলো সারতে হয় এজন্য তাঁর তত দুঃখ নেই, কারণ সে বড় বৌ করে—এখনও তাঁকে তিনবার করে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল নিতে হয় মাথায় (এতবার স্নান করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা), সে জন্য লজ্জাও নেই—কিন্তু আহারটার জন্যেও যে পরের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, এর চেয়ে আর দুঃখ কি আছে? ডাক্তার বেঁধে দিয়েছেন পোরের ভাত, সিঙ্গি মাছের ঝোল আর কাঁচকলা সিদ্ধ, বিকালে বার্লি, রাত্রে দুধবার্লি বা খই-দুধ। এ খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে, না পায়ে জোর পায়? এ শুধু ওদের ষড়যন্ত্র ওঁকে পঙ্গু ক'রে রাখার।

রামলোচন হাঁ করে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বাইরের দালানের দিকে। কিন্তু দালানের একোণের দিকে প্রায়ই কারুর প্রয়োজন হয় না—কদাচিৎ কেউ ছিটকে এসে পড়ে। তবে যদি কেউ

আসে তার আর রক্ষে নেই, সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তাকে তাড়া করে, 'অ নবৌমা, মালক্ষ্মী, এদিকে একবার শোন-না। আমার মা-জননী কই গো, ছেলেকে কি মনে পড়ে না?'

আগে আগে দয়া-পরবশ হয়ে কিংবা ভদ্রতার খাতিরে, ইদানীং মজা দেখবার জন্য হয়ত সে এসে দাঁড়াল। ভাল করে ঠাউরে দেখে রামলোচন বললেন, 'ন-বৌমা নয়—আমাদের নতুন বৌমা, মালতী? বেশ, বেশ—আহা, তুমি মা কত বড় বংশের মেয়ে, তোমার বাবাকে ত আমি চিনি—মহাশয় লোক ছিলেন! আহা অমন লোক কি আর হবে!'

মালতী হয়ত বললে, 'ওকি জ্যাঠামশাই, ছিলেন কি, আমার বাবা ত এখনও বেঁচে আছেন!'

'থাকবেন বৈকি মা থাকবেন বৈকি! পুণ্যের শরীর তাঁর, দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবেন। তুমি দেখে নিও নতুন বৌমা, একশ বছর পরমায়ু পাবেন তোমার বাবা!···তা হ্যাঁ বৌমা, একটা কথা শুনবে মা?'

'কী বলুন?' অতিকষ্টে হাসি চেপে বললে মালতী।

'চারটি মুড়ী একটু নুন-তেল মেখে নিয়ে আসতে পার মা? খুব তুটিখানি?'

'না জ্যাঠামশাই, সে আমি পারব না। ডাক্তার আপনাকে তেল খেতে একেবারে বারণ করেছে!'

'ওসব ডাক্তারদের বুজরুকি মা, বুঝেছ? আমাকে মেরে ফেলবার মতলব। ওসব তুমি শুনো না বাছা,—যাও তুটিখানি মেখে নিয়ে এসো, লক্ষ্মী মা আমার!'

মালতী ঘাড় নেড়ে বললে, 'সে আমি পারব না। মা জ্যাঠাইমা রাগ করবেন।'

এই বলে সে হয়ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রামলোচন রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, 'তা পারবেন কেন? কুঁড়ে পাথর, নিজে গিলতে পারো খুব! রাক্ষুসী!···ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ত, ও আর কত ভাল হবে! ছোটলোকের ঝাড় সব!' ইত্যাদি।

সে রাগটা কমলে আবার উৎসুক দৃষ্টি মেলে শুয়ে থাকেন। এবার হয়ত আসে চাঁপা, মেজভাইয়ের নাৎনী। সঙ্গে সঙ্গে রামলোচনের কণ্ঠ মোলায়েম হয়ে আসে, 'চাঁপা ভাই, দিদি আমার, একবার শুনবি এধারে? একটুখানি, এক মিনিট?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাঁপা এসে দাঁড়ায়, 'কী বলছ?' সতেরো আঠারো বছরের ঝলমলে মেয়ে চাঁপা, সম্ভ বিয়ে হয়েছে ওর, শাড়িতে ও গয়নায় যেন জ্বলছে।

'চাঁপা ভাই, নাতজামাই এসেছিল কাল?'

'কাল কেন আসবে, কাল কি আসবার দিন? কী দরকার তাই বলো না—'

'না তাই বলছি! যাই বলিস ভাই চাঁপা, আমার সলিল বড় ভাল ছেলে, অমন জামাই একটাও এবাড়িতে আসেনি! যেমন রূপ তেম্‌নি গুণ! আর বিদ্যেটাই কি সোজা? সলিল আমার রত্ন।'

'আচ্ছা তাই না হয় হ'ল। এখন আমাকে ডাকছিলে কেন?'

'চাঁপা, একখানা গরম লুচি খাওয়াতে পারিস দিদি?'

'লুচি? লুচি কোথা পাবো?'

'তবে একটা গজা?' উৎসাহে, আগ্রহে, আকুলতায় মাথাটা ওঁর বিছানা থেকে ঝুলে পড়ে, 'একখানা খাস্তার গজা? গজা খেলে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না আমার, তুই দেখে নিস!'

'হ্যাঁ, তারপর বড়দি আমাকে বকুক! তাকে একশ বার ময়লা ঘেঁটে মরতে হচ্ছে, আর আমি কুপথ্যি খাইয়ে আরও রোগ বাড়িয়ে দিই। সে আমি পারব না।'

সবেগে মাথা নেড়ে, শাড়ির আঁচল দুলিয়ে চাঁপা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

রামলোচন পেছন থেকে গালাগালি দেন, 'মরণ! অহ্মারে মট্‌মট করছেন। তবু যদি বড়লোকের ঘরে বিয়ে হ'ত! ঐ ত বরের ছিরি, কালো রোগা ত্রেষ-কাঠ! ঐতেই এত তেজ! তেজের মাথা খাও!'...

আবারও গলাটা ঝুঁকিয়ে দালানের দিকে চেয়ে থাকেন, যদি কেউ আসে এধারে।

সেদিন বাড়িতে কি একটা খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় কোন বৌয়ের সাধ কিংবা অন্নপ্রাশন কারুর ছেলের। সারাদিন ভাল ভাল রান্নার গন্ধ রামলোচনের কাছে এসে পৌঁচেছে অত দূর থেকেও। সন্ধ্যা থেকে লুচি, কাটলেট, পাঁপর ভাজার গন্ধ। অনেকবার মিনতি করেছেন বড়-বৌয়ের কাছে, অনেক পরলোকের ভয় দেখিয়েছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। সন্ধ্যা বেলা রাগ করে দুধবার্লির গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তাতে লাভের মধ্যে

বড়বৌয়ের কুবাক্যই সইতে হয়েছে, পরে আর একগ্লাস বার্লিও জোটে নি। অতিথিদের শুনিয়ে গৃহস্থদের অপদস্থ করার ইচ্ছায় খানিকটা চীৎকার করে কাঁদবার চেষ্টাও করেছেন—ফল হয়েছে এই যে, ছোট ভাইপো এসে ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। অগত্যা ঘরে শুয়ে শুয়ে অতিথিদের আনন্দ-কোলাহল শোনা এবং পরিবেশণের শব্দ থেকে কি কি রান্না হয়েছে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করা—এছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি রামলোচন।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। বাড়ির সমস্ত গোলমাল কম্‌তে কম্‌তে একসময়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল যে, বড়বৌ মুখে যাই বলুক, আর এক গ্লাস বার্লি অন্ততঃ দেবে, কিন্তু সে আশাও একসময়ে ছাড়তে হ'ল যখন দালানের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ কানে এসে পৌঁছল।

রাগে, ক্ষোভে, ক্ষুধায় ঘুমোতে পারেন না রামলোচন। ইদানীং আর বড়বৌ এঘরে থাকেন না, রোগ খুব বেশি নেই, মিছিমিছি সারাদিন খাটুনির পর বিশ্রামটা নষ্ট করতে চান না। অয়েলক্লথের ওপর রামলোচন শুয়ে থাকেন, কতকগুলো ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পাশেই থাকে। 'পা পড়ে গেছে, হাত ত আর যায় নি!' ঝঙ্কার দিয়ে বলেন বড়বৌ, 'আমি কি আর দিনরাত ঐ করব?'

অবশেষে ঘড়িতে দুটো বাজল। কিছুতেই আর শুয়ে থাকতে পারেন না রামলোচন। নিজের অনাহার এবং ভাল ভাল খাদ্যের কল্পনা তাঁকে পাগল ক'রে তোলে। শেষ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত মতলব মাথায় যায় ওঁর, কোনমতে বিছানার ধারে এসে দেহের ওপরের অংশটা অনেকখানি ঝুলিয়ে দুই হাতে মেঝেটা স্পর্শ করেন, তারপর হাতের ওপর ভর দিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে পা-দুটো টেনে তক্তপোশ থেকে নামিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কাজটা দুর্বল শরীরের পক্ষে খুবই দুরূহ, হাত দুখানা থর থর করে কাঁপে, সমস্ত দেহ ঘামে ভেসে যায়। তবু রামলোচন হাল ছাড়েন না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরের নিচের অংশকে আকর্ষণ করতে থাকেন।

খানিকক্ষণ ধরে এমনি চেষ্টা করার পর একসময় সেটা ধপাস্‌ করে আছ্‌ড়ে এসে পড়ে মেঝের ওপর। যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ করে ওঠেন রামলোচন, কিছুক্ষণ আর নড়তেও পারেন না। মনে হয় পা দুটো বুঝি ভেঙেই গেল। কিন্তু খানিকটা পরে আবার নিজেকে সাম্‌লে নেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তিই জয়ী হয়ে ওঠে—দুটো হাতে ভর করে পা টানতে টানতে যান

দরজার দিকে, খোঁড়া কুকুর যেমন করে পেছনের পা-ছুটো টেনে টেনে চলে—কতকটা সেই রকম করে।

তারপর দরজাটা ফাঁক করে দালানে মুখ বাড়ান।

আঃ—কী মুক্তি! কতকাল পরে এ ঘরের বাইরে পা দিলেন তিনি!

আজকাল একটা পাঁচ বাতির আলো দালানে জ্বলে সমস্ত রাত। তাঁর অসুখের সময়ই এ ব্যবস্থা হয়েছিল, ছেলেপুলের ঘরে খুবই সুবিধা হয় বলে সেটা টিঁকে গেছে। ক্ষীণ আলো, তবু তাইতেই সর্বাগ্রে চোখে পড়লো তাঁরই ঘরের প্রায় সামনে এঁটো পাতা-গেলাস-খুরি স্তূপাকার করা আছে, তার সঙ্গে ছুচারটে গামলা বাল্‌তি প্রভৃতি বাসনও।

লোভে ও ঔৎসুক্যে চোখ ওঁর জ্বলতে থাকে। দেহে যেন অপরিসীম বল অনুভব করেন। সামনে এগিয়ে লোলুপ-আগ্রহে সেই এঁটো পাতার রাশির মধ্য থেকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে থাকেন—আধখানা লুচি, আলুর টুকরো, মাছের কুঁচি, খানিকটা কাট্‌লেট, সিকিখানা চিংড়িমাছ, দরবেশের গুঁড়ো, পান্তুয়ার অর্ধেকটা—এমন কি আস্ত সন্দেশ রসগোল্লাও এক-আধটা খুঁজে পান। খেতে খেতে যেন নেশা লাগে, পাতাগুলো তুলতে তুলতে জিভ দিয়ে চাট্‌তে শুরু করেন। সারা মুখে, বুকে, সর্বাঙ্গে তরকারির ঝোল, মিষ্টির রস, দই লাগে—তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খেয়ে একসময়ে শ্রান্ত হয়ে চুপ করেন রামলোচন। এইবার দালানটার দিকে ভাল করে তাকাবার অবসর মেলে।

ও কি, ওখানে শুয়ে কে! এত কাছে মানুষ ছিল তাঁর, আর এই কাণ্ড তিনি করেছেন এতক্ষণ ধরে, নিশ্চিন্ত হয়ে?

ভয়ে রামলোচনের বুকের মধ্যেটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। টিপ্‌ টিপ্‌ করে শব্দ হয় সেখানে।

কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হন। না, ও ঘুমোচ্ছে। ঝি বোধ হয়, নতুন ঝি।

রামলোচনের মনে পড়ে ওদের পুরোনো ঝি নেত্যর মেয়ে সাবি বিধবা হয়ে মার কাছে ফিরে এসেছে, তারই সম্প্রতি বাহাল হবার কথা শুনেছেন বড়-বৌয়ের কাছে। সাবি যখন এগারো বছরের মেয়ে তখন বিয়ে হয়েছে—এখন সে-হিসেবে ওর কুড়ি-একুশ বছর বয়স হবার কথা। কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে!

কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে ক্রমশ। তেমনি হাতে ভর দিয়েই এগিয়ে যান তার দিকে। একটা মাছুরের ওপর সাবি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। পরিশ্রান্ত

দেহ, কাপড়চোপড় যে এলিয়ে পড়েছে তা ও টের পায় নি। ওরই মাথার ওপর আলোটা জ্বলছে, সেই আলোতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামলোচনের দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে ওঠে বহুকাল পরে, তিনি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যান। সেই খাবারের রস ও ঝোল মাখা হাতেই ওর নধর যৌবনপুষ্ট কাঁধ ও হাতের ওপর হাত বুলোতে যান। হাতই যেন রসনা ওঁর, সাবির তরুণ যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করেন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে।

কিন্তু সে স্পর্শে সাবির ঘুম ভেঙে যায়। মুহূর্ত কয়েক বিহ্বল ভাবে ঘুম-চোখে তাকিয়ে থেকে ঘুম-ভাঙার অর্থ খুঁজে পায় সে। বৃদ্ধের লোলুপ দৃষ্টি এবং সর্বাঙ্গে ঐ ভোজ্যের রস মাখা বীভৎস চেহারা দেখে ভয়ে বিকট চীৎকার করে একেবারে হাট বাধিয়ে তুললে।

সেই চিৎকারে বাড়িশুদ্ধ সবাই ছুটে এল। তাদের খানিকক্ষণ সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর বড় বৌ মেঝেতে মাথা খুঁড়তে লাগলেন লজ্জায় ও অপমানে, বাকি সকলে যার যা মুখে এল বলতে লাগল।

সেই অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার মধ্যে ব্যাকুল অসহায় আর্ত রামলোচন বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলেন চুপ করে—শুধু কী যেন একটা কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ওর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

বেলকুঁড়ির মা

বেশী দিনের কথা নয়—এই বছরেই, ১৯৮৪ সালের জুন মাসে, ক'দিনের জন্যে হরিদ্বার গিয়েছিলাম। পড়লাম বিপুল জনসংঘট্টে। এ সময় এর আগেও গিয়েছি, বছরের সব ঋতুতেই হরিদ্বার দেখেছি--বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু এত ভীড় এক কুম্ভমেলার সময় ছাড়া আর কখনও দেখি নি। রাস্তা এমন কিছু চওড়া নয়, কাজেই এর মধ্যে টাঙ্গা, রিকশা, মোটরগাড়ি, বাস—আর এই অগণিত মানুষ এক সঙ্গে যাওয়া আসা করলে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। দেখলুম এই হিসেবেই পুলিশ বেলা তিনটে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত থানার উত্তরে যান-বাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছেন। ফলে ওখান থেকে 'হর-কি-প্যারী' পর্যন্ত ঠেলাঠেলি করতে করতে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। দুদিকে দুটো বাই-পাস রোড হয়েছে, তবে সে পথে যেতে গেলে ডবল ভাড়া লাগে, সময়ও অনেক বেশী। তাও একেবারে ব্রহ্মকুণ্ড পর্যন্ত কেউই পেঁাছে দেয় না।

এ সময়ে এত ভীড় কেন, শুধোলুম দু-একজন কর্তাব্যক্তিকে। তাঁরা বললেন, বাস-ট্যাক্সির অভাবে কেদার-বদরীর যাত্রী চার পাঁচ হাজারের মতো ঋষিকেশে আটকা পড়েছে—সে কথা শুনে বহু যাত্রী এখানেই অপেক্ষা করছেন। এ ছাড়াও, যাঁদের সিমলেয় বেড়াতে যাবার কথা, তাঁরা গোলমালের ভয়ে মুসৌরীতে ঠাণ্ডা পাহাড়ের সাধ মেটাচ্ছেন। আর তাঁদেরও অধিকাংশ যাওয়া-আসার পথে দুটো দিন হরিদ্বারে থেকে যাবেন বৈকি। সবটা জড়িয়েই সুমথবাবুর ভাষায়, 'পৈশাচিক ভীড়'।

তবু কটা দিন যা হয় করে কাটল, হেঁটেই যেতুম খানিকটা—ফেরার পথে ফেরার গাড়িও পাওয়া যেত, কিন্তু দশহরার দিনে অবস্থা চরমে পেঁাছলো।

আমি অত ভেবে দেখিনি, সকালের দিকে গাড়ি, রিক্সা চলবে এই ভরসায় কনখল থেকে দিব্যি রিকশায় চেপে বসেছি, ব্রহ্মকুণ্ডে যাবো বলে। উদ্দেশ্য দুটো, প্রথম-একটা টেলিগ্রাম করব, দ্বিতীয় চেনা ভাল দোকান থেকে হিংয়ের কচুরি কিনব।

কিন্তু স্টেশন বরাবর পেঁাছেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলুম। প্রায় সেখান থেকেই আজ গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ করা হয়েছে। পদাতিকদের অবস্থাও ভাল না, পেষা-পিষি ভীড়—নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র বলতে গেলে। এক সিপাহীকে জিজ্ঞেস করে জানলুম, রাত তিনটে থেকেই নাকি গাড়ি ঘোড়া বন্ধ, সারা দিনরাতই বন্ধ থাকবে। আজ দশহরার স্নান, আমরা কি তা জানি না?

ফিরে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু সেও মন রাজী হলো না। আসল ঘিয়ে ভাজা হিংয়ের কচুরির আকর্ষণ প্রবল। ধাক্কাধাক্কি করতে করতে নালসুদ্ধ জুতোর তলায় বার কতক পিষ্ট হয়ে খেঁাড়াতে খেঁাড়াতে একটু একটু করে এগিয়ে চললুম। পা যাক, কিন্তু মাথা না যায়—এই চিন্তা। রাজস্থানী ভগ্নীদের 'শির পর' কোণ-বার-করা লোহার প্যাটরা, প্রতি মুহূর্তেই পার্শ্ব-বর্তীদের মাথা কাটবার সম্ভাবনা।

এইভাবেই শম্বুক গতিতে এগোচ্ছি, হঠাৎ বিশুদ্ধ কলকাত্তাই বাংলায় কানের পাশে কে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আ খেলে যা! মরণ হোক তোদের। বড় বড় জুতো সুদ্ধ ক্রমাগত পা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমার পা দুটো থেঁতো করে দিলে গা। এমন জানলে দশহরা আর মা গঙ্গা মাথায় রেখে ধর্মশালাতেই পড়ে থাকতুম। সব বেটাবেটি যেন উটমুখ করে চলেছে। বুড়ো মানুষের পা, তার আর দাম কি বলো। সেদিকে চাইবে কেন। হাত্তোর···'

প্রবাসে বাংলা গালাগালও মিষ্টি লাগে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে

মুখটাও চেনা চেনা মনে হলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সে মহিলাও আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো, হাত দিয়ে পার্শ্ববর্তিনীর প্যাঁটরার আঘাত থেকে মাথাটা বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে বলে উঠলেন, 'কে, আমাদের বলাইবাবু না? ওমা, আপনিও এয়েচেন? আপনিও কি গঙ্গায় যাচ্ছেন নাকি?'

এবার আমারও মনে পড়ল—বেলকুঁড়ির মা।

সেই ভীড় ও ধাক্কাধাক্কির মধ্যেই তাঁর প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিয়ে, তাঁর ধর্মশালার নাম ও অবস্থান জেনে নিয়ে এবার উল্‌টো মুখ ধরলুম।

এভাবে গেলে ব্রহ্মকুণ্ড পোঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে হয়ত। আর দরকার নেই, হিংয়ের কচুরির সাধ মিটে গেছে।

একটু কেমন অবাক লাগছিল বৈকি।

কতকাল দেখিনি বেলকুঁড়ির মাকে। এক সময় এক পাড়াতে ছিলুম, বছর তিন-চার, কিন্তু সে অন্তত উনিশ কুড়ি বছর আগের কথা। এত কালের মধ্যে কিছু কিছু খবর পেলেও দেখা হয় নি একবারও। আজ আমাকে দেখেই চিনলেন কি করে?

বেলকুঁড়ির অবশ্যই একটা পোশাকী নাম ছিল। ভাস্বতী না কি যেন—সেটা অত মনে নেই। বেলকুঁড়ি নামটা অদ্ভুত বলেই এর ওপর জোর দিতুম, ইচ্ছে করেই বার বার উচ্চারণ করতুম।

বেলকুঁড়ির মাকে আমরা বৌদি বলতুম। শুধু আমি কেন, আমার ভাইপো ভাগ্নে সবাই। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন তখন, ভাল কি একটা চাকরিও করতেন। অবস্থা স্বচ্ছল, নিজেদের বাড়ি। দুটি মাত্র সন্তান—এক ছেলে আর ঐ এক মেয়ে।

মায়েদের স্বভাবত ছেলের দিকেই টান বেশী হয়, কিন্তু বৌদির ছিল উল্‌টো। মেয়ে নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। আসলে ছেলেটা একটু ভ্যাদা ভ্যাদা ছিল, ভাল মানুষ গোছের। লেখাপড়াতেও মাঝারি। দুজন টিউটার রেখেও কোন মতে বছরের শেষে পাস করানো ছাড়া কিছু করা যায় নি। সেই জন্যেই বোধ হয় বৌদি তাকে তত টানতেন না, যতটা টানতেন মেয়েকে।

বেলকুঁড়ি সব দিক দিয়েই আকৃষ্ট করার মতো। দেখতে বেশ সুশ্রী—

বরং সুন্দরী বলাই উচিত। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, তাতে গোলাপী আভা ; আয়ত চঞ্চল দুটি চোখ ; ছিমছাম একহারা গড়ন, তাই বলে কাঠের মতো নয়। ওরই মধ্যে একটু নরম নরম ভাব। লেখাপড়াতেও ভাল, ওর জন্যে কোন প্রাইভেট টিউটার দরকার হয় নি। নিজে পড়েই বরাবর স্কুলে ফার্স্ট, সেকেণ্ড হয়েছে। বুদ্ধিমতী যে, সেও ওর চোখের চাহনি আর কথাবার্তার তীক্ষ্ণতা দেখেই বোঝা যেত।

আমরা যখন ও পাড়ায় যাই তখন ওর বছর দশ এগারো বয়েস। চলে আসি যখন তখন চৌদ্দ পনেরো। স্কুলের পালা সাঙ্গ করার সময়।

মেয়ের সম্বন্ধে ওর মায়ের যেমন উচ্চ ধারণা ছিল, তেমনি আমাদেরও— যতদূর জানি পাড়ার সকলকারই। আমার মা বলতেন, 'দেখে নিও বেলকুঁড়ির মা, তোমার মেয়ে একদিন হাইকোর্টের জজ হবে'।

'হ্যাঁ, তুমিও যেমন। মেয়েছেলে আবার জজ। কোন মতে বি-এ পাশ করলেই বিয়ের চেষ্টা দেখব।'

বলতেন কিন্তু আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত ওঁর মুখ।···

ও পাড়া থেকে চলে এলেও খবরাখবর কানে আসত। ছেলে সুসীম বি-এ পাস ক'রে বাপের অফিসে ঢুকেছে। মেয়ে বি-এ পড়ছে।

কিন্তু সে পাস করার আগেই ভবেশদাদা মারা গেলেন, আপিসে কাজ করতে করতেই। দশ মিনিটের মধ্যে নাকি সব শেষ।

আরও খবর কানে এল, বেলকুঁড়ি ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে। ফার্স্ট হতে পারে নি, সেকেণ্ড হয়েছে।

এর মাস দুই পরেই শুনলুম, সে নিজেই একটা মার্কিন ফার্মে দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি যোগাড় করেছে। ভালো মাইনে। তাছাড়া বাড়ি ভাড়া ও অন্য কিছু কিছু য়্যালাউন্সও আছে।

এ খবরের বছর খানেক পরে ওঁদের পাশের বাড়ির পরেশ কাকার সঙ্গে দেখা হতে খবর পাওয়া গেল, সুসীমকে ঐ আপিসেরই এক বড় কর্তা জামাই করে নিয়ে ভাল চাকরি দিয়ে নাগপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বৌ নিয়ে ঘর করা বৌদির হয়ে ওঠে নি। এখন এ বাড়িতে বেলকুঁড়ি আর তার মা শুধু থাকেন। বৌদি নিচের তলা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু তার পরে যে খবর এল—আর যাই হোক, তার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলুম না।

সকলেরই একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল, সম্পূর্ণ অনাত্মীয়দেরও। মেয়েটাকে

আমরা সবাই বুদ্ধিমতী ভাবতুম, সে এই কাজ করে বসল।

অমন সুন্দরী লেখাপড়া-জানা ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। সে নাকি ওর আপিসেরই এক অল্পবয়সী গুর্খা দারোয়ানকে বিয়ে করে বসে আছে। নেহাতই অল্পবয়সী, ওর চেয়েও বছর দুই নাকি ছোট হবে, তবে দেখতে খুব ভাল। রীতিমতো রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে—নড়চড়ের কোন উপায় নেই। আপিসের বড় সাহেবের এতে নাকি খুব সহানুভূতি। তিনিই ব্যবস্থা করে একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়েছেন, আপিসের তরফ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে, সেখানেই স্বামী-স্ত্রী বাস করছে এখন। স্বামী দারোয়ানী ছেড়ে দিয়েছে, সে নাকি ব্যবসা করবে। আপাতত স্ত্রীর পোষ্য হয়ে আছে।

বৌদি চেঁচামেচি, গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত যা করবার সব করেছেন, কিন্তু মেয়ে সাফ বলে দিয়েছে, তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, যা করেছে, ভেবেই করেছে। মাকে সে টাকা দেবে নিয়মিত— তাঁর কোন অসুবিধাই হবে না। আর যদি ওদের সঙ্গে থাকতে চান, তিনি স্বচ্ছন্দে ওপর তলাটা ভাড়া দিয়ে এ ফ্ল্যাটে চলে আসতে পারেন। আরও বলেছে, ছেলেও তো মার পক্ষে অবাঞ্ছিত বিয়ে করে তাকে ফেলে চলে গেল, কৈ, তার জন্যে তো মা এত দাপাদাপি করেন নি।

কিছু টাকা নাকি প্রথম মাসে পাঠিয়েও ছিল। বৌদি তা ফেরৎ দিয়েছেন।

খবর এর পর পেয়েছিলুম আরও বছর তিনেক পরে। বৌদিও নাকি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছেন। ওঁদেরই এক প্রাক্তন রাঁধুনীর মেয়েকে পুষ্যির মতো নিয়ে রেখেছেন। চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে, চলনসই দেখতে, লেখাপড়া কিছুই জানে না। অত বয়সে স্কুলে ভর্তি করলে লজ্জা পাবে বলে বৌদি এক বুড়ো মাষ্টার রেখে বাড়িতেই পড়াচ্ছেন কিছু কিছু। কিন্তু সে যাই হোক, তাকে মেজে-ঘষে সাজিয়ে গুজিয়ে তার চেহারাই পালটে দিয়েছেন বলতে গেলে। তাকে দেখলে এখন নাকি বেশ সুদর্শনা আধুনিক তরুণী বলে মনে হয়।

বৌদির এত মেয়ের শখ। আমরা সবাই বলাবলি করলুম। এত কাণ্ডের পর আবার সেই মেয়েই নিলেন।...

এর পর শেষ যা খবর পেয়েছিলুম তাতে অভিনব কিছু নেই। ছেলেমেয়ে অবাঞ্ছিত বিয়ে করলে প্রথম প্রথম বাবা মা খুবই তিক্ততার সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার পরই আমে-দুধে এক হয়ে যায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে। মাসিমার বেলাও তার অন্যথা হয় নি। তিনি এখন ওদের ফ্ল্যাটে যাওয়া আসা করছেন,

জামাইকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে বাঙালী রান্না, ভাল ভাল খাবার খাওয়াচ্ছেন। খুব নাকি পছন্দ জামাইকে; বলেন,—না বাপু, ছেলেটা ভাল। বেশ নেটিপেটি, আর ঠাণ্ডা স্বভাব। আর কাজকর্মও তো করছে—শুনছি কি সব দালালী-টালালী করে, তাতে বেশ কিছু আসছেও। মেয়েকে আমার ভালও বাসে খুব। সমীহও করে। একটু কিছু বাড়ির কাজ করতে দেয় না, সব নিজে করে। বৌয়ের পায়ে কাঁটা ফুটলে বোধ হয় নিজের দাঁত দিয়ে তুলে নেয়—এমনি ভাব।

এর পর গত দুতিন বছর আর কোন খবরই পাই নি। আমিও এখন কলকাতায় থাকি কম, তাছাড়া যাদের মারফৎ ওঁদের খবর আসত তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। মারাও তো গেছেন অনেকে।

এতদিন পরে একেবারে এই দেখা ওঁর সঙ্গে।

পরের দিন সকালেই খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হলুম। পঞ্চায়েতী মারোয়াড়ী ধর্মশালাতে আছেন, স্টেশনের কাছেই, বেশী ভিড় ঠেলতে হল না।

বৌদি ঘরেই ছিলেন, বোধ হয় আহ্নিক পূজো সেরে উঠেছেন এই মাত্র। কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরণে তসরের থান ধূতি। তাড়াতাড়ি উঠে একটা কুশাসন পেতে দিয়ে বললেন, 'বোস ভাই। সত্যিই মনে করে এলে এই আমার ভাগ্যি। বুড়ো হাবড়া অবীরে মেয়েছেলের খবর নিতে কেই বা গরজ করে আসে। তারপর? সব ভালো তো? চা খাবে একটু? করে দোব? ছ্যাখো, সব যোগাড়ই আছে। আমি একবার ভোরেই খেয়ে নিয়েছি। নির্জলা একাদশী যেকালে করি না—কেই বা করে এখন—সেকালে খেতেই বা দোষ কি?'

এর পর আমাদের পরিবারের ও সংসারের যাবতীয় সংবাদ নিয়ে স্টোভ ধরিয়ে চা করতে বসলেন।

আমি এবার প্রথম প্রশ্ন করার সুযোগ পেলুম, 'তারপর? সুসীমের খবর কি? এখানে আসে-টাসে? এখন আছে কোথায়?'

'না, আসে না। খবরই রাখতে চায় না। ওর শ্বশুর একবার বাড়ির অংশ নিয়ে কথা তুলেছিল, তা আমি সোজাসুজি ঝাঁটা হাতে করে এগিয়ে গিয়ে দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম, বাড়ি আমার, আমার নামে। আমি যতদিন আছি ততদিন আবার ভাগের কথা কি? মলেও এ বাড়ি যাতে

আমার ছেলেমেয়ে না পায় সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি। শুনছি তো বাবু এখন বোম্বেতে কি ফ্ল্যাট কিনেছে। একটা ছেলে—সেও নাকি বাপেরই মতো হয়েছে বোকা-বোকা, ভ্যাবা গঙ্গারাম।'

'বেলকুঁড়ি কেমন আছে?'

চা ছাঁকতে ছাঁকতে বেশ সহজভাবে উত্তর দিলেন, 'সে তো আর নেই। চলে গেছে।'

'চলে গেছে তার মানে?' ঠিক বুঝতে পারি না কথাটা।

'চলে গেছে বুঝলেন না? মারা গেছে। আরও খোলসা করে বলি, আত্মঘাতী হয়েছে।'

(বৌদি কখনও 'আপনি' কখনও 'তুমি' বলেন চিরকালই। তেমনি কখনও 'ভাই' কখনও 'বাবা'!)

'আত্মহত্যা করেছে! সে কি? কেন?'

সত্যিই একটা যেন দৈহিক আঘাত পাই। অমন মেয়েটা! আহা!

'কেন আবার ভাই। মনের আগুন। কৃতকর্মের ফল। নিজেই খাল কেটে বিলের জল ঘরে ঢোকালে নিজেকেই কুমিরের পেটে যেতে হবে বৈকি! ...বুঝলে? মাথায় গেল? এই যে এদানীং সব লাভ ম্যারেজের ফ্যাশন হয়েছে, কেউ সুখী হয়? যে আমাকে ভালবেসে এসেছে, সে যে আর একজনকে আবার ভালবাসবে না, তার মানে কি? যদিও না বাসে, নিজের মনের সন্দটা যাবে কোথায়? বর বৌ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না।'

'এমনি বাজে সন্দেহে মেয়েটা প্রাণ দিল!'

ততক্ষণে চা, ক্ষীরের মিষ্টি সাজিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। বেশ সহজভাবেই আবার সামলে গুছিয়ে বসে বললেন, 'অবিশ্যি একেবারে বাজে সন্দও নয়। একটু কারণ ঘটেছিল, আর এই তিথিস্থানে মিছে বলব না—সে ঘটিয়েছিলুম আমিই।'

'তার মানে! আপনি?'

ভদ্রমহিলার দুই কোটরগত চোখে যেন নিমেষে আগুন জ্বলে উঠল, মুখে ভয়াবহ এক কুটিল হাসি। যেন চোখের পলকে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পিশাচী হয়ে উঠলেন।

কঠিন ব্যাঙ্গের সুরে বললেন, 'আমি একটা সোমত্ত মেয়ে পুষ্যি নিয়েছিলুম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। আরও শুনেছি যে, আপনি তার ভোল পালটে দিয়েছেন।

রূপকথার সেই আগলি ডাকলিংকে রাজহাঁস করে তুলেছেন।'

'কেন নিয়েছিলুম সেটা আঁচ করতে পারো নি? মাছ গাঁথতে গেলে চারও চাই, টোপও চাই'। ঐ হারামজাদা জামাইকে কাছে এনে কত কি খাইয়েছি, কত যত্ন করেছি—প্রিতি মুহূর্তে তাতে বিছের জ্বালা সহ্য করেছি। কিন্তু ওটার দরকার ছিল। ঐটেই চার। সেই জন্যেই তো মেয়েটাকে পোষা। ঐ মেয়েটা বিভা নাম, সে-ই যত্নআত্তি করত, ঠাঁই করা, পরিবেশন করা—মায় এলে পা থেকে জুতো খুলে নেওয়া পর্যন্ত। সবটা আমার শেখানো নয়, কিছুদিন পরে নিজের প্রাণের টানেই করেছে, ছোঁড়াটা সুন্দর দেখতে, তাগড়া জোয়ান, অল্পবয়িসী মেয়ে সেবা করতে তো চাইবেই। পায়ের জুতো খোলা, কপালের ঘাম মুছিয়ে নেওয়া মানেই তো মানুষটাকে ছোঁওয়া গো। জামাই-বাবু বলত, এতে কেউ দোষও ধরতে পারবে না। ছেলেটারও তো ত্যাখনও কাঁচা বয়েস, টোপ গিলল। মেয়েটা গর্ভবতী হল। এদান্তে আমি ইচ্ছে করেই দুজনকে রেখে একটু আধটু বাইরে যেতুম, আশপাশের বাড়িতে। আধ ঘণ্টা পোন্ ঘণ্টা বড় জোর, তা তাই তো যথেষ্ট—কি বলেন।'

বলে অধিকাংশ দন্তহীন মুখে বীভৎস হাসি হেসে চোখ টিপলেন।

আমি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বললুম, 'তার পর?'

'তারপর আমি রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরলুম। মেয়ের কানে যাতে ঠিক ঠিক পৌঁছয় সে ব্যবস্থারও ত্রুটি রাখি নি। বেগতিক দেখে ছোঁড়াটা বিভাকে নিয়ে পালাল। মেয়ে আমার বেশী সুন্দর হতে পারে, তা সেটা তো চাখা হয়ে গেছে—তাছাড়া তার কাছ থেকে তো এমন সেবা পায় নি।'

এই বলে একটু থেমে বললেন, 'মেয়ের জ্বালার বেস্তর কারণ। ছেলেটাকে ভালবাসত, সে এমন বেইমানী করল সে জ্বালা তো আছেই—এর পর ঘরে বাইরে যে টিটকিরি শুরু হল সেইটেই সইতে পারল না।'

'ওর ছেলেমেয়ে হয় নি?

'একটা ছেলে। তাকে আগেই ওর এক মেয়ে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিছু টাকা ব্যাঙ্কে আছে বুঝি, তার সুদ ঐ বন্ধুর কাছেই যাবে—তবে সে জন্যে নয়, আমি শুনেছি, খোঁজ নিয়েছি, সে বন্ধুরও ছেলেপুলে হয় নি, খুব যত্ন করেই মানুষ করছে। সত্যি সত্যিই ভালবাসে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। বয়স্কা ভদ্রঘরের মহিলা প্রতিহিংসায় এমন পিশাচী হতে পারে কখনও ভাবি নি। শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

শেষ অবধি বলেই ফেললুম, 'আপনি জেনে শুনে হিসেব ক'রে নিজের

মেয়ের এমন সর্বনাশ করলেন ?'

'কেন করব না গা বলাইবাবু !' বৌদি যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন। মনে হয় নিজের বিবেকও পীড়া দিচ্ছিল, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত, বোধ হয় ভীতও হয়ে পড়েছেন। এ জবাব সেই বিবেককেই।

বললেন, 'আমি ঐ মেয়ের জন্য কি না করেছি। ছেলের দিকে কখনও তাকাই নি, নিজের সোয়ামীর কথা ভাবি নি। সেই মেয়ে যদি আমাকে ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে চলে যায়—আমি তার শোধ নেব না! আমিই কি ঘরে-বাইরে কম অপমান সহ্য করেছি, কম টিটকিরি সইতে হয়েছে আমাকে!··· আমাকে নিজের বয়েস দেখিয়েছিল, আইনে কোন বাধা দিতে পারবে না, এই তো তার অর্থ—তাই নয় কি ? আবার বলেছিল, কিছু কিছু টাকা পাঠাব, তাহলেই তো হল। জুতো মেরে গরুদান! আমি ওর টাকার পিত্যিশী—সেই জন্যে অমন করে মানুষ করেছিলুম! কখনও একটা কমদামী শাড়ি কি খেলো জামা পরতে দিই নি। তার এই প্রিতিফল! ···বেশ করেছি, শোধ নিয়েছি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছি, ওরই মন্তরে ওকে জব্দ করেছি। সাপকে লাথি মারলে সে কি ছেড়ে কথা কইবে ? ফিরে ছোবল দেবে না ? তোমরা বলবে, তুমি কি সাপ ? হ্যাঁ, তাই। সব মেয়ের মধ্যেই সাপ একটা লুকিয়ে থাকে।'

বলতে বলতেই তাঁর সেই জ্বলন্ত চোখের কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল। তিনি ছুটে বাইরে চলে গেলেন।

অসম্বন্ধ ঘটনা

দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ঘটেওছে দুদিন আগে পিছে ; কিন্তু বিচিত্র কারণে একই দিনে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।

পরশুর আগের দিন মধ্যমগ্রামের কাছে এক জায়গায় ডোবার ধারে এগারো বারো বছরের একটি ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, তার দেহে নাকি অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন, মুখখানা তো মনে হয় ভারী কোনো জিনিস দিয়ে একেবারে থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে—যাতে লাশ সনাক্ত করা না যায়। তার পরণে হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি কিন্তু সে দুটোও নতুন, অর্থাৎ পুরনো জামাকাপড়

দেখে যে কেউ খোঁজ পাবে, সে উপায়ও রাখা হয় নি।

[কে-ই বা খোঁজ করছে, কার এত গরজ ? মনে মনে বলে বিজিতা। নিত্য যদি একগাদা করে খুন হতে থাকে, পুলিশ করবে কি ? তাছাড়া পুলিশেরও তো প্রাণের ভয় আছে।]

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল। গড়িয়াহাট ব্রীজের নিচে ঘুপ্‌চি মতো জায়গায় কে বা কারা একটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের লোককে খুন করে রেখে গেছে। বীভৎস হত্যা—খবরের কাগজের ভাষায় পেটটা একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত ফালা করে দিয়েছে, ফলে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। ওখানটা এমনিই অন্ধকার, কিছুক্ষণ লোডশেডিংও ছিল, সেই সময় কেউ কাজ সেরেছে। চেনা লোক সম্ভবত, যাকে কোন সন্দেহ হয় নি, ডেকে এনে খুন করেছে। কখন কাজটা হয়েছে কেউ জানে না। ওখানে বড়-একটা কেউ যায় না, কিছু গৃহহীন লোক রিক্সাওলা প্রভৃতি রাত্রে ঐখানে শুয়ে থাকে। তাদেরই একজন প্রথম দেখেছে। এ লাশও সনাক্ত হয় নি এখনও। হত্যাকারীর চিহ্ন একটা শাল পড়ে আছে কিন্তু তাও লণ্ড্রীর নম্বর যেখানটায় সুতো দিয়ে তোলা থাকে সেখানটা কাটা। মনে হয় হত্যাকারী ঐটে জড়িয়ে এ কাজ করেছে, যাতে তার জামা প্যান্টে না রক্তের দাগ লাগে।

কাগজখানা এলোমেলোভাবে পাট করে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'ধ্যেৎ' বলে উঠে রান্নাঘরের দিকে যাবে, নরেশ ডাকল, 'এই শোন।'

আজ সকাল থেকেই অঘটন চলছে। বিজিতার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

নরেশের পক্ষে এই সকাল নটা পর্যন্ত বাড়ি থাকা এবং মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়া—এই তো যথেষ্ট অঘটন। তার ওপর এই আকস্মিক সাধারণ স্বামীর মতো স্ত্রীকে ডাকা। আজ হ'ল কি ?

ওদের বিয়েটা হয়েছিল পাড়ার মধ্যেই। হাতের কাছে যে অল্পবয়সী ছেলে পাওয়া যায়, অল্পবয়সী মেয়েরা তারই প্রেমে পড়ে বেশির ভাগ। উল্‌টোটাও তাই। বিজিতার বাবাও আপত্তির কারণ খুঁজে পান নি। ছেলে বি. কম. বি. এল. পাস। রাজনীতি করে বটে—কিন্তু সেটা তার পেশা ধরে নিলেই হল। যে দলের হয়ে নরেশ কাজ করে, সেই দলটিই খরচ চালায়। ভাবগতিক দেখে মনে হয় বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে। এমনি আরও বহু কর্মী টাকা পায়। এইভাবে টাকা পায়—চারদিকে এমন ঢের ছেলে আছে। এক সময় এদেরই মধ্যে থেকে ইলেক্‌শনে দাঁড়াবে কেউ কেউ—দল জিৎলে মন্ত্রী না হোক উপমন্ত্রী রাষ্ট্রমন্ত্রী

হওয়াও আশ্চর্য নয়। আর তাহলে বাড়ি গাড়ি হতে দেরি হবে না।

বিয়ের পরই অবশ্য বিজিতার মোহভঙ্গ হয়েছে। না, অর্থাভাব হয় নি একদিনও। সংসার চলেছে মসৃণ ভাবেই। ছেলে মেয়েও হয়েছে। তারা লেখাপড়াও শিখছে। কিন্তু মানুষটা কৈ ?

বারবারই অনুযোগ করে বিজিতা, প্রতিবারই এক উত্তর শোনে, 'কেন তোমার অসুবিধা হচ্ছে কি ? খাওয়া পরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, কোন্‌টা হচ্ছে না ? ঝি আছে, একটা এখন আবার বাচ্ছাও জুটেছে, ফাইফরমাশ খাটার। আরও কি চাও তুমি ? বরং যা স্বাধীনতা পাচ্ছ, এতটা কি কেরানির বৌ হলে পেতে ? যা খুশি তাই কিনচ, ইচ্ছেমতো খরচ করছো। আমাকে পাওয়া তো হয়েই গেছে, তার প্রমাণ তো এই দুটো। আমি যদি ব্যবসাদার হতুম তো এর চেয়ে বেশি দেখা পেতে না মানিক। তাদেরও আসা যাওয়ায় কোন ঠিক থাকে না।'

কথাগুলো সত্যি তাও বিজিতা মানতে বাধ্য। ঠিক নেই, হয়তো তিন চার দিন এলই না। কোথায় যায় কোথায় শোয়—কেউ জানে না। বদ-খেয়ালী যে করে না সেটা বোঝে, দলাদলি, পার্টিতে পার্টিতে টক্‌রা-টক্‌রি যেখানে, সেখানে এসবের সময় কোথা ? মাঝে মাঝে তার বাড়িতেও তো এক এক সময় দল এসে পড়ে, মন্ত্রণা হয়—সে হৈ-হল্লা কথাবার্তা থেকেই বুঝেছে যে এদের ওসব ফুর্তি করার কোন সময় নেই।

বিজিতার বাবা অবশ্য বলেছিলেন, 'ছাখ বিজু, একটা কথা সাবধান করে দিচ্ছি, পলিটিক্‌স ইজ এ হোল-টাইম জব, এর পর হয়ত এমন সময় আসবে যে তোর মুখের দিকে চেয়ে ও তোকে চিনতে পারবে না।'

কিন্তু ঠিক এই সঙ্গহীনতার জন্যেই ওর এত দুশ্চিন্তা নয়।

বছর খানেক হলো সচ্ছলতা আরও বেড়েছে। মুঠো মুঠো টাকা এনে নরেশ ওদের আলমারিতে রাখে। সিঁড়ির নিচে যেখানে ভাঙ্গাচোরা ডেয়ো-ঢাকনা থাকে, তার আড়ালে একটা বাতিল ফুটবলের মধ্যে বিস্তর একশো টাকার নোট পোরা থাকে—তাও দেখেছে। নরেশের নিজস্ব আলমারির চাবি আগে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতো, বিজিতা কতবার খুলেছে—আজকাল নরেশ নিজের পৈতেয় বেঁধে রাখে, এমন কি রাত্রে শোবার সময়ও পৈতেয় বাঁধা অবস্থাতেই ট্যাঁকে গোঁজা থাকে।

তার মানে অনেক টাকা ! এত টাকা কোথা থেকে আসে ?

কে দেয় ? বিয়ের আগে থেকে নরেশের মুখে শুনে আসছে পার্টির

কাজের জন্যে চাঁদা ওঠে, বড় বড় কারবারীরা দেয় নানা সুবিধে আদায়ের জন্যে। তা নইলে এই সব ইলেকশনের লাখ লাখ টাকা আসে কোথা থেকে? অবশ্য ওরা সব দলকেই দেয়—কে কখন গদিতে বসে তার তো ঠিক নেই।

কিন্তু সে চাঁদার কতটুকুই বা এদের মতো মাঝারি কর্মীর হাতে আসবে? যা আসে তাতে ছোট সংসার হয়ত স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে, বাহুল্য করা, বড়মানুষী করা, সম্ভব নয়। নরেশ হোমরা চোমরা কেউ নয়, কর্মিদলের কয়েকজন প্রবীণের মধ্যে একজন। তার কাছে দলের এত টাকা থাকবে কেন? কি ভরসায় রাখেন দলের কর্তারা? না কি গোপনে উচ্চস্তরে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়—সেইজন্যে যাকে কেউ সন্দেহ করবে না, তার কাছে গচ্ছিত রাখে? না কি সকলের কাছেই এমনি থাকে, কর্তাদের কাছে আরও বেশি?

কে জানে। মরুক গে। ওর কি এত মাথাব্যথা?

তবু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি আর অশান্তি থেকেই যায়।

এছাড়াও অস্বস্তির কারণ দেখা দিয়েছে একটা। শালা ভগ্নিপতির সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতা।

বিজিতার ছোট ভাই বিমু কোন কাজকর্ম যোগাড় করতে না পেরে, দিদির প্রাচুর্য দেখে নরেশের পথই ধরেছে। রাজনৈতিক কর্মী বা ক্যাডারের দলে যোগ দিয়েছে। তবে সে একেবারে অন্য দলের হয়ে কাজ করছে—যাদের সঙ্গে এ দলের প্রায় অহি-নকুল সম্পর্ক। দল তো অনেক আছে এ দেশে।

যে দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল তারই দুই কর্মী এরা। তবে বিমু নরেশের মতো প্রতিষ্ঠিত সর্বজন-পরিচিত অগ্রজ কর্মী নয়। নরেশের তাঁবে যত কর্মী—মারামারি করা, চাঁদা তোলা, শ্লোগান দেওয়া, মিছিল বার করা এতে অনেক লোক লাগে—এত বিমুর তাঁবে থাকবে তা সম্ভব নয়, সে এখনও দলের কনিষ্ঠ কর্মী, সাহস বা ড্যাশ বেশি থাকায় ওরই মধ্যে একটু প্রাধান্য পেয়েছে।

বিপরীত দলের কর্মী বলেই বছর তিনেক কোন সম্পর্ক ছিল না। নরেশ শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন, এখন বিমুও আসে না।

আসে না, মানে আসত না।

বাড়ি ঠিক না এলেও, এ পাড়ায় আসে, দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হয়, এ কথাটা জানতে পেরেছে সে এই মাসকতক হলো। হঠাৎ নরেশের মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেছে একদিন। তবে অপ্রতিভ হবার পাত্র সে নয় বিজিতা বিস্ময় প্রকাশ করতে বলেছে, 'দশ মাইল দূরে থাকে ঠিকই, ওটাও যেমন আমার কর্মস্থল এটাও তার তেমনি। এ তো আর লক্ষ্মণের মতো গণ্ডি টেনে দেয় নি

কেউ। সব জায়গাতেই চার ফেলতে হবে। যার শক্তি বেশি সেই তত বেশি মানুষ টানবে তার দলে— এই তো!'

বিজিতাও তখন তাই ভেবেছিল। তবে ক্রমশ বুঝেছে—দেখা হওয়াটা দৈবাৎ নয়। এমন প্রায়ই হয়। কিছুদিন ধরেই হচ্ছে। দুজনকে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে আরও কেউ কেউ দেখেছে। শেষে একদিন অনেক রাত্রে, নরেশ আজকাল প্রায় প্রত্যহই দেরি করে ফেরে বলে বিজিতা তার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজেরা খেয়ে শুয়ে পড়ে, নরেশ সবদিন ফিরে খায়ও না, অন্য কোথাও খেয়ে আসে প্রায়ই, কাজেই তার জন্যে বসে থাকার কোন কারণ নেই। কিন্তু সে রাত্রে ওর ঘুম আসে নি। গরমের দিন জানলা খোলা। অন্ধকারেই শুয়ে ছিল। কানে এল দুজনের গলার স্বর।

শহরতলীর বাড়ি, পিছনে বা সামনে একটু বাগান মতো থাকে প্রায় প্রতি বাড়িতেই, সেই পিছনের বাগানেই কারা কথা কইছে। প্রথমটা ভয় পেয়েছিল. পরে ভয়ের জায়গায় বিপুল কৌতূহল ও বিস্ময় দেখা দিল।

স্বামীর গলা যেমন ভুল হবার কারণ নেই, তেমনি আপন ছোট ভাইয়েরও না।

কথাগুলো মানে শব্দগুলো ঠিক বোঝা গেল না—এতই আস্তে বলছে, তবে কোন :গাপন পরামর্শ যে হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতই গোপন যে নরেশ সিগারেট পর্যন্ত ধরায় নি।

কথা হল অনেকক্ষণ ধরে, তার পর দুজনেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল এক-সময়। এবার নরেশ এসে ডাকবে, প্রস্তুত হয়েই উঠে বসেছিল বিজিতা কিন্তু নরেশ এলো না। এলো একেবারে ভোরবেলা।

'বাব্‌বা একেবারে রাত শেষ করে এলে!'

'হ্যাঁ গো প্রেয়সী, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।'

তামাশার একটা ভঙ্গি করলেও ক্লান্তমুখের ক্লিষ্ট হাসিতে কোন আনন্দ ফুটল না।

কে জানে কেন 'তুমি তো বাড়ি অবধি এসেছিলে, তবে ঢুকলে না কেন একবার, বিমুই বা কোথায় গেল' কথাটা বলতে গিয়েও বলল না বিজিতা। ও যদি এত লুকোতে পারে, তারই বা কি দরকার গায়ে পড়ে ধরা দেবার। তাতে বরং আরও সাবধান হয়ে যাবে। অসাবধান থাকাই ভালো। তাতে একদিন রহস্যটা আপনিই প্রকাশ পেয়ে যাবে।

তবু হয়তো অনেক দেরি হতো তা প্রকাশ পেতে—যদি না ওর বালক

ভূত্যটি হঠাৎ ঐ বেফাঁস কথাটা না বলে ফেলত !

ছেলেটা নামেও বোকা, কাজেও বোকা। হুল্ হুল্ করে বকতে ভালবাসে, সব কথা তার সবাইকে বলা চাই !

বোকা ওর ঝি কমলারই ছেলে। এতদিন লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছিল কমলা, পরে সে অসাধ্য সাধন থেকে নিবৃত্ত হয়ে বিজিতাকেই ধরল, 'তুমি একটু রাখো না বৌদি, কোথায় কার বাড়ি কাজে পাঠাবো, কে হয়তো মারধোর করবে—এই তো সেদিন শুনলুম একটা ছেলেকে চোর সন্দেহ করে মনিবরা সকলে মিলে এমন মেরেছে ছেলেটা মরেই গেছে। তুমি যা হোক দুটো চারটে টাকা দিও, আর দুবেলা খোরাকিটা চালিও—এ তোমার অনেক আসান হবে দেখে নিও। তোমার তো বেস্তর কাজ উনকুটি চৌষট্টি—ছেলে-মেয়ে দুটোর ধকলও তো কম নয়। একবার যেয়ে গাড়িতে তুলে দে এসো; আবার নাইমে নাও, কাজ তো বেড়েই যাচ্ছে। ওকে রাখো, যা বলবে তাই শুনবে। ছেলেটা আমার বড় ভাল, বড় সরল।'

তাই রেখেছে বিজিতা, আজ বছর খানেক হল। সত্যিই বড় ভাল ছেলেটা। সারা দিনে কত যে কাজ করে—এত যে কাজ ছিল তাই যেন বিজিতার চোখে নতুন করে ধরা পড়ল—খাটে হাসিমুখে। একটু আদরের কথা বললে গলে যায় একেবারে। খুব নেটিপেটি। ক্রমশ এই মাস তিনেক হল বাড়িতেই শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিজিতা। একেবারে একা থাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে, স্বামী যে কখন আসে তার ঠিক নেই, আজকাল তো মাসের মধ্যে পাঁচ ছ দিন রাত কাবার করে আসে, হঠাৎ অসুখ বিসুখ হলে তো অন্তত পাশের বাড়ির লোককে ডেকে আনতে পারবে। এ বন্দোবস্তে কমলাও খুশি। 'যে ভাবে মাথা গুঁজে থাকে বৌদি, এ ওর যা হ'ল বলতে গেলে আজন্ম।' আরও খুশি বোকা মশারি পেয়ে—'জন্মে কখনও মশারিতে শুইনি মাইমা, গরমেও মুড়ি দিয়ে শুতে হয়। এ তো সগ্‌গ বলতে গেলে !'

আগে দিত পাঁচ টাকা মাসে, এখন দশ টাকা দেয়। ভূতের মতো খাটে ছেলেটা, ভগবান যখন কোন অভাব রাখেন নি ওর—ছেলেটাকে বঞ্চিত করবে কেন ?

'আমার ছেলেমেয়েগুলো যেন দাঁড়িয়েছে তোমার সতীন-পো, বোকাই আসল ছেলে !'

বিজিতা খুব হাসে। বলে, 'তা বটে। সত্যিই, ছেলেটাকে বাজারে পাঠালে কেবল ভয় হয় যা ছটফটে এই বুঝি গাড়ি চাপা পড়ল কি ট্রামে কাটা গেল !'

এইভাবে বোকা যে কতটা মনের কাছে এসে গেছে বিজিতা তা বুঝতেও পারে নি। বুঝেছিল নরেশ, প্রায়ই হেসে বলত, 'তুমি যে নিজেই নিজের সতীন হয়ে যাচ্ছ গো!'

'তার মানে?' কথাটা তখনও বোঝে নি বিজিতা।

বোকার দোষের মধ্যে ঐ একটি—কমলা যা বলেছিল।

বড্ড বকে। কথা কইতে পেলে আর কিছু চায় না।

অকারণেই বকে। যে প্রসঙ্গে ওর কোন দরকার নেই, সে প্রসঙ্গেও কথা বলা চাই, আগু বেড়ে, গায়ে পড়ে।

এই অভ্যাসটাই কাল হল বুঝি।

বিমুর সঙ্গে যে ওর প্রায়ই দেখা হয়—এখন আর গোপন করে না নরেশ। বলে, 'বাবু তো লীডার হতে চান, তার তো ঘাঁৎ ঘোঁৎ আছে, এখন এসে 'আমার কাছে সারেগুার করেছেন— 'তুমি একটু শিখিয়ে দাও'!

অকারণেই বলা। এবং গলার স্বর ও কথার ভঙ্গি এতই কৃত্রিম যে সেটা নরেশের নিজের কাছেও চাপা থাকে না। সে কেমন এক রকমের অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে চুপ করে যায়। বিজিতা মনে মনে শঙ্কিত হয়, অস্বস্তিটা বেড়ে যায় আরও—তবু মুখে বলে, 'অ। তাই নাকি। তা ভালই তো, তবে ভাল পরামর্শই দিও। কুপথগুলো তোমার জন্যেই থাক।'

হঠাৎ যেন চটে ওঠে নরেশ, 'আমার কি কুপথ দেখলে?'

বিজিতা এক রকমের স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে, 'অমানুষিক খাটুনিতে তোমার নার্ভ সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ঠাট্টা তামাশাও বুঝতে পারো না।'

বিমুর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রকাশ্য হয়ে গেছে বলেই সে এখন প্রকাশ্যেই এ বাড়ি আসে, চা খাবার খায়, আড্ডা দেয়, ভাগ্নে ভাগ্নির সঙ্গে খেলা করে।

সেদিন খুব সকালেই এসেছিল বিমু। কি নাকি কাজ আছে এদিকে তাই। 'দিদি একটু চা দে তাড়াতাড়ি' বলে সদ্য জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়া কাগজ-খানা তুলে নেয়।

আগের দিন আবারও একটা বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়ে গেছে আলিপুর অঞ্চলে। ছটো লোক জখম হয়েছে, ম্যানেজারকে ভল্টে পুরে রেখেছিল সেই শকে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। প্রায় আড়াই লাখ টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা—এই সব গরম খবর।

'আবার ডাকাতি। দেখেছেন নরেশ দা।'

'হ্যাঁ, কাল রেডিওতে বলেছে শুনলুম।'

'আচ্ছা, এই যে টাকার অঙ্ক লেখে এ কি সত্যি? সত্যিই অত টাকা নেয়।' বিমু প্রশ্ন করে।

'তার মানে? খাতা, কলমের ব্যাপার। পুলিশ কি আর তা চেক করে না ভাবিস?'

'না, না। তা বলছি না। তুমি কি ভাবো ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে না? তারা রীতিমতো ভাগ বসায়। তারাই তো সন্ধান-সুলুক দেয়।'

'নট নেসেসারিলি।' নরেশ বলে, 'আর দিলেই যে ভাগ বসাতে পারবে তাই বা কে বললে। সে তো তখন তাদের হাতে চলে যায়। এ নিয়ে তো মামলা চলে না। আর, হাউএভার, ব্যাঙ্কের টাকাটা তো বেরিয়ে যায়, সবটাই লুট ধরতে হবে; কে কত ভাগ বসাচ্ছে সে লুটেরাদের প্রাইভেট ব্যাপার।'

বেশ নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই আলোচনা চলছিল। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটাল শ্রীমান বোকা। কী একটা কিনতে দোকানে গিয়েছিল, লাফাতে লাফাতে ফিরল। এইটেই ওর অভ্যাস। এমনি চলতে পারে না, হয় ছোটে নয় লাফায়। বাড়ি এসে জিনিসটা নামাতে নামাতেই বিমুকে দেখতে পায়। একটা কি ঠোঙা হাতে নিয়েই ঘরে ঢুকে বলে, 'বিমু মামা, তোমরা ঐ সেই সরকারদের ভাঙ্গা ইটখোলাটার ধারে বসে কি গুনছিলে গো। টাকা না কি? য়্যাঁ। বাপরে. কত্‌ত টাকা।'

মুহূর্তকাল অস্বস্তিকর নীরবতা।

মনে হল নিমেষের মধ্যে নরেশের কপালে ঘাম দেখা দিল। মুখটা ছাইয়েব মতো সাদা হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

সামলে নিল বিমুই প্রথম, বললে, 'আমি? আমাকে কি করে দেখলি? আমি থাকি টালিগঞ্জে—এই তো এলুম। তাই কোন্ ভোরে বেরিয়েছি। আর তুই বা সে ইটখোলায় গিছলি কি করতে?'

'আমি সেখানে যাবো কেন। আমি যে নারকোল গাছে উঠেছিলুম। একটা কাকের বাসা হয়েছে বড্ড জালাতন করে। আমায় কাল এমন জোরে ঠোকর মেরেছে না! ত্যাখনি বলেছি দাঁড়াও শালা কাক, তোমায় ছ্যাখাচ্ছি মজা। শেষ-রাত্তিরে উঠে তাই মাথায় গামছা বেঁধে নারকোল গাছে চড়েছি। ত্যাখন সবে ভোর হচ্ছে, আমি যখন নেমেছি। বেশ লাগে না, ওপর থেকে উঠে চারদিক দেখতে!'

নরেশ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল এবার, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে মামীর আদরে বাঁদর হয়ে উঠেছ। শেষ রাত্তিরে উঠে গাছে চড়িস, পড়ে পা ভাঙ্গলে? আবার যদি কোনোদিন শুনি চাবকে পিঠের চামড়া তুলবো। রাস্কেল কোথাকার। দূর করে দোবো বাড়ি থেকে। আর, শেষ রাত্তিরে অতদূরে সরকারদের ইটখোলা সেখানে কে কি করছে, তুই অমনি দেখতে পেলি! লোকে শুনলে কি ভাববে?'

বোকা আর দাঁড়ায় না। নিজে নিজেই কানমলা খেয়ে ছুটে চলে যায় রান্নাঘরের দিকে।

বিজিতা তখন রান্নাঘরে ছিল না।

তার কি রকম একটা মনে হয়েছিল। কাল রেডিওতে খবরটা শুনে পর্যন্ত কেমন যেন সেই অস্বস্তির ভাবটা বেড়েছে। তাই নিঃশব্দে ভেতরের ঘর দিয়ে ঢুকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কিছু যদি হদিশ পায়। প্রথমটা এই নিতান্ত সাধারণ কথাবার্তায় কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছিল।

এখন ছেলেটা এই কথার বোমা ছোঁড়ার পর নরেশের মুখের চেহারাটা দরজার আড়াল থেকে ওর চোখে পড়ল। এতকাল যার সঙ্গে ঘর করছে তাঁর মুখের প্রতিটি রেখাই বোঝবার জানবার কথা। তাতেই পাথর হয়ে গিয়েছিল, ওখান থেকে সরবার কি কিছু করবার যেন ক্ষমতা ছিল না। এক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্ব জানানোও উচিত নয়। সেটা কোন কিছু না ভেবেই মনে হয়েছিল।

এখন কানে গেল, নরেশ ফিস ফিস করে বলছে, 'উই মাস্ট রিমুভ হিম। কোনমতে এখান থেকে দূরদেশে কোথাও সরাতে হবে।'

বিমুও তেমনি চাপা গলায় বলে উঠল, 'ননসেন্স। কোথায় পাঠাবে? সেখানেই যাবে স্বভাব সঙ্গে যাবে। অকারণেই বকবে। আর এখান থেকে সরালে দুই আর দুইয়ে চার—ওর ঐ নিরেট মাথাতেও ঢুকবে। তাতে উৎসাহ আরও বাড়বে। থাক, আমি দেখছি।'

বিমু আর বসল না, উঠে চলে গেল।

বোকাকে সেদিন বাড়ির বাইরে যেতে বারণ করেছিল বিজিতা। কিন্তু কোনো কারণ দেখাতে পারেনি বলেই, বোকা সে কথায় অত গুরুত্ব দেয় নি। 'মাইমা'র খ্যাল' ভেবেছে হয়তো। তা ছাড়া বিকেলে দুধ আনতে যাওয়াটা বাড়ির বাইরে যাওয়া—অত তার মাথায় ঢোকে নি। ঝি বাসন মাজতে আসা

বা পিওন চিঠি দিতে আসাটাও যে কারও আসা—তা কেউই ভাবে না। তেমনি নিত্য যে কাজে বাইরে যেতে হয়, যেমন দুধ আনতে যাওয়া, সেটা কোন যাওয়া বলে মনে করে না লোকে।

দুধ আনতে গিয়ে আর ফেরে নি। সারা রাতেও না, পরের দিনও না।

সবাই অনেক খুঁজেছে। বোকার মা তো হাহাকার করে কাঁদছে আর মাথা কুটছে মেঝেয়।

নরেশ আগে অত গ্রাহ্য করে নি, পরের দিন সেও ব্যস্ত হয়েছে। তার চেলা চামুণ্ডাদেরও লাগিয়েছে খোঁজে। আর এই ব্যস্ততা দেখে এক একবার বিজিতারও মনে হয়েছে—নরেশ কিছুই জানে না। যতটা বিপদ আশঙ্কা করেছে ততটা নয়।

তারপর ঐ ছেলেটার মৃতদেহ। যাকে সনাক্ত করা যায় নি।

'কি হল, অমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছ কেন?' যেন একটু বিরক্তিরই সুর নরেশের গলায়।

'তুমি "শোন" বললে, আমি দাঁড়িয়ে আছি শোনবার জন্যে। কি কথা না জানলে দৃষ্টিতে অন্য ভাব ফুটবে কেন?' বিজিতা শান্তভাবেই উত্তর দেয়।

'কাল বিকেলে তুমি কোথায় গিছলে, অনেক রাত্রে ফিরেছ?'

'দরকার ছিল?'

'গিয়েছিলে কোথায়?'

'তুমি কি কবে কখন কোথায় যাচ্ছ, কখন ফিরবে—আমাকে বলে যাও? তবে এ কৈফিয়ৎ চাও কোন অধিকারে? আমি তো কোনোদিন কৌতূহল প্রকাশ করি না। এমন কি তোমার এই বিশ্বস্ত সংবাদ-দাতাটি কে, তাও তো জানতে চাইছি না।

নরেশ যেন থতমত খেয়েই চুপ করে যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

কথা শেষ হয়েছে ভেবে বিজিতা আবার ভেতরে যাচ্ছে, নরেশ প্রশ্ন করল, 'তোমার মেরুন রঙের শালটা কোথায় থাকে?'

এবার যেন বোমার মতো ফেটে পড়ে বিজিতা,' 'কেন বলো দিকি এত জেরা। আমার জিনিস কোথায় রাখব কাকে দেব তোমার তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন? তুমি এখানে ওখানে যা এনে রাখো তা কার, কোথায় পেলে আমি তো জিজ্ঞেসা করি না! তুমি ঐ কাগজের খবর পড়ে ভাবছো আমি আমার নিজের ছোট ভাইকে খুন করে এসেছি? বেশ তো, তাই যদি মনে করো, পুলিশে খবর দাও না। জবাব দিতে হয় তাদেরই দেব।'

আর দাঁড়ায় না, নরেশের মুখের দিকেও চেয়ে দেখে না—সোজা রান্না-ঘরের দিকে চলে যায়।

আত্মবিশ্লেষণ

শ্রীলেখা একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল।

খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তখনও পুরো খবর পায় নি। সবটা কেউ বলে নি তাকে, বলতে সাহস করে নি। সর্বনাশের পূর্ণ পরিমাণটা জানল সে এখানে এসে, নিজের চোখে দেখে।

আর তখন থেকেই সে এমনি দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে যেন শরীরে কোন স্পন্দনমাত্র নেই, প্রাণ আছে কিনা তাই সন্দেহ। চোখের দৃষ্টিতে মুখের পরিবর্তনে যে সব মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়—তার কোনটাই দেখা যাচ্ছে না।

এটা যে অশোভন, তা ঐ জড় স্থাণুবৎ অবস্থাতেও সে বুঝতে পারছে—কতকটা অবচেতনেই।

এ অবস্থায় চিৎকার করে ওঠা, বুকফাটা কান্নায় আছড়ে পড়া, বা—খুব শক্ত মানসিক গঠন হলে—সক্রিয় হয়ে উঠে তখনও যতটুকু যা করা সম্ভব প্রতিকারের—সেইটুকু করা।

এই তো উচিত। এই তো করে সকলে। অপরের কাছ থেকেও এ-ই আশা করে। বিশেষ মেয়েছেলের ক্ষেত্রে।

সে তা পারছে না কেন? কেন সে এইখানে এমনি দাঁড়িয়ে বর্তমান কর্তব্যের কথাটা না ভেবে নিজের কৃতকর্মের বিচার করছে মনে মনে?

সে সময় তো অনেক পাবে এর পর, তা তো সে নিজেও জানে।

তবে? এ কি করছে সে? একবার নিজেকে দোষী মনে করছে, আর একবার নিজের পক্ষ সমর্থন ক'রে কোন অদৃশ্য আদালতে জবাব দিচ্ছে।

তার যে অনেক কথা বলবার ছিল।

বলবার আছে এখনও।

সেই ঝগড়াটাও যদি করতে পারত!

তাকে কথাগুলো শুনিয়ে দিতে পারলে নিজেকে এতটা অপরাধী বা

দোষী মনে হ'ত না। মনে হচ্ছে বলেই তো প্রত্যক্ষ কর্তব্য এড়িয়ে গিয়ে মনে মনে এত যুক্তি ও প্রতিযুক্তির অবতারণা করছে।

সে যে সুবীরকে ভালবাসত, গভীরভাবে ভালবাসত—তা কি এই দীর্ঘ পনেরো বছরেও বুঝতে পারে নি সুবীর? আর, সে বোঝার ওপর নির্ভর করতে পারে নি?

এত হীনমন্যতা তার কিসের? এটুকু আত্মবিশ্বাস তার থাকল না কেন যে, সে পাত্র হিসেবে বিয়ের সময় যেমন লোভনীয় ছিল, আজও—স্বামী হিসেবেও—সে তেমনি আকাঙ্ক্ষিত, আকর্ষক আছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র সে, পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই বড় কলেজে অধ্যাপনার চাকরী পেয়েছিল। সুদর্শন, সচ্চরিত্র। কলকাতায় না থাকলেও দেশে বড় পৈতৃক বাড়ি আছে, আর সে দেশ খুব দূরেও নয়।

ঠিক প্রেমের বিবাহ যাকে বলে তা নয়—তবে শ্রীলেখা তাকে দেখে, কথা বলে—বলতে গেলে উপযাচিকা হয়েই বিয়ে করেছিল। অর্থাৎ ওর মাসীমা সুবীরকে চিনতেন—ওর মনের ভাব বুঝে তিনিই কথাটা পাড়েন শ্রীলেখার কাছে, শ্রীলেখা হেসে মাথা নিচু করে। অতঃপর সেই মাসিমাই মধ্যস্থতা বা ঘটকালি করেন এ বিয়ের।

সুবীরেরও ভাল লেগেছিল, বিয়ের পর ভালও বেসেছিল। ভালবেসেছিল বলেই, স্ত্রীকে আরও ভালভাবে রাখতে—এতবড় স্বার্থত্যাগটা করল।

পড়াতে ভালবাসত সে, অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিল ইচ্ছে ক'রেই সেই চাকরি ছেড়ে বেশী মাইনেতে এই চাকরি নিল। ঢুকেই ছিল দু হাজার টাকা মাইনেতে, এখন আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়। এছাড়াও নানাবিধ য়্যালাউন্স আছে, বাইরে যেতে হয় প্রায়ই, তাতেও অনেক টাকা আসে। এই বাড়িও করেছে শ্রীলেখার মনের মতো করে। শ্রীলেখা শহরতলীতেই থাকতে চায় তাই, নইলে সে দক্ষিণ কলকাতায় ভাল একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারত।

প্রথম বে-সুর বাজল শ্রীলেখা এই ইস্কুলে চাকরি নিতেই সুবীর ঘোরতর আপত্তি করেছিল, 'তুমি ঐ গাধা ঠেঙাতে যাবে। গাধার খাটুনি ইস্কুলে পড়ানো। বিশেষ মেয়ে-ইস্কুলে। কলেজ হলেও কথা ছিল। আর কেনই বা যাবে? তোমার কিসের অভাব?'

শ্রীলেখা জবাব দিয়েছিল, 'বেশ তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে থাকো। আমি কোথাও যাবো না। তুমি নটায় বেরিয়ে যাও, ফেরো সাতটার পর।

মাসের অর্ধেক দিন তোমার বাইরে কাটে—ট্যুরে। একটা ছেলে, আর সন্তান আনার সাহস হ'ল না তোমার—তাকেও দিলে নরেন্দ্রপুরে পাঠিয়ে। আমার দিন কাটে কিসে? এ তো পাড়ার মধ্যেই বলতে গেলে, সেক্রেটারী সীতানাথ-বাবু নিজে এসে অনুরোধ করলেন—বসেই আছি, সেইজন্যেই কাজ নেওয়া। নইলে ঠিক চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে আমি কি কোন কলেজে কাজ নিতে পারতুম না। আমারও ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার ফেলনার নয় মশাই, সেটা ইয়াদ রেখো।'

তারপর অবশ্য সয়ে গিছল সুবীরের।

বেশীক্ষণের কাজ নয়, পাড়ার মধ্যেই বলতে গেলে। স্কুলের চাকরিতে ছুটিও বিস্তর। ছেলে যখন ছুটিতে বাড়ি আসে তখন শ্রীলেখারও ছুটি। ছেলে কোন অভাব টের পায় না। সুবীরেরও ব্যক্তিগত অসুবিধা কিছু হয় না। সে বেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে শ্রীলেখা বেরোয়, ফেরার অনেক আগে আসে। দিনরাতের ঝি থাকা সত্ত্বেও শ্রীলেখাই রান্না করত, এখনও করে। সুবীর যা যা খেতে ভালবাসে, এখনও তা মনে ক'রে সযত্নে তৈরী করে। আর সুবীরের ছুটি আছে শ্রীলেখার নেই—এমন ঘটনা ঘটে দৈবাৎ। সুতরাং এই চাকরি নেওয়াতে সুবীরের যে ভয় হয়েছিল—তার সাংসারিক জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে—সে ভয়টা আর থাকে না।

বিপদ বাধল শুভময় এসে শ্রীলেখাদের স্কুলে চাকরি নিতে।

শুভময়ের বাড়ি উত্তরপাড়ায়। একটা কি পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবসর কাটাতে এসেছিল এ পাড়ায় ওর মামার বাড়িতে। শুভময়ের মামা কল্যাণ-বাবুদের সঙ্গে এদের সৌহার্দ্য দীর্ঘদিনের, সেই সূত্রে শুভময়ও আসা যাওয়া করত। সে এখন থেকে বছর চারেক আগের কথা। ছুটির শেষে বাড়ি চলে গিছল সে, কদাচ কখনও এলে এক-আধবার দেখা করে যেত হয়ত। এইটুকু মাত্র। আদৌ কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

চাকরিটা যে সে এখানে কোন তদ্বির করে নিয়েছে তা নয়—বেকার বসে ছিল, সায়ান্সের ছাত্র—সীতানাথবাবুই কল্যাণকে অনুরোধ করেছিলেন, 'তোমার ভাগ্নেটাকে দাও না, দিনকতক পড়াক। ভাল চাকরি পেলে সেখানেই যাবে অবশ্য, আমিও 'না' করব না। ততদিন করুক না। আমাদেরও আজ তিন মাস সায়ান্সের টীচার নেই। অবিশ্যি আজকাল ইস্কুলের চাকরিও নেহাৎ ফেলনা নয়। নতুন আই-এ-এস-এর মাইনে বলতে গেলে—'

হয়ত কতকটা অনিচ্ছাতেই এসেছিল শুভময়, কিন্তু কে জানে কেন, সে

অনিচ্ছা ওর বেশী দিন রইল না।

কারণটা কি তা শ্রীলেখাও বোঝে নি। তা নিয়ে মাথাও ঘামায় নি। অনেকেই মাস্টারী পছন্দ করে। সুবীরও তো করত, তাকে যে মোটা মাইনের চাকরীর জন্যে শিক্ষকতা ছাড়তে হল সেটা একরকম ট্র্যাজেডিই তার কাছে। পড়াতে চায় পড়াক না—ভালই তো।

মূল কারণটা যখন অবশেষে সুস্পষ্ট, বলতে গেলে সুপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, তখন শ্রীলেখারও বিস্ময়ের অবধি রইল না। এ কারণের কথা সে কখনও ভাবে নি, সুদূর চিন্তাতেও আসে নি।

শুভময় তার আকর্ষণেই ইস্কুলে থেকে গেল, ব্যাঙ্কের চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও।

শ্রীলেখার কাছে এটা এতই অবিশ্বাস্য যে বারবার নানা ভাবে আভাস ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও সে বোঝে নি। শেষে শুভময় পরিষ্কার একদিন বলতে বাধ্য হ'ল, 'আমি আপনাকে ভালবাসি লেখাদি। প্রচণ্ড, উন্মত্তের মতো ভালবাসি। সেই জন্যেই এখানে পড়ে আছি।'

বেশ কিছুটা সেদিন সময় লেগেছিল শ্রীলেখার উত্তর দিতে। তারপর বলে উঠেছিল, 'চুপ। ইডিয়ট কোথাকার। ফাজলামি করার আর জায়গা পেলে না। আমি তোমার দিদির বয়িসী—আমাকে বাঁদর নাচাতে চাও, না?'

শুভ একেবারে ওর পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, 'এই আপনাকে ছুঁয়ে বলছি, যে কোন দিব্যি গালতে বলবেন গালছি—এ নাচানো নয়, আমার অন্তরের কথা এটা!'

সত্যি যে ওর—মুখের দিকে চেয়েই বোঝা যায়। এই শেষা শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে গত ক মিনিটের মধ্যে। তা হোক, একে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এ পাগল, পাগলামি রোগটা বেড়েই যায় ক্রমশঃ।

শ্রীলেখা উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও। এসব নাটকের বয়স চলে গেছে, এক্সট্রা-ম্যারিটাল প্রণয়ে আমার প্রবৃত্তিও নেই। আর কখনও তোমার এ বাড়িতে না আসাই ভাল।'

একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল শুভময়ের মুখ। সে শুধু হাত জোড় ক'রে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'না না,এত বড় শাস্তি দেবেন না। আমি আর এসব কথা বলব না, কথা দিচ্ছি।'

শ্রীলেখার আঙুলটা দেখানোই ছিল দোরের দিকে, তেমনিই রইল। শুভময় আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল অপরাধীর মতো।

শুভময়ের আসা এ বাড়িতে বন্ধ না হ'লেও দিনকতক এ প্রণয় নিবেদন পর্ব বন্ধ রইল। তবু মুখে না হোক—ভাবে ভঙ্গীতে চাহনিতে অনেক অব্যক্ত কথাই সরব হয়ে ওঠে প্রণয়াস্পদের মনে।

এবং—তা বুঝেও কঠিন হতে পারে না শ্রীলেখা।

শুভময় সুপুরুষ যাকে বলে তা নয়। তবু তার চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। রোগা একহারা চেহারা—খুব লম্বাও নয়—কিন্তু রঙটা একেবারে যাকে বলে সাহেবের মতো—তাই। এদেশে সুগৌর বর্ণ বলতে যা বোঝায়, কিছু হরিদ্রাভ—এ তা নয়। সাদাটে রঙ তাতে গোলাপী আভা। রোগা বলেই পাতলা চামড়ার মধ্যে দিয়ে নীলাভ স্নায়ুগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এই রঙ ছাড়াও তার মধ্যে আকর্ষণের কিছু আছে। চোখ দুটি—খুব টানাটানা হয়ত নয়, তবে তাতে ক্ষণে ক্ষণে আবেগ বা কামনা ফুটে ওঠে, কখনও বা করুণ মিনতি কি পূজার ভাব—তাতে যে কোন মেয়েরই বিচলিত হবার কথা।

সেই কথাই ভাবে শ্রীলেখা। এর তো মেয়ের অভাব হবার কথা নয়। চারিদিকে মেয়েও তো বিস্তর। ওপরের ক্লাসের ছাত্রীরা যে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে তা সকলেই লক্ষ্য করেছে। নিচের ক্লাসের ছাত্রীদের মা আসেন, দিদি আসেন। তাঁরা ওর সঙ্গে আলাপ করতে উৎসুক, ব্যগ্র।

তৎসত্ত্বেও সে নিত্য তিরস্কার অবহেলা সহ্য ক'রে তার কাছেই বা আসে কেন? কী আছে তার মধ্যে এমন? শ্রীলেখা এমন কিছু সুন্দরী নয়, বয়সেও শুভর থেকে বেশ বড়। তবে?

যত ভাবে—ততই বুঝি নিজের অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতে আকৃষ্টও হয়। আর হয়ত সেই কারণেই ওর আসা যাওয়াটা একেবারে বন্ধ করতে পারে না।

এই অস্বাভাবিক এবং আপাত-একতরফা প্রণয় কাহিনী সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অনেকেই সচেতন হয়ে উঠল। এসব কথা একজন আর একজনকে বলবে, এ তো আবহমান কালের নিয়ম।

ফলে, সে কথাটা সুবীরের কানে উঠতেই বা দেরি হবে কেন?

সুবীর অবশ্য—তার স্বপক্ষে এটুকু বলতেই হয়—প্রথমে বিশ্বাস করে নি, উড়িয়েই দিয়েছিল।

'ঐ ছোঁড়াটা! ফোঃ! চিমসে বোকা বোকা চেহারা—ওরাই অবশ্য কথায় কথায় প্রেমে পড়ে। তা পড়ুক, বেশী বাড়াবাড়ি করলে লেখা ওকে পায়ের চটি খুলে পিটবে যে আমি জানি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

কিন্তু কিছু পরে ওকেই মাথা ঘামাতে হ'ল। ক্রমাগত ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয়ে যায়। সুবীরের অচল অটুট বিশ্বাসও একটু একটু ক'রে ক্ষইতে লাগল। ওর সুখী জীবনের মূল ধরে কে যেন এক প্রচণ্ড নাড়া দিল। আর, সে কুটিল সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা চাপাও রইল না। এ বুঝি চেপে রাখা যায়ও না।

প্রথম প্রথম শ্রীলেখাও উড়িয়ে দিয়েছিল, 'দূর! এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ! এতকাল পরে! আমার ছেলের বয়েস তেরো হয়ে গেল, সে হুঁশ আছে? প্রেম করলে কত লোকের সঙ্গেই তো করতে পারতুম।'

'এত লোকে একই কথা বলছে, এটাও তো ভাল নয়।'

'যার যা খুশি বলুক। তুমি তা নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?'

সেদিনের মতো কথাটা চাপা পড়লেও একেবারে চাপা থাকে না।

আবারও প্রসঙ্গটা ওঠে। শ্রীলেখাও বোঝে সুবীরের খেয়ে শুয়ে শান্তি নেই। বলে, 'ও ছোঁড়াটা পাগল, তাই বলে তুমিও পাগল হবে!'

মুখ গোঁজ ক'রে সুবীর বলে, 'ওকে এ বাড়ি আসতে বারণ করে দাও। অশান্তির কারণটা নির্মূল করাই তো ভাল।'

'সে চেষ্টা কি আমি করি নি ভাবছ। গাল দিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি— ছেলেটা পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করে। এরপর তাড়াতে গেলে ছোটলোকমি করতে হয়।···আর ছাখো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এই ধরনের সন্দেহ বিষাক্ত ঘায়ের মতো। একে চাপা দেওয়া যায় না, নির্মূল করতে হয়। এই সন্দেহটাই মন থেকে দূর করো। ওকে বাড়ি আসতে বারণ করলেই কি সন্দেহের কারণ দূর হবে? একই ইস্কুলে কাজ করব, দেখাশুনো কথাবার্তা সবই হবে— তোমার মনে সন্দেহের কারণ তো থেকেই যাবে। যদি প্রেম করারই ইচ্ছে থাকে আমার—সুযোগ তো অজস্র। মেয়েদের চরিত্র পাহারা দেওয়া যায় না—বহু বইতেই তো পড়েছ।'

'ইস্কুল ছেড়ে দাও।'

'না। তুমি পাগল হতে পারো, আমি হই নি।'

শ্রীলেখা রাগ করে চলে যায়।

কিন্তু যার দিন রাত্রি, খাওয়া শোওয়া সব বিষাক্ত হয়ে যায়, সে চুপ করে থাকবে এটা আশা করাই অন্যায়। শেষে প্রায় প্রতিদিনই এ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা-কাটাকাটি—শেষে কলহ বিবাদ শুরু হয়ে গেল।

বিষাক্ত হয়ে উঠল শ্রীলেখার জীবনও। অথচ প্রতিকারও কি ভেবে পায়

না। শুভকে নিষেধ করে, হাত ধরে অনুরোধ করে—সে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কোনমতেই কঠিন হতে পারে না শ্রীলেখা।

শেষে একদিন তিক্ততা অসহ্য হতে—কতকটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে, তামাশা ক'রে মজা দেখার জন্যেই—বলে, 'ছাখো, তোমাকে তাহ'লে একটা কথা বলি। তুমি আমাকে খুবই ভালবাসো তা আমি জানি, আমার জন্যে কোন ত্যাগ-স্বীকারই তোমার কাছে অসম্ভব হবে না—এও বিশ্বাস করি। তুমি এটুকু মানিয়ে নাও, লক্ষ্মীটি। আমি ওকে ছাড়তে পারব না। ও বড্ডই ভালবাসে, পাগলের মতো ভালবাসে। এই বয়সে তরুণ ছেলের ভালবাসা—এর মোহ সাংঘাতিক তা তো বোঝ। তবে আমিও কথা দিচ্ছি, তুমি যদি এমন কোন তরুণীর প্রেমে পড়ো আমি তোমাদের মিলনে বাধা দেব না।'

চুপ ক'রে গেল সুবীর। একেবারেই চুপ ক'রে গেল। এর পর ক'দিন তবু একটু ভয়ে ভয়ে কাটাল শ্রীলেখা। কিন্তু যখন দেখল সুবীর সহজভাবেই খাওয়াদাওয়া করছে, রাত্রে ওর পাশে এসে শুচ্ছেও, গায়ে হাত দিতে গেলে হাত সরিয়ে দিচ্ছে না, তখন একটু নিশ্চিন্তও হ'ল।

বুঝল সন্দেহটাই বেশী জ্বালা দিচ্ছিল সুবীরকে। নিশ্চিত হতে আর এত জ্বালা নেই। যথার্থ প্রেমের কাছে ঈর্ষার পরাজয় ঘটেছে এর আগেও—এ দৃষ্টান্ত জীবনে বিরল নয়।

এই আপাত সহজ আচরণের আড়ালে সুবীর যে এই সাংঘাতিক মতলব আঁটছিল তা স্বপ্নেও ভাবে নি শ্রীলেখা।

শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে বাড়িতেই ছিল আজ, শ্রীলেখা স্কুলে—ছেলে নরেন্দ্রপুরে—ঝিকে সরিয়ে দেওয়া কঠিন নয়, একটা ছুতো ক'রে বেশ খানিকটা দূরেই পাঠিয়েছে। সুতরাং বাড়ি খালি। সে বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ ক'রে, একখানা চিঠি লিখে রেখে—টেবিলের ওপর উঠে পাখার সঙ্গে দড়ি বেঁধে ফাঁশ গলায় দিয়ে—পা দিয়ে টেবিলটা সরিয়ে দিয়েছে।

কেউ জানতে পারে নি, কেউ কোন শব্দও পায় নি।

চিঠিতে লেখা ছিল, "আমি পারলুম না লেখা, এত উদার হ'তে। তুমি আমাকে মাপ করো।"

ঝি এসে ডেকে সাড়া পায় নি। খুব চেঁচামেচি দরজায় ঘা দেওয়াতেও না। এমনভাবে অসময়ে দরজা জানলা বন্ধ দেখে তারও কিছু সন্দেহ হয়ে

থাকবে—সে পাশের বাড়িতে খবর দিয়েছে—পাড়ার আরও কিছু লোক জড়ো হয়েছে, তারপর দরজা ভাঙাও হয়েছে।

অনিবার্য হিসেবেই পুলিসে ফোন করা হয়েছে, শ্রীলেখাকেও খবর দিতে দেরি হয় নি।

ছুটেই এসেছে শ্রীলেখা।

কিন্তু তারপর থেকেই এমনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, এসময় তার যাওয়া দরকার, দেখা দরকার—লোকে কি ভাবছে—এসব কোন কথাই তার মাথায় যাচ্ছে না।

সে ভাবছে নিজের দোষ কতখানি। খবরটা শুনে পর্যন্ত সেই কথাই ভাবছে।

তামাশা ? না, নির্জলা তামাশা সে করে নি।

এতদিনের বিরক্তি তার মনেও জ্বালা ধরিয়েছিল, অসহ তিক্ততা, কতকটা তারই প্রতিশোধ নিতে এই মিথ্যে কথাগুলো বলেছিল। কিছু যন্ত্রণা সুবীরও ভোগ করুক—এই ভেবেই। আর, স্বামী কতটা ভালবাসে বোধ করি তার চরম পরীক্ষার কথাও মনে ছিল।

কিন্তু শুধুই কি তাই ?

আজ এই মুহূর্তে মনের মধ্যে একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিয়েই আরও তাকে অনড় অবশ ক'রে দিচ্ছে।

যা বলেছে সুবীরকে তা কি সবটাই মিথ্যে ?

একটা তরুণ ছেলের—রূপবান না হ'লেও সুদর্শন, শিক্ষিত ভদ্র—এই ঐকান্তিক ভালবাসা, যা লজ্জা অপমান লোকনিন্দা কিছু গ্রাহ্য করেনি—পূজার মতো করেই যে ভালবেসেছে, পায়ে পড়ে থাকতে চেয়েছে, শয্যায় ওঠার কথা মুখেও আনে নি,—তা কি ওকে একটু একটু ক'রে দিনে দিনে তিলে তিলে আকৃষ্ট করে নি ?

সে কি মুক্তি চায় নি ? চায় নি অন্ততঃ দুটো দিনের জন্যে ঐ ছেলেটার আশ মেটাতে, তাকে সুখী করতে—আর সেই সঙ্গে নিজেরও আশ মিটিয়ে নিতে, সুখী তৃপ্ত হ'তে ? অর্ধসত্য বলে কি যাচাই ক'রে দেখতে চায় নি স্বামী তার এই অনাচার মেনে নেন কিনা ?

কে জানে, সেইটেই স্থির করতে পারছে না।

পুরীতে চিরদিনই গরমের সময় ভীড় বেশী হয়, বিশেষ বাঙালীদের। কিছুদিন ধরে দেখছি মে মাসের মাঝামাঝি থেকে সে ভীড় দুঃসহ হয়ে ওঠে। কেন না, এখন ইস্কুল-কলেজের ছুটি ছাড়া গৃহস্থদের বেড়াতে যাবার সুবিধে হয় না, আর গরমের ছুটিতে যাবার জায়গা—কাছাকাছির মধ্যে তো মোটে দুটি, পুরী আর দার্জিলিঙ। এ দুইয়ের মধ্যেও পুরীর পাল্লা ভারি। কাছাকাছি, এক রাত্রের 'জার্নি'। খরচও অপেক্ষাকৃত কম।

জানি বলেই মে মাসের অন্তত আট ন তারিখের মধ্যেই যাবার চেষ্টা করি প্রতি বছরই। কিন্তু এবার কিছুতেই কাজের ফাঁক পেলুম না, কুড়ি তারিখের আগে।

ভয় তো ছিলই—যা দুর্দশা দেখি বছরের পর বছর—মালপত্র নিয়ে শুকনো মুখে বসে থাকতে পথে ঘাটে, স্টেশনে, হোটেল ধর্মশালার বাইরে—তেমনি ভরসাও ছিল, একা তো, কোথাও কি আর একটু ঠাঁই হবে না!

কিন্তু প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই পাণ্ডার ছড়িদার ঘনশ্যামের মুখে সুসংবাদ পেলুম, প্রতি বছরই ভীড় হয় এ সময়। কিন্তু এ বছর যা লোক ঠেল মেরেছে এমন সে নাকি এতখানি বয়সে কখনও দেখে নি।

তবু, উপায়ই বা কি!

ওকে নিয়েই একটা রিক্‌শা চেপে আশ্রয় খুঁজতে বার হলুম। শুরু করেছিলুম চক্রতীর্থ থেকে, একে একে স্বর্গদ্বার, মায় চটক-পাহাড় পর্যন্ত ঘুরলুম, কোথাও 'তিল ঠাঁই আর নাহি রে!'

ঘুরতে ঘুরতে বারোটা বেজে গেল, রিক্‌শাওলাকে 'খুশী ক'রে দেব' প্রতিশ্রুতি দিয়ে, দুবার চা কেক খাইয়েও তখন আর ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না। অগত্যা ঘনশ্যামকে বললুম, 'চলো মালটা কোথাও রেখে দর্শন করে নিই, তারপর স্টেশনে ফিরে যাই, যা হয় ক'রে এক্সপ্রেসে চড়ে বসব। এ যাত্রা আর পুরীতে থাকা হবে না, বেশ বুঝতে পারছি।'

'চলে যাবেন!'

'কি করব বলো!'

খানিকটা কি ভেবে নিয়ে ঘনশ্যাম বলল, 'চলুন একটা শেষ চেষ্টা দেখে নিই জগন্নাথের নাম করে।'

'সে আবার কোথায়? জায়গা থাকতে পারে জানো যদি তো এতক্ষণ

গ্যাখো নি কেন?' একটু চটেই যাই যেন।

সত্যিই তখন আর সহ্য হচ্ছে না এই দুর্দশা।

সে বললে, 'বাবু রাগ করবেন না। এর মধ্যে একটা কথা আছে। এখানে এক বুড়িমা আছে, তার বাড়ি ভাড়া দেয় কিন্তু সে ঘর হিসেবে দেয় না, পুরো বাড়ি কেউ নিলে তবে দেয়। খালি পড়ে থাকলেও ঘর হিসেবে দেয় না। বলে ও বড় ঝামেলা। বাড়িটা দুভাগ, ছোট যে অংশ তাতে ওপর নিচে দুখানা ঘর, রান্নাঘর। নিচের ঘরে বুড়ো হিন্দুস্থানী চাকর থাকে, সে নাকি অনেক দিনের লোক। ওপরে মা থাকে। পাশের অংশটা বড়, ওপর নিচে চার পাঁচ-খানা ঘর, দুটো বাথরুম। ভাড়াও নেয় মোটা। খুব পরিষ্কার রাখে বলে যে একবার এসে থেকেছে, সে এলে আর কোথাও ওঠে না। তাই চড়া ভাড়া হ'লেও কখনও ভাড়াটের অভাব হয় না।'

'তাহ'লে? সেখানে গিয়ে লাভ কি?'

'বাবু, কাল দৈবাৎ ওদিকে গিয়ে পড়েছিলুম—চোখে পড়ল বাড়িটা বন্ধ। হয়ত যে ভাড়াটে আসবে সে এখনও আসে নি, দু-চার দিন পরে আসবে। আমাকে চেনে—আমাদের মধুসূদন ঠাকুর ওঁরও পাণ্ডা। আমাকে একটু স্নেহও করে। যদি আপাতত একটা দুটো দিনের জন্যেও থাকতে দেয় তাহলেই বা মন্দ কি! কোথাও না কোথাও কি আর ঘর খালি হবে না?'

আর দ্বিরুক্তি করলুম না।

দূর থেকে বাড়িটা দেখে বেশ ভালও লাগল। স্বর্গদ্বার বলতে আজকাল যে বিস্তৃত এলাকা বোঝায় তার এক প্রান্তে। যদিও সমুদ্রের খুব কাছে নয়, তবু ফাঁকা বলে হাওয়ার অসুবিধা হবে না মনে হল। ওপরের তলা থেকে সমুদ্রও দেখা যাবে—যদি নিচের ঘর থেকে দেখা নাও যায়।

তবে, এ সবই অবান্তর। এখন কোথাও একটু ঠাঁই পেলে বাঁচি। যেখানে হোক। শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ছে।

বাড়িটায় একটু পাঁচিল ঘেরা কম্পাউণ্ডও আছে। তার মধ্যে দু একটা ফুলের গাছও।

রিকশার শব্দেই ভদ্রমহিলা বাইরে এসেছিলেন। সঙ্গে স্যুটকেশ বিছানা দেখে ভুরু কুঁচকে ঘনশ্যামের দিকে তাকালেন।

বয়স হয়েছে, তবে বুড়িমা বলতে যে ছবি আমার মনে দেখা দিয়েছিল, তেমন নয়। দেখে তো মনে হ'ল বয়স ষাটের বেশী হবে না। দীর্ঘাঙ্গী, শাল-গাছের মতোই ঋজু দেহ, কোথাও—না চলনে না বলনে—অর্থাৎ কথাবার্তায়

কোথাও জরার চিহ্ন প্রকট হয় নি। মাথার চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা। তাও সব পাকা নয়, বরং অর্ধেকের ওপরই কাঁচা বলে মনে হ'ল।

আমি যতদূর সম্ভব নত হয়ে নমস্কার করলুম। কিন্তু ঘনশ্যাম একেবারে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকাল। মহিলাও সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বুঝলুম, 'স্নেহ করেন' কথাটা মিথ্যা নয়।

ঘনশ্যাম হাত জোড় ক'রে ঘটনাটা সব বুঝিয়ে দিল। বলল, 'বাবু আমাদেরই যজমান, এখনও হালআমলের মতো পাণ্ডা ছাড়েন নি। খুব লেখাপড়া জানা লোক, বই লেখেন, সে বই ছাপা হয়। আপনাকে জ্বালাতন করতুম না কিন্তু এখন এই রকম বিপদে পড়েই এসেছি আপনার কাছে।'

স্থির কণ্ঠে বুড়িমা উত্তর দিলেন, 'তুমি তো জানো আমি গোটা বাড়ি ছাড়া ভাড়া দিই না। এঁদের গত সপ্তাহেই আসবার কথা ছিল, নিহাৎ কর্তা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই আসতে পারেন নি, পরশু সকালে এসে পৌঁছবেন বলে তার করেছেন।'

ঘনশ্যাম একটা কৃত্রিম উল্লাসে দুই হাত শূন্যে তুলে বলে উঠল, 'জয় জগন্নাথ! জানি বাবুর ওপর ওঁর দয়া হবেই। মা, এই একটা দিনই থাকতে দিন—আমরা কালকের মধ্যেই একটা কোথাও ঘর জুটিয়ে নেব। বাড়ি হোক, হোটেল হোক, খালি তো হবেই!'

তবু ভ্রূকুটি-ঘন ললাট মসৃণ হয় না। বললেন, 'আমার কোন মালি কি লোক নেই। আমার যা কাজ সব মজুয়াই করে। একজন আছে বাউড়ি বলে, সে কোন ভাড়াটে এলে চলে আসে, জল তুলে দেয়, অন্য কাজকর্মও করে। তাকে এখন পাব না। মজুয়ার শরীর খারাপ, তার দ্বারা বাড়তি কাজ হবে না। টিউবওয়েল আছে অবিশ্যি, ও বাড়ির উঠোনেই আছে—উনি জল তুলে নিতে পারবেন? ঘরদোর ঝাড়া হয়েছে গত রবিবার ওঁরা আসবেন বলে, তার চেয়ে বেশি কিছু করার দরকার হ'লে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঘনশ্যাম বলে ওঠে, 'আমি, আমি সব ক'রে দেব মা। ঝাড়ু বালতি তো ও বাড়িতে থাকেই—কোথায় থাকে সেও আমি জানি সব, আপনি কিছু কষ্ট করবেন না—গিয়ে শুয়ে পড়ুন। শুধু চাবিটা দিন, ব্যাস, আর কিছু চাই না।'

এবার অনেকটা সহজ হলেন বুড়িমা, নিঃশব্দে চাবির গোছা বার ক'রে দিলেন ওর হাতে।

ঘনশ্যামের জল তোলা লাগল না। ও একটা ঘর সাফ করতে করতে আমিই জল তুলে স্নান কাপড়-কাচা সেরে ফেললাম। ঘনশ্যাম বলল, 'পথে তো জলখাবার খাওয়া হয়েছে—আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন। এখন চন্দন-যাত্রার সময়। একটার মধ্যে রাজভোগ সরবে, আমি একটু প্রসাদ নিয়ে দুটোর মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

আমি বারণ করতে যাচ্ছি—ঘনশ্যামের অবস্থাও ভাল নয়, সেই বেলা আটটা থেকে, এখন একটা বাজে, সমানে ঘুরছে আর বকছে ; ওর আবার, সাইকেল-রিকশায় স্থানাভাব হয় বলে, যাত্রীদের সঙ্গে সাইকেলেই ঘোরে ; বুড়িমা আর তাঁর পিছনে মজুয়া দেখা দিলেন। বুড়িমার দু হাতে দুটি পাত্র—একটা পাথরের আর একটা কাঁসার—তাতে চিঁড়ে দুধ কলা চিনি, মজুয়ার হাতে দু গ্লাস জল। পাথরের খোরাটি আমার সামনের টেবিলে রেখে—কাঁসার থালা ঘনশ্যামের হাতেই ধরিয়ে দিলেন।

বললেন, 'ঘন যাই বলুক—ভোগ পৌঁছতে যার নাম বিকেল চারটে। এখন একটু পেট ঠাণ্ডা ক'রে নিন, প্রসাদ সন্ধ্যের সময় খেলেই চলবে। চিঁড়ে খাওয়া চলবে তো ? এখনকার বাবুরা তো ফলার শুনলেই মূর্চ্ছা যান।'

'না, না, আমার বাবা মারা যান—আমার তখন তিন বছর বয়েস। বিধবা মায়ের কাছে মানুষ। তাঁর উপোস তিরেস থাকলে আমি চিঁড়ে মুড়ি খেয়েই কাটিয়ে দিতুম। তবে এত হাঙ্গাম আবার করতে গেলেন কেন !'

'এ তো কর্তব্য বাবা। সঙ্গে লোক নেই, খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, ঠিক দুপুর বেলা এসে পড়লে, শুকনো মুখে বসে থাকবে আমরা থাকতে ! দুটো ভাতই দিতে পারতুম আর একটু আগে এলে। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে তাই—। এখন রাঁধতে গেলে মজুয়াকেই তো সব যোগাড় দিতে হবে। ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না। ও বলে পশ্চিমের শরীর নোনা হাওয়ায় টেঁকে না। আসলে বয়েস যে বাড়ছে সেটা মানতে চায় না।'

এই বলে মুখ টিপে একটু হাসলেন।

•

প্রসাদ চারজনের মতোই পাঠাতে বলেছিলুম। নিজের দর্শন সেরে ফেরার পথে আম কলা মিষ্টি-প্রসাদ কিনে এনে বুড়িমার সামনে নামিয়ে দিলুম।

তিনি ব্যস্ত হলেন না। শুধু শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এসব কি বাবা ? ঘরের ভাড়া ? কিন্তু যা প্রসাদ আনিয়েছেন তাই তো যথেষ্ট !'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'কি বলছেন মা ! ছি ছি ! মায়ের কাছে এসে

ভাড়া দোব এমন আস্পদ্দা আমার নেই! মাকে কি এটা ওটা খাওয়াতে ইচ্ছে করে না! আর একশোবার আপনি আপনিই বা বলছেন কেন!'

ইলেক্‌ট্রিকের আলো, দেখার কোন অসুবিধে নেই, দেখলুম অকস্মাৎ ভদ্রমহিলার দুই চোখে জল ভরে এল। আস্তে আস্তে প্রসাদের ভোগাইটা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে লজ্জা দিলে বাবা। উচিত শিক্ষাই দিয়েছ। মানুষের ঘরের ছেলে তাতে কোন সন্দেহ নেই আর!'

পরের দিন ভোরবেলাই ঘনশ্যাম খবর আনল, একটা হোটেলে ঘর খালি হবে আজই বিকেলে, সে আটকে এসেছে কিন্তু বেলা বারোটার মধ্যে টাকা য়্যাডভান্স করতে হবে।

তখন আমি এ বাড়িতে বুড়িমার সামনে বসে গরম রুটি আর আলুভাজার সঙ্গে চা খাচ্ছি। সেই অবস্থাতেই বাঁ হাতে পকেট থেকে টাকাটা বার করতে যাবো—হঠাৎ মা আমার হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন, 'তোমার তো কোন ন্যাটা নেই দেখছি, যা পাও তাই খাও—তা আমি একটা কথা ভাবছিলুম, এখনই মনে এল কথাটা—এ ঘরে তুমি থাকতে পারবে? মজুয়া চিরদিনই এই ভেতরের বারান্দায় সিঁড়ির নিচেটায় শোয়, ওর ভয়—আমার অসুখ করবে, ওকে ডাকব—ঘরে শুলে শুনতে পাবে না। শুধু দিনের বেলায় বিছানাটা এই ঘরে রাখে, তা সে অনায়াসে ঐ সিঁড়ির নিচের বেঞ্চিটায় রাখতে পারবে। যদি অসুবিধে না হয় এখানেই থাকো, ও ঘরটা সাফ-সুৎরো ক'রে দিক, বিছানা বাক্স নিয়ে চলে এসো। এখানেই খেয়ো, তবে বাবা আমার সব নিরামিষ।'

ঘনশ্যাম আবারও দুহাত তুলে বলে উঠল, 'জয় বাবা জগন্নাথ। আমি বলিনি বাবু, বুড়িমা দেবতা?'

'থাক, আর অত বাড়াতে হবে না। নিরিমিষ খেয়ে থাকতে পারবে কিনা সেটা আগে ঠিক হোক!'

'আমি তো বলেছি মা, বিধবার ঘরে মানুষ। নিরিমিষটাই আমার বেশী প্রিয়। কিন্তু···এতটা বোঝা চাপানো কি ঠিক হবে? আপনি খরচপত্রও যদি কিছু না নেন—'

'কে বলে নেব না। তবে এ কাজ তো করিনি। রেট-ফেট-এর মধ্যে যাবো না। তোমার যা খুশি ধরে দিও একটা টাকা, আমি হাসিমুখে নেব।'

সত্যিই নিশ্চিন্ত হলুম। বাড়িটা ভালো লেগেছিল, বুড়িকেও। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা স্পষ্ট কিন্তু রূঢ় নয়। তেমনিই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য সহজ

জ্ঞান। সব চেয়ে, দেখলে মনে হয় ওঁর ভেতরটা বুঝি পাথর দিয়েই গড়া কিন্তু এই ক'ঘণ্টার মধ্যে সামান্য সামান্য ব্যবহারেই বুঝেছি খুবই কোমল, যাকে পাথর মনে হয়েছিল তা বস্তুত স্নেহের সরোবর।

আমাকে ওঁর ভাল লেগেছিল।

পরে বললেন সেটা। বই লিখি, লেখক শুনে ভয় পেয়েছিলেন গোড়ায়—কিন্তু তারপর দেখলেন আমি নিতান্তই সাধারণ লোক একজন, গেরস্ত মেজাজের মানুষ। জমিয়ে গল্প করতে পারি, এও নাকি আমার বিরাট ক্ষমতা একটা। ওঁর এখানে যেসব ভাড়াটে আসে তাদের চালের কথাবার্তা শুনলে ওঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

সামনে মুখে যাই বলুক ওঁর এই ব্যবহার ঘনশ্যামের কাছে অবিশ্বাস্য।

ও বলে, 'আপনি কি গুণতুক জানেন বাবু, বশীকরণ মন্তর? কাউকে নিজের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেয় না বুড়ি। ভাড়াটেরা এলে বাইরের রকে দাঁড়িয়ে কথা কয়। দরকারী কথা ছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। আমাকে খাবার টাবার দিয়েছে অনেকদিন, চায়ের সময় গিয়ে পড়লে চাও দিয়েছে—কিন্তু তাছাড়া কাউকে কখনও খাওয়াতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সব মাপা-জোপা, হিসেব করা। সকালে চারখানা রুটি হবে, পাঁউরুটি খায় না, আর একটু কিছু ভাজা, চা। কেউ মিষ্টি দিলে বা মিষ্টি প্রসাদ আনলে তাও। তারপর বারোটায় ভাত ডাল দুটো তরকারি—তা তিনটে হবার আইন নেই। বড় জোর কিছু ভাতে পোড়া। সেই দুপুরেই ছ'খানা রুটি করা থাকে, উনি ঠিক সন্ধ্যায় দু'খানা রুটি আর একটু দুধ খেয়ে নেন, মজুয়াও ঐ চারখানা রুটি আর দুধ খায়। আম কি কলা থাকলে তাও। আর কিছু না। কেবল কেউ প্রসাদ দিলে এই নিয়মের বদল হয়।'

আবার কোন দিন বলে, 'আমার বাবু সন্দেহ হয় মেয়েছেলে কিনা। এমন ঝানু ব্যবসাদার আমি পুরুষের মধ্যেও দেখি নি। এখানে আসে আজ কুড়ি-একুশ বছর আগে কি বাইশ-তেইশ হবে—একটা টিনের তোরঙ্গ আর ঐ চাকর নিয়ে—বিছানা পর্যন্ত তেমন ছিল না। এসে মাসখানেক একটা ঘর ভাড়া ক'রে থাকতে থাকতে ঐ কাচকামিনীর বাড়ির কাছে একটা ছোট, একেবারে ভেঙে-পড়ে-যাওয়া বাড়ি কিনে নিল, মোট চারশো টাকায়। তারপর বাবু নামে একটা মিস্ত্রি লাগিয়ে ঐ মা আর ঐ হিন্দুস্থানী লোকটা যোগাড় দিয়ে কি ক'রে যে সেই বাড়ি সারিয়ে তুলল—তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সেই

বাড়ি খাড়া হ'তেই দালাল লাগিয়ে বেচে দিল সাড়ে চার হাজার টাকায়। তার পর থেকে শুরু হয়ে গেল কারবার। ঘুরে ঘুরে ভাঙা দরজা-জানলা পর্যন্ত নেই, এমন দেখে বাড়ি কেনে জলের দামে—আর সেই বাড়ি সারিয়ে নিয়ে পরে বেচে দশগুণ লাভে। লোকে বলে এই ক'রে অন্তত লাখ খানেক টাকা করেছে বুড়ি। এখন আর করে না, লোকটার শরীর ভেঙে গেছে—খাটতে পারে না। অভাবও নেই, যা সুদ আসে তাতেই বেশ চলে যায়, বরং কিছু জমে আরও। খাওয়া দাওয়া তো ঐ শুনলেন, পালে-পার্বণে খরচা—তাও বড় একটা দেখি না। খালি পাণ্ডাঠাকুরকে বছরে পঞ্চাশ টাকা দেয় আর ঐ রামকৃষ্ণ মঠে, ভারত সেবাশ্রমে, দু-চার টাকা চাঁদা। মনে হয় মলে এরাই পাবে।'

আমি কিন্তু যত দেখি ততই মহিলা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। ব্রাহ্মণের বিধবা, নিজেই বলেছেন, ঠাকুর্দা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, বাবা বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু ওঁর ভাষায় 'বামনাই' ছিল ষোল আনার ওপর আঠারো আনা—অথচ ওঁর মতো এমন সংস্কারমুক্ত মন আমি এই-বয়সী মেয়েছেলেদের মধ্যে খুব কম দেখেছি।

আগে নাকি মজুয়াই রান্না করত। উনি বলেন, 'অনেক বামুনের চেয়ে মজুয়া খাঁটি মানুষ, অনেক বেশী পরিষ্কার। ওর হাতে খাবো না কেন। এখন খাই না, ওর শরীর ভালো নয় বলে। তাও তো দেখছ বাবা সকালের চা জল-খাবার, রাত্রের রুটি—সবই ও করে। বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, ওপরে জল তোলা সবই ঐ এক হাতে। রাত্রের দুধটি পর্যন্ত গরম ক'রে না দিলে ওর শান্তি নেই। দুপুরের রান্নাটা আমি আজকাল করি এক রকম জোর ক'রেই।'

সবই বলেন ভদ্রমহিলা, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর পা ছড়িয়ে বসে বহু রাত্রি পর্যন্ত গল্প হয়, শুধু স্বামী কে, বাড়ি কোথায়, সেইটে বলতে চান না। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বলেছিলেন, 'ও প্রসঙ্গটা থাক বাবা। ও পাট যখন চুকে বুকে গেছে তখন আর আলোচনা করেও লাভ নেই।'

কেবল একটা কথা একদিন বলে ফেলেছিলেন, হঠাৎই বেরিয়ে গিছল—অত কিছু বোঝার আগেই। ওঁর ঐ নীরবতাতেই কৌতূহলটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, ঘুরেফিরে ঐ প্রসঙ্গটা তোলার চেষ্টা করতুম। একদিন খুব সহজ ভাবে প্রশ্ন করলুম, 'আপনি বিধবা হয়েছেন কদিন ?'

'তা তো জানি না। আদৌ বিধবা হয়েছি কিনা তাও জানি না।'

'তরে মানে এই বেশ—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে চেয়ে থাকি।

'এটা আত্মরক্ষার ধর্ম বাবা। পুরুষের চোখ আর নিন্দুকের রসনা থেকে বাঁচার জন্যে—।'

'মানে, উনি কি নিরুদ্দেশ হয়ে গিছলেন!'

'হ্যাঁ।'

সংক্ষেপে বলে উঠে পড়েছিলেন সেদিন।

কিন্তু 'ও পাট' যে চুকে যায় নি, সেটাই একদিন প্রমাণ হয়ে গেল—আমি থাকতে থাকতেই।

শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা। সুন্দর নিয়মে বাঁধা। আদর-যত্নে বাহুল্য নেই, যথার্থ স্বাচ্ছন্দ্য আছে। আমার যেন নেশা লেগে গিয়েছিল। এক সপ্তাহ থাকার কথা, পনেরো দিন হয়ে গেলেও নড়তে ইচ্ছে হয় নি। উনিও ধরে রাখতেই চান।

ওঁর কাছে থাকা স্থির হবার পরেই দুশো টাকা দিতে গিছলাম, উনি অভ্যস্ত শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ক মাস থাকবে বাবা, এত টাকা দিচ্ছ!'

আমি একটু থতমত খেয়ে গিছলুম।

'না, যা বাজারের হালচাল—হোটেলে থাকলে তো এতে পাঁচ ছ দিনও চলত না বোধ হয়।'

'হোটেল যখন যাও নি তখন আর সে প্রশ্ন কেন। তাদের ব্যবসা, লোক-জন চাকরবাকর, মাছ মাংস খাওয়ানো—অনেক খরচা, তা চালিয়েও লাভ করতে হয়। আমি খরচা নেব বলেছি, লাভ করব না। একশো থাক, দরকার বুঝলে নেব।' উত্তর দিয়েছিলেন।

সুতরাং নিশ্চিন্ত আছি। আরও একশো দিলে বোধ হয় উনি দু মাসই রাখবেন।

সেই নিশ্চিন্ত আরামের নিস্তরঙ্গ সরোবর অকস্মাৎ একটা অনভিপ্রেত ঘটনার আঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠল।

সকালে চা খাওয়া হয়ে গেছে, বুড়িমা কুটনো কুটে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছেন—এমন সময় মঞ্জুয়া প্রায় ছুটতে ছুটতে এল বাইরে থেকে।

এ সময় সে বড় একটা বাইরে যায় না, তার বাজার করার সময় প্রধানত অপরাহ্ণ, আজ বুঝি কি একটা জিনিস কম পড়েছে বা মা কোন বিশেষ ব্যঞ্জন রান্না করবেন, তারই কিছু মশলা প্রয়োজন—সাধারণ বাজারের প্রয়োজনে সে লক্ষ্মীর বাজারে যায়, এখানে বা আসল স্বর্গদ্বারে যে সব দোকান আছে,

তাদের উপর মজুয়ার কোন আস্থা নেই। সে অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও—তার নাকি লো প্রেসার মা বলেন—লম্বা লম্বা পা ফেলে রিকশার আগে লক্ষ্মীর বাজারে পৌঁছে যায়। লক্ষ্মীর বাজারে মাছ আসে না—আর সব জিনিসই ভাল পাওয়া যায়, মাছে ওঁদের দরকারও নেই। জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমে লক্ষ্মী বাজার।

আজ বোধ হয় স্বর্গদ্বারের দিকেই গিছল।

কিন্তু যেখানেই যাক সে এল শুধু হাতে।

মা বিস্মিত হ'লেও বিচলিত হন না, তিনি তাঁর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ভ্রূ কুঁচকে চাইলেন ওর মুখের দিকে। তবে মুখের চেহারা দেখে আমরা দুজনেই বুঝলুম কোথাও কোন অঘটন ঘটেছে।

তার শীর্ণ মুখ ঘামে ভেসে গেছে, সেটা প্রায়-ছুটে-আসার পরিশ্রমেও হতে পারে—কিন্তু পাঙাসপানা মুখে একই সঙ্গে যে ভয় বিস্ময় ও বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে—সেটা ছুটে আসার জন্যে হয় নি নিশ্চয়ই। বিশেষ ক'রে তার হাতে বাজারের থলিও নেই—যেটা নিয়ে সে গিয়েছিল—কোন বাজারও না।

এবার মা উঠে তার হাত ধরে বাইরে রাখা বেঞ্চিটায় বসিয়ে দিলেন, তারপর পাখার অভাবে একটা খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। ভেতরের এ বারান্দায় প্রচুর হাওয়া কিন্তু তার চেয়ে বেশী হাওয়া প্রয়োজন মজুয়ার তখন।

'কি ব্যাপার মজুয়া? এমন ধারা পাগলের মতো কাণ্ড কারখানা করছ কেন?'

আমি এইভাবে আসতেই যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলুম কিন্তু আরও বিস্মিত হলুম বুড়িমার গলায় কোন বিস্ময় ফুটল না দেখে। যেন ঘটনাটা তিনি আঁচ করতে পেরেছেন এবং এটা আশঙ্কাই করছিলেন।

'সে—সে এসেছে। এখানে।'

'কে, কে এসেছে?'

'সে, আবার কে। সেই সব্বনেশে লোকটা! ···মিশ্রবাবু।'

'তা হোক না। তোমার তাতে এত ব্যস্ত হবার কি আছে! কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে—এ তীর্থস্থান, লোক তো আসবেই। বাজারের থলেটা কই? কোথাও ফেলে এসেছ বুঝি! তা বাজারও তো কিছু আনো নি। টাকাগুলোও খোয়া গেছে নাকি?'

সে কথার উত্তর দিল না মজুয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলল, 'ও নাকি কোন রাতের টেরেনে এসে ইস্টিশানেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, মরণাপন্ন অবস্থা। ইস্টিশানের কুলিরা নাকি ঐ হাল দেখে ধরাধরি করে স্বর্গদ্বার শ্মশানে ফেলে গেছে। তাতেই ভীড়ে ভীড়—এখন নাকি হুঁশ হয়ে কেবল তোমার নাম করছে। যারা আছে তারা কেউ তোমার নাম জানে না। তবে কেউ কি আর বেরোবে না! যদি—যদি এখানে নিয়ে আসে?'

'আসে সে আমি বুঝব এখন। তুমি যাও কাপড় ছেড়ে উনুনটা ধরাও। যা আছে ঘরে তাই রাঁধব—আমার এ ছেলের খাওয়া নিয়ে কোন বায়নাক্কা নেই, যা রাঁধব তাই খাবে!'

স্বাভাবিক সহজ গলা, তেমনই সহজ কথাবার্তা।

কিন্তু ব্যাপারটা সেভাবে সহজে মিটল না।

কিছু পরেই সেই অপেক্ষাকৃত জনবিরল পাড়াতেও একটা শোরগোল উঠল। অনেকের চেঁচামেচি, একসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বোঝাবার চেষ্টা করছে কিছু।

আগে শব্দ পরে সৃষ্টি, বাইবেলে আছে। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। লোক-গুলিও দৃষ্টিগোচর হ'ল একটু পরেই।

অনেকগুলি নুলিয়া (দু'একজন এদেশীও আছে—তবে বেশিরভাগই নুলিয়া) মাদুরে বাঁধা একটা দেহ—জীবিত কি মৃত বলা মুশকিল—দুটো বাঁশে ঝুলিয়ে আনছে।

সে বোঝা নামল আমাদেরই বাড়ির সামনে। ফটকের সামনে নয়—ভেতরে ঢুকে একেবারে রকের সামনেই আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল।

এতক্ষণে মাদুরটা খুলে যেতে দেহটা দেখাও গেল। অতি শীর্ণ কঙ্কালসার একটা দেহ, প্রতিটি পাঁজর গোনা যাচ্ছে, এমনই মেদের অভাব যে চামড়া দুখানা পাঁজরের মধ্যে ঢুকে ঢুকে গেছে—পরিখা সৃষ্টি ক'রে।

তবে প্রাণ আর নেই, মুখটা দেখে যা মনে হল। যতদূর দৃষ্টি চলে—বুকও ওঠানামা করছে না।

হৈচৈ-তে পাশের ভাড়াটেরা সবাই বাইরে এসেছেন। কাছাকাছির সব বাড়িই এখন ভর্তি, তারাও যে যতটা দ্রুত সম্ভব এদিকে আসছে।

নুলিয়ারা অনেকেই বুড়িমাকে চেনে, তাদেরই একজন এসে হাত জোড় করে বলল, 'মা এই লোকটাকে মুর্দা মনে করে শ্মশানে ফেলে গিছল রেলের কুলিরা। লোকটা নাকি ইস্টিশনের বাইরে একটা গাছতলায় পড়েছিল। আমরা

সকালে দেখে মুখে হাতে একটু জল দিতে—রাগ করবে না মা—ছু'ফোঁটা দারুও দিয়েছি জলের সঙ্গে—একটু জ্ঞান হয়েছিল। এখন মা দেখছেন মূর্দাই —কিন্তু তখন ছু'চারটে কথাও বলেছিল। আপনার নাম করেছিল, বলেছিল আপনি তার বৌ, বিয়ে করা বৌ। বলেছিল, মরার আগে একবার তার কাছে নিয়ে চলো। সে পোড়াবার খরচা দেবে, তোমাদেরও কিছু দেবে।'

দেখলাম মহিলার মুখে কোন উদ্বেগ, উত্তেজনা বিস্ময় বা উষ্মা—কোনটাই কিছুমাত্র প্রকাশ পেল না। খুব স্থির কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমি তো একে চিনতে পারলুম না। তাছাড়া আমার স্বামী তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন। আমার চেহারা কাপড় দেখে বুঝছ না।'

'উনি যে বললেন—'

'ওঁরই ভুল হয়েছে। মরার সময় বিকারের ঘোরে কি বলেছেন কে জানে। যাই হোক, এখন এসব সরিয়ে নাও। এভাবে আনাও তোমাদের ঠিক হয় নি।'

'আপনার নাম যে বললে—'

'কী নাম?'

'রাণী।'

'আমার নাম রাণী নয়। আমার নাম সুমিত্রা। এখানে তেইশ চব্বিশ বছর আছি, বহু বাড়ি কিনেছি—বেচেছি, দলিল দস্তাবেজ বিস্তর—সব জায়গাতেই ঐ নাম।'

পেছন থেকে একজন বলে উঠল, 'কিন্তু আপনার চাকরকে দেখেছে এ লোকটা। তাতেই তো এখানে আনলুম। বলেছে ঐ যে রোগামতো লোকটা চলে গেল, ও তার চাকর। ওকে খোঁজ করলেই তার খোঁজ পাবে।···আপনার চাকরকে তো চিনি। তাতেই এখানে নিয়ে এলুম।'

এবার কঠিন হয়ে উঠলো ওঁর কণ্ঠস্বর, বললেন, 'যে লোকটা ছু মিনিট পরেই মরবে, এমন মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল যে সবাই মড়া ভেবেছে—তার চোখের জোর এত হবে যে সে দূর থেকে একটা লোককে দেখে চিনতে পারবে—তোমাদের চিনিয়ে দেবে। এ তোমাদের বজ্জাতি, আমার কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা। এখনি যদি লাশ এখান থেকে না সরাও, আমি থানায় খবর দেব। আমাকে তো চেনো, আমি আজকের লোক নই। থানাদার ম্যাজিস্ট্রেট সবাই আমাকে চেনে!'

লোকগুলো বেশ মুষড়ে পড়ল।

একজন বুড়োমত মুলিয়া হাতজোড় করে বলল, "ওদের অন্যায় হয়ে গেছে

না। কিন্তু লাশটা তো পোড়াতে হবে। এমনি যদি দয়া করেও কিছু জান—'

তেমনি কঠিনগলায় বললেন ভদ্রমহিলা, 'না। অন্য ক্ষেত্র হলে আমি দিতুম। এখন দেব না। এসব কথার পর আর দেওয়া যায় না। বেওয়ারিশ মূর্দা সৎকার করা সরকারের কাজ। থানায় খবর দাও। তবে সে তোমাদের খুশী। মড়া সরাও এখান থেকে। আমাকে গোবরজল ছড়া দিয়ে চান করতে হবে।'

তিনি বোধহয় গোবরের খোঁজেই ভেতরে চলে গেলেন।

বোঝা গেল মুলিয়ারা ওঁকে সত্যিই চেনে। তারা হতাশ মুখে মড়াটাকে আবার মাদুর জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

রাত্রে উনি খেতেন সন্ধ্যার পরই, আমি খেতুম ন'টায়। সেই সময়ই মজুয়া উঠে আমার খাবার দুধ গরম করত। আম কেটে দিত, নিজেও খেত। মধ্যের প্রায় দু' ঘণ্টা একেবারেই নিষ্ক্রিয় আমরা। কোনদিন বই পড়তুম, কোনদিন ওপরের বারান্দায় বসে ওঁর সঙ্গে গল্প করতুম।

ওঁর ঘরে একটা চৌকীতে জগন্নাথের ও রামকৃষ্ণদেবের পট ছিল। প্রত্যহ সকালে স্নানের পর পুজো করতেন—সেও অল্প কিছুক্ষণ—এছাড়া আর ধর্মাচরণের কোন চিহ্ন পেতুম না। মধ্যে মধ্যে মন্দিরে যাওয়া ছাড়া। অন্য বুড়িদের মতো মালা জপ কি আধ ঘণ্টা ধরে আহ্নিক করা-কিছুই না। একবার প্রশ্নও করেছিলুম, 'আপনি দীক্ষা নেন নি কেন?'

'না বাবা, ওটা হয়ে ওঠে নি। তেমন গুরুরও দেখা পাই নি, যাঁকে দেখলেই পায়ে পড়তে ইচ্ছে করবে।'

সেদিন যখন ওপরে উঠলুম—উনি তখন নিস্তব্ধ হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে আছেন। দুদিন আগেই পূর্ণিমা গেছে— তাই সেসময় চাঁদ সবে উঠছে। উনি সেই রূপোলি ফুলঝুরি ছড়ানো ঢেউয়ের দিকেই প্রায় নির্নিমেষ চোখে চেয়ে ছিলেন।

আমাকে দেখে 'এসো বাবা, বসো।' বলে ছোট মাদুরটা এগিয়ে দিলেন শুধু। আর কোন ভাবান্তর হল না। যেমন সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিলেন, তেমনই রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে একেবারে আমার দিকে ঘুরে বসলেন। খুব নরম গলায় বললেন, 'সকালের ব্যাপারটা নিয়ে খুব কৌতূহল বোধ করছো, না?'

'করছি বৈকি। তীর্থস্থানে এসে আর অকারণ মিছে বলি কেন?'

'হ্যাঁ, কৌতুহল তো স্বাভাবিক। আমার সামনে এমন হলে হয়ত মুখে কিছু বলতাম না কিন্তু মনে মনে অনেক কিছু ভেবে নিতুম। আমার আশ-পাশের লোকেরা, ভাড়াটে ভদ্রলোক—উনি আবার এককালে পুলিসের বড়-কর্তা ছিলেন—ওঁরা সকলেই নিজের নিজের মতো ভাবছেন। খারাপই ভাবছেন বেশির ভাগ, মেয়েদের নিয়ে কোন রহস্যের গন্ধ পেলে মন নরকের দিকেই যায়।'

তারপর হঠাৎ একটু হেসে ফেলে বললেন, 'এখনকারকালে তবু এইটুকু সুবিধে হয়েছে, ব্যাপারটা জানবার জন্যে ভেতরে ভেতরে ছটফট করলেও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে না। এখনকার ভদ্রতায় বাধে। তাই না?'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তোমার কি মনে হচ্ছে বাবা?'

'বলব?'

'বলবে বৈকি। শোনবার জন্যেই তো জিজ্ঞেস করলুম।'

'আমার ধারণা ওরা যা বলেছে তাই সত্যি। উনি মজুয়াকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। অবশ্য ধারণাই বা বলি কেন, আমি তো সকালে মজুয়ার অবস্থা দেখেছি, ওর কথাগুলোও শুনেছি। তবে, এও বুঝেছি, আপনার তরফ থেকেও এটা উড়িয়ে দেবার কোন প্রবল কারণ ছিল, নইলে আপনি এভাবে মিথ্যে কথা বলতেন না।'

'ঠিক মিথ্যে কথা যে বলেছি তাও হয়ত না। মিথ্যাচরণ বলতে পারো।'

তারপর বললেন, 'অবশ্য ধরা না পড়লেও—মানে মজুয়া ঐভাবে নার্ভাস হয়ে ধরা না দিলেও আমি তোমাকে কথাগুলো বলতুম। বলব বলেই কথা পেড়েছি। তুমি বই লেখো, আমার কথা বুঝবে। তবে আমার নাম দিও না, বেঁচে থাকতে অন্তত না।'

তারপর, আস্তে আস্তে সবই বললেন। তাঁর জীবনের বিরাট ইতিহাস, নির্বুদ্ধিতা, মোহ এবং তা থেকে সর্বনাশ বা বিপুল বিনষ্টির ইতিহাস। উনিও বোধ হয় একটা কৈফিয়ৎ কোথাও রেখে যেতে চান— মৃত্যুর আগে। ওঁর মৃত্যুতেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরেও যদি কোন সুবিচারের সুবিধা বা কারণ থাকে সেই জন্যে। সেই আশাটুকুই ওঁর যেন এখন এক-মাত্র অবলম্বন।

দুটোই ওঁর নাম। সুমিত্রা পোশাকী, রাণী ডাক নাম। পিতামহ বড় পণ্ডিত ছিলেন, তবুও অতি সাধারণ নাম—রাণী বলেই ডাকতেন তিনি।

নামটা তাঁরই দেওয়া।

রাণী অল্প বয়সেই স্কুলের পড়া শেষ করেন। ম্যাট্রিক পাস করেন পনেরো বছরে। আঠারো বছর বয়স যখন—যখন এই কাণ্ডটা ঘটল—তখন উনি বি. এস. সি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। ঠাকুর্দার ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত পড়ানোর— বাবার ইচ্ছা সায়ান্স, ঠাকুর্দা ছেলের মতের ওপর নিজের মত খাটান নি।

এই কাহিনীর আরম্ভটা খুবই তুচ্ছ। তখন ওরা বহরমপুরে মামার বাড়ি। একটা সার্কাস এল, এমন কোন বিখ্যাত দল কিছু নয়, মালিক বাঙালী, বড় দল গড়ার মতো সঙ্গতি বা বুদ্ধি কি উদ্যম ছিল না। খেলোয়াড় অধিকাংশই দক্ষিণ ভারতীয়— কেবল ট্রাপিজ ও বারের খেলা যে দেখায়, সে নাকি বাঙালী। খুব ভাল খেলা দেখায় সে—নিজেরা দেখতে যাবার আগেই রাণী শুনেছিলেন। দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন সুগঠিত দেহ নাকি তিনি এতখানি বয়সে কোন পুরুষের দেখেন নি। রামমূর্তি দেখেছেন ছোটবেলায়, ভীম ভবানীকে দেখেছেন। সাহেবদের দলেরও কাউকে কাউকে দেখেছেন—সে সব দৈত্যাকৃতি মোটা মোটা হাতের গুলি, বুকের মাস্‌ল্—তা সাধনার সাক্ষ্য দেয় কিন্তু নয়নানন্দ নয়।

এই লোকটি—নির্মল বুঝি নাম—এর চেহারা দেখলে সত্যিই ভালো লাগে। ভালো লাগার সীমা পর্যন্ত গিয়ে যেন থমকে গেছে। অবশ্য এখনও অল্প বয়স, সাতাশ আটাশের বেশি নয় নাকি—বেশীদিন এইভাবে খেলা দেখালে হয়ত অমনি দৈত্যাকৃতি হবে।

দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হলেন, সে মুগ্ধতা আর কাটল না। দিবারাত্রির স্বপ্নে —বা কবিগুরুর ভাষায়—ভাবনার সঙ্গে লেগে রইল।

বাবা-মাকে রাজী করিয়ে আর একদিন দেখা গেল—কিন্তু নিতান্তই মামুলী সার্কাস রোজ দেখতে যাবার কোন উপযুক্ত কৈফিয়ৎ নেই। শেষে কলেজ কামাই করে ম্যাটিনী শোতে একাই যেতে শুরু করলেন।

একটি সুশ্রী মেয়ে—যাকে সুন্দরীও বলা চলে—সে রোজ দেখতে আসে এবং তার খেলা শেষ হবার দু'চার মিনিট পরেই উঠে চলে যায়—এটা নির্মলের লক্ষ্য না হবার কোন কারণ নেই। লক্ষ্য করল এবং উল্লসিত হয়ে উঠল। তারও নেশা ধরবে এ তো স্বাভাবিক।

ট্রাপিজের খেলা যে দেখায় তাকে অত রঙচঙ মাখতে হয় না। খেলা শেষ

হলেই একটা জামা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে এসে পথে একদিন ধরল। আলাপেরও অসুবিধা হ'ল না। দু'পক্ষই যখন উৎসুক তখন সামান্য দ্বিধা সংকোচ লজ্জা বাধা হয়ে উঠবে কেন?

পরিচয় পেল। নির্মল বাঙালী নয়, উত্তর প্রদেশেই ওদের আদি বাড়ি, পদবী শর্মা। তবে তিনপুরুষ বাংলায় কাটাবার ফলে বাঙালীই হয়ে গেছে। ওর বাবা ঠাকুর্দা ডুয়ার্সের চা বাগানে কাজ করতেন। ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবেন এই ইচ্ছা ছিল কিন্তু নির্মলের ধাতে বেশী লেখাপড়া সইল না। সে ভবঘুরে হয়ে বেরিয়ে পড়ল, তারপর সাত ঘাটের জল খেয়ে এই সার্কাসের দলে এসে পড়েছে।

এই নিত্য সার্কাস দেখতে যাওয়া আরও দু-চারজন চেনা লোকের চোখে পড়বে বৈ কি। ক্রমশ কথাটা বাবার কানেও উঠল। তিনি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাঁর শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ের এ প্রবৃত্তি হবে কেন? শেষে যখন প্রমাণ পেলেন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কঠোর শাসন করতে গেলেন. মেয়ে এক ফাঁকে নির্মলের সঙ্গে পালাল।

মিশ্রও ব্রাহ্মণ। কলকাতায় এসে ওরা কালিঘাটে গিয়ে একটা বিয়ে করে নিয়েছিল। তবে সেটা ধোপে টিকত না। রাণীর বাবা খুঁজে বার করলেন, এবং পুলিসের সাহায্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। মেয়ে বলল, 'তাহলে আমি আত্মহত্যা করব, কেউ রুখতে পারবে না। এই তোমার দিব্যি বলছি।'

ওঁর বাবা খুবই ঘা খেলেন, কিন্তু বুদ্ধি করে একটা রেজেস্ট্রী বিয়ের ব্যবস্থা করলেন, ওর জন্যে যা গহনা গড়ানো ছিল তাও সব দিয়ে চলে গেলেন। চিরদিনের মতোই যে চলে গেলেন তা রাণী তখন বোঝেন নি। এই ঘটনায় মাস চারেক পরেই তিনি মারা গেলেন।

নির্মল কিছুই আনতে পারে নি। রাণী এনেছিলেন। ঠাকুর্দা আদরের নাতনীকে মধ্যে মধ্যে কিছু টাকা উপহার দিতেন, তা খরচ করার দরকার হয় নি, পালাবার সময় সে টাকা তুলে এনেছিল। তাতেই একটা ঘর ভাড়া করে কোনমতে সংসার চালাচ্ছিলেন রাণী।

প্রবল দেহপিপাসা যখন তরুণ তরুণীকে পেয়ে বসে তখন হিতাহিত জ্ঞান, বিশেষ বাস্তব সচেতনতা একেবারেই থাকে না। সে পিপাসার প্রাথমিক নিবৃত্তি হলে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, উঠতে বাধ্য হয়।

রাণী বলেন, 'এবার কাজকর্ম কিছু করো।'

'কাজকর্ম? কি করব, কে কি কাজ দেবে? জানি তো এই যা সার্কাসের

খেলা। তাও দল ছেড়ে এসেছি না বলে কয়ে, ওদের ডুবিয়ে কলাতে গেলে— ওদের কাছে গেলে পুলিসে দেবে না হয় মেরে তাড়াবে। আর অন্য সার্কাসের দলে চেষ্টা করতে গেলে ঘোরাঘুরি করতে হয়, কোন দল কোথায় আছে, কখন কোথায় যায় কিছু তো ঠিক নেই। তাহলে গোটা দেশটা ঘুরে বেড়াতে হয়। সে খরচ দেবে কে, তুমি কোথায় থাকবে?'

'তাহলে চলবে কিসে?'

'তা আমি কি জানি। তুমিই আমার চাকরি খুইয়ে টেনে এনেছ! সে দায় তোমার।'

টাকা গেল, গহনায় হাত পড়ল। রাণী অনেককে ধরে ক'রে একটা ইস্কুলে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটরের কাজ যোগাড় করল। নির্মল বলল, 'ও আমার দ্বারা পোষাবে না।'

এর মধ্যে টাকা রোজগারের জন্যে যে পথটা সবচেয়ে সহজ এবং সর্বনাশা সেই পথ ধরল, 'রেস' খেলা। তাতে টাকা আরও দ্রুত খরচ হতে লাগল।

হতাশ হলেন রাণী। কিন্তু তখনও আসক্তি যায় নি। হ্যাঁ, ভালবাসা শব্দটা ঐ লোকের সম্বন্ধে উচ্চারণ করতে মন চায় না। তাই তাড়িয়েও দিতে পারলেন না। ফেলে চলেও যেতে নয়। তাই অনেক ঘোরাঘুরি করে একটা ইস্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ানোর মতো চাকরি যোগাড় ক'রে নিলেন। সামান্য আয়, তাতে কোনমতে বেঁচে থাকা যায় মাত্র—তাতে নির্মল রাজী নয়।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত মকরের মেলার সময় বাবুঘাটের কাছে এক সাধুকে ধরল। তিনি সীসাকে সোনা করে দিতে পারেন নাকি, সোনা দিলে তাকে ডবল করতে পারেন। তাঁর শক্তির প্রমাণ স্বরূপ নিজের জটা নিঙড়ে দুধ বার করে দেখালেন। নির্মল ফিরে এসে স্ত্রীর স্কুলে যাওয়ার অবসরে যা দু' একখানা গহনা ছিল বার করে নিয়ে গিয়ে সাধুকে দিল, সাধু বললেন, 'এসব ক্রিয়া গভীর রাতে করতে হয়। তুমি কাল তিল আর সের ভর গাওয়া ঘি দিয়ে যেও।'

পরের দিন ভোরবেলাই ছুটেছিল নির্মল কিন্তু সে সাধুর চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না, শুধু ধুনির জায়গায় এক মুঠো ছাই মাত্র পড়ে আছে।

এবার রাণীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিনি এই প্রথম তিক্ত তিরস্কার করলেন —নিজের বাসনার দেবতাকে, ফলে নির্মলও এই প্রথম হাত তুলল ওঁর গায়ে। যে বলিষ্ঠতার জন্য উনি সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন, তার পূর্ণ পরিচয় পেলেন সেদিন। চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। বাড়িওয়ালারা না দেখলে

বাঁচতেন কিনা সন্দেহ !

এ ব্যাপারের পর তাঁরা নোটিশ দিলেন, 'তোমরা অন্যত্র যাও। ছোট-লোকমি বরদাস্ত হবে না। আর বাড়িতে গুণ্ডা পুষতে পারব না।'

রাণীরও এখানে থাকার ইচ্ছা ছিল না। সে গিন্নীর পায়ে-হাতে ধরল, 'আমাকে একটা রান্নার কাজ যোগাড় করে দিন কোথাও—কলকাতার বাইরে। আপনাদের তো বৃহৎ গুষ্টি শুনেছি !' এই শেষের তোষামোদেই কাজ হ'ল, তিনি বললেন, 'তা মা ঠিকই বলেছ, আমরাই গরিব—কিন্তু আত্ম-কুটুমরা সবাই প্রায় লাখোপতি। আচ্ছা দেখছি।'

পরের দিনই খোঁজ এল। বাগচী বাবুদের এক গিন্নীর খুব শরীর খারাপ—তিনি প্রায় বাইরে বাইরে ঘোরেন, কখনও স্বামী, কখনও ভাই সঙ্গে যায়। টাকার অভাব নেই। তাঁকেই সেবা করতে হবে, বাইরে গেলে রান্নাও। ভাল কাজ করলে মাইনে যা, খাওয়াপরা ছাড়া চল্লিশ টাকাও দিতে পারে। কিন্তু তোমার বয়েস আর চেহারা শুনে তিনি রাজী হচ্ছেন না। বলছেন আমি তো এই রুগ্‌নী, কর্তার এখনও বয়সের তেজ আছে—ঐ রূপের খাপরা অল্প-বয়সী মেয়ে এনে কি বিপদে পড়ব ?'

রাণী এক মুহূর্তও সময় নিলেন না, বললেন, 'আপনি মা কাল একবার নিয়ে চলুন, যাতে তাঁর পছন্দ হয়, সে ব্যবস্থা আমি করছি।'

নির্মলের ক্ষুরটা বাড়িতেই ছিল। রাণীর চুল যেমন বিশাল তেমনি ঘন—পাশের বাড়ির মহিলার কাছ থেকে সেলাইয়ের বড় কাঁচি চেয়ে এনে যতটা সম্ভব নিজে নিজেই কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেন। তার পর ক্ষুর বুলিয়ে একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেলেন। পরের দিন, নির্মলকে উপহার দেওয়া ধুতি—সে এক দিনও পরে নি—সেইটে পরে হাত থেকে শাঁখা লোহা খুলে পূর্ণ বৈধব্যের বেশে এসে ওপরের গিন্নীকে বললেন, 'চলুন মা। এর পর বোধ হয় আপনার বাগচী গিন্নীর আপত্তি হবে না!'

তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এ কি করলি হতভাগী, সে যে এখনও বেঁচে আছে !'

'না মা। আমার স্বামী আমার কাছে মৃত।···চলুন।'

চাকরি হ'ল। পরের দিনই বাগচী গিন্নী ভুবনেশ্বরে যাবেন, রাণীকে নিয়ে গেলেন। নিজের কিছু ভাল শাড়ি বেচে দুটো ধুতি কিনে তৈরী হয়ে নিলেন রাণী। বাড়ীওলাদের বললেন, 'আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, এসব মাল ফেলে দিয়ে ঘর আপনারা খালি করে নিন।'

বছর তিনেক এর পর সুখে না হোক নিশ্চিন্তে কেটেছে। অনেক দেশও দেখা হয়েছে—কাশী, পুরী, ভুবনেশ্বর, এলাহাবাদ, জয়পুর, হরিদ্বার—আরও বহু স্থান। শেষ পর্যন্ত কর্তা ওঁর ওপরই স্ত্রীর ভার ছেড়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু সে আশ্রয় ঘুচল মধুপুর এসে। মধুপুরে ওঁদের নিজস্ব বাড়ি কিন্তু একঘেয়ে হয়ে গেছে বলে আসতে চায় না কেউ। এবার কর্তা ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে এখানে এলেন। সঙ্গে অন্য ভৃত্যও।

অকস্মাৎ পাপগ্রহের মতোই নির্মল এসে হাজির হ'ল একদিন। কি করে খবর পেল তা জানা গেল না। একেবারে বাড়ির ফটকের বাইরে এসে চেঁচামেচি। 'আমার বিয়ে করা পরিবারকে আপনারা ফুসলে এনে আটকে রেখেছেন। দস্তুর মতো রেজেস্টারী বিয়ে। পুলিসে খবর দোব। আপনাদের জেলে দিয়ে ছাড়ব। চালাকি ভেঙে দোব একেবারে!'

পাড়ার লোক জড়ো হওয়ায় লজ্জায় কর্তার মুখ আগুনবর্ণ ধারণ করল। তিনি রাণীকে ডেকে বললেন, 'এ লোকটা যা বলছে তা কি ঠিক? তুমি ওর স্ত্রী?'

রাণী মিথ্যে বলতে পারলেন না। নীরব রইলেন। বাগচীবাবু বললেন, 'ছিঃ ছিঃ! ঐ লোকটার স্ত্রী! কী জাত কী না তার ঠিক নেই, বামুনের মেয়ে, বিধবা এই পরিচয়ে তুমি এসেছিলে! তুমি এখনই চলে যাও তোমার টাকা-কড়ি জিনিসপত্র নিয়ে, নইলে আমিই থানায় যাবো, দুজনে ষড় করে আমার বাড়ি ডাকাতির মতলবে এই চাকরি নিয়েছ বলে। ছিঃ ছিঃ! নিজেকেই অশুচি মনে হচ্ছে!'

এরপর আর বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি! গোলমাল কেলেঙ্কারীর ভয়েই আরো সেখানে কোন 'সীন' করতে পারেন নি, ওর সঙ্গেই যেতে হয়েছিল। নির্মল নিয়ে গিয়ে তুলেছিল একটা প'ড়ো বাড়ির পেছন দিকে চাকরদের থাকার যেসব ঘর, তারই একটায়—যেখানে শুধু একটা ময়লা বিছানা, দু' তিনটে মদের বোতল আর কিছু ভাঙ্গা কলাইয়ের সান্‌কি। আর মেঝেতে কিছু মাংসের হাড়। মদ ও বাসি মাংসের দুর্গন্ধে নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে এল ওঁর। একটি মাত্র ছোট্ট জানলা, আর একটা দরজা ঘরে। ওঁকে সজোরে ঠেলে দিয়ে কপাট বন্ধ করে চাবি দিয়ে চলে গেল নির্মল, বলতে বলতে গেল, 'তুমি যেমন কুকুর তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করছি। টের পাইয়ে ছাড়ব।'...

বসে বসে কাঁদছেন আর আত্মহত্যার উপায় ভাবছেন, অনেকক্ষণ পরে জানলার ধারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল, তারপরই কে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, 'বামুনদি, জেগে আছেন? শুনুন!' গলা পরিচিত বৈকি, আধা হিন্দী উচ্চারণও। মজুয়া। বাগচী বাবুদের মালী।

বললে, 'বামুনদি, ঐ লোকটার খবর আমি সব বার করেছি। একটা গুণ্ডার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে, হাজার টাকা নিয়েছে তার কাছ থেকে, তোমাকে বিক্রী করবে বলে। রাত্তির বেলা মানিক গুণ্ডা লোক নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি ভেবো না, আমিও এখানে লোক ঠিক করছি, আশপাশের সব মালীই আমাকে চেনে, আমি অসময়ে ওদের টাকা ধার দিই—আমরাও সাত আট জন এখানে লাঠি নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকব। আর এই নাও ;—' সে জানলার শিক গলিয়ে কিছু মিষ্টি খাবার আর একটা বোতলে করে জল দিয়ে গেল। 'খেয়ে নাও, যুঝতে হবে তো!'

তবে অত হাঙ্গাম কিছু করতে হয় নি। নির্মল মজঃফরপুরে এমনি একটা মেয়েকে নিয়ে এসে কাকে বিক্রী করেছিল, তার গহনাপত্র সব নিজে নিয়ে—ভুল করেছিল একটা বড় রকম—মেয়ের জ্যাঠা বড় পুলিস অফিসার। কাজেই তদন্তের কোন ক্রুটি হয় নি। ওখানকার পুলিশ এখানের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সেই দিনই বিকেলে ধরে নিয়ে গেল। মজুয়াই খবর দিলে। তালা ভেঙে ওকে উদ্ধার করে—দূরে এক বাড়িতে রেখে এল। কাপড়চোপড় যোগাড় ক'রে, খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে রাত্রে মেয়েছেলে পাহারা রেখে চলে গেল।

তার পর?

এখন এই প্রশ্নই প্রবল।

রাণী ওর কাছেই কাঁদছিলেন—অবশ্য টাকা কিছু বাবুদের কাছে পাওনা আছে, গেলে দিয়েও দেবেন—কিন্তু তাঁদের কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না। কোনমতে যদি কোন তীর্থস্থানে একটা যাবার ব্যবস্থা হয় তো তিনি মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে ভিক্ষে ক'রে খেতে পারেন।

মজুয়া স্থির ভাবে সব শুনল। তার পর শুধু বলল, 'কোন্ তীর্থে যেতে চাও?'

'কাশীতে বড় ঝঞ্ঝাট—বড় বদলোক, বিধবার গাঁদি—বৃন্দাবন যাই নি কখনও। পুরী গেলে বোধ হয় ভালো হয়।'

'তাই হবে' বলে মজুয়া চলে গেল।

তারপর সে যা করলে তা রাণী ভাবতে পারেন নি, সুদূর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। মজুয়াকে দেখেছেন, কথা বলেছেন ওবাড়িতে থাকতে, ভালো মানুষ মিষ্টভাষী লোক, অনেক কাজ যেচে করে দিত ওঁর হয়ে—এই পর্যন্ত। সিমুলতলায় তিলুয়াতে ওর বাড়ি। একদিনে কলেরাতে বৌ ছেলে মরে যায়। তারপর আর বিয়ে করে নি। দেশে ভাই মা ছিল, কিছু কিছু পাঠাত। মা মরার পর আর পাঠায় নি। মাইনের টাকা জমিয়ে কিছু কিছু তেজারতী করত। অল্পস্বল্প অবশ্য, জিনিস বন্ধক রেখে। এখন চার পাঁচ দিনের মধ্যে যতটা পারলে কারবার গুটিয়ে নিলে, যারা মাল ছাড়াতে পারল না, তাদের হিসেব অন্যকে বুঝিয়ে দিয়ে যা পেলে নগদ নিয়ে নিলে। কিছু ছাড়তে হ'ল অবশ্য, লোকসান হ'ল কিছু—কিন্তু সে ক্ষতি গ্রাহ্য করে নি ও। দেশে গিয়েও ও সব সম্পত্তি ভাইকে লিখে, ভাই যা নগদ দিতে পারল, সে মাত্র শ পাঁচেক টাকা—তাই নিল। আর কিছু ভবিষ্যতে দেবে বলেছিল, বলা বাহুল্য সেও তা দেয় নি, মজুয়াও আশা করে নি।

আগে কিছুই শোনেন নি রাণী। বলে নি মজুয়া। পুরীতে পেঁাছে একটা ঘর ভাড়া করে কিছু কিছু আসবাব, অন্য দরকারী জিনিস, কাপড় জামা বাসনকোসন কিনে এনে, নগদ প্রায় পৌনে তিন হাজার টাকা রাণীর হাতে ধরে দিলে।

তখনও বোঝেন নি অত। বললেন, 'তা তুমি যাবে কবে?'

'যাবো আর কোথায়, ওখানকার পাট তো চুকিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'সে কি! তার পর? খাবে কি?'

'খেটে খাবো। আমি না থাকলে তোমাকে দেখবে কে?'

'লোকে কি বলবে?'

'বলার কি আছে, আমি তোমার চাকর, সঙ্গে এসেছি। বাঙালী বিধবা মেয়েছেলের সঙ্গে একটা বিহারী চাকর এসেছে—তাতে আর বলবার কি আছে। সে যাই বলো, তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলে যেতে পারব না।'

'তা তুমিই বা কি খাবে, আমিই বা কি খাবো। আমার তো ভিক্ষে ক'রে খাবার কথা! এত ঘর ভাড়া দিয়ে চাকর নিয়ে থাকলে কি কেউ ভিক্ষে দেবে?'

'রাখো দিকি ভিক্ষে। টাকাটা আছে তো, এতেই দেখি না কিছু ছোট-খাটো করবার করতে পারি কিনা। না হ'লে খেটে খাবো। এখানে অনেক বাবুরা লোক চায়, বিশেষ জল তোলার। তাদের ঠিকে কাজ। কোন অসুবিধে

হবে না।'

সেই কারবারেই আয় হ'ল। ঐ ভাঙা বাড়ি কেনার বুদ্ধি ওরই। দু-চার টাকা তেজারতিও শুরু করল। বস্তুত ওরই টাকা, ও-ই মালিক, কিন্তু আচারে ব্যবহারে বাক্যে সেবায় সে কখনও গৃহ-ভৃত্যের আচরণ লঙ্ঘন করে নি। কিছু চায়ও নি। টাকা সবই রাণীর। তাঁর নামেই ব্যাঙ্কে থাকে। কখনও টাকার কথা উচ্চারণ করে না, কী রইল, কী এল—তাও জানতে চায় না। মধ্যে মধ্যে দু-চার পয়সা সবিনয়ে চেয়ে নেয়—বিড়ির জন্যে। কাপড় জামার দরকার হলে রাণীই কিনে দেন। উনি অবশ্য ব্যাঙ্কের হিসেবে ওর সঙ্গে 'জয়েন্ট-সিগনেচার' ক'রে নিয়েছেন—সেও বিস্তর জোর ক'রে। ও বলেছিল, 'আমার টাকা কি হবে, আপনি যদি মারা যান, আমি অন্য জায়গায় নোকরিতে ঢুকব।'

দীর্ঘ কাহিনী শেষ হতে আমি প্রশ্ন করলুম, 'মজুয়ার এ আকর্ষণ কিসের? মোহ না ভালবাসা?'

'মোহ শব্দটা তুমি বাবা ঢেকেঢুকে বলছ, আগে যেটা সেটা কামই। পরে যেটা দাঁড়াল সেটা প্রেমই, সত্যিকার প্রেম। তবে কাম বা কামনা বা দেহজ আকর্ষণ এই থেকেই তো প্রেম জন্মায়। প্রথম নজরে প্রেম, ওটা বাজে কথা। প্রথম নজরে যে আকর্ষণ, সেটা কামনাই। প্রেম হয়তো পরে আসে, কোন কোন ক্ষেত্রে আসেই না। তাতেই তো এত অশান্তি হয় পরে।'

'আশ্চর্য। কিছুই চায় নি কোন দিন? কোন প্রতিদান?'

'না বাবা। এদিক দিয়ে সে আমার নমস্য। অশিক্ষিত মালী, তার এই নিষ্কাম কামনা বা প্রেম—এর সঙ্গে যখন ঐ লোকটার কথা মনে হয়—মনে হয় এ স্বর্গের দেবতা, সে নরকের কীট!'

তারপর একটু থেমে কেমন এক রকমের অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'এতই যখন বললুম বাবা, শেষ কথাটাও বলে যাই। তীর্থস্থানে বসে স্বীকার করে যাই। এই সর্বস্ব ত্যাগ করা প্রেমের প্রতিদান আমি দিয়েছি। স্বেচ্ছায়, ওর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। তিনটি দিন, বা তিন রাত্রি বলাই উচিত। তার পর আর না। সে-ই ওর আশ্চর্য মনের জোর বাবা, স্বাদ পাওয়ার পরও কোনদিন এদিকে হাত বাড়ায় নি, কোনদিন মনিব চাকরের ব্যবধান লঙ্ঘন করে নি। ভাবতে অবাক লাগে, না?'

তার পর বললেন, 'আমি একে পাপ মনে করি না, আশা করি ভগবানও

মনে করবেন না তা। এ আমার ঋণ শোধ, এটুকু না করে গেলে শান্তি পেতুম না।'

রাজপথের বসন্ত

কলিকাতার রাজপথেও বসন্ত আসে। চাঁদের আলো ঠিক মানুষের গায়ে আসিয়া না পড়িলেও রাস্তার বিদ্যুৎবাতিগুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। দক্ষিণের বাতাসে মন অকারণে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে, ট্রাম-বাস-মোটরের কোলাহল না কমিলেও পথ কেমন যেন জনহীন বলিয়া মনে হয়। পথিকের মনেও সে নিঃসঙ্গতা আঘাত করে, মনে হয় এ পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা, কোথাও কেহ তাহার আত্মীয় বা বন্ধু আজ আর নাই, কিন্তু তবুও তাহার পথে পথেই ঘুরিতে ইচ্ছা করে।

এমনিই এক বসন্ত-রজনীতে বীরেশ্বর মেস হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিল। মেস তাহার একেবারেই ভাল লাগে না, বিশেষ করিয়া এই রকম সন্ধ্যায়। পাচক-চাকরের কোলাহল, একঘেয়ে রান্নার গন্ধ, বাবুদের অশ্লীল রসিকতা, ইহার কোনটার সহিতই তাহার খাপ খায় না। তাহার বিশ্বাস, চোখ কান বুজিয়া মেসে গিয়া একবার স্নান করিয়া খাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে বাস করা যায় না।

কিন্তু এমনই তাহার অদৃষ্ট, মেসেই তাহার প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দেশ হইতে ম্যাট্রিকুলেশান এবং সদর হইতে বি-এ পর্যন্ত সে পড়িয়াছে কিন্তু তাহার জন্য কখনও মেসে বা হোস্টেলে থাকিতে হয় নাই। সদরে তাহার মামার বাড়ি আছে, সেখানে মামীমা ও মামাতো ভাই-বোনেরা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত, কখনও বাড়ির অভাব সে বুঝিতে পারে নাই, আজও তাহাদের কথা মনে হইলে চোখে জল আসিয়া পড়ে। বি-এ পাশ করিবার পর কিন্তু তাহাকে কলিকাতায় আসিতে হইল; উদ্দেশ্য আইন পড়া ও চাকরির চেষ্টা দেখা, যেটা আগে হয়! এবং সেই হইতে সে কলিকাতাতেই আছে, ঐ মেসে!

মামা দশ টাকা ও বাবা দশ টাকা পাঠান, তাহার উপর নিজের গোটা-পনেরো টাকার ট্যুইশন সম্বল করিয়া সে আইন পড়িয়াছে, এইবার পরীক্ষাও দিবে—তবে চাকরির কোন আশাই আর নাই। ইতিমধ্যে দরখাস্ত করিয়াছে

সে হাজার খানেক, সুপারিশ ধরিয়াছে শ'পাঁচেক এবং 'ইন্টারভিউ'ও শ'তিনেকের কম দেয় নাই ; কিন্তু পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয়ের পরিবর্তে একটি ছোট রকমের কেরানীগিরিও তাহার জোটে নাই। মাস ছয়েক হইল সে-চেষ্টা সে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, অনর্থক পয়সা খরচ করিতে আর তাহার মন ওঠে না।

তাহার পরিবর্তে সে সাহিত্য ধরিয়াছে। সারা দুপুর ধরিয়া মেসে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া গল্প লেখে এবং সেগুলিকে পুনশ্চ 'কপি' করিয়া 'উপযুক্ত ডাক-মাশুল সহ' মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের অফিসে পাঠাইয়া দেয়। তাহার মধ্যে গোটাকতক ইতিমধ্যে ছাপাও হইয়াছে, আরও হইবে এরূপ ভরসা পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, কোথা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া জন-দুই সম্পাদক তাহাকে চিঠিও দিয়াছেন। সুতরাং গল্প লিখিয়া অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করাও নিতান্ত দুরাশা নয়—এইরূপ একটা কথা কিছুদিন যাবৎ তাহার মাথায় দেখা দিয়াছে।

সে কথা এখন থাক্—কি বলিতেছিলাম যা—

বীরেশ্বর কর্ণওআলিস্ স্ট্রীট দিয়া হাঁটিতেছিল। একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্য, বিরহের আভাস-মিশানো একটা অস্পষ্ট ক্লিষ্টতা, তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ; সে হাঁটিতেছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীনভাবে। যে কখনও কাহাকেও ভালবাসে নাই, তাহারও মনের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে বিরহের উপলব্ধি হয়, তেমনিই একটা অকারণ বেদনা, তেমনিই অজানা বেহাগের সুর তাহার মনে। তাহার মনে হইতেছিল, চির-পরিচিত, প্রতিদিনকার এই রাজপথ সহসা যেন কোন্ সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সীমাহীন, অনন্ত পথের একমাত্র পথিক সে! আর কোথাও কেহ নাই, পথের পিছনেও কেহ নাই, সামনেও কেহ নাই,—তাহার জীবনে যেন কোনও কালে কেহ ছিল না।

রাত ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিল, কিন্তু বীরেশ্বর মেসে ফিরিবার কথা ভাবিতে পর্যন্ত পারিল না। হাতিবাগানের মোড় পার হইয়া শ্যামবাজারের মোড়ে পড়িল, সেখান হইতে শোভাবাজারের মধ্য দিয়া আসিয়া পড়িল, অত্যন্ত প্রশস্ত একটা নূতন রাস্তায়। কতকগুলি অনর্থক এলোমেলো চিন্তায় সে এমনিই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে শারীরিক ক্লান্তি পর্যন্ত যেন অনুভব করিতে পারিতেছিল না। পা-দুইটা নিতান্তই অভ্যাসবশে চলিতেছিল।

কিন্তু এইভাবে চলিতে চলিতে সহসা তাহার গতিরোধ হইল। একটা

গলির মোড়ে কতকগুলি স্ত্রীলোক যথাসম্ভব সাজিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদেরই একজন রসিকতা করিয়া ডাকিল—'বাবু শুনছেন!'

অন্যমনস্কভাবেই দাঁড়াইয়া বীরেশ্বর একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা রূঢ় আঘাত লাগিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কতকগুলি নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোক মুখে খড়ি মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে কামোন্মাদ পুরুষের আশায়। তাহাদের কুৎসিত দেহ, বিশ্রী প্রসাধন, বিড়ি ও সস্তার এসেন্সের গন্ধ মিলিয়া এমন একটা আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল যে সেদিকে চাহিবামাত্রই তাহার গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিল—

কিন্তু একটুখানি যাইবার পরই আবার তাহাকে থামিতে হইল। একটা গাড়িবারান্দার নিচে একটি মাত্র মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার প্রসাধন ও বেশভূষার দিকে চাহিবামাত্র বোঝা যায় যে সেও পূর্বোক্ত দলেরই একজন, কিন্তু তবু তাহার মধ্যে কোথায় একটা স্বতন্ত্রতা ছিল যাহা বীরেশ্বরেরও চোখে পড়িল। তাহার হাতে বিড়ি নাই, চোখে জোর করিয়া জাগানো লালসার দৃষ্টি নাই, সে যেন কতকটা অন্যমনস্কভাবেই শূন্য রাজপথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা বীরেশ্বর থামিয়া পড়িতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—'বাবু ঘরে যাবেন?'

'ঘরে?···মন্দ কি?'

বীরেশ্বর হাতের ঘড়িটায় দেখিল রাত বারোটা বাজে, মেসে পৌঁছিতে পৌঁছিতে ঝি-চাকরেরা পর্যন্ত শুইয়া পড়িবে। তাহার চেয়ে এইখানেই রাতটা কাটাইয়া গেলে কেমন হয়!

কী একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্যের সুর তখন তাহার মনে বাজিতেছিল, মনে হইল, তাহার কখনও কাহারও উপর ঘৃণা ছিল না, এখনও নাই; তাহার কাছে মেসের বিছানা আর গণিকালয়ের বহু-জন-ভোগ্য শয্যায় কোনও তফাৎ নাই; পথ ও গণিকালয় সব সমান।

সে অকস্মাৎ মন স্থির করিয়া ফেলিল, কহিল, 'চল যাচ্ছি, কিন্তু বেশী পয়সা-কড়ি নেই আমার কাছে। একটা টাকা দিতে পারি—'

মেয়েটি যেন একটু বিস্মিত হইল, তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া মাথা নিচু করিয়া কহিল, 'তাই দেবেন। আসুন—'

পাশের সরু গলিটার মধ্যে একটুখানি গিয়াই একটা একতলা মাঠ-কোঠা। সদর দরজা তখনও খোলাই ছিল, দ্বারের পাশে একটা কুলুঙ্গীর ভিতর

কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল, মেয়েটি সেটি তুলিয়া লইয়া বীরেশ্বরের পাশ কাটাইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। সেই শব্দে ভিতরের একটা ঘর হইতে তন্দ্রাজড়িত মোটা গলায় কে প্রশ্ন করিল—'কে রে বিনি এলি?'

বিনি জবাব দিল—'হ্যাঁ মাসী, আমি।'

তারপর সামনেই একটা ঘরের তালা খুলিয়া কহিল—'আসুন।'

বীরেশ্বর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেন একটু বিস্মিত হইয়া গেল। ছোট ঘর, এক পাশে একটা তক্তাপোশের উপর অতি পরিপাটি শয্যা এবং একপাশে একটা জলচৌকীতে কতকগুলি বাসন ও পানের সরঞ্জাম, তাকের উপর কতকগুলি কাঁচের বাসন, গ্লাস ও রান্নার বাসন; এই মাত্র আসবাব—কিন্তু সমস্তগুলিই ঝক্ ঝক্ করিতেছে, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, সে ঘরে বসিতে মোটেই ঘৃণা বোধ হয় না। ঘরের মেঝেও চক্‌চকে, তেল পিছ্‌লাইয়া পড়ে।

একপাশে পিতলের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া ডিবাটা নিভাইয়া দিল; তারপর বীরেশ্বরের দিকে ফিরিয়া কহিল, 'বসুন।' বিছানার যে পাশটায় ঘরের একটি মাত্র জানালা, বীরেশ্বর সেইখানটায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিনি মেঝেতে বসিয়া তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া জুতাটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিল, 'খাবার টাবার আনাতে হবে বাবু?'

বীরেশ্বর কহিল, 'না, তুমি খেতে চাও তো আনাতে পারো—'

বিনি কথার জবাব দিল না; সে বীরেশ্বরের ধরণ দেখিয়া কী যে বলিবে তাহা বুঝিতেও পারিতেছিল না। বীরেশ্বর তখন তাহাকে দেখিতেছিল। শ্যামবর্ণ, নিতান্ত সাধারণ চেহারা, বয়স বোধ হয় তেইশ চব্বিশই হইবে, কিম্বা আরো বেশী। তাহার দৃষ্টিতে একটু বিচলিত হইয়া বিনি কহিল, 'জামাটা খুলুন—'

বীরেশ্বর কহিল, 'থাক্‌গে জামা, আমি শোব না এখন। আমার এখানে ঘুমও হবে না!' তারপর কথাটা মনে পড়িয়া গেল, কহিল, 'তুমি শুয়ে পড়তে পারো; আমার কিছু দরকার নেই। ··আমি মেসে থাকি, ঘুরতে ধুরতে রাত হয়ে গেল। মেসে ফিরতে ইচ্ছে নেই তাই রাতটা কাটাবো ব'লে তোমার ঘরে এসেছি। তোমাকে আমার দরকার নেই—'

বিনির চোখে সুগভীর বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া বীরেশ্বর কহিল—'তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি বরং টাকাটা আগেই নিয়ে নিতে পারো।'

বিনি লজ্জিত হইয়া কহিল, 'না না টাকা এখন থাক্—'

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরে মুখের রং ধুইয়া আসিয়া সে একটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া মেঝেতে বসিল।

বীরেশ্বর জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'তুমি শুলে না?'

বিনি জবাব দিল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে না এখন—'

সহসা ছাদের দিকে দেখাইয়া বীরেশ্বর কহিল, 'ওটা কেন?'

'ওটা' অর্থাৎ ছেলের দোলনা। চালের কাছাকাছি একটা বাঁশে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'গেল বছর এক বাবুর কাছে প্রায় মাস-ছয়েক ছিলুম। সেই সময়ে একটি ছেলে হয় আমার—'

'সে ছেলে কৈ?'

বিনি আঙুল দিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিল, 'বাড়িওলা মাসির ঘরে রাত্তিরে থাকে; ছোট ছেলে কাঁদে, সেই জন্যে বাবুরা ঘরে বসতে চায় না।'

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া যেন কতকটা ভয়ে-ভয়েই কহিল, 'নিয়ে আসব বাবু, তকে এ ঘরে?'

বীরেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিনি লাফাইয়া উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর মিনিট-খানেক পরে কাঁথা-বালিসসুদ্ধ মাস-ছয়েকের একটি ছেলেকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ছেলেটি তখনও ঘুমাইতেছিল। ঘুমন্ত ছেলেকে প্রদীপের আলোর কাছে ধরিয়া কহিল, 'দেখুন না বাবু—'

ছেলেটি মন্দ নয়, বেশ ফুটফুটে।

বীরেশ্বর কহিল, 'বেশ দেখতে—'

বিনি একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা তাহাকে সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। ঘুমন্ত ছেলে কাঁদিয়া উঠিতেই তাহাকে চাপড় মারিয়া শান্ত করিয়া মেঝেতে বিছানাসুদ্ধ নামাইয়া রাখিল। তাহার পর আবার বীরেশ্বরের চৌকীর নীচে আসিয়া বসিল।

বীরেশ্বর কহিল, 'তুমি শোবে না?'

'না বাবু, আমার ঘুম পাচ্ছে না।'

বীরেশ্বর হাসিয়া কহিল, 'আমাকে ভয় করছে, না?'

মাথা নাড়িয়া বিনি কহিল, 'আগে করেছিল, এখন আর নেই; সত্যি বাবু, সত্যি কথাই বলছি!'

বীরেশ্বর কহিল, 'তবে ঘুমোচ্ছ না কেন ?'

সে মাটির দিকে চাহিল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথাই বলি না !··· তাছাড়া জ্যোছনা রাতে, বিশেষ ক'রে এই নতুন হাওয়ার সময় আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে না, আমি এমনিই অনেকদিন জেগে কাটাই, সারারাত !'

বীরেশ্বর একটা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া কহিল, 'অনেক হেঁটেছি আজ শুধু-শুধু, আমার ঘুম পাবারই কথা, কিন্তু নতুন জায়গা ব'লেই বোধ হয় ঘুম আসছে না !

বিনি একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, 'পা-টা টিপে দেব বাবু একটু ?'

'পা—? আচ্ছা দাও—'

বিনি বিছানায় বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার পা টিপিয়া দিতে লাগিল। একটু পরে বীরেশ্বর কহিল, 'আচ্ছা, তোমার বাড়ী কোথায় ছিল ?'

বিনি একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, 'আমাদের বাড়ি ? বাড়ি কোথায় পাবো বাবু ? ভাড়াটে ঘরেই চিরকাল—'

বীরেশ্বর কহিল, 'না, না, সে বাড়ির কথা বলিনি।'

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিনি নতমুখে জবাব জিল, 'বাড়ি আমাদের পথে পথেই বাবু ; আমি এই সব ঘরেই জন্মেছি।'

বীরেশ্বর লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। একটু পরে বিনি কহিল,—'আপনি ঘুমোলেন ?'

বীরেশ্বর জবাব দিল, 'না। আচ্ছা বিনি, তোমার এসব ভালো লাগে ?'

বিনি কহিল, 'ভালো মন্দ তো কোনও দিন ভাবিনি ; এই ঘরেই মানুষ হয়েছি, এই ঘরেই জন্ম, এই কাজই শিখেছি ; এছাড়া আর গতি কি বলুন ? তবে—'

'তবে কি ? বলো—'

বিনি কহিল, 'মাঝে মাঝে এক একদিন কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়, মনে হয় কোথাও চলে যাই। আজকেই, যেন মনে হচ্ছিল খোকাকেও ফেলে কোথাও চলে যাই—'

বীরেশ্বর সহসা উঠিয়া বসিয়া বলিল—'আচ্ছা, যদি কোনও আশ্রমে তোমার ব্যবস্থা ক'রে দিই তো তুমি এসব ছাড়তে রাজী আছ ?'

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনি কহিল, 'না সে আমি পারব না বাবু। এইখানেই জন্ম আমার, এইখানেই একদিন শেষ হবে। তা ছাড়া টাকা এখন জমাতেই হবে, নইলে খোকাকে মানুষ করব কি ক'রে ?'

বীরেশ্বর আর কথা কহিল না। জানালাটা দিয়া দমকা দক্ষিণের বাতাস আসিয়া ঘরের মধ্যকার প্রদীপশিখাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল।···

খানিকটা পরে ঘুম ভাঙিয়া দেখিল, বিনি নামিয়া গিয়া ছেলের পাশে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটা হাত খোকার গায়ে। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল আকাশে চন্দ্র নাই, নক্ষত্রের আলোও ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ ভোরের আর বেশী দেরী নাই। সে পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিনির মাথার কাছে রাখিল, তারপর জুতাটা পায়ে দিয়া যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে ভোরের হাওয়ায় আসিয়া তাহার যেন মনে হইল, বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নকে সে পিছনে ফেলিয়া আসিল—

বিনি তখন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল কে জানে!

বাস্তব দর্শন

পুজোর সামান্য কিছু আগেই সেবার বেরিয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাও ঠিক ছিল—রাজগীর। পুরোনো বাতের ব্যথাটায় কিছুদিন থেকেই বড় কষ্ট হচ্ছিল, তাই স্থির করেছিলাম কয়েকটা দিন ওখানকার পাহাড়ে-গরম-জল লাগিয়ে আসব।

রাজগীর এর আগেও একবার এসেছিলাম। কিন্তু সে অনেকদিন আগে। এবার এসে দেখলাম স্টেশনের কাছে বেশ ভাল ভাল বাড়ি হয়েছে, বাড়িওলাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালীও আছেন। অর্থাৎ প্রধান অসুবিধা যেটা এদেশের বাড়ির জানলা ও বাথরুমের অভাব, সেটা কতকটা দূর হয়েছে। প্রথম দিনটা ধরমশালাতে কাটিয়ে ওরই ভেতর একখানা ঘর খুঁজে নিলাম। ব্যারাকমত বাড়ি, এক-একখানা ঘর, তার ভেতর দিকে উঠান বাথরুম রান্নাঘর—যাকে সোজা বাংলায় (?) বলে—সেল্‌ফ্‌ কন্‌টেন্‌ড। এমনি সার সার, কেবল বাইরের বারান্দাটা টানা; তা নইলে অপর ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

বেশ লাগল নতুন বাসা। যদিও পাহাড়ের দিকে পেছন-ফেরা, বারান্দায়

না বেরোলে পাহাড় দেখবার কোন উপায় নেই, ঘর থেকে শুধু চোখে পড়ে রেলওয়ে সাইডিং-এর স্তূপাকার কয়লা এবং শান্টিং-এর কুশ্রী দৃশ্য—তবু ভালো বাসারও একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি! আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য, জীবনে এর দামও কম নয়। যাঁরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে সত্যিই আহার নিদ্রা ভুলে যান—এমন লোক খুব বেশী নেই পৃথিবীতে, যাঁরা আছেন তাঁরাও—আমার বিশ্বাস—কিছু অতিশয়োক্তি অথবা অভিনয় করেন।

সে কথা থাক্। রাজগীরের কথায় ফিরে আসা যাক।

বেশ আরামেই কাটল ক'দিন। আরাম এবং শান্তি। স্বামী-স্ত্রী দুটি প্রাণী গিয়েছি। প্রথম প্রণয়ের বাড়াবাড়ির সময় কেটে গেছে—নিত্য ঝগড়া হওয়ার সময় এখনও আসে নি, আমাদের সেই অবস্থা। কাজেই কোথাও কোন অশান্তি নেই। ওখানে গিয়ে ঝি পাওয়া গিয়েছে—সুতরাং গৃহিণীর মুহুর্মুহু চা দিতেও আপত্তি নেই। বাইরে বসবার জন্য একটি চেয়ার সংগ্রহ করেছি। সঙ্গে আছে বাছাই-করা ইংরেজী গোয়েন্দাকাহিনী—একেবারে যাকে বলে আদর্শ অবস্থা। শান্তির নীড় নয়—সুখস্বর্গ।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বাঁধা রুটিন। ভোরে উঠেই একবার চা। বেলা সাতটায় মুখহাত ধুয়ে ছোটেলালের উৎকৃষ্ট দেশী ঘিয়ে ভাজা জিলাপীর সঙ্গে আর একপ্রস্থ চা খেয়ে বাজার। বাজার থেকে ফিরে বাইরের চেয়ারে বসে বা খাটিয়ায় গা এলিয়ে নভেল পড়া; তার ফাঁকে ফাঁকে গৃহিণীর আদর-করে-দেওয়া আলুভাজা অথবা পাঁপড় কিংবা নিম্‌কী। আর একবার চায়ের আবেদন ক'রে তর্জন লাভ এবং পরে উৎকৃষ্ট এক কাপ চা। এর ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য যুবতী গোয়ালিনীর সঙ্গে দুধের ও ঘিয়ের দরদস্তুর; কোন কোন দিন মৎসগন্ধারও দেখা মিল্‌ত। এগারোটা নাগাদ প্রায় এক পুষ্পকরথে চড়ে স্নান করতে যাওয়া, ফিরে এসে আহারান্তে কিছু দিবানিদ্রা। এই সময় কলকাতার গাড়ি এসে পৌঁছত। যাত্রীরা কে নামল—সেটা দেখাও একটা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। তারপর বিকেলে চা, সন্ধ্যায় স্নান—ফেরবার পথে ছোটেলালের দোকানে আর একবার কিছু নমস্কারী দেওয়া, বাড়ি ফিরে চা কিংবা দুগ্ধ পান (গৃহিণী শরীর ভাল করবেনই আমার)—আবার নভেল পড়া গৃহিণী এই সময়টা যে দিন পাড়া বেড়াতে যেতেন অবশ্য সেই দিনই—নচেৎ মনোযোগ দিয়ে বসে তাঁর বাপের বাড়ির বহুবার শ্রুত কাহিনী শুনতে হ'ত!)—তারপর আহার ও নিদ্রা।

অর্থাৎ জীবনটা বেশ মন্দাক্রান্তা ছন্দেই বয়ে যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু

গোলমাল বাধাতেন মালেকান্—'এখানে যাবো' 'ওখানে যাবো' বলে, গৃধ্রকূট, পাওয়াপুরী—এই সবের বায়নাক্কা তুলে। প্রথম প্রথম বাতের অজুহাতে কাটান দিয়েছি। শেষে চেষ্টা করেছি ও-পাশের দোতালাবাড়ির মহিলাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে—নিতান্ত না পারলে যেতেও হয়েছে সঙ্গে ছ-একদিন। নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামের যে সুখ তা ওঁদের বোঝানো কঠিন। কারণ যাঁরা দিবা-নিদ্রা দিয়েই সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, তাঁরা ওর মর্ম কি বুঝবেন? পিতৃ-ক্রীত পাঁচসিকে জোড়ার মালার বদলে আজীবন পেন্সন্ ভোগ করেন যাঁরা, তাঁরা স্বামীর আয়ে বসে খেয়েই শুধু খুশি নন—স্বামীকে সর্বদা উপ-গ্রহের মত নিজের পাশে ঘোরাতে চান।

হ্যাঁ—মোটামুটি শান্তিতেই ছিলাম।

ছিলাম যে তার কারণ আমাদের ঠিক পাশেই কোন প্রতিবেশী ছিল না। প্রতিবেশী থাকবে অথচ অশান্তি থাকবে না—এমনটি বোধ হয় মনুষ্যসমাজে ঘটা সম্ভব নয়। ঐ ব্যারাকের সব কটি ঘরেই লোক ছিল, শুধু ছিল না আমার পাশের ঘরে। তার পাশের ঘরে জনতিনেক মহিলা ক্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রী এসেছিলেন, তাঁরা কারুর সঙ্গে মিশতেন না—স্নান ও বাজারের সময় ছাড়া সব সময় ঘরে বসে উচ্চৈঃস্বরে পরনিন্দা করতেন। তার পাশে এসে উঠেছিলেন এক মাদ্রাজী পরিবার, দেখা হ'লেই মিষ্ট হাসতেন—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেন নি। তারও পাশের একটা পৃথক বাড়িতে একটি বাঙ্গালী ও একটি পাঞ্জাবী পরিবার ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমার স্ত্রীর খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল, তারই ঢেউ মধ্যে মধ্যে এসে যা আমার কাছ পর্যন্ত পেঁ ছিত, তা না হ'লে সত্যিই বেশ ছিলাম।

কিন্তু অত সুখ বিধাতার সইল না। বাড়িওয়ালার বিহারী প্রতিনিধি একদা এসে জানালেন যে, ও-ঘরের ভাড়া হয়ে গেছে, আগামী কালই ভাড়াটেরা এসে পেঁ ছিবেন। আমাদের ঝিকে দিয়েই তিনি ঘরটা একটু ধুইয়ে রাখলেন। আমার স্ত্রী বললেন, 'বাঁচা গেল, রাত্রে ঘরটা ফাঁকা হা-হা করে, কেমন যেন ভয় লাগত!'

আমি শুধু মনে মনে বললাম, 'কী আপদ!'

এলেন তাঁরা পরের দিন। স্বামী স্ত্রী ও একটি চাকর। স্ত্রীটি সুশ্রী, তরুণীও বটে, কিন্তু অলঙ্কার ও বেশভূষার বড় বাহুল্য। স্বামীটিও একটু—কী বলব—কেমন ধরণের, অতিরিক্ত টেরী, ঘাড়-চাঁচা, পাতলা আব্রেঁায়ার পাঞ্জাবি

আর গিলেকরা ধাক্কা-দেওয়া ধুতি—সব মিলিয়ে একটি মাত্রই ইঙ্গিত করে। মাল কিছু বেশিই, তার সঙ্গে আবার একটি হারমোনিয়ামের বাক্স। সখ আছে বটে।

তাঁরা এসেই সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন। আমাদের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত, আলাপ করা তো দূরের কথা। চাকরটিই মালপত্র গুছিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বাজার-হাট এনে সংসার পেতে বসল। সে-ই একবার এসে আমার কাছ থেকে কোথায় কি পাওয়া যায় সন্ধানসুলুক জেনে নিয়েছিল। ওঁরা কিন্তু আর একবারও ঘর থেকে বার হন নি।

কিন্তু তার দ্বারা তাঁরা দুর্বল পুরুষকেই শুধু তাঁদের রহস্য থেকে বঞ্চিত করতে পারলেন, প্রবলা নারীর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার যো কি তাঁদের? আমার স্ত্রীর তো আহারনিদ্রা ঘুচে গেল। তিনি নানাভাবে বাহ্যিক নিস্পৃহতা দেখান অথচ সুযোগ পেলেই উঁকিঝুঁকি মারেন। অবশেষে রাত আটটা নাগাদ তাঁর স্টক-টেকিং হয়ে গেল, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানালেন, 'হ্যাঁ গো, ওরা যেন কেমন কেমন!'

'কেমন কেমন মানে?'

'মানে এই ইয়ে—ওরা ঠিক—মানে ঐ মেয়েটা ঠিক বিয়ে করা নয়।'

'কি করে জানলে? ওর তো সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে!'

'ও, তুমি ঐটুকুর ভেতর তা-ও দেখেছ?' সকোপ কটাক্ষে গৃহিণী চান আমার দিকে, 'কিন্তু তা থাকলে কি হবে? সিঁদুর কৌটো নেই যে সঙ্গে!··· এখন মেয়েটা চান ক'রে এসে দাঁড়াতেই পুরুষটা ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, সিঁদুর পরো মনে ক'রে এই বেলা। তাতে মেয়েটা কি উত্তর দিলে জানো? বললে, ঐ যা, সিঁদুরটা ফেলে এসেছি ছাখো!···ছোট্ট সুটকেসটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলে—ওতে ওর সব টয়লেটের জিনিসই বোঝাই কিনা—কিন্তু সিঁদুর নেই!'

'তাতে আর কি হয়েছে। ভুল তো হতেই পারে!'

'ভুল—এমন সাংঘাতিক ভুল! বাঙালীর ঘরের সধবা মেয়ে সিঁদুর কৌটো নিতে ভুল করবে? মনে তো হয় না। অনব্যেসের ফোঁটা, কপাল চড়-চড় করে।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'দেখো, ও কখনও ভদ্রঘরের নয়—নষ্ট মেয়েমানুষ!'

'ছিঃ!' একটু ভর্ৎসনাই করি আমি, 'ওসব কথা বলতে নেই। কে কি,

তা প্রথম নজরে বোঝা যায় না। আগে থাকতেই সন্দেহ ক'রে বসতে নেই।'

গৃহিণী কিন্তু কিছুমাত্র নিরুৎসাহ বোধ করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, দেখো তুমি!'

এরপর দিন দুই কাটল নিরুপদ্রবে। ওঁরা একদিন মাত্র স্নান করতে গিয়েছিলেন। বেড়াতেও যান না কোথাও। দিনরাতই ঘরে বসে থাকেন। জানলায় (বোধ করি আমার গৃহিণীর উপদ্রবেই) বেশ ভারী করে পর্দা টানিয়েছেন। সন্ধ্যা হতে না হতে জানলাটাও বন্ধ করে দেন। দরজাটা তো বন্ধ থাকেই। চাকর শুধু মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া করে কিন্তু যত বারই যাতায়াত করে, কপাটটা সন্তর্পণে বন্ধ করে যায়। এত সতর্কতার কারণটাও অজানা রইল না, বিলাতী সুরার তীব্র সৌরভ আর কত ঢাকা যায়? এমন কি দ্বিতীয় সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীও নাক সিঁটকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ গো, কিসের একটা গন্ধ ছাড়ছে বল তো?'

পাছে পরোক্ষভাবে তাঁর মতেরই সমর্থন করতে হয়, তাই বললাম, 'কে জানে!···কই, আমি তো পাচ্ছি না!'

তৃতীয় দিনে হারমোনিয়াম বাজল। সেদিন জানলাটা বন্ধ হয় নি পুরো-পুরি। সুতরাং গানও শোনা গেল। মেয়েটির গলা ভাল, তবে গানের বাণীটা আর যাই হোক, ঠিক সুরুচিসঙ্গত নয়।

আমার স্ত্রী বিজয়গর্বেই মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'দেখলে? মিলিয়ে পাচ্ছ তো?'

আমি অনাবশ্যক বোধে আর কথা বাড়ালুম না।

ওখানে শয়নপর্বটা সারা হ'ত একটু তাড়াতাড়িই। এত তাড়াতাড়ি যে কলকাতার লোক শুনলে হাসবে। এক একদিন আটটার মধ্যে শুয়ে পড়তুম। কাজটা কি বলুন? সন্ধ্যা থেকে দুটি প্রাণীতে আর কত গল্প করা যায়? তা ছাড়া কলকাতায় থাকতে পুরোপুরি ঘুমটা তো কখনই হয় না—বিদেশে এলে সেটাই পুষিয়ে নিতে ইচ্ছা করে।

সেদিনও আমরা শুয়ে পড়েছি খুব সকালে। খানিকটা পরে—আমাদের মনে হ'ল বেশ এক ঘুমের পরে কিন্তু উঠে দেখি, মোটে রাত দশটা—প্রবল চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। কারা যেন চীৎকার করছে, কী যেন একটা ভাঙল ঝন্ ঝন্ ক'রে।

চমকে ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

চেঁচামেচিটা বেশী দূরে কোথাও নয়, আমারই পাশের ঘরে। আর একটু কান পেতে শুনতেই বোঝা গেল দুজনে ঝগড়া হচ্ছে। কণ্ঠস্বরে উচ্চতা যথেষ্ট থাকলেও জড়তা কম ছিল না। অর্থাৎ দুজনেরই মত্ত অবস্থা।

ভদ্রতার ওপর কৌতূহলের জয় হ'ল। জানলাটা অর্ধেকের ওপর খোলা, পর্দা থাকলেও তার ফাঁক দিয়ে দেখার অসুবিধা নেই। কাছে এসে ভেতরের দিকে চাইলাম।

মেঝের মাঝখানে একটা বড়-গোছের জাজিম পাতা, তার দুই প্রান্তে দুজন। মাঝখানে হারমোনিয়মটা তখনও পড়ে আছে, এমন কি তার বেলোটা পর্যন্ত টিপে বন্ধ করা হয় নি। আর তার চার পাশে কতকগুলো খালি বোতল—মদের ও সোডার—মাংসের প্লেট, এঁটো হাড়, সিগারেটের টুকরো, দেশলাইয়ের কাঠি—একেবারে ছত্রাকার ক'রে ছড়ানো। পুরুষটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, স্ত্রীলোকটি অকথ্য এবং অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করছে। মেয়েটা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার দুই চোখ রক্তবর্ণ, বেশ-ভূষা আলুথালু, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পেরে ক্রমাগত টলছে। অবস্থান দেখে বোঝা গেল ইতিপূর্বে শ্রীমতী ছটি কাঁচের গেলাস লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়েছে, কিন্তু দৃষ্টি এবং হাত কোনটাই প্রকৃতিস্থ না থাকায় ছটাই ওদিকের দেওয়ালে গিয়ে লেগে ভেঙেছে। এবার তুলেছে সোডার বোতল, বোতলটা বার বার তাগ করছে আবার সেটা সম্বরণ ক'রে নিয়ে খানিকটা ক'রে গালা-গাল দিচ্ছে। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই কানে গেল মেয়েটা বলছে, 'লজ্জা করে না তোর, বন্ধু অসুখ হয়ে চেঞ্জে গেছে আর তুই তার মেয়েমানুষকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস! বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, ইস্টুপিড কোথাকার! আবার আমাকে স্তোক দেওয়া—আজ আসবে কাল আসবে ক'রে! তোকে আমি খুন করব। তোর রক্ত মেখে আমি নাচব ধেই ধেই ক'রে!'

লোকটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ছিল, এবার একটু উঠে বসে ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'থাম্ থাম্—সতী সাবিত্রী এলেন একেবারে! বুকে হাত দিয়ে বল্ দিকি, জেনে শুনে এইছিস কিনা!···এই ক'দিনে এক মোট টাকা তোর পেছনে খরচ করলুম, সে কি অমনি!'

ঝন্ ঝন্ ক'রে সোডার বোতলটা ভাঙল। এবারেও দেওয়ালে গিয়েই লাগল—লোকটার গায়ে নয়।

আর এক দফা অকথ্য গালাগলি—দু পক্ষেই।

এই সময় বাইরে পদশব্দ। ফিরে দেখি ওদেরই চাকর শিবু উঠছে বারান্দার

সিঁড়ি বেয়ে। হাতে ভিজে কাপড়—এই এত রাত্রে বোধ হয় কুণ্ডে গিয়েছিল স্নান করতে।

ওকে ডেকে বেশ একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বললুম, 'শিবু, ভদ্দরলোকের পাড়ায় এসব কি? আমি কিন্তু এখুনি পুলিসে খবর দেব বলে দিলুম।'

ওপাশের ঘর থেকে ক্রিশ্চান মহিলারাও বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরাও এগিয়ে এলেন, একজন বললেন, 'আপনি না যান—আমরা যাব পুলিসে। আমরা প্রোফেসারী করি—আমাদের প্রেস্টিজ আলাদা।'

শিবু বিষম কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, 'শুরু করেছে বুঝি! আঃ—একদণ্ড কি আমার কোথাও যাবার উপায় নেই! এসে ইস্তক তো বেরোতে পারি নি। বলি যে, এখানে লোকে কত পয়সা খরচ ক'রে চান করতে আসে—আমি এসেও চান না ক'রে চলে যাবো? আর যে বেশীদিন থাকা হবে না তা তো বুঝতেই পারছি। তাই আজ এত রাতে নটার পর বেরিয়েছি। আপনি রাগ করবেন না বাবু, ও আমি থামিয়ে দিচ্ছি এখনই।'

সে দ্রুত দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল—ক্রীশ্চান মহিলারা দল বেঁধে তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তাঁদের মুখের সামনেই প্রায় সজোরে এবং সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে কপাটটা।

আমার স্ত্রী বিজয়গর্বে ওঁদের দিকে তাকিয়ে জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মারলেন। বলা বাহুল্য আমিও মহাজন-পদাঙ্ক অনুসরণ করলুম। কৌতূহল বড়ই প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশ।

শিবু ভেতরে ঢুকেই ভিজে কাপড়টা একপাশে ফেলে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে; ওকে দেখেই যেন সে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সুযোগ আর শিবু দিলে না। কাছে এসেই ঠাস ঠাস করে গোটা পাঁচ ছয় চড় কষিয়ে দিলে মেয়েটার দুই গালে। বেশ সজোরেই—দেখতে না পেলেও অনুমান করলুম যে দুই গালে দাগ বসে গেল আঙুলের।

কিন্তু তাতেই শেষ নয়—চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে। একটু পরে যখন ফিরে এল তখন মেয়েটার আপাদমস্তক ভিজে। মাথা দিয়ে, কাপড়-জামা দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়ছে। বুঝলুম বেশ কয়েক বালতি জল পড়েছে মাথায়।

ঘরে ফিরিয়ে এনে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রাখলে মেয়েটাকে, ছোট্ট মেয়েটির মতোই। তারপর একটা তোয়ালে এনে মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড়-জামা হাতে দিয়ে বললে, 'যাও ভিজে কাপড় ছাড়ো গে!'

আশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েটা যেন কেঁচো হয়ে গেছে। একটা কথাও না বলে কাপড়-জামা নিয়ে ভেতরের দিকের অন্ধকার বারান্দায় চলে গেল। জবরদস্ত বাপদের শাসনে মেয়েদের যে অবস্থা হয়—ওরও প্রায় সেই রকমই।

এবার শিবু একটা ঝাঁটা এনে কাঁচের গুঁড়োগুলো ঝাঁট দিতে শুরু করলে। এতক্ষণে বাবুটির কথা ফুটল, যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলে, 'ছাখ শিবে আমি কাল চলে যাবো!'

শিবু ঝাঁটা ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভোর বেলা একটা গাড়ি ছাড়ে এখান থেকে। সেই গাড়িতে উঠে তুমি চলে যেও বাবু। এই ভালয় ভালয় বলে দিলুম। কাল সূর্যোদয়ে যদি তোমার মুখ দেখতে পাই তো তোমার একদিন কি আমার একদিন। শিবুর নাদ্‌না যে কি চীজ তা তো জানই! একদিনে কি শিক্ষা হয় নি?'

বাবু বললেন বটে, 'থাম্ থাম্, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি!' কিন্তু খুব ক্ষীণকণ্ঠে—একটুও জোর ফুটল না গলায় আওয়াজ।

আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল ক্রমশ। সম্ভবত দুজনেই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবুর তো নাক ডাকার শব্দ পাওয়াই যাচ্ছে। খুট-খাট আওয়াজ হচ্ছে—শিবুর ঘর গোছাবার। আর কোন উত্তেজনা নেই দেখে প্রচণ্ড এক হাই তুলে আমার গৃহিণী শুতে চলে গেলেন। কিন্তু আমার ঘুম তখন দস্তুরমত চটে গিয়েছে, আমি বাইরের চেয়ারখানাতেই বসে রইলুম।

খানিকটা পরে খুট ক'রে দরজা খুলে বেরিয়ে এল শিবু, অভ্যাসমত আবার সাবধানে কপাট বন্ধ ক'রে আমার কাছে মেঝেতেই এসে বসল। বললে, 'বাবু, কিছু মনে করবেন না, একটা বিড়ি ধরাই!'

বললাম, 'ধরাও, ধরাও। যা খাটুনীটা খাটলে!'

বিড়ি ধরিয়ে নিঃশব্দে গোটা-কয়েক টান টেনে শিবু বললে, 'দেখলেন তো বাবু কাণ্ডটা! একটা মিনিট আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। এক বোতলের পর দু-বোতল পড়ল কি একেবারে দশবাই চণ্ডী। কেলেঙ্কার একটা করবেই! আমি থাকলে সামলে রাখি, না থাকলেই খাবে। আমি বাক্সয় পুরে চান করতে গিয়েছি—চাবি খুলে বার ক'রে টেনেছে দুজনে। আর ও ও তেমনি ছ্যাঁচড়া। বাবুর বন্ধু তুই, বিশ্বাস ক'রে মেয়েমানুষের কাছে নিয়ে এসেছে, আসা-যাওয়া করতে দেয়—তুই তার সঙ্গে এমনি বেইমানিটা করলি! সে রইল হাসপাতালে পড়ে আর তুই মিছে কথা বলে নিয়ে এলি!

আমি ঠিক ধরেছিলুম বাবু, আমার চোখ এড়াবে এতবড় ধুত্ত ও এখনও হয় নি! বললুমও ওকে তা বললে, মরুকগে, তাই যদি হয় তো কি করা যাবে, শখ হয়েছে যখন মিটিয়ে নিক। খরচাও তো করবে তুশো-পাঁচশো। ধর্ যদি তোর বাবু মরেই যায়—আমাকেও তো দাঁড়াতে হবে। এই সব!···হাড্ডোর মেয়েমানুষ রে! এমন স্বার্থপর জাত আর যদি তুটি দেখেছেন!'

আমি একটু হেসে বললুম, 'কিন্তু তাই বলে তুমি মনিবকে মেরে বসলে, তোমার সাহস তো কম নয়!'

'তা নইলে ওকে সামলাতে পারব কেন বাবু! ঐ ওর এক ওষুধ!'

'রাগ করে না?'

'পাগল হয়েছেন! এত করবে কে? এর আগে আগে যত চাকর রেখেছে সবাই ওর গয়না মেরে সরে পড়েছে। তু'বোতল পেটে পড়লেই তো বেহুঁশ। সেই তো মওকা।···আমি এসে তবে তো তুটো পয়সার মুখ দেখেছে। গয়নাও জমেছে, টাকাও জমেছে। টাকা তো আমি বাড়িতে রাখতে দিই না—কিছু এলেই ব্যাঙ্কে দিয়ে আসি। আর গয়না থাকে লোহার আলমারীতে, সে চাবি আমার কাছে, এই কোমরে ঘুন্সিতে বাঁধা। এত কে টানবে? আমি তো বলি যে, আমাকে ছেড়ে দাও—তা দেয় কই!'

বিড়িটা বকুনির চেটে নিভে গিয়েছিল—আবার ধরিয়ে নিলে। আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তোমার খুব মায়া পড়ে গিয়েছে বুঝি!'

'তা আপনার কাছে মিছে কথা বলব না বাবু,' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই উত্তর দেয় সে, 'তা একটু পড়েছে। এধারে খুব ভাল মেয়েমানুষটা। যখন ঐ ছাইভস্ম পেটে না পড়ে, বেশ থাকে। আদর যত্নও করে খুব। দিল্‌ও আছে। চাকরিতে ঢোকবার মাসখানেক পরেই আমার বউয়ের খুব অসুখ করে—একেবারে থোক তু'শ টাকা হাতে দিয়ে বলেছিল—শিবু, ভাল ক'রে চিকিৎসা করাও গে। কে এত বিশ্বাস করে বলুন তো?'

'বৌ বেঁচে আছে তোমার?'

'না না বাবু।···সে সেই যাত্রায়ই পটল তুলেছে।'

'আর বিয়ে করো নি?'

'না বিয়ে আর করি নি বাবু।'

'করো নি কেন? কীই বা তোমার বয়স।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল শিবু। তারপর গলাটা নামিয়ে বললে, 'তাহলে খুলেই বলি বাবু, একটু আশায় পড়েই আর বিয়ে করি নি। বড্ড

মায়াটা পড়ে গেছে কিনা—ছু পক্ষেই। আমাকে ছাড়ে না, চাকরি ছাড়ব কি? দেশে যাবো বললেই বলে, চ কোন্ তীর্থে গিয়ে কণ্ঠিবদল ক'রে আমরা বাস করিগে। এসব আর ভাল লাগে না। আমিই বরং বলি, তা কেন, রূপযৌবন যতদিন আছে ছু পয়সা কামিয়ে নে। তীর্থে গিয়ে বসলেও পেটটা তো চলা চাই?···যখন বেশ-কিছু জমবে তখন না হয় কোথাও একটা গিয়ে প্রাচিত্তির ক'রে বৈষ্ণব হয়ে কণ্ঠী বদল করা যাবে। কী বলেন বাবু, ঠিক বলি নি? তা ছাড়া ধরুন না কেন, যখন কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। তখন আর তাড়া কি?'

চুপ ক'রে রইলাম। আমার নীরবতাকে সমর্থন ভেবে নিয়ে শিবু বলে চলল, 'দেশে ঘাটে ভাই-ভাইপোরা আছে—পিণ্ডি দেবার লোকের অভাব হবে না। ও জমি জায়গা তাদেরই ছেড়ে দেব সব। আমরা বুড়োবুড়ি মনে করছি বৃন্দাবনে গিয়েই উঠব—ভাল দেখে একটা গুরু করে নিয়ে তোফা ভগবানের নাম করা যাবে।···আমি গিয়েছি ওদিকে বাবু, সব আমার ঘোরা আছে। রাবড়ী যা সস্তা বাবু বৃন্দাবনে—তখন তো বারো আনা সের মিলত—'

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে শিবু ভবিষ্যৎ গৃহস্থালীর একটা উজ্জ্বল ছবিই বোধ করি দেখতে পায়।

সংশয়

সবাই ধন্য ধন্য করলে। শুধু মুখে নয়, অন্তরেও। বাস্তবিক নির্মলা যে এতটা করতে পারবে তা কে ভেবেছিল। শত্রুকবল থেকে আপন শিশুকে ছিনিয়ে আনতে কোন বাঘিনী বা সিংহিনীও এতখানি পারত কিনা সন্দেহ।

অথচ নির্মলার কীই বা সম্বল ছিল?

ওরা ধনী নয়। সাধারণ মার্চেন্ট-অফিসের চাকরি, তাও কোন ইংরেজ এমন কি বাঙালীর বাড়ি নয়, এক মারোয়াড়ীর গদীতে। যা মাইনে পেত তাতে কোন দিনই কুলোয়নি সতীনাথের—আগে একটা টিউশ্যনী করলেই চলত, এখন ছুটো করে। একদা সসম্মানে এম্-কম্ পাস করেছিল, সেইজন্য ও কাজটা এখনও অনায়াসে জোটে। নিজের বাড়ি নেই; ফ্ল্যাটের ভাড়া দিয়ে, একটি শিশুর খরচা চালিয়ে কলকাতায় থাকা—তাতে এক পয়সা

জমবার কথা নয়, জমেওনি। যত্র আয় তত্র ব্যয়—থাকার মধ্যে ছিল বিয়ের সময়কার কয়েকখানা গহনা এবং সতীনাথের মায়ের মৃত্যুর সময়ে পাওয়া খানদশেক গিনি, একটা ইন্‌সিওরেন্সও ছিল কিন্তু তার টাকা পাবার সময় এখনও আসেনি।

রূপ ? না, নির্মলার তাও ছিল না। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। একেবারে কুশ্রী নয়, এই পর্যন্ত বলা চলে। আর যাই হোক্,বুদ্ধিমান ও ধনী ব্যবহার-জীবীদের প্রভাবিত করার মতো চেহারা নয় ওর।

বিদ্যা ?

তাই বা কই ? তৃতীয় বিভাগে কোনমতে ম্যাট্রিকটা পসে করেছিল বটে। তবে তাতে যে কিছুই লেখাপড়া শেখেনি তা বলা বাহুল্য। আর সেও তো হ'ল ছ' সাত বছরের কথা। কিছু শিখে থাকলেও তা এত দিনে ভুলে যাবার কথা।

তবু—তবু তো সে অসাধ্য সাধন করলে। বলতে গেলে একমাত্র নির্মলারই চেষ্টায় সতীনাথ এতবড় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে সসম্মানে বেরিয়ে এল। শুধু তাই নয়—তার পুরোনো চাকরিও দিতে বাধ্য হ'ল ওর মনিবরা।

অভিযোগ গুরুতর বৈকি !

ওদের অফিসের যে ঘরে বড়সাহেব বসেন, সেই ঘরেই থাকে লোহার সিন্দুক। সে ঘরে আর চীফ্‌ য়্যাকাউন্টেন্ট সতীনাথের ঘরের ভেতর ঠেলা-দোরের মাত্র ব্যবধান। ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন ওদের বড়সাহেব (শালা-ভগ্নীপতি দুই অংশীদারের একজন, শ্যালক) সন্ধ্যা ছ'টার সময় যখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন, সতীনাথ তখনও বসে কাজ করছে। সতীনাথ ওঠে সাতটায়—ওর সামনেই দারোয়ান রামনন্দন ঐ ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরের দিন বড়সাহেব এসে রামনন্দনের হাতে চাবি দেন, চাবি খোলা হ'লে যখন নিজের ঘরে ঢোকেন তখন রামনন্দনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে—জানলা দরজা খুলে চেয়ার টেবিল মুছে দেবে বলে। তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে দেখেন লোহার আলমারীর তালা ভাঙা—একটা পাল্লা খোলা হাঁ হাঁ করছে, ভেতরে বড় দু'টি নোটের বাণ্ডিল নেই। হিসেব ক'রে দেখা গেল, আগের দিনের আদায় করা মোট তেইশ হাজার টাকার ভেতর দশ হাজার টাকা উধাও হয়েছে।

পুলিস এল। সরেজমিনে যতটা সম্ভব তদারক করলে। নোটের বাণ্ডিল-

গুলো এক-একটা কাগজে মুড়েছেন ক্যাশিয়ারবাবু। কাগজে মুড়ে তার গায়ে টাকার অঙ্ক লিখে নিজে হাতে সাজিয়ে রেখে গেছেন। তাতে কোন আঙুলের ছাপ আছে কিনা তার ছবি নেওয়া হ'ল। ফটো ডেভলপ্ করার পর দেখা গেল বাকি বাণ্ডিলগুলোতে ক্যাশিয়ার বাবু ছাড়া যার আঙুলের ছাপ আছে—সে হ'ল সতীনাথ। যার ঐ বাণ্ডিলে হাত দেবার কোন কারণ নেই। কারণ পৌনে ছ'টায় ক্যাশিয়ারবাবু টাকা রেখে সিন্দুক বন্ধ ক'রে গেছেন—ছ'টায় বড়সাহেব বেরিয়েছেন অফিস থেকে। ইতিমধ্যে সতীনাথের ও-ঘরে যাবার কোন কারণ ঘটে নি।

ফটো হস্তগত হওয়ার ঘণ্টাকতকের ভেতরেই পুলিস যথারীতি সতীনাথকে গ্রেপ্তার করলে। এই ঘটনার আকস্মিকতায় সতীনাথ যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে একটি কথা কইলে না, কারুর সঙ্গেই না—তেমনি স্তম্ভিত অবস্থাতে গিয়েই পুলিস-ভ্যানে উঠল। এমন কি স্ত্রীকে সংবাদ দেবার কথাও সে কাউকে বলে যেতে পারল না।

ওরই সহকারী একটি ছোকরা, যাদব তার নাম, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নির্মলাকে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দিলে।

নির্মলা খবরটা শুনে পর্যন্ত সমস্ত রাত কেমন একটা স্তম্ভিত অবস্থায় বসে রইল—আড়ষ্ট, কাঠের মতো। একেবারে ওর চমক ভাঙল ভোরের দিকে মেয়েটা কেঁদে উঠতে। এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরল ওর। সহজভাবেই উঠে মেয়েকে খানিকটা দুধ তৈরী ক'রে খাওয়ালে। ততক্ষণ ঝি এসে গেছে। তার কাছে মেয়েটাকে দিয়ে স্নান করে এল। এর পর ঘরদোরের খুঁটিনাটি কাজ সেরে নিজে এক কাপ চা তৈরী ক'রে খেয়ে নিলে। আগের দিনের আহার্য যেমন রান্না তেমনি ছিল—প্রায় সবই ধরে দিলে ঝিকে। ঝি একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'মা, খাবার খাও নি কাল? বাবুকেও তো দেখছি না—বাবু কোথায়?'

মুহূর্তকাল সময় লাগল নির্মলার উদ্গত অশ্রু সামলে নিতে। তারপর বললে, 'উনি কাল আসেন নি।'

'আসেন নি,—কেন মা?'

'কী একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া ক'রে সাহেবের সঙ্গে মারামারি করেছেন, তাই তারা পুলিসে দিয়েছে।'

'মাগো, কী হবে মা!...তারপর—এখন কি করবে?'

'দেখি কি হয়!'

ঝি কাজ সেরে চলে যেতেই নির্মলা ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বাস বদল ক'রে একেবারে এসে উঠল বাগবাজারে নিজের বাপের বাড়ি। বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল না, ওঁরা থাকেন একটি ঘর ভাড়া করে। ওর বিয়ের পরই বাবা মারা যান—ভাইটি তখন ছোট। এই সবে বি. এ. পাস ক'রে চাকরিতে ঢুকেছে। এখনও সামলে নিতে পারে নি—বিপুল ঋণ ঘাড়ে চেপে আছে। তার পরের ভাইটি আরও ছোট, সবে ক্লাস নাইন্-এ পড়ছে। সুতরাং এখান থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাবার উপায় নেই তা সে জানত, তবে যেটুকু পাওয়া যায় সেইটুকুই নিতে হবে। সে সংক্ষেপে কথাটা মাকে জানিয়ে বলল, 'মা, যে ক'দিন না একটা সুরাহা হয়, আমাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। আর কেউ নেই—তাই বলে পড়ে পড়ে অদৃষ্টের মার খাবো না। চুরি সে করে নি, করলে টাকাগুলো অন্তত থাকত। টাকা কিছুই প্রায় নেই, তবু আমি সহজে ছাড়বো না, মা।···কিন্তু এই ক'দিন খুকিটাকে তুমি রাখো। ওকে নিয়ে থাকলে পুরুষের কাজটা হবে না—অথচ আমাকেই তো সব করতে হবে, কে আর করবে বলো!'

মা বললেন, 'তা না হয় দেখলুম, কিন্তু তুই-ই বা কি করবি মা—একা সোমত্থ মেয়ে।'

'দেখি না—কী করতে পারি।'

নির্মলা সেখান থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এসে উঠল একেবারে হেয়ার স্ট্রীট থানায়। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ওর শুষ্কমুখের দিকে চেয়ে একটু সদয় হয়ে উঠলেন। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন 'মকদ্দমাসাহেব' অথবা কোর্ট-ইন্সপেক্টারের কাছে। সেখানে গিয়ে নির্মলা ধীরভাবে সমস্ত অভিযোগ শুনল। দু'একটি প্রশ্ন ক'রে জানলে যে যে-ভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাঁড়াচ্ছে তাতে সতীনাথের অব্যাহতি পাওয়া শক্ত।

ভেঙে পড়বারই কথা। নির্মলা কিন্তু ভেঙে পড়ল না। এতটুকু দুর্বলতা বা অবসাদ প্রকাশ পেল না ওর আচার-আচরণে। বরং মনে হ'ল এতখানি সবল সে নিজেকে মনে করে নি কোনদিন। সে বেরিয়ে আসার সময় কোর্ট-ইন্সপেক্টারকে আর একটি প্রশ্ন করলে,'আচ্ছা এখন ভাল ক্রিমিন্যাল ল'-ইয়ার কে বলতে পারেন?'

তিনি দু-তিনটি নাম ক'রে বললেন, 'এঁদের মধ্যে পাইন সাহেবই ভাল কিন্তু তিনি তো পাঁচশ' টাকার কম কোনদিন দাঁড়াবেন না। এঁরা সবাই সাদা

হাতী। অত টাকা খরচ করতে পারবেন ? পারলেও I won't advice you—কেস খুব স্ট্রং আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে।'

কিছুক্ষণ শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে নির্মলা প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা, মাঝারি গোছের দু-একজনের নাম বলুন তো !'

নাম এবং ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে যখন সে থানা থেকে বেরোল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জামিনের চেষ্টা ক'রে কোন ফল নেই তা 'মকদ্দমাসাহেব' ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং খুব তাড়া নেই। নির্মলা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গড়ের মাঠে, তারপর একটা রিক্সা নিয়ে চলল সদ্য-নাম-ঠিকানা-সংগ্রহ-করা এক উকীলের বাড়ি। উকীলটি অপেক্ষাকৃত তরুণ কিন্তু 'মকদ্দমা-সাহেব' বলে দিয়েছেন—খুব খাটিয়ে উকীল, কালে পাইন সাহেবের মতই নাম করবে।

নির্মলার সৌভাগ্যক্রমে তখন অন্য মক্কেল কেউ আসেনি, উকীলবাবু ধীর ভাবে সব শুনলেন। নির্মলার অপরিসীম শুষ্ক এবং অবসন্ন মুখ দেখে বোধ করি তিনি একটু বিচলিতই হ'লেন। বললেন, 'দেখুন আমার যথাসাধ্য করব কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, এভিডেন্স বড় খারাপ। অন্য কোন বড় উকীল দিতে চান ত বলুন। আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে করতে পারি। আমার তাতে কোন অভিমান-বোধ নেই !'

নির্মলা বললে, 'আপনি যতটা পারেন তাই করুন। আমার এমন সঙ্গতি নেই যে বড় উকীলের কাছে যাই। শুধু আপনি আমাকে কথা দিন যে যথা-সাধ্য করবেন—আমি তাতেই খুশী।'

বাড়িতে নগদ টাকা যে-কটা ছিল তা প্রায় সবই নির্মলা সঙ্গে করে এনেছিল, তা থেকে পঞ্চাশটি টাকা প্রাথমিক খরচা বাবদ গুণে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে উকীলবাবুও উঠে দাঁড়ালেন।…একবার কেশে গলাটা একটু সাফ্ করে নিয়ে বললেন,…'দেখুন, ডাক্তারের কাছে রোগ গোপন করলে রোগ সারে না। আমার অন্তত সব কথা জানা দরকার। নইলে লড়তে পারব কেন !…আপনি কি বিশ্বাস করেন—আপনার স্বামী নির্দোষ ?'

মুহূর্তকাল কি নির্মলা ইতস্তত করেছিল ?

কে জানে। তারপরই সহজ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'করি বৈকি নইলে মকদ্দমা চালাতে আসতুমই না।'

উকীলবাবু তবু একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার

স্বামীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আপনার পুর্ণ বিশ্বাস আছে ? অর্থাৎ টাকা খরচের অপর কোন পথ নেই, তা আপনি জানেন ?···মাপ করবেন—অতর্কিতে কোনো পথ দিয়ে না আক্রমণ আসে, তাই শত্রুপক্ষের সব অস্ত্রের সন্ধান আগে আমাদের নিতে হয়।'

গলায় বেশ জোর দিয়েই নির্মলা বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ রকম কোন আক্রমণই কোথাও দিয়ে আসবে না।'

তাঁকে নমস্কার ক'রে নির্মলা বেরিয়ে এল এবং সোজা বাড়ির পথই ধরলে।

সারাদিনের উপবাস, উদ্বেগ এবং ঘোরাঘুরি। অবসন্ন পা যেন আর চলে না। কোনমতে সে দুটো টেনে টেনে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছয় নির্মলা। নিরানন্দ, নির্জন, অন্ধকার ফ্ল্যাট। অথচ কাল এমন সময় পর্যন্ত তা ছিল ওর সুখের নীড়, নিরাপদ আশ্রয়।

ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলেই একটা চেয়ারে যেন এলিয়ে পড়ে। আর কিছুই করতে ইচ্ছা করে না তার। এখন এইভাবে পড়ে থাকতে পেলেই সে খুশী। মেয়েটা হয়ত কাঁদছে, দিদিমাকে জ্বালাতন করছে। হয়ত পেট ভরে খায় নি সে। আর—আর সে, সতীনাথ—সে কী করছে কে জানে। হাজতের অন্ন কি মুখে রুচবে তার ?···হয়ত সে—

কিন্তু এ সব কি ভাবছে ও ?

না, এসব ও ভাববে না। এমন কি, এমন কি শরীরটাকেও সুস্থ রাখতে হবে তার। যুদ্ধ করতে হবে যখন—তখন হাতিয়ার প্রস্তুত থাকা চাই, সেই সঙ্গে যোদ্ধার শরীরও। অকারণে দেহকে পীড়ন ক'রে লাভ নেই।

নির্মলা উঠে বসল। এখন রান্না সম্ভব নয়। খাবার আনাবারও লোক নেই। স্পিরিট ল্যাম্পে জল চড়িয়ে সে বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এল, মেয়ের টিনের দুধ দিয়ে এক কাপ দুধ ক'রে নিয়ে মেয়েরই জন্য আনা দু'খানা বিস্কুটের সঙ্গে খেয়ে নিলে। তারপর আলমারী থেকে একখানা গহনা বার ক'রে নিয়ে আবার ফ্ল্যাটের বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল।

কার কাছে যাবে সে ?

এই বাড়ির বাকি ফ্ল্যাটে যে বাঙালীরা থাকেন তাঁদের সকলকার কথাই একবার ক'রে ভেবে নিলে সে। কিন্তু কারুর কাছেই যেতে ইচ্ছা করল না। একেবারে ওপরে থাকেন এক মারাঠী ভদ্রলোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর ফ্ল্যাটে

গিয়েই সে কড়া নাড়লে।

অত রাত্রে ওকে দেখে মহিলাটি খুব অবাক হয়ে গেলেন। বিশেষত ওর ঐ চেহারা দেখে আরও উদ্বেগ বোধ করলেন। দুই হাত ধরে একেবারে একটা চেয়ারে এনে বসিয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার দিদি—এত রাত্রে, এমন ভাবে? কোন বিপদ হয়েছে কি?'

মারাঠী ভদ্রলোকটি নিজেও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দিকে চেয়ে নির্মলা মাথা নিচু ক'রে বললে, 'এমন বিপদ যেন অতি বড় শত্রুরও না হয় ভাই! আমার আর কেউ নেই, উনি আমার বড় ভাইয়ের মতো—তাই ওঁর কাছেই ছুটে এসেছি।'

মারাঠী ভদ্রলোকটি বেশ পরিষ্কার বাংলা বলেন। তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, 'কী হয়েছে বল বোন্‌টি, আমার যা করবার তা নিশ্চয়ই করব—যথাসাধ্য!'

নির্মলা সব খুলে বললে। তারপর আঁচল থেকে হারটা খুলে ওঁর হাতে দিয়ে বললে, 'এটা বিক্রী ক'রে আমাকে টাকা এনে দিতে হবে। আমি মেয়েছেলে—হিসেব বুঝতে পারব না,—আমাকে ঠকাবে।'...

ভদ্রলোক বিষম বিচলিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'কিন্তু এখনই বিক্রী করবে? না হয়—এখন কিছু টাকা আমার কাছ থেকে ধারই নাও না কেন?'

'না, আপনি দয়া ক'রে বিক্রী করারই চেষ্টা করুন।'

সে হারটি ওঁদের টেবিলে রেখে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এল।

পরের দিন নির্মলা আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসল। কলেজ স্ট্রীটের এক বইয়ের দোকান থেকে একখানা ক্রিমিন্যাল আইনের বই কিনে নিয়ে এল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা ক'রে বেশী দাম দিয়ে সব চেয়ে প্রামাণ্য বইখানাই সংগ্রহ করল সে।

এর পর শুরু হ'ল ওর তপস্যা।

বিদ্যা সামান্য। ম্যাট্রিক পাসের বিদ্যাতে এমনিই কিছু শেখা যায় না—তার ওপর এতদিনের ব্যবধানে সব কিছুই প্রায় ভুলে গিয়েছে। এই অত্যল্প বিদ্যায় আর যাই হোক্, আইনের বই পড়ে আইন বোঝবার চেষ্টা করা চলে না। সেটা অবিশ্বাস্য তো বটেই—বোধ হয় অসম্ভবও।

নির্মলা কিন্তু সেই দুঃসাধ্য-সাধন-ব্রতেই প্রয়াসী হ'ল। দিনরাত বইখানা খুলে ঝুঁকে বসে পড়ে। অভিধান খুলে মানে বোঝবার চেষ্টা করে। শব্দার্থ

বুঝলেও গূঢ়ার্থ বোঝা যায় না। ভাষার গহন অরণ্যে বুদ্ধি পথ হারায়। এ জটিলতার জাল কেটে ভেতরে প্রবেশ করা বুঝি মানুষের অসাধ্য। এক এক সময় একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। বই মুড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়—রাস্তায় যানবাহন ও লোক-চলাচল দেখে শূন্য দৃষ্টি মেলে। আবার এসে বসে বই খোলে।

হার সে মানবে না—কিছুতেই।

অবশেষে বহু চেষ্টা করতে করতে এক সময় মনে হ'ল অন্ধকার কিছু ঝাপ্‌সা হচ্ছে। বোপদেবের গল্পের মাটির কলসীর মতো নিয়ত সংঘর্ষে পাথরেও দাগ পড়ল। নির্মলার কাছে দুরূহ এবং দুর্বোধ্য ভাষার কুয়াশা সরে গিয়ে আইনের সহজ রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে এবার ভাবতে শুরু করে—এর কোন্ রন্ধ্রপথে সে বার ক'রে আনবে সতীনাথকে!

অবশেষে একসময় মকদ্দমা শুরু হয়। নির্মলা মাথার ওপর সামান্য কাপড় তুলে দিয়ে মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে উকীলের পাশে এসে বসে। এ পর্যন্ত সবই স্বাভাবিক—কিন্তু উকীলবাবু চমকে উঠলেন সওয়াল-জবাব শুরু হ'তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের প্যাঁচগুলো যখন নির্মলাই বলে দিতে লাগল—জেরার অর্ধেক জবান নিজে লিখে উকীলের চোখের কাছে ধরতে লাগল।

পুলিস আগে ছিল নিশ্চিন্ত। ক্রমশ আসামী পক্ষের সওয়ালে প্রথমে বিপন্ন, পরে উদ্বিগ্ন—শেষ অবধি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারাও প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল আসামীর যাতে সাজা হয়ে যায়।

কিন্তু তা হ'ল না।

প্রমাণ হয়ে গেল যে নোটের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে যাবার সময় সতীনাথের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে ক্যাশিয়ারবাবুর হাত থেকে দুটো বাণ্ডিল পড়ে গিয়েছিল।···সতীনাথই উঠে এসে কুড়িয়ে দেয়। সুতরাং তার আঙুলের ছাপ থাকাটা অসম্ভব নয়। আলমারীর হাতলে ছাপ ছিল কিনা—পুলিস তা দেখে নি।···নোটের বাণ্ডিলে আঙুলের ছাপ দেখেই উল্লসিত হয়েছিল, হাতলের ফটো নেবার কথা মনে পড়ে নি।···দুটো মাত্র বাণ্ডিলেই সতীনাথের হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল—সুতরাং ও প্রমাণটার খুব জোর রইল না।

দারোয়ান রামনন্দন বড়সাহেব যাওয়ার পর সারাক্ষণই ঘরের বাইরে টুলে বসেছিল, সে ভেতরে কিছু দেখে নি বটে তেমনি সতীনাথের চেয়ার

ছেড়ে ওঠবার আওয়াজও পায় নি। অন্তত হলফ্ ক'রে বলতে পারে না যে পেয়েছে। বামাল ধরা পড়ে নি—কারণ কোনটাই নম্বরী নোট নয়, কেউ তার নম্বর লিখে রাখারও চেষ্টা করে নি। পুলিস লক্ষ লক্ষ সাধারণ নোটের সমুদ্র থেকে একবিন্দু জলকণার মতো ঐ সামান্য ক'খানা নোট উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করে নি।

সুতরাং পুলিসের কেস শেষ অবধি টিঁকল না। সতীনাথ সসম্মানে মুক্তি পেলে, পাল্টা মকদ্দমার ভয় দেখিয়ে চাকরিটাও বজায় রাখা হ'ল। এ বুদ্ধিও নির্মলার—সে বললে এখানেই চাকরিতে বহাল না হ'লে অন্যত্র কাজ পাওয়া শক্ত হবে। বরং কয়েক মাস এখানে কাজ করার পর ছেড়ে অপর জায়গায় চেষ্টা করলেই হবে।

এই অব্যাহতি বা সাফল্যের পনেরো আনা কৃতিত্বই নির্মলার। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। বাড়ির অপর ফ্ল্যাটের অধিবাসীরা চাঁদা তুলে একটি গহনা উপহার দিয়ে গেল। অভিনন্দন ও অভিবাদনের ঝড় বয়ে গেল যেন ক'দিন ধরে।

সতীনাথের তো কথাই নেই।···প্রথম নির্জন দর্শনে তার কৃতজ্ঞতা আর বাধা মানল না, অজস্র অশ্রুর আকারে ঝরে পড়তে লাগল আলিঙ্গনাবদ্ধ স্ত্রীর মাথার ওপর।···গর্বই কি কম? সে প্রকাশ্যেই তার এই দুর্ঘটনার জন্য আনন্দ প্রকাশ ক'রে বেড়াতে লাগল। নির্মলা যে এমন, নির্মলা যে তাকে এত ভালবাসে—এই বিপদে না পড়লে তো কোনদিনই সে বুঝতে পারত না। এই অসাধারণ প্রেম উপলব্ধি করার জন্য পুরুষ যে-কোন বিপদেই পড়তে রাজী আছে।

গর্ব আর আনন্দ নির্মলারও কম হয় নি। সকলের স্তুতি ও প্রশংসা—স্বামীর পুরুষবন্ধুদের ঈর্ষাতুর চাহনি—যেন নেশার মতো তাকে একই সঙ্গে উত্তেজিত ও অভিভূত ক'রে তুলল। সে সেই মাদক রস চুমুকে চুমুকে পান করতে লাগল বেশ উপলব্ধি করতে করতে।···সুখে ও আনন্দে মশ্গুল হয়ে উঠল ওদের ছোট সংসার।···

'

অবশেষে একদিন সে ঝড়ের উদ্দামতা কমে এল—শান্ত হ'ল চারিদিকের আব্হাওয়া, আবার পূর্বের মতো সহজ, স্বাভাবিক এবং উত্তেজনাহীন জীবন-যাত্রা শুরু হ'ল। তিনটি প্রাণীর ছোট্ট সংসারের সামান্য ও সাধারণ জীবনযাত্রা···

ঠিক কি সবই আগের মতো চলতে লাগল?···বাহ্যত তাই বটে। কিন্তু নির্মলা ও সতীনাথ অনুভব করে—কোথায় যেন সুর কেটেছে। সতীনাথের কৃতজ্ঞতা আজও কমে নি—নির্মলার ব্যবহারে মনের মধ্যে সংশয়ের আভাস পেলেই সে জোর ক'রে স্ত্রীর কৃতিত্বের কথাটা স্মরণ করবার চেষ্টা করে। যেন বার বার জপ করে সে স্ত্রীর নাম।

তবু—

তবু কোথায় কী একটা গোলমাল থেকে যায়। দৈনন্দিন জীবনের সহজ অন্তরঙ্গতার ভেতর কোথায় যেন একটা পাঁচিল উঠেছে। খুবই সূক্ষ্ম হয়ত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাকে বলেছেন প্রদীপের শিখার কিছুটা লাল ও কিছুটা শ্বেত অংশের ভেতর সামান্য ছায়ারেখার ব্যবধান—হয়ত তাই। তবু উঠেছে। আর তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবারও উপায় নেই। ক্রমে ক্রমে তা প্রতিষ্ঠিতই হচ্ছে।

হয়ত এতটা মনে হ'ত না, যদি না সতীনাথ অফিসেও একটা চাপা অবিশ্বাস অনুভব করত। সবাই কথা কয়—কিন্তু কাজের কথা। হয়ত বন্ধুরা কেউ কেউ ঠাট্টা-তামাসাও করে, এবং একেবারে যে তাতে অন্তরঙ্গতার অভাব ঘটে তাও না, তবু সবটা যে ঠিক আগের মতা নেই তা সতীনাথ বেশ বুঝতে পারে। সে টের পায় যে সে পেছন ফিরলেই বহু জিজ্ঞাসা ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। চোখে চোখে একটা প্রশ্ন বিনিময় হয়ে যায়।

এক এক সময় সতীনাথ মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে যে ওর অফিসের এই অভিজ্ঞতাই নির্মলা সম্বন্ধে এমনি একটা ধারণা গড়ে তুলেছে মনের মধ্যে। ···এ ওর বুঝি একট ম্যানিয়া।

এই অনুভূতির সময়গুলোতে তাই সে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে বসে। স্ত্রীর সঙ্গে একটু মাত্রা-অতিরিক্ত ভাবেই চপলতা করতে যায়।

কিন্তু মাত্রা-অতিরিক্ত বলেই বুঝি তা সহজ ও স্বাভাবিক হয় না।

নির্মলাও প্রথম প্রথম মনে মনেই প্রবলভাবে মাথা নাড়ে। না-না—। স্বামীকে সে কোন দিন অবিশ্বাস করে নি, আজও করে না।

ভূতকে যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে-ই অবিশ্বাসের কথাটা প্রবল-কণ্ঠে ঘোষণা করে। আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা অনুপস্থিত উপস্থিতি যেন অনুভব করে তার আশেপাশে।

নির্মলাও তেমনি একটা ভূতের ভয় অনুভব করে। সে ভূত নেই, তার

কোন অস্তিত্ব কোথাও প্রকাশ পায় নি—তবু নিজের ভেতরই তার উপস্থিতিটা টের পায় যেন।···

অবশেষে আর চাপা থাকে না। এক সময় সেই দেহহীন ছায়াহীন ভূতের ভয়টাই প্রবল হয়ে ওঠে।

শুকিয়ে আসে ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে উচ্ছলতার রস। কথা বলে ঠিকই—কিন্তু কেউ কারুর দিকে চায় না চোখ তুলে, পাছে চোখে চোখ পড়ে এবং তাতে ক'রে মনের কথা প্রকাশ পায়।

সহজ সুরও যেন বাজে না কণ্ঠে।···ক্রমশ আচরণে প্রকাশ পায় কুণ্ঠা।··

ভাগ্যিস্ পাশাপাশি শোয় না তারা, মধ্যে খুকীটা থাকে। তা না হ'লে ওরা যে বহু রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র থাকছে, সে তথ্যটা না-জানার অভিনয় আর কত দিন চালানো যেত?

তবু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারে না নির্মলা। যে স্বামীকে সে ভাল-বাসত একদা সারা মন প্রাণ দিয়ে, সেই স্বামীকে ফিরে পেতে চায় সে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ তাই বিছানায় উঠে বসে সে বলে, 'হ্যাঁগো, তুমি জেগে আছ?'

'আছি, কেন বলো তো?' বিস্ময় প্রকাশ করে, প্রশ্নও করে—কিন্তু গলার কম্পনে ধরা পড়ে যে সতীনাথ উত্তরটা অনুমান করেছে।

নির্মলা একটুখানি ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তুমি আমার অপরাধ নিও না—ঐ টাকাটা সত্যিই কি তুমি নাও নি?'

এতদিনের সমস্ত ক্ষোভ সতীনাথের গলার ভেতর দিয়ে যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তুমিও কি ওদের মতো মনে মনে আমাকে সন্দেহ করো, নির্মলা?···তাহ'লে কেন আমাকে বাঁচাতে গেলে এত কাণ্ড ক'রে?···আইনের হাতে ছেড়ে দিলেই পারতে!'

অনুতপ্ত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় নির্মলা, 'আমাকে মাপ করো। আর কখনও এমন কথা তুলব না!'

কিন্তু তবু···যত দিন যায়, মনের মধ্যে এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না নির্মলা যে, যে-উত্তরটা সে শুনতে চেয়েছিল সে উত্তর দেয় নি সতীনাথ। হয়ত ওর কথার মধ্যেই সেটা প্রকাশ করতে চেয়েছে, অনাবশ্যক বোধে আর বেশী কিছু বলে নি। কিংবা হয়ত—ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে সে।···কে জানে।

সহসা সেদিন ঘুম ভাঙিয়া অরুণের মনে হইল প্রভাতটি বড় সুন্দর। আদি-গঙ্গার শীর্ণরেখার ওপারে গরুর গাড়ির শ্রেণী, বোসেদের অতি প্রাচীন নারিকেল গাছের অল্প দুই একটি সবুজ পাতা, এমন কি, তাহার ঘরের সামনের রাস্তায় হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানদের বিবাদের শব্দ পর্যন্ত যেন তাহার সেদিন ভাল লাগিল। মনে হইল গতরাত্রের বিশ্রামের অবসরে তাহাদের যেন রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

তাহার এই মনোভাবের কারণ সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না—একটা দিন যে অন্ততঃ এই কুৎসিত জরাজীর্ণ পৃথিবীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে, ইহারই খুশীতে সে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মুখটা ধুইয়া আসিয়া, চা না খাইয়াই, সে কাগজ-কলম লইয়া বসিয়া গেল গল্প লিখিতে। আজ সে গল্পই লিখিবে, কবিতা নয়, প্রবন্ধ নয়, ছেলেদের বই নয়—এই সুমধুর প্রভাতে সে অত্যন্ত মিষ্ট একটি গল্প লিখিবে।

অরুণ সাহিত্যিক। কোন্ অশুভ মুহূর্তে যে সে এই পথ বাছিয়া লইয়াছিল তাহা বোধ করি সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আজ তাহার ঐ জীবিকা. জীবনের পথ ঐ! একটি ছেলেদের মাসিকে সে সহকারী সম্পাদকের কাজ করে, মাহিনা পায় মাসিক কুড়িটি টাকা। তাহাকেই লেখা ভিক্ষা করিতে হয়, প্রুফ দেখিতে হয়, আর্টিষ্টের বাড়ি গিয়া ছবি এবং ব্লকওয়ালার কাছে গিয়া ব্লকের তাগাদা করিতে হয় এবং আশানুরূপ গ্রাহক বৃদ্ধি হইতেছে না বলিয়া সম্পাদক-মালিকের নিকট হইতে তিরস্কার সহ্য করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কাগজে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া সে আরও কিছু উপার্জন করে। উঞ্ছবৃত্তি বলিবার কারণ এই যে ইহাদের নিকট হইতে সাহিত্যের মূল্য যেটুকু সে পায় তাহার তিনগুণ তাহাকে বেগার দিতে হয়; তিনটি গল্প তিনটি বিভিন্ন কাগজে বিনামূল্যে দান করিয়া চতুর্থ গল্পটির জন্য হয়ত চার টাকা কিংবা পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক পায়; খবরের কাগজে রবিবারের সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিবার জন্য হয়ত টাকা পাওয়া যায়, অনেক সময়ে অগ্রিমও পায় কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে ঐ সকল দৈনিকের অফিসে প্রতিদিন দুপুরে ও সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে হয় এবং প্রায় প্রতিদিনই

সম্পাদকের অনেকখানি কাজ যাচিয়া করিয়া আসিতে হয়। সবসুদ্ধ মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশটি টাকা উপার্জন করিবার জন্য তাহাকে প্রতিদিনই রাত্রি এগারটা পর্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া আসিয়া আবার একটা-দেড়টা পর্যন্ত জাগিয়া গল্প লিখিতে হয়।

এক একদিন তাহার মনে হয় যে, প্রথম যৌবনে যখন কলেজে পড়িত সেই সময়েই কাহারও হাতে পায়ে ধরিয়া যদি একটা অফিসে চাকুরি যোগাড় করিয়া লইত তাহা হইলে আজ তাহার দিন কাটিত সুখে এবং রাত্রে পাইত বিশ্রাম। ছোট দুটি ভাইকে ভাল স্কুলে দেওয়া চলিত, বোনটার জন্য দিনরাত ভগবানের কাছে মাথায় ছোট করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইত না এবং মায়ের জন্য দাসী রাখাও চলিত, অন্ততঃ ঠিকা ঝি। আর, হয়ত বিবাহ করিবার ইচ্ছাও আজ তাহার একান্ত দুরাশা বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু তবু এখনও, আজিকার মতো দুই-একটি মুহূর্ত তাহার জীবনে আসে, যখন মনে হয় যে প্রাণপণে অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করিবার শক্তি তাহার এখনও যায় নাই, সাহিত্য সৃষ্টি সে এখনও সত্যই করিতে পারে। এখনও সে মধ্যে মধ্যে সেই দিনের স্বপ্ন দেখে, যেদিন তাহার সৃষ্ট সাহিত্য তাহাকে যশ ও অর্থ আনিয়া দিবে। সেই সব মুহূর্তে সে যেটুকু শক্তি ও উদ্যম সংগ্রহ করে তাহাই সে প্রাণপণে ক্ষয় করিয়া চলে, সেই কল্পনারই একটা ছায়াকে কোথাও দাঁড় করাইয়া রাত্রি দুইটা পর্যন্ত কলম চালাইয়া যায়, শ্রান্ত মন হইতে আত্মহত্যার চিন্তাকে দূরে রাখে।

যাক্ সে কথা·

অরুণ আজ গল্প লিখিতে বসিয়াছে। চমৎকার একটি গল্পের প্লট বহুদিন আগে পথ চলিতে চলিতে মাথায় আসিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অবসর হয় নাই; আজ আর তাহার সারাংশ কিছু মনে নাই, শুধু ছায়াটা আছে স্মৃতির সঙ্গে লাগিয়া। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সে দ্রুত কলম চালাইতে লাগিল। মধুর, সুন্দর একটি প্রেমের গল্প ছাড়া এমন আলো-ঝলমল অপরূপ প্রভাতে আর কিছুই লেখা যায় না! প্রেমের গল্পে তাহার সমবয়সী কোন সাহিত্যিকেরই নিষ্ঠা ছিল না, কিন্তু অরুণের প্রেমের গল্পের উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস, তাহার ধারণা, যে প্রেম জগতে দুর্লভ, সেই প্রেমের গল্প ছাড়া মানুষ আর কিছুই স্মরণ রাখিতে চায় না।

গল্প যখন অর্ধেকেরও বেশী অগ্রসর হইয়াছে, তখন রান্নাঘর হইতে মা আসিয়া দেখা দিলেন, দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আজ কখন

বেরোবি অরুণ ?'

অরুণের চমক ভাঙিল, খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'যেমন সময় যাই, একটায়। কেন ?'

প্রশ্নটার সহজ জবাব না দিয়া তিনি পুনশ্চ নিজেই প্রশ্ন করিলেন, 'তোর মাইনে আজ দেবে ওরা ?'

অরুণ উত্তর দিল, 'দেবার কথা তো পরশু থেকেই ছিল, দেবে কি না কি জানি।'

মা আরও একটু নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, 'গয়লাটা বড্ড তাগাদা করছে। গত মাসে নিরুর অসুখের সময় যে দুধ নেওয়া হয়েছিল তারও দাম দিতে পারি নি কিনা! এ মাসেও অনেক দিন হয়ে গেল, ওরই বা অপরাধ কি ? কিন্তু আমার হাতে একটি পয়সা নেই ; আজ মোটে দু' আনার বেশী বাজার হয় নি।'

অরুণ জানিত যে তাহার মা সহজে পয়সাকড়ির কথা তাহার কানে তোলেন না, ব্যাপার নিশ্চয়ই আজ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'গয়লা কি দুধ বন্ধ করবে বলেছে ?'

মা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'বন্ধ ক'রে আর কি করবে, চা খাওয়া তো ? না হয় না-ই খেলুম। কিন্তু বড় চেঁচামেচি করে—'

তিনি আরও খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। অরুণও একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গল্পের প্যাডটি একটা বই চাপ দিয়া রাখিয়া দিল। গল্প লিখিলে আর চলিবে না—রচনা-বিন্যাসের আর সময় নাই। তাহার মনিবের মাহিনার উপর শ্রদ্ধা ছিল না, হয়ত তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেও দিতে পারিবেন না, সুতরাং আরও একটা কিছু অমোঘ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে একখানা বিলাতী বই টানিয়া লইয়া দৈনিক কাগজের জন্য একটা জোরালো প্রবন্ধ লিখিতে বসিল।

কিন্তু প্রবন্ধে তাহার মন বসিল না। মধ্য-আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় জাতির গৃহস্থালীর বিবরণ লিখিতে লিখিতে কেবলই তাহার মনে হইতেছিল বেচারী মাধুরী—তাহার নায়িকার কথা। সকালে যে সুরটি তাহার মনে জাগিয়াছিল, তাহারই রেশ মনে থাকিতে থাকিতে গল্পটা শেষ করিলে ভাল হইত। কিন্তু উপায় কি ?...

প্রবন্ধটি শেষ করিয়া যখন সে উঠিল তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। কালীঘাট

হইতে কলেজ স্ট্রীট, এই দীর্ঘ পথ তাহাকে প্রায়ই হাঁটিয়া যাইতে হয়, কদাচিৎ কোনদিন দম্‌কা টাকা পকেটে আসিয়া পড়িলে সে বাসে চড়ে! যাহা হউক, অফিসে যখন পৌঁছিল তখন দুইটা বাজিয়া দশ মিনিট, তাড়াতাড়ি গিয়া প্রুফ দেখিতে বসিল। কাগজের মালিক পাশের ঘরে বসিয়া অট্টহাস্য করিতেছেন শুনিতে পাইল কিন্তু প্রেসের লোকেরা এখনই প্রুফের জন্য ভীষণ তাগাদা দিবে বলিয়া তখন আর সেখানে যাওয়া চলিল না, প্রুফ দেখিতে শুরু করিল। গোটা-চারেক নাগাদ হাতটা একটু খালি হইতেই পাশের ঘরে গিয়া দেখিল ঘর খালি। কেরাণীকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, বাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন ;—বিশেষ কাজে শ্রীরামপুর যাইতে হইবে, সুতরাং আজ আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই।

বিবর্ণ মুখে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মাইনের চেকটা কি রেখে গেছেন?'

কেরানী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, 'কৈ না। আমাকে কিছু বলেও যান্ নি তো!'

অরুণ বুঝিল যে এখানে অপেক্ষা করা বৃথা, তখনই সে বাহির হইয়া পড়িল।

হেড্ কম্পোজিটার শ্যামবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'আরও তিনটে গ্যালি বাকী রইল যে—'

অরুণ সংক্ষেপে কহিল, 'থাক্—'

শ্যামবাবু পিছনে পিছনে আসিয়া কহিলেন, 'বড্ড অসুবিধে হবে কিন্তু, কোন কাজ শেষ করতে পারব না।'

অরুণ রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'অসুবিধা হ'লে বাবুকে ব'লো, জবাব যা দিতে হয় তাঁকেই দেব।'

ততক্ষণে সে রাস্তায় পা দিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে তাহার মাথা যখন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল তখন সে বুঝিল যে অতটা মেজাজ দেখাইয়া কোন লাভ হইল না, বরং কিছু লোকসানের সম্ভাবনা আছে। এই বাজারে যদি এ চাক-রিটি যায় তো তাহার পরে কি হইবে, এক মুহূর্ত কল্পনা করিবার চেষ্টা করিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। তবে শ্যামবাবু সে ধরনের লোক নয়—এই যা ভরসা!···

যে দৈনিকের অফিসে সে উপস্থিত হইল, ইহারাই সর্বাপেক্ষা বেশী নগদ বিদায় করে। কিন্তু, তাহার বন্ধু, সহকারী সম্পাদক জিতেনবাবু তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'ইস্ অরুণবাবু, আর যদি পাঁচটা মিনিট আগে

আস্তেন!'

সে বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেন বলুন তো?'

জিতেনবাবু তাহার পকেটের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, 'ওটা কি? প্রবন্ধ তো?···ননীবাবু একটু আগেই আপনার কাছে লেখা চাইবার কথা বলছিলেন। আর একটু আগে এসে পৌঁছলে নগদ বিদায় হয়ে যেত'—

অরুণ বুকের ভিতর যেন একটি হিম শৈত্য অনুভব করিল। কহিল, 'তিনি কি নেই?'

'না, এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন!'

ননীবাবু মালিক, ম্যানেজার—সব। তাঁহার হুকুম না হইলে টাকা পাইবার উপায় নাই, তাহা সে জানিত। সুতরাং ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, 'তিনি ফিরবেন তো এখানে?'

জিতেনবাবু পাশের টেবিলের অভয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ননীবাবু কি আজ ফিরবেন?'

অভয়বাবু জবাব দিলেন, 'কি জানি, কিছুই ব'লে যান নি। ফেরেন তো সাতটার মধ্যেই ফিরবেন।

অরুণ অগত্যা একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। জিতেনবাবু তাহার জন্য এক পেয়ালা চা আনিবার হুকুম দিয়া কহিলেন, 'অরুণবাবু একটা কাজ করতে পারেন? জার্মানরা তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে মস্ত বড় বড় কথা বলেছে, শুনেছেন তো? তাই নিয়ে স্টেট্‌সম্যান আজ আবার একটা লিডার দিয়েছে। আমাদেরও তো কিছু বলা দরকার! লিখুন না বেশ সরস একটা প্রবন্ধ, ঐটেই এডিটোরিয়াল চালিয়ে দিই—'

অগত্যা সে কাগজ-কলম লইয়া বসিল। জিতেনবাবুর অনুগ্রহে আরও এক কাপ চা খাইয়া যখন সে প্রবন্ধটি শেষ করিয়া দিল তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ননীবাবু?

জিতেনবাবু বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'আজ আর তাঁর ফেরবার কোন আশা আছে ব'লে মনে হয় না। আপনি বরং প্রবন্ধটা রেখে যান —কাল আমি দামটা চেয়ে রাখব।

অরুণ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, 'আজ রেখে যেতে পারব না। যদি অন্য কোথাও নগদ দাম পাই তো দিয়ে দেবো, আজ আমার বিশেষ দরকার।

জিতেনবাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, 'তাই তো! আমার কাছে একটাও

টাকা নেই, নইলে আমিই দিয়ে লেখাটা আট্‌কে রাখতুম।'

অরুণ আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল! আর যে একটি মাত্র বাংলা দৈনিকে গল্প বা প্রবন্ধের বিনিময়ে টাকা পাইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে পৌঁছিয়া যদি টাকা না পায় তো ফিরিয়া আসিতে ন'টা বাজিয়া যাইবে। ততক্ষণে বইয়ের দোকান একটাও খোলা থাকিবে না। সুতরাং সে আগেই প্রকাশকদের কাছে ঘুরিয়া যাইবার সংকল্প করিল। প্রকাশকদের মধ্যে অনেকে তাহাকে চেনেন, তাঁহারা সকলেই সমাদর করিয়া বসাইলেন। এক এক পেয়ালা চা'ও সকলে খাওয়াইলেন কিন্তু ছয় সাত কাপ চা খাইয়া যখন তাহার মাথা ঘুরিতে শুরু হইল, তখনও টাকার কোন ব্যবস্থা হইল না।

বিরক্ত হইয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল সাহিত্য না করিয়া ছেলে পড়াইলে নিয়মিত কিছু টাকা পাওয়া যাইত। কিন্তু সে সব চিন্তা বৃথা, লালদীঘির মোড়ে অপর কাগজের অফিসে যত শীঘ্র পোঁছিতে পারে ততই সুবিধা, সুতরাং সে তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিল। তবুও, অফিসে সে যখন পৌঁছিল তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধুই প্রধান সহকারী সম্পাদক, এখানে তাহার খাতির আছে—যদিচ পয়সা-প্রাপ্তিযোগ এখানে দুর্লভ।

তাহার সব কথা শুনিয়া গিরিজা জবাব দিল, 'কিন্তু ক্যাশ তো ছ'টায় বন্ধ হয় জানিস। এখন আর কোন উপায় নেই।'

অরুণ শুষ্ক মুখে কহিল, 'তোর কাছে নেই? অন্ততঃ দুটো টাকা? লেখাটা না হয় রেখেই যাচ্ছি—

গিরিজা কহিল, 'ক্ষেপেছিস্? গত মাসের মাইনে আজও পাই নি। কম্পোজিটররা টাকা না পেলে কাগজ বন্ধ করবে ব'লে তাদের মাইনে আগে দেওয়া হয়েছে।'

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। গিরিজা কহিল, 'দাঁড়া, চা খেয়ে যা—'

ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, 'চা থাক্। বিকেল থেকে এত কাপ চা খেয়েছি যে চায়ের বদলে দু'পয়সা হিসেবে তার দামগুলো পেলে আমার কাল বাজার খরচাও বাঁচত, শরীরটাও ভাল থাকত।...'

বাহিরে আসিয়া কোথায় যাইবে প্রথমটা যেন স্থির করিতে পারিল না। শেষকালে বাড়ির পথই ধরিল। গোয়ালা কালও গালি দিবে, কিন্তু উপায় কি?

সাহিত্য যাহার পেশা, গোয়ালার অপমানকে ভয় করিলে চলিবে কেন ?...

সে বাড়ির দিকেই চলিয়াছিল, সহসা তাহার মনে হইল শ্যামবাজারের কাছাকাছি এক প্রেসের মালিক তাহার নিকট হইতে তাঁহার ছেলেদের মাসিকের জন্য একটি লেখা চাহিয়াছিলেন ; হয়ত—

সে আবার শ্যামবাজারের পথ ধরিল—জুতার গোড়ালি ক্ষইয়া গিয়াছে বহুদিন, সেই জুতা পরিয়া হাঁটাহাঁটির ফলে পা দুইটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তথাপি সে বাসে চড়িতে সাহস করিল না ; আবার সমস্ত পথটা হাঁটিয়া রাত্রি এগারটা নাগাদ প্রেসের দুয়ারে ঘা দিল। মালিক জাগিয়াই ছিলেন, নামিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই অরুণ কহিল, 'আপনি আমার কাছে একটা গল্প চেয়েছিলেন। তার জন্যে টাকা দেবেন তো ?'

মালিক ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, 'টাকা ?'

অরুণ কহিল, 'হ্যাঁ, অন্ততঃ কিছু চাই। তিন টাকা, চার টাকা—যা হয় ! অম্‌নি দেবো না।'

মালিক কহিলেন, 'লেখা এনেছেন ?'

অরুণ জবাব দিল, 'আজ যদি টাকা দেন তো কাল বারোটার মধ্যে পৌঁছে দেব।

মালিক কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া জবাব দিলেন, 'তারপর আর এ ধারের ফুট-পাথই হয়ত মাড়াবেন না। আগাম টাকা নিলে আপনাদের লেখা দিতে ভারী কষ্ট হয়।

অরুণ কহিল, 'আমাদের হয কিন্তু আমার হয় না। আমার অভাব সবার চেয়ে বেশী।'

অনেকক্ষণ ভাবিয়া—বোধ করি লেখার প্রয়োজন তাঁহার খুবই বেশী ছিল—তিনি বলিলেন, 'কাল সকাল সাতটার সময়ে যদি লেখা পৌঁছে দিতে রাজী থাকেন তাহ'লে এখন দুটি টাকা আপনাকে দিতে পারি, বাকী দু'টাকা কাল সকালে নিয়ে যাবেন।'

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া অরুণ কহিল, 'বেশ, তাই দিন।'

যখন বাড়িতে ফিরিয়া আসিল, তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। মা আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়া পুনশ্চ শুইয়া পড়িলেন। ভাত ঢাকা দেওয়াই থাকে, কারণ তাহার বাড়ি ফিরিতে প্রত্যহই মধ্যরাত্রি হয়।

অত্যধিক চা পানে মাথা ঘুরিতেছে, পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত, তবুও আহারের

পর কাগজ কলম লইয়া সে বসিল হ্যারিকেনের সামনে। ছেলেদের গল্পটি আজ রাত্রের মধ্যে শেষ না করিলে কাল সকালে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু গল্প কোথায়? মিনিট দশেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পরও কোনরকমের লেখা তাহার মাথায় আসিল না। অথচ চোখ ক্রমশ বুজিয়া আসিতেছে ভিতর দিকে—

সহসা তাহার চোখ পড়িল সকালের অর্ধসমাপ্ত গল্পটার দিকে। সেটা টানিয়া পড়িতে শুরু করিবার পর তাহার মনে হইল যে এই গল্পটা যতটা লেখা হইয়াছে তাহার মধ্য হইতে দুইটি প্যারা বাদ দিয়া আর যদি গুটিতিনেক প্যারা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে ইহাকেই ছেলেদের গল্প বলিয়া চালানো যাইতে পারে!

প্রভাতের স্বপ্ন সন্ধ্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুমধুর প্রেমের গল্প লেখার কোনও মূল্যই চোখে পড়ে না এখন। সে দৃঢ়হস্তে কলম ধরিয়া মিনিট দশেকের মধ্যেই গল্পটির রূপান্তর কার্য শেষ করিল।

আলোটা নিভাইয়া শুইয়া পড়িল বটে কিন্তু বহুক্ষণ ঘুম আসিল না। খোলা জানালাটার মধ্য দিয়া যতটুকু আকাশটা দেখা যায় সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল যেন নক্ষত্রদল নীরবে তাহার দিকে উপহাসের দৃষ্টি মেলিয়া আছে।

সে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

দূরের পরশ

মালতীর চিঠি আসিয়াছে। এইমাত্র পিওন বিলি করিয়া গেল।

নীলরঙের মোটা কাগজের পুরু খাম, দেখিলেই যেন মালতীর চিত্ত ভরিয়া উঠে, মনে হয় কত অজানা আনন্দই না বহন করিয়া আনিয়াছে খামখানা! অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিঠিটা খুলিতেই ইচ্ছা করে না তাহার, শুধু খামখানা হাতে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয়, খুলিলেই সমস্ত সম্ভাবনাটা শেষ হইয়া যাইবে, আনন্দটা আর অভাবিত থাকিবে না। ললিত যে এই বড় খাম ব্যবহার করে তাহার জন্যই মালতী কৃতজ্ঞ। তাহার মেজদির বর যেন কি, বরাবরই সরকারী খামে চিঠি লেখে, আবার বলে, মিছামিছি খামের পয়সাটা

খরচ করিয়া লাভ কি ?

মালতীর বিবাহ হইয়াছে মাত্র দুই মাস, গত বৈশাখের ষোলই—দিনটা চিরকাল মালতীর মনে থাকিবে। ললিতের মতো স্বামীই সে চিরদিন কল্পনা করিয়াছে, কামনা করিয়াছে—রূপবান, স্বাস্থ্যবান, ভদ্র! সেই স্বপ্ন তাহার সার্থক হইয়াছে বৈশাখের ঐ তারিখটিতে ;—স্মরণীয় বৈকি দিনটা!

কিন্তু বেচারী মালতী! বিবাহের পর এগারোটি দিন মাত্র সে স্বামীকে পাইয়াছে, বিবাহের আট দশ দিন শ্বশুরবাড়িতে এবং এখানে জোড়ে আসিয়া তিন দিন। তাও তিন রাত্রি নয়—এগারো দিনের দিনই সে চলিয়া গিয়াছে, এখান হইতে সোজা তাহার কর্মস্থলে, সুদূর বিহারের পাটনা শহরে! তাহার পর হইতে এই চিঠিই একমাত্র ভরসা তাহার। একদিন অন্তর একখানি নীল খাম পাটনা শহর হইতে তাহার স্বামীর বার্তা বহন করিয়া আসিয়া হাজির হয়। কোনদিন বা দীর্ঘ, কোনদিন বা সংক্ষিপ্ত, অফিসের কাজের তাড়া যেদিন থাকে সেদিন আর ললিত বড় করিয়া চিঠি লিখিতে পারে না ; কিন্তু ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, প্রতিদিনই নতুন নতুন কথা লেখে সে —এত কথা কোথায় পায় ললিত, কে জানে! মালতী কত চেষ্টা করে কিন্তু লিখিবার মতো বেশী কথা মনে পড়ে না তাহার, ফলে মালতীর প্রত্যেক চিঠিই হয় ছোট, সে জন্য আবার ললিত কত অনুযোগ করে।

খামখানা বাবা ডাকিয়া হাতে দিলেন। প্রতিদিন তিনিই ডাকিয়া দেন। সকালে বাহিরে বসিয়া চা খাইবার সময় পিওন তাঁহার হাতেই দিয়া যায়। তিনি চা খাওয়া শেষ করিয়া হাসি-হাসি মুখে ভিতরে আসিয়া ডাকেন, 'আমার মালু-মা কৈ গো ; চিঠি আছে!'

মালতীর বড় লজ্জা করে কিন্তু—রোজই তাঁহার হাতে চিঠি পড়ে, কী মনে করেন তিনি, কে জানে। তাঁহার ঐ হাসিটা বিশেষ করিয়া—! আজও সেই হাসি তাঁহার মুখে, 'মালু-মা তোমার চিঠি নাও।'

মালতী কোনমতে খামখানা তাঁহার হাত হইতে লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল একদম তেতলার ছাদে। এখানে বড় একটা কেঁহ আসে না, নির্জনে চিঠি পড়িবার পক্ষে এইটিই নিরাপদ স্থান। সে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর পাঁচিলের সামান্য ছায়ায় বসিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু তখনই সে চিঠিটা বাহির করিল না। কোন দিনই করে না, সে চিঠিখানা খুলিবার আগে কল্পনা করিতে চেষ্টা করে ললিত কি কি লিখিয়াছে।

নানা কথা ভাবে সে, দু-তিন রকম চিঠি সে মনে মনে ভাঁজিয়া রাখে, তাহার পর চিঠি খুলিয়া দেখে তাহার কল্পনার সঙ্গে মেলে কিনা। এইটাই তাহার খেলা, জুয়া খেলার আনন্দের মতো একটা তীব্র নেশা অনুভব করে সে। প্রায়ই চিঠি তাহার কল্পনার সহিত মেলে না, আরও নূতন কথা, প্রেম নিবেদনের নূতন পদ্ধতি থাকে তাহার মধ্যে—কিন্তু তাহাতেই মালতীর আনন্দ হয় বেশী।

আজও সে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া নানা কল্পনা করিল। তাহার পর কৌতূহল যখন অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল তখন সে চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। নীল রঙেরই পুরু কাগজ, চমৎকার লাইন টানা—আর তাহারই উপর মুক্তার মত ললিতের সুন্দর হাতের লেখা। মালতীর বুক আশু আনন্দের সম্ভাবনাতে কাঁপিয়া উঠিল, রোজই এমনি ওঠে, ললিতের হাতের লেখা দেখিলেই তাহার এমনি হয়।

আজ কিন্তু চিঠিটা বড়ই ছোট। একখানি মাত্র কাগজের এক পিঠে আঠারো-উনিশ লাইন লেখা। সেজন্য ললিত ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছে; লিখিয়াছে, "মধু-মালতী গো, আজ আফিস থেকে বেরিয়েছিই রাত ন'টার পর। এমন খাটুনী গেছে আজ, তা আর বলবার নয়। এসে স্নান ক'রেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, ঘুমে যেন চোখ জুড়ে আসছে। আজ বোধহয় খাওয়াও হবে না, চিঠি শেষ ক'রেই শুয়ে পড়ব। কাজেই চিঠি ছোট হ'লো ব'লে কিছু মনে ক'রো না।—"

মালতীর মন বেদনায় ভরিয়া গেল। আহা বেচারী! সাহেবটা যেন কী, এত খাটায় কেন বাপু! একটু সকাল করিয়া ছাড়িলে কি হয়? এই খাটুনী, তাহার উপর খাওয়া-দাওয়ার এই অনিয়ম, শরীর টিঁকিবে কেন?

কিন্তু গর্বও বড় কম হইল না তাহার। সারাদিনের পর বরং খাওয়াটাও ললিত বাদ দিতে পারে, কিন্তু চিঠি লেখা বন্ধ করিতে পারে না! বিবাহের পর হইতে এই দুই মাসে একদিনও তাহার চিঠি লেখার বেনিয়ম হয় নাই। ঠিক একদিন অন্তর তাহার চিঠি আসে—

মালতী আবার চিঠিটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। চিঠির ভাঁজের একটা দিক কি করিয়া জলে ভিজিয়া গিয়াছে, ফলে অনেকগুলি অক্ষরই হইয়া গিয়াছে অস্পষ্ট! তা হোক, তবু পড়া যায়।···

কিন্তু কিসে ভিজিল কে জানে! জলে পড়িয়াছে? না, তাহা হইলে আরও ভিজিয়া যাইত, সমস্ত কালি লেপিয়া চুপ্‌সাইয়া একেবারে একাকার হইয়া

যাইত, কিছুই পড়া যাইত না। তবে ?···

হঠাৎ মালতীর একটা কথা মনে পড়িল। ঠিক হইয়াছে, চিঠি লিখিয়া নিশ্চয় তাহার জামার বুক পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল, তাহার পর অফিসে আসিয়াও কাজের ভীড়ে অনেকক্ষণ চিঠি ফেলিবার কথা তাহার মনে ছিল না, গরমের দিন, ঘামে গেঞ্জি-জামা ভিজিয়া উঠিয়াছে চিঠিটাও ভিজিয়াছে সেই সঙ্গে! জলের ভিজা এত সামান্য হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া চারভাঁজ করা চিঠির একটি দিক মাত্র ভিজিয়াছে ; যে দিকটা তাহার দেহের দিকে, বুকের দিকে ছিল—

আকস্মিক উত্তেজনায় মালতীর বুক ধক্-ধক্ করিতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন সে পরিষ্কার চোখের সামনে দেখিতে পাইল। অফিসের টেবিলে ঘাড় গুঁজিয়া ললিত এক মনে কাজ করিয়া যাইতেছে, বুক পকেটে চিঠিখানা গোঁজা, তাহা খেয়ালও নাই। তাহার কপাল, গলা সব ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জামাটাও—আর তাহারই সংস্পর্শে চিঠিখানি উঠিতেছে সেঁতাইয়া !···

কথাটা মনে হইতেই ললিতের চেহারাটা তাহার চোখের সামনে পরিষ্কার ভাসিয়া উঠিল। সুন্দর চেহারা তাহার, ঘামিলে আরও সুন্দর দেখায়। বিবাহের পর সামান্য যে কয়দিন সে স্বামীকে কাছে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছে।···অমন সুন্দর দেহ অনিয়মে অযত্নে হয়ত মলিন হইয়া যাইতেছে। কে-ই বা সেখানে তাহাকে দেখিবে, কে বা যত্ন করিবে !

ললিতকে কাছে পাইবার জন্য তাহার মনটা আকুলিবিকুলি করিয়া উঠিল। উড়িয়া যাইবার উপায় থাকিলে সেই মুহূর্তে সে উড়িয়া যাইত।—নানা অসম্ভব অসম্ভব কল্পনা তাহার মাথাতে আসিতে লাগিল। আচ্ছা, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে যদি একা চুপি চুপি ট্রেনে চাপিয়া পাটনা চলিয়া যায়, তাহা হইলে কেমন হয় ? হঠাৎ ললিতের অফিসে বা বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলে সে কী পরিমাণই না বিস্মিত হইবে !···কল্পনায় ললিতের বিস্মিত দৃষ্টি অনুমান করিয়া সে আপন মনেই হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু না, তাহা সম্ভব নয়। বাবা-মা ভাবিবেন, এখানে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইবে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার !···তাহার পর আর বাপের বাড়িতে মুখ দেখানো যাইবে না। ললিতও হয়ত তিরস্কার করিবে।···মালতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সে কল্পনাকে বিদায় দিল।

সহসা তাহার নজর পড়িল চিঠিখানার উপর। ললিত কাছে নাই সত্য ; কিন্তু তাহার পরশ তো আছে। তাহারই চিঠি—ললিতেরই হাতের লেখা এবং বুকের স্পর্শ আসিয়াছে নীলরঙের এই খামখানায় ভরিয়া। তাহার দেহের স্বেদবিন্দুর স্মৃতি এখনও ঐ কাগজটাতে লাগিয়া আছে।

সে চিঠিখানা নাকের কাছে তুলিয়া ধরিল। বোধ হয় ভাবিয়াছিল ললিতের দেহের সৌরভও কিছু আছে উহাতে, কিন্তু কাগজ-কালির একটা অতি পরিচিত গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইল না। তা না থাক্—তবু ললিতেরই স্পর্শ আছে উহার মধ্যে। মালতী চিঠিখানাকে সজোরে গালের উপর চাপিয়া ধরিল, তাহার পর বুকে, কপালে। অজস্র চুম্বনে ভরাইয়া দিল চিঠিখানা। এখানি প্রতিদিনের সাধারণ চিঠি নয়—বিশেষ চিঠি এটি। এটি শুধু বাণীই আনে নাই, পরশও আনিয়াছে তাহার স্বামীর !

মালতীর চিঠি থাকিত তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে, সমস্ত কাপড়-জামার তলায়। কিন্তু এখানা সে সেখানে রাখিল না, এটা সে কাছে কাছেই রাখিয়া দিল। কখনো থাকিত ব্লাউজের মধ্যে, কখনো বা বালিশের নিচে। চিঠিখানা সে আর একবারও পড়ে নাই, কিন্তু তবু সে উহাকে ছাড়িতে পারে না। যখনই ললিতের কথা মনে হয়, তাহার চিঠিখানা বাহির করিয়া মুখে-বুকে চাপিয়া ধরে। তাহার মনে হয় উহারই মধ্য দিয়া সে ললিতের স্পর্শ পাইতেছে। স্বপ্ন দেখে সে, চিঠিখানা বুকে করিয়া ললিত অফিসে বসিয়া কাজ করিতেছে, তাহার ললাটে কণ্ঠে স্বেদবিন্দু—

এম্‌নি করিয়া হপ্তা-দুই কাটিবার পর হঠাৎ একদিন ললিত আসিয়া উপস্থিত হইল, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। অফিসেরই কি একটা কাজে সে আসিয়াছে, একটি রাত্রি থাকিয়া কালই আবার চলিয়া যাইতে হইবে। তা হোক—এই ক্ষণিক মিলনের মূল্যই কি কম ! মালতী আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল, যত রকমের প্রসাধন, যত রকমের বাক্যবিন্যাস মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার কোনটাই মনে পড়িল না। সুখে, লজ্জায়, অকারণ হাসিতে রঞ্জিত হইয়া কোন্‌মতে সে ভাইবোনদের সহিত হাস্য-পরিহাসে সন্ধ্যাটা কাটাইয়া দিল, তাহার পর এক সময়ে দুরু দুরু বক্ষে স্বামীর কাছে উপস্থিত হইল।

তাহার পরের ইতিহাসটা সংক্ষিপ্ত এবং অতি সাধারণ। হাসিতে, খুশিতে, গল্পে কোথা দিয়া যে রাত গভীর হইয়া গেল, তাহা বোঝা গেল না। ললিত বাসা ঠিক করিয়াছে পাটনাতে, কদমকুঁয়ার দিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট-মতো

বাসা বাড়ি। মালতীর শ্বশুর-শাশুড়ীরও মত আছে—শুধু আষাঢ় মাস মালতীর জন্মমাস বলিয়া মা আপত্তি করিয়াছেন, শ্রাবণ মাস পড়িলেই চার-পাঁচদিনের ছুটি লইয়া ললিত আসিবে, এখান হইতে দেশে গিয়া দুইদিন থাকিয়া সোজা পাটনায় যাইবে তাহারা। সেখানে বামুন-চাকর পর্যন্ত ঠিক হইয়া আছে—ললিত শুনাইয়া দিল।

মালতী কহিল, 'ঠাকুর আবার কি হবে, আমি রাঁধব।'

ললিত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তাই না!···তারপর ভাত রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলো, আর আমি অফিস কামাই ক'রে ডাক্তারবাড়ি ছুটোছুটি করি! ···তার চেয়ে একটা বাবাজীর মাইনে গোনা ঢের সহজ!'

মালতী মুখে আঁচল দিয়া কহিল, 'বামুনঠাকুর আবার বাবাজী! তুমি যেন কি, সে কি তোমার জামাই?'

ললিত কহিল, 'হ্যাঁ, একবার ঠাকুর ব'লে দেখো না—লাঠি নিয়ে তাড়া করবে! ওখানে ঠাকুর বলে নাপিতদের, বামুনঠাকুর হ'লো বাবাজী!···'

এমনি সব টুকরো টুকরো কথা। ছোট ছোট পরিহাস। অকারণে হাসি।

সহসা এক সময়ে মাথার বালিশটা নিবিড় করিয়া টানিতে গিয়া ললিতের হাতে একটা কাগজ ঠেকিল। সে কহিল, 'ভাল কথা, শুতে এসে দেখি, মাথার বালিশের নিচে আমারই একখানা পুরোনো চিঠি। এসব চিঠি যেখানে সেখানে ফেলে রাখো কেন, তুলে রাখতে পারো না? কেউ যদি দেখতে পায়, কি কেলেঙ্কারী হবে বলো দেখি—! ছিঁড়ে ফেললেও তো পারো।'

মালতী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। ললিতেরই বালিশের খাঁজে মুখ লুকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'না, না, সব চিঠিই আমি পড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্সয় পুরে ফেলি। এটা—'

'এটা কি?'

'এটা আমি কাছে-কাছেই রাখি কি না—ও প্রায় আমার বুকের মধ্যেই থাকে।'

দারুণ বিস্মিত হইয়া ললিত কহিল, 'কেন বলো দেখি?'

মালতী জবাব দিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

ললিত জোর করিয়া তাহার মুখের উপর হইতে হাত দুটা সরাইয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিল, তাহার পর চুপি চুপি কহিল, 'ব্যাপার কি বলো তো?'

মালতী তখন জবাব দিল, 'তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?'

'কই না! চিঠি পড়ে ত আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বরং ওখানাই বোধ হয় সব চেয়ে ছোট চিঠি, কিছুই তো নেই ওতে—'

তবু মালতী বলিতে পারে না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে ললিতের বুকের মধ্যেই মুখ রাখিয়া থামিয়া থামিয়া আসল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ললিত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার হাসি আর থামিতেই চায় না। অনেকক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিল, 'তুমি মাসিকপত্রে গল্প-কবিতা লিখতে আরম্ভ করো মালতী, তোমার খুব পসার হবে—'

মালতী তাহার হাসিতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সে চুপ করিয়া রহিল। ললিত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, 'রাগ করলে মধুমালতী?···ঘটেছিল যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, তাই হেসে উঠেছিলুম: কিন্তু তোমার কল্পনার জোর আছে, সত্যি!'

মালতী রাগ করিয়া কহিল, 'হোক অন্যরকম। আমি শুনতে চাইনে।'

কিন্তু ললিত আসল কথাটা খুলিয়াই বলিল, 'চিঠিটা লিখে খামে মুড়ে টেবিলেই রেখে দিয়েছিলুম। তারপর ভোরবেলা চাকর লাল্লু চা ঢেলে দিতে এসে দিব্যি ক'রে টেবিলের ওপর খানিক চা ফেলে গিয়েছিল, অতটা লক্ষ্য করি নি। ব্যাস্—বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে একটা বই টেনে নিতে গিয়ে একেবারে চিঠিখানা সেই চায়ের ওপর!···তখন আর চিঠি লেখবার সময়ও ছিল না, আর দেখলুম খামখানাই বেশী ভিজেছে, ভেতরের চিঠিখানা বেশ পড়া যায়, তাই খামটা পাল্‌টে চিঠিখানা ডাকে পাঠিয়ে দিলুম। এই হ'লো তোমার চিঠির ইতিহাস!'

মালতীর সমস্ত আবেগ, সমস্ত কল্পনার উপর কে যেন খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল। এমন কি স্বয়ং ললিতের উপস্থিতি, এই প্রণয়লীলা—ইহাও যেন সেই মুহূর্তের মত সম্পূর্ণ ব্যর্থ, অর্থহীন হইয়া গেল। সে আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

ললিত উদ্বিগ্নভাবে তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া কহিল, 'রাগ করলে, হ্যাঁ গো?'

মালতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'না।'

কিন্তু আর কোন কথা কহিল না। ললিত হাসিয়া কহিল, 'তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ মালতীমঞ্জরী, ছি ছি, একটা সামান্য চিঠির জন্যে তুমি আমার ওপর অভিমান করলে, সে-ও আমারই চিঠি! সত্যি কথা বলার জন্যে আমার এই

শাস্তি ?'

সত্যই তো ! মালতীও হাসিয়া ফেলিল। তাহার স্বামীর চেয়ে তাঁহার চিঠি বড় হইয়া উঠিল ! শুধু তাহার কল্পনার সহিত আসল সত্যটা মেলে নাই বলিয়া এ তাহার কী অহেতুক রাগ !

সে চুপি চুপি বলিল, 'ছাই চিঠি। বালিশের তলায় হাত ঢুকাইয়া চিঠি-খানা ছুঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর সজোরে ললিতের গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'কিন্তু তুমি সত্যি কথাটা না বললেই ভাল হ'তো বোধ হয়।'

পরের দিন খুব ভোরে উঠিয়া মালতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছিল, চিঠিটার কথা তাহার মনে ছিল না। কিন্তু স্নান শেষ করিয়া ললিতের জন্য চা লইয়া ঘরে ঢুকিতে দিনের আলোতে তাহার প্রথমেই নজরে পড়িল সেই চিঠিখানা, তাল পাকাইয়া জানালার কাছে পড়িয়া আছে।

ললিত তখনও ঘুমাইতেছিল। মালতী টেবিলের উপর কাপটা নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইল। ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত, এখনই চাকর ঘর ঝাঁট দিতে আসিবে, সে যদি পড়িয়া ফেলে।

কিন্তু চিঠিটা ছিঁড়িতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল সে। তাহার যেন মনে হইল সারা বুকটা কে মুচড়াইয়া ধরিতেছে, চিঠিখানার সহিত যেন প্রাণটাও তাহার বাহির হইয়া যাইবে। এই বিশেষ চিঠিটিকে কেন্দ্র করিয়া এই দশ-বারো দিন যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছে, তাহার নিজের কাছে সে স্বপ্নের মূল্য তো কম নয়। হোক না তাহার মূল্যের ইতিহাসটা মিথ্যা, তবু এ চিঠি তাহার কাছে সত্য-সত্যই তাহার স্বামীর পরশ বহন করিয়া আনিয়াছিল। আজ সত্যকার ইতিহাসটা জানা গেল বলিয়া কি সেদিনের সমস্ত অনুভূতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে ?···না, এ চিঠি মালতী ছিঁড়িতে পারিবে না। কিছুতেই না।

সে চিঠিখানা সযত্নে আবার সোজা ব্লাউজের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল, তাহার পর ললিতের গা ঠেলিয়া ডাকিল, 'ওগো' 'শুনছ, ওঠো। তোমার চা এনেছি—

কলাপী

কলাপীকে চিনতুম বৈকি। এক পাড়াতেই থাকি, বাস-ষ্টপে এসে বাস ধরতে হয়। এমনিও দোকান-বাজার যাবার পথে হেঁটে যেতেও দেখি—। পরিচয়ও কিছু কিছু জানি। সেটা অবশ্য আমার স্ত্রী অনিলার দৌলতে। ওর স্বভাবই হ'ল যখন যে পাড়ায় যাবে—আগে আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয় ক'রে তাদের হাঁড়ির খবর বার ক'রে তবে নিজের সংসার গুছিয়ে বসা।

সেই কলাপীকে হঠাৎ আমাদের আপিসে চাকরি নিয়ে আসতে দেখে প্রেথমে একটু অবাক, পরে খুশী হয়ে উঠলুম। যেচেই গিয়ে আলাপ করলুম, দু একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়েও দিলুম—কাজকর্ম বুঝে নিতে একটু সাহায্যও করলুম। অবশ্য বুঝে নেবার এমন কীই বা আছে! এসেছেও স্টেনো হিসেবে, কেরানী হিসেবে নয়। তবু বড় আপিস তো, কাজ না থাক কায়দাকানুন অনেক, সে বিষয়ে একটু ওয়াকিবহাল করে দেওয়া ভাল।

এতকাল আমার সঙ্গেও কখনও মৌখিক আলাপ হয় নি। কথাবার্তার দরকার হয় নি বলেই। তবু দীর্ঘদিনের জানাশুনো বলে প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা কোন পক্ষেই দেখা দিল না। কলাপীও বরং আমার এই স্বাগত জানানোতে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতগুলি অপরিচিত মানুষের মরুভূমে আমিই একমাত্র পরিচিতের ওয়েসিস।

বাড়িতে এসে অনিলাকে খবরটা দিতে সে বলে উঠল, 'যাক, ওর বাবার এতদিনের সাধনার সিদ্ধি মিলল, ঐ মেয়ের জন্যে কী না করেছেন ভদ্রলোক!'

'তার মানে?'

'আর ব'লো না। মেয়েটা যে খুব মাথামোটা তা নয়—কিন্তু ওর মা যে সেই ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই ওর মাথায় সংসার চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ একটা মাস্টারও রাখে নি কখনও। রাখবে কি, দুই ছেলে বাপ-মায়ের প্রাণ। তাদের মিশনারী স্কুলে দিয়েছিল, অত পড়া তাদের কম্ম নয়—তাই মাস্টারও রাখতে হয়েছিল। তাতেই সব পয়সা শেষ। সরকারী কর্মচারী—তাও আই· সি· এস, কি আই· এ. এস, তো নয়। যখন রিটায়ার করেছে তখন নাকি মোটে ডেপুটি না আণ্ডার সেক্রেটারী কি বলে—সেই র‍্যাঙ্ক। কত আর মাইনে

পেত বল। ঘুষের চাকরিও নয়, বোনাসও ছিল না। নেহাৎ তিরিশ বছর আগে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল—সরকারী কর্মচারী—বাড়িওলা ওঠাতে পারে নি তাই। আমাদের মতো ভাড়া দিতে হ'লে?'

'আমারই বা কি মাইনে ব'ল!' আমি বলতে যাই—

গলা নামিয়ে অনিলা বলে, 'তেমনি বিল পাস করার টু পার্সেণ্ট? তুমিই তো ব'লো কেউ কেউ আবার সেধে বাড়তি কিছু দিয়ে যায়।'

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলি, 'তা সাধনাটা তা'হলে কি হ'ল মেয়েকে নিয়ে?'

'ছেলেদের কাছে ঘা খেতেই চৈতন্য হ'ল কর্তাগিন্নীর। তখন ওঁরা পড়লেন মেয়েকে নিয়ে। ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা—সে কি আর অত সহজ। মেয়েটা ফী পরীক্ষায় ফেল করেছে একবার ক'রে। তখন খোঁজ খোঁজ—কোথায় অল্প টাকায় মাস্টার পাওয়া যায়। কর্তা নিজেও কিছু কিছু পড়াতে শুরু করলেন। তাই বলে তো আর সংসার নামল না ঘাড় থেকে। দু বেলা হাঁড়ি ঠেলা তো বজায়ই রইল। তবু মেয়েটাও খেটেছে খুব। সংসারের কন্না করে রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত পড়েছে। তাতেই কোনমতে বি. কমটা পাস করেছে ব্যাক ট্যাক পেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেনো পড়ানো শুরু হয়েছে, ওধারে কর্তা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন চাকরির তদ্বিরে। নইলে সংসার চলে না যে। অমন তোল-মাটিঘোল না করলে কি আর চাকরি মিলত! বয়েস কি এধারে কম হ'ল। মেঘে মেঘে বেলা অনেকদূর গড়িয়েছে!'

ওদের আরও ইতিহাস শুনলাম অনিলার মুখে।

বড় ছেলে বিল্টু খুব ভালভাবেই পাস করেছিল। চাকরিও নিজের জোরেই পেয়েছে—ধরপাকড়ের তোয়াক্কা রাখে নি। বাবা-মার গর্বের ও গৌরবের সীমা ছিল না এই ছেলেকে নিয়ে। সেইজন্যেই বিস্তর খুঁজে ভবেশবাবু এক ধনী কন্যাকে ঘরে আনেন।

এমন রত্ন ছেলেকে কে না জামাই করতে চায়। সুতরাং বহু জিনিসপত্র, গহনা এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বৌ এসেছিল। আরও অনেক টাকা দেনা ক'রে ঘটা ক'রেই বিয়ে দিয়েছিলেন ভবেশবাবু—অনেক সাধ ক'রে।

কিন্তু বৌ এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে এসে প্রসন্ন হ'ল না আদৌ। ভোরে উঠে চা জলখাবার করতে হবে—ননদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে রান্নার যোগাড় দিতে হবে, সেভাবে সে মানুষ হয় নি। তবু বিল্টু বহুদিন সে বিরূপতা ও ধিক্কার সহ্য করেছিল। কিন্তু সন্তান হ'তেই বৌ আরও কঠিন হয়ে উঠল। এ বাড়িতে থাকলে তার মেয়ে মানুষ করা তো দূরের কথা—বাঁচবেই না। শেষ

পর্যন্ত সোজা গিয়ে বাপের বাড়ি উঠল। স্বামীকে জানিয়ে দিল অন্য ভাল ব্যবস্থা না হ'লে সে ফিরবে না।

বিলটু ভদ্র ছেলে, বাবা মার দুঃখ ও বুঝত। তাই সে ভদ্রভাবেই অন্য ব্যবস্থা করল। তদ্বির ক'রে বোম্বের এক বড় ফার্মে চাকরি যোগাড় ক'রে সেখানে চলে গেল। তাঁরা সাজানো কোয়ার্টার দিলেন। কাজেই বৌ নিয়ে যেতে বাধা রইল না। তবে যত ভাল চাকরিই হোক, বোম্বে শহরে শিশুর জন্যে আয়া রেখে সংসার চালিয়ে মা বাবাকে কিছু দেওয়া সম্ভব নয়—অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবাকে তা জানিয়ে দিতে হ'ল।

ছোট শিলটু অবশ্য বাড়ি ছেড়ে যায় নি—বিয়ের পরও। কারণ তার উপায় ছিল না। লেখাপড়ায় সে বরাবরই 'মাঠো,' চলনসই। কোনমতে টায়ে টায়ে পাস করেছে ইস্কুল থেকেই। সেই ভাবেই দু তিনবার চেষ্টা করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। নেহাৎ ভবেশবাবু বহু পূর্ব থেকেই তদ্বির শুরু করেছিলেন —তাই নিজের আপিসে কনিষ্ঠ কেরাণী করে দিতে পেরেছেন।

কিন্তু তারও পূর্বে একমাত্র যে বিষয়ে তার কিছু যোগ্যতা ছিল সেই বিষয়েই অগ্রসর হয়েছে। পাড়ার একটি কুরূপা মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রে— রেজেস্ট্রি করে বসে আছে। চাকরি পাবার পর তাকে ঘরে নিয়ে এসেছে বা আনতে বাধ্য হয়েছে। বিয়ের কোন আড়ম্বর হয় নি। তবু নমোনমো ক'রে সেরেও পূর্ব ঋণের ওপর আর কিছু ঋণ চেপেছে ভবেশবাবুর। ছেলে মাসে মাত্র দেড়শো টাকা ক'রে দেয়—তারা দুজন এবং বিয়ের চার মাসের মধ্যেই একটি ছেলে হয়েছে—তাদের সব খরচাই এবং ঝঞ্ঝাটই এঁদের বইতে হয়— ভবেশবাবু ও কলাপীর। ঝগড়াঝাঁটি ক'রেও টাকাটা বাড়াতে পারেন নি ভবেশবাবু, তবে টিনের দুধ ওষুধপত্র নিজেরা কেনে—কাপড় জামাও।

সেই জন্যেই ভবেশবাবুর একান্ত আকিঞ্চন—মেয়েকে একটা ভাল চাকরিতে ঢুকিয়ে তার জন্যে পাত্র খুঁজবেন। খরচ করার আর সাধ্য নেই। চাকরি করা মেয়ে হলে সেদিকে কামড় হবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। তারপর মেয়ের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ি কোন তীর্থে চলে যাবেন, যাতে পেন্‌সনের টাকাতেই জীবনটা কাটাতে পারেন।

সেই জনেই অনিলা ওটাকে সাধনার সিদ্ধি বলেছিল।

কলাপীর স্বভাবটা ছিল ভারী মিষ্টি ধরণের। 'মিষ্টি' কথাটার আজকাল ব্যাপক প্রচলন হয়েছে সেই জন্যেই ব্যবহার করলাম বটে, তবে তাতে ঠিক

কথাটা বোঝানো যাবে না। কেমন যেন সদাই একটু কুণ্ঠিত ভাব। সকলের কাছেই যেন সর্বদা অপরাধী। সহকর্মীদের খুশী করতে পারলে যেন বেঁচে যায়। এমন মেয়ে সকলেরই স্নেহাস্পদ হয়ে উঠবে—এটাই স্বাভাবিক। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই নবাগতা যেন বহু পরিচিতা হয়ে উঠল।

আর যাঁরা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, অতঃপর ওকে সুপাত্রে বিবাহ দেবার চেষ্টা করাটা নিজের কর্তব্য বলে ভাবতে লাগলেন।

তবে আমি জানতুম যে চেষ্টা বিশেষ করতে হবে না। অনেক তরুণ ছেলে আপনিই এগিয়ে আসবে। বিশেষ, বোধহয় এখন সংসার থেকে অন্তত এই ক'ঘণ্টা অব্যাহতি পেয়ে অথবা উপার্জনের তৃপ্তিতে—শরীরের সেই রুক্ষতা ও কৃশতা, শির-ওঠা হাতের কাঠিন্য, এগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, এখন চামড়ার নিচে ঈষৎ একটু মেদসঞ্চার হওয়ার ফলে অল্প বয়সের পেলবতা না হোক কিছুটা কোমলতা এসেছে দেহে। রঙেরও তামাটে ভাব মিলিয়ে চিক্‌চিকে হয়ে উঠছে।

হ'লও তাই। দু-তিনটে ছেলে উশখুশ করতে শুরু করেছিল, তাদের মধ্যে যে ছেলেটি—সুবাস বলে—সবাইকে প্রায় কনুয়ের গুঁতো দিয়ে সরিয়ে কলাপীর কাছাকাছি এল—সেটিই আমাদের অপিসের অবিবাহিতদের মধ্যে সেরা ছেলে। রত্ন বলাই উচিত।

সুশ্রী, বলিষ্ঠ, লেখাপড়ায় ভাল রেকর্ড, খেলাধূলোতেও খুব কম নয়। আপিসে ইতিমধ্যেই কর্তাদের চোখে পড়েছে—ফাঁকি কম দেয় বলে ; অর্থাৎ অচির ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি সত্যিই খুশী হলুম। আমার কেউ নয়—তবু মেয়েটা সম্বন্ধে স্নেহ সহানুভূতি দুই-ই ছিল। নিশ্চিন্তও হলুম। কারণ সামাজিক বাধাও কিছু ছিল না। দুজনেই ব্রাহ্মণ। পাল্‌টি ঘর। সুবাসের মনটাও ভাল, ভদ্র ও সভ্য দুই-ই, সে পরিচয় অনেকবার পেয়েছি। বিয়েতে কোন পাওনার কামড় করবে না সেটা জানতুম।

অতঃপর কলাপীও আসল ময়ূরের মতোই পেখম মেলবে বৈকি। বহুদিনের তৃষ্ণার্ত মরুও আশায়, প্রেমে, পুরুষের সরব স্তুতিতে, নীরব মুগ্ধ দৃষ্টিতে —যেন পুষ্পিত উদ্যানের মতোই সুন্দর হয়ে উঠল। দুজনেই দুজনকে নিয়ে মশগুল।

কিন্তু সুখটা যে এত সাময়িক তা বুঝি নি। হঠাৎ কলাপী কদিন অনুপস্থিত। যেদিন আবার এল সেদিন যেন তাকে চেনা যায় না! কদিনে

শুধু শুকিয়ে নয়—বুড়িয়ে গেছে একেবারে—এই কদিনে সুবাসও যে আর এক কাণ্ড ক'রে বসেছে, তাও আগে টের পাই নি। টের যেদিন পেলাম সেদিন সে আর কলকাতায় নেই। বড়কর্তাদের ধরে আরও বড় পোষ্টে সে লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সে নাকি লক্ষ্ণৌ চলে গেছে এখানের পাট তুলে দিয়ে।

উদ্বিগ্নভাবে কলাপীকে নানারকম প্রশ্ন করেও কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। করতে গেলে শুধু দেখি চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে—কিন্তু জল বেরোয় না। মনে হয় তার চোখের জলও আর অবশিষ্ট নেই।

কারণটা অবশ্য খুঁজে বার করল অনিলাই।

বিবাহের প্রস্তাবে নাকি ভবেশবাবু স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, 'তাহলে আমাদের বুড়োবুড়ির আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। যা পেনসন পাই তাতে তোমার মার চিকিৎসার খরচই চলবে না। কবে বিয়ে করবে বলো—তার আগেই আমরা সরে পড়ি—স্লীপিং পিল কেনার পয়সাটা হাতে থাকতে থাকতে।'

কলাপী বোধহয় সুবাসের পরামর্শেই বলতে গিছল,' আমি যদি আমার সব মাইনে মাসে মাসে তোমাদের ধরে দিই ?'

'না, সে নিতে পারব না। সে ভিখিরী বলে মনে হবে নিজেদের। তাছাড়া জামাইয়ের কাছে মুখ দেখাবো কি করে। না, তোমরা বিয়ে করো। সুখী হও—আমাদের দিকে তাকিও না। সত্যিই তো—যখন ভবিষ্যতের সংস্থান রাখতে পারি নি তখন আমাদের বাঁচবার অধিকারই বা কি !'

এরপর আমাকেও বদলী হ'তে হয় পাটনায়, তার পর কটকে। তার পর আবার কলাপীকে দেখলাম। এই মাত্র বছর তিনেক আগে।

ডিলাক্স এক্সপ্রেসে দিল্লী যাচ্ছিলাম বন্ধুর ছেলের বিয়েতে। গাড়ি লেট ছিলই, তার ওপর কোডারমা ছাড়িয়ে একটু গিয়েই ইঞ্জিনে আগুন লেগে গেল। পেছন দিকে লেগেছিল। ড্রাইভার টের পেয়ে যখন গাড়ি থামাল তখন প্রথম বগিও জ্বলতে শুরু করেছে।

হৈ হৈ কাণ্ড। অনেকে ছুটেই গেলেন আগুন নিভোতে। বাকী যাঁরা—সবাই ভয়ে মালপত্র নিয়ে সেই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যেই নেমে পড়ল। সকলেই দিশাহারা, পাগলের মতো অবস্থা।

সকলেই নামলেও আমি নামি নি। কারণ, হিসেব করে দেখলাম আমরা

চতুর্থ বগিতে আছি। এখনও ঢের সময় আছে। দ্বিতীয় শেষ করে তৃতীয় বগিতে আগুন পৌঁছলে ধীরে সুস্থে নামবার চেষ্টা করা যাবে। জানুয়ারী মাস, প্রচণ্ড শীত। এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় নামব? এখানে বাঘ আছে, মনুষ্যব্যাঘ্রও কম নেই। লুঠ-তরাজের এই তো প্রকৃষ্ট অবসর।

দু-একজন অবশ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সদুপদেশ দিতে এলেন, 'উতারিয়ে, উতারিয়ে আপ আভিতক শো রহা হ্যায়!' বাঙ্গালী এক মহিলাও নিচে থেকে হাঁক দিলেন, 'বাবা লাইম্যা পড়েন, লাইম্যা পড়েন, সহসাই চারিদিক দিয়া আগুন ঘেরব।'

আমি নির্বিকারই ছিলুম, এবার একটু উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখি আরও একজন গাড়ি ছাড়েন নি এবং তিনি মহিলা। এই শীতেও ঠাণ্ডা জানলার কাঁচে মাথা রেখে স্থির হয়ে বসে আছেন।

ভদ্রমহিলা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন নাকি?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেই তিনি মাথা তুললেন, বলে উঠলেন, 'কেষ্টদা! আপনি এখানে!'

তবু চিনতে দেরি হ'ল। অনেকক্ষণ চোখের দিকে চেয়ে মনে পড়ল। কলাপী।

কিন্তু এ কোন কলাপী! সেই যে শ্রীময়ী মেয়েটিকে দেখেছিলুম, মিষ্টি স্বভাবের, হাসিমুখ—শেষের দিকে তো বেশ সুশ্রীই হয়ে উঠেছিল—এ কি সেই! প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি, তবু তার মধ্যেও পূর্ব গঠনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ যে কিছুই নেই।

কলাপী বুঝল। একটু হেসে বলল, 'চিনতে অসুবিধে হবারই কথা। বয়সও তো হ'ল।'

'তা তুমি নামো নি! যদি সত্যিই আগুন এসে পড়ে?'

'আমি থাকলে আসবে না কেষ্টদা—সে আমি জানি। যমের অরুচি কথাটা শোনেন নি?'

আমি তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে দিলুম, 'অবশ্য একদিক দিয়ে ভালই করেছ। এ জঙ্গলে বাঘ আছে, চিতা, হায়না—কী নেই। তার চেয়েও মানুষ লুটেরা—তারা সাংঘাতিক। তারাও মানুষ ধরে নিয়ে যায়, খাওয়ার থেকে বেশী দুর্গতি করে।'

অকস্মাৎই কেমন যেন তিক্ত বিদ্রূপের স্বর শুনলুম ওর গলায়—ওর স্বভাবের একেবারে বিপরীত। 'আছে না কি? তা জানলে তো নেমে পড়তুম,

তবু তো কিছু একটা ঘটত জীবনে : একটা কিছু অঘটন!'

অল্প কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। বললুম, 'তোমার বাবা মা ভাল আছেন?'

'আছেন বৈ কি! আরও নাকি ভাল থাকতেন যদি আমি চুরি ডাকাতি ক'রে আর কিছু টাকা এনে ওঁদের আরও দামী দামী ওষুধ কিনে দিতুম। আমি স্বার্থপর বলেই, তেমন কোন চেষ্টা করছি না, আর স্বার্থপর বলেই ভাইকে ভিন্ন করেছি, সে এখন জড়িয়ে পড়েছে—নইলে সে কিছু চিকিৎসার খরচ দিতে পারত! অবশ্য তাতে যে সংসারে বাড়তি খরচ হ'ত আরও—সে প্রশ্ন তোলা এখানে অনাবশ্যক!'

এও ওর স্বভাবের বাইরে। কতখানি তিক্ততায় এমন কথা ওর গলা দিয়ে বেরিয়েছে কে জানে!

বললাম, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ।'

বললে, 'ওঁদের বাঁচাবার জন্যে আমাকে আপিসের পরেও পার্টটাইম করতে হচ্ছে। আমি যে এতেও মরছি না—এ দেখেও ওঁরা বোঝেন না যে ওষুধ না খেলেও মানুষ বাঁচে!'

আর থাকতে পারলুম না। বললুম, 'সুবাসের কোন খবর রাখো? সে বিয়ে করেছে?'

এইবার একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে লাগল যেন। অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলল, 'করেছে। মানে আমিই বাধ্য করেছি। পথ তো বাবার কাছ থেকে পেয়েই গিছলাম—তাতেই কাজ হ'ল। লিখে পাঠালুম, 'তুমি যদি বিয়ে না কর তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হয়। তার পরই বিয়ে করেছে।'

'সে বৌ দেখেছ? ওরা বেশ সুখী?'

'হওয়াই তো উচিত! কিন্তু ওকথা এখন থাক কেষ্টদা।'

এই বলে সে আবারও গাড়ির কাঁচে মাথা রেখে চোখ বুজল।

ততক্ষণে সম্ভবত আগুন নিভে এসেছে। কারণ দেখলাম এবার হুড়হুড় ক'রে আবার উঠতে শুরু করেছেন অন্য যাত্রীরা।

শেষ মুহূর্তেও সত্য কথাটা তাহার মুখে আটকাইয়া গেল।

পূজার সময় সস্তা ভাড়া, খাঁটি দুধ এবং সস্তা মুরগীর সুবিধা থাকায় সাঁওতাল পরগণার সমস্ত শহরগুলিই 'বাঙালী বাবু'তে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। মধুপুরের তো কথাই নাই—কালীপুরের ফাঁকা দিকটাও মানুষের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

খালি আছে মাত্র ডাক্তারবাবুর বাগানের প্রান্তের একটি বাড়ি; ছোট বাড়ি অথচ ভাড়া অত্যন্ত বেশী বলিয়াই এখনও খালি আছে, আর সেইটিরই খোঁজে নন্দ সেদিন সকালে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ির বারান্দায় তখন মজলিস জোর চলিয়াছে; প্রতিদিন প্রভাতে এবং সন্ধ্যাতেই এ আড্ডা বসে, চলেও বহুক্ষণ পর্যন্ত। পাড়ায় যত অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী ডাক্তার প্রভৃতি প্রবীণরা আছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই এই আড্ডাতে হাজিরা দেন এবং জন্মান্তর হইতে শুরু করিয়া হিটলার পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই সমান উৎসাহে আলোচনা চালাইয়া যান। সিগারেট, বিড়ি বা চুরুট সকলে নিজেরা লইয়া আসেন, যাঁহারা তামাক খান তাঁহাদের তামাক এবং চা—ডাক্তারবাবুর খরচ মাত্র এই দুটি।

এ হেন আড্ডাতে সেদিন নন্দ আসিয়া সসংকোচে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণের মতো আলোচনা থামিয়া গেল। বক্তা সুরেশবাবু তখন পঞ্জিকার মতে যাত্রার দিন দেখা কত কঠিন সেই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, বাধা পাইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন; মুন্সেফবাবু শুধু ঈষৎ বিরক্ত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন, 'কী চাই আপনার?'

নন্দ একবার সকলের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া জবাব দিল, 'ডাক্তার-বাবুকে খুঁজছি—'

ডাক্তারবাবু কহিলেন, 'বলুন, কি দরকার।'

আঙুল দিয়া বাড়িটা দেখাইয়া নন্দ কহিল, 'ঐ বাড়িটা শুনেছি এখনও খালি আছে, আমি ভাড়া নিতে চাই মাস-ছয়েকের জন্যে।'

ডাক্তারবাবু ধীরে-সুস্থে মুখে কতকগুলি সুপারী পুরিয়া দিয়া কহিলেন,

'বেশ তো, নিন না। কুড়ি টাকা ভাড়া ; দুখানা ঘর আছে, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর বাথরুম—সব কম্প্লিট।'

কথাটা সহজে মিটিবার নয় দেখিয়া সুরেশবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'কী জন্যে নিচ্ছেন শুনতে পাই কি ? হাওয়া খেতে আসছেন, না অসুখ-বিসুখ আছে ?'

নন্দ সবিনয়েই জবাব দিল, 'আজ্ঞে, অসুখ-বিসুখ না হ'লে আর এখানে হাওয়া খেতে আসে কে বলুন ? আর এক আসে বুড়ো হ'লে, যখন কিছু হজম হয় না—'

মুন্সেফবাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কারণ তাঁহার বহু বৎসরের ডিস্‌পেপসিয়া। তিনি বেশ একটু উষ্ণভাবেই জবাব দিলেন, 'অসুখটা কী শুনতে পাই ?'

নন্দ স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'থাইসিস্। ঐ যাকে আজকাল টি-বি বলে—'

নন্দর ঠিক কাছেই বসিয়াছিলেন অনুকূলবাবু, তিনি সভয়ে হাতখানেক সরিয়া বসিলেন। বাকী সকলেও যেন নিমেষে ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ, অবশেষে নন্দই পুনরায় কথা কহিল, 'আমার নয়, আমার স্ত্রীর—তাঁর জন্যেই।'

ডাক্তারবাবু বার-দুই কাশিয়া কহিলেন, 'কিন্তু আমার বাড়িতে ওসব বিশেষ সুবিধে হবে না। আমি ও রোগ রাখি না।'

নন্দ হাসিয়া বলিল, 'ভাড়া যখন দিচ্ছেন তখন একথা বললে চলবে কেন বলুন! আমি স্বীকার করলুম তাই, না ব'লে নিলে কি ক'রে টের পেতেন ? তাছাড়া আজকাল শতকরা দশটা লোকেরই ঐ রোগ—কত বাছবেন ? এখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদেরই যে কারুর আছে কিনা তাই বা কেমন ক'রে জানলেন, কিংবা তাঁদের বাড়িতে কারুর ? সব সময়ে আবার বোঝাও যায় না—'

সকলেই কেমন যেন অস্থির হইয়া উঠিলেন। সুরেশবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'সে দুর্ভাবনা আপনার না করলেও চলবে আপাততঃ। আর কিছু বলবার আছে ?'

নন্দ কহিল, 'আর কী মশাই, এখনও একটা কথাই যে শেষ হ'লো না—'

'সে তো উনি বললেনই, যে দিতে পারবেন না।'

নন্দ হাসিল। কহিল, 'কিন্তু আমি তো এখনও বলি নি যে নিতে পারব না।'

তাহার পর ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, 'দেখুন আশে-পাশের সব বাড়ির চেয়ে আপনার ভাড়া বেশী। সুতরাং আমরা চলে যাবার পর না হয় সব বাড়িটা ভাল ক'রে চূণ দিয়ে, দরজা-জানলাগুলোতের রং দিয়ে নেবেন। কতই বা খরচা? না জানিয়ে কী আর এর আগে কেউ ও বাড়ি ভাড়া নেয় নি বলতে চান? তখনও তো ঐ কর্মই করেছিলেন! আর এর পরের ভাড়াটেরা টেরই বা পাচ্ছে কি ক'রে?'

ডাক্তারবাবুর শ্যামবর্ণ মুখ বেগুনি হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু নন্দ সে অবসর দিল না—পকেট হইতে খান দুই নোট বাহির করিয়া কহিল, 'আচ্ছা না হয় আর পাঁচ টাকা বেশীই নেবেন। এই নিন, এই পনেরো টাকা অ্যাড্ভান্স দিয়ে গেলুম, বাড়িটা একটু ধুইয়ে রাখবেন। আমি বিকেলে এসে চাবিটা নিয়ে যাবো।'

ডাক্তারবাবু আর আপত্তি করিবার অবসরও পাইলেন না, কর্তকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই টাকাটা গ্রহণ করিলেন। শুধু কহিলেন, 'এখন কোথায় আছেন?'

নন্দ কহিল, 'ঐ হোটেলটায়। বাড়ি ঠিক করতে একলাই এসেছি কিনা। আজ চাবি নিয়ে রাত্রের গাড়িতে চলে যাবো, তারপর কাল কি পরশু ওঁকে নিয়ে—আচ্ছা, 'আসি, নমস্কার!'

সে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। তাহার ধৃষ্টতা এবং তাচ্ছিল্যে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে সুরেশবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, 'কিন্তু এটা কি করলেন ডক্তোরবাবু? জেনেশুনে পাড়ার মধ্যে একটা থাইসিস্ রুগী—'

ডাক্তারবাবু ঈষৎ অপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, 'ঠিক পাড়ার মধ্যে তো নয়। আমার বাড়িটাই একটেরে, তার ওপর ওটা ত আবার আমার বাড়িরও শেষ কোণে। তাছাড়া ভদ্রলোক কথাটাও বড় মিথ্যে বলেন নি, ও বাড়িটা প্রথম করবার সময়ই এক ভাড়াটে আসে ম্যালেরিয়া ব'লে, পরে জানতে পারি টি-বি!…বুঝলেন না! সেরকম হ'লেই বা করছি কি বলুন! এ তো তবু পাঁচটা টাকা ক'রে বেশী পাওয়া গেল।…আর পড়েও আছে বাড়িটা—পুজোর সিজ্‌ন্ ত যায়-যায়!…বুঝলেন না?'

উপস্থিত সকলেই মুখটা বোদা করিয়া রহিলেন, খালি সায় দিলেন সান্যালমশাই, তাঁহার জামাইটি পুরীতে গিয়া সম্প্রতি এই বিভ্রাটেই পড়িয়াছে, রোগটা জানিতে পারায় কেহ বাড়ি দিতেছে না—

নন্দ সেইদিনই বাড়িতে নিজের তালা লাগাইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর একটা দিন বাদ দিয়া দ্বিতীয় দিনের দিন সকালেই দেখা গেল বাড়িটার জানলায় পর্দা ঝুলিতেছে এবং রান্নাঘরে ধোঁয়া। ভোর চারটায় যে ট্রেণটা আসিয়া পোঁছায়, সম্ভবত সেইটাতেই উহারা আসিয়াছে। সুরেশ-বাবু ভোর বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, অত সকালেই পর্দা ঝুলিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাহিড়ীমশাইকে কহিলেন,' 'সাক্ষাৎ যমে ছুঁয়েছে, আর ক'দিন—তবু পর্দা দেখেছেন লাহিড়ীমশাই ? আব্রু দেখে আর বাঁচি না—'

নন্দ উহাদের দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল। সহাস্যমুখে নমস্কার করিয়া কহিল, 'আপনাদের আশ্রয়েই এসে পড়লুম। একটু দয়া রাখবেন—'

অগত্যা সুরেশরাবুকে মিষ্টভাষণ করিতে হইল। কথা কহিতে কহিতে তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে তাহার ভাগ্যে দুঃখিত না হইয়া পারিলেন না। নিটোল বলিষ্ঠ দেহ, স্বাস্থ্যে ও প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ—সে দিকে চাহিলে বৃদ্ধদের ঈর্ষাই হয়।···

সুরেশবাবু বোধ করি একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা কানে গেল লাহিড়ীমশাই বলিতেছেন, এখানে তো হাওয়া খেতেই এসেছেন, তবে এসেই আগে পর্দা টাঙিয়েছেন কেন ? হাওয়া যত যায় ততই তো মঙ্গল, এখানকার হাওয়াতেই স্বাস্থ্য, বুঝলেন না ?'

নন্দ ম্লান হাসিয়া কহিল, 'ভাগ্য আমার। আমার 'উনি'টি আবার এমন সেকেলে, বাইরে কিছুতে আসতে চান না। কত বলি--কে কার কড়ি ধারে।'

তাহার পর গলা খাটো করিয়া কহিল, 'আবার এ-ও ভাবি, আর কদিনই বা, সারবার রোগ তো নয়—যে কদিন বাঁচে নিজের ইচ্ছেমতোই চলুক, আমি আর টানা-হেঁচড়া বিশেষ করি না।

শ্রোতা দুইজনেই যেন শিহরিয়া উঠিলেন। সুরেশবাবু হাত তুলিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা নমস্কার ! চলুন, লাহিড়ীমশাই—'

কিন্তু নন্দকে ঠেকানো গেল না। দিন-দুই যাইতে না যাইতেই দেখা গেল যে, তাস এবং দাবা, এই দুটিই সে ভাল খেলে এবং তাহার মতো মজলিসী লোক মেলা ভার। ইতিহাস ভাল জানা আছে, খবরের কাগজও নিত্য পড়ে সুতরাং রাজনীতিতে দ্রুত আলোচনা জমাইতে পারে, সরল কথাবার্তার জন্য আলাপও জমে সহজে। অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই মধুপুরের এই পাড়াতে তাহার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ হইল।

প্রথম প্রথম তাহার এতটা মেলামেশাতে দুই-একজন, বিশেষত লাহিড়ী-

মশাই, একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। হাজার হউক কঠিন রোগ লইয়া নাড়া-ঘাঁটা করে তো! ছোঁয়াচটা খারাপ যে। কিন্তু সুরেশবাবু এক কথাতে তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন, থাইসিস ত আজকাল বলতে গেলে সব বাড়িতেই, তাদের বাড়ির লোকেরা পথে-মাঠে-বাসে-ট্রামে কোথায় নেই বলুন? তাদের পাশে কি আপনাকে বসতে হচ্ছে না?'

সুতরাং সে আপত্তি টিকিল না। তাসের আড্ডার হোতা, মজলিসের তন্ত্রধারক এবং দাবার আড্ডার নায়ক হইয়া নন্দ ক্রমশ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। এমন কি ইহারই মধ্যে সুরেশবাবু, বাগ্‌চীবাবু, মুন্সেফবাবু এক-একবেলা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াও দিলেন।

কিন্তু নন্দ যেমন অনায়াসে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তাঁহার স্ত্রী তেমনি সুদূর হইয়া রহিল। কোনমতেই কোথাও বাহির হয় না, সকলে ঘুমাইলে সে নাকি গভীর রাত্রে পাশের মাঠটায় একটু পায়চারী করে। বেশী চলিতেও পারে না। শরীর তাহার খুবই খারাপ। চিকিৎসাও একরূপ বন্ধ; নন্দ বলে, কী হবে মিছিমিছি কতকগুলো টানাহেঁচড়া ক'রে বলুন! ওখানকার ডাক্তার একটা ক্যাল্সিয়াম ট্যাবলেট দিয়েছে, সেইটে খাওয়াই আর দুধ খায় পাঁচপো-দেড় সের। ঐতেই যে কটা দিন বাঁচে! আর যা করে আপনাদের মধুপুরের হাওয়া।'

এইভাবেই চলে। সহসা একদিন দেখা গেল আড্ডাতে নন্দ অনুপস্থিত। মুন্সেফবাবু অধৈর্য হইয়া লোক পাঠাইলেন, তাহার সহিত নন্দর দেখা হইল না, নন্দর যে বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী চাকর তাহাদের সহিত কলিকাতা হইতে আসিয়াছে তাহার মুখে খবর পাওয়া গেল—মাইজীর অসুখ বাড়িয়াছে, বাবু এখন বাহির হইতে পারিবেন না।

সংবাদে সকলেই ক্ষুণ্ণ হইলেন। আড্ডা যেন ভাল জমিল না। অনুকূলবাবু বলিলেন, 'ছোকরা ঐ বৌয়ের জন্যেই ডুববে—'

পরের দিনও নন্দ আসিল না, তাহার পরের দিনও না। খবর সেই একই, মাইজীর অসুখ বেশী, বাবু নড়িতে পারিতেছেন না।

দিন চার-পাঁচ পরে যখন নন্দ বাহিরে আসিল, তখন যেন তাহাকে আর চেনা যায় না, মুখ বিবর্ণ, চক্ষু কোটরগত—রাত্রি জাগরণ ও অনিয়মের চিহ্ন সর্বাঙ্গে। সুরেশবাবু শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, 'ইস্—চেহারাটাকে কি ক'রে ফেলেছ হে?'

নন্দ ম্লান হাসিয়া জবাব দিল, 'আর চেহারা! কদিন যা কেটেছে, একটি ঘণ্টাও পুরো ঘুমোতে পারি নি।'

মুন্সেফবাবু বলিলেন, 'কিন্তু এমন ক'রে শরীরের ওপর অত্যাচার করলে তো চলবে না, একে পাশে ঐ দুর্দান্ত রোগ, দুর্বল শরীর পেলেই চেপে ধরবে যে—'

'নন্দ কহিল, 'বুঝি তো সব, কি করি বলুন—'

অনুকূলবাবু কহিলেন, 'নার্স-টার্স একটা—কী অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন—'

নন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে হবার যো নেই অনুকূলবাবু, তাহ'লে আর ভাবনা কি! নার্সের হাতের জল উনি খাবেন না। ব'লে রেখেছেন, 'তার আগে তুমি নিজে হাতে আমার গলা টিপে দিও! সে-ও আমার সইবে।'··· আর আত্মীয়স্বজন এ রোগে কে আসবে বলুন?···'

তাহার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না, ও আর কোন উপায় নেই। এ বোঝা আমাকেই বইতে হবে—'

এই ঘটনার পরে পুরুষ মহলে যেমন অতিরিক্ত স্ত্রৈণ বলিয়া নন্দর বদনাম রটিয়া গেল, নারীমহল তেমনি ঐ কর্তব্যপরায়ণ পুরুষটির প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠিলেন। মুন্সেফবাবুর নাত্‌নী কমলা বেথুনে পড়ে, সে তো স্পষ্টই বলিল, 'এ সব স্বার্থত্যাগের ইতিহাস আর কে জানছে বলো, শাজাহান হ'লে লোকে কবিতা লিখত!'

কমলার বৌদি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'এমন স্বামীর কোলে মরেও সুখ আছে!'

তাঁহার স্বামী এখন কলিকাতায়, আট দিনেরও বেশী হইল কোন চিঠি পাওয়া যায় নাই—সুতরাং তাঁহার ক্ষোভটাই বেশী।

ইহার পর কমলা একদিন, প্রায় গায়ে পড়িয়াই, নন্দর সহিত আলাপ করিল এবং অপরাহ্ণে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া অপটু নিজহস্তে নিম্‌কি ভাজিয়া খাওয়াইল। সুরেশবাবুর বিধবা বোন একেবারে অন্তঃপুরে বসাইয়া চিঁড়ার পায়স খাওয়াইলেন এবং বার বার মাথার দিব্য দিয়া দিলেন, 'তুমি বাবা দুধ একটু বেশী ক'রে খাও, নইলে শরীর একদম টিকবে না। চেহারা এই কদিনে একেবারে আদ্ধেক হয়ে গেছে।'

অর্থাৎ বিদেশের এই ক্ষুদ্র বাঙালী সমাজটিতে নন্দর প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হইল।

কিন্তু হপ্তাখানেক না যাইতে যাইতে আবার দেখা গেল নন্দ অনুপস্থিত। এবারে আর কাহাকেও খোঁজ লইতে হইল না, নন্দ নিজেই একটা চিরকুট লিখিয়া সুরেশবাবুর কাছে ছুটি লইল—'ওঁর আবার একটা টাল এসেছে। এখন বোধ হয় ক'দিন আর নড়তে পারবো না।'

মনের আবেগে ও অস্থিরতায় হাত কাঁপিয়াছে, নন্দর অমন সুন্দর হাতের লেখা চেনাই যায় না। সুরেশবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'ছোকরাকে ঐ রোগটি চেলে না দিয়ে আর মা-লক্ষ্মী যাবেন না দেখছি।'

কমলা উত্তেজিত হইয়া কহিল, 'কিন্তু কাকাবাবু, আপনি কি বলতে চান যে রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করাই তাঁর পক্ষে উচিত হ'তো? নারীর তাহ'লে এই মূল্য আপনাদের কাছে?'

অপ্রস্তুত হইয়া সুরেশবাবু চুপ করিলেন।

কিন্তু এবারে যখন নন্দ বাহির হইয়া আসিল তখন তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন, চেহারা ঠিক অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। কৈফিয়ৎ-স্বরূপ নন্দ কহিল, 'আমার আবার এই ক'দিন যেন ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার মতো হয়েছে, বোধ হয় রাত জেগেই, কিছু হচ্ছে হজম না!'

কমলার বৌদি আড়াল হইতে চক্ষু মুছিলেন। নন্দ কহিল, 'যা ব্যাপার দেখছি, হয়ত ওঁকে নিয়ে আমাকে দেশেই ফিরে যেতে হবে—। আর বেশী দিন নয়।'

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। এমন শোকাবহ ব্যাপারে কীই-বা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। মুন্সেফবাবু কহিলেন শুধু, 'কিন্তু এখানকার এমন হাওয়া থেকে নিয়ে গেলে কি আরও খারাপ দাঁড়াবে না? বিশেষতঃ এই সামনে শীত, এখন আরও হাওয়া ভালো হবে।'

অন্যমনস্কভাবে নন্দ কহিল, 'দেখি।'

কিন্তু দিন-তিনেক পরেই আবার সে অদৃশ্য হইল। বাজারে চাকরের কাছে খবর লইয়া জানা গেল যে, এবারে অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। সকলেই ছোকরার দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। অমন ছেলে, অমন স্বাস্থ্য, অমন মধুর স্বভাব —এক স্ত্রীর জন্য মাটি হইয়া গেল!

মেয়েরাও ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যা-নাগাদ কমলা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, 'কিন্তু এ কী অন্যায় দাদু, তোমরা সবাই লোক-

টিকে ভালবাসো, কিন্তু ওঁর এই উপর্যুপরি বিপদের খবর পেয়েও কেউ একবার তাঁর খবর নেওয়া কর্তব্য মনে করো না! আশ্চর্য তোমাদের জীবনের মায়া। তোমাদের যা ভয়, ভগবান না করুন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের যদি কিছু হয় তা হ'লে দেখছি তাদেরও খবর নেবে না?'

মুন্সেফবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, 'না না, তা নয়। তবে খবর নিয়েই বা কি করব বল্, ওর বৌ পর্দানশীন, আমরা গেলেও তো কোন কাজে লাগব না!'

সহসা কমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, 'তবে আমিই যাই একবার—'

বাড়িসুদ্ধ সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, 'সে কি, তুই যাবি কোথায়? এই রাত্রি বেলা—'

শান্ত কণ্ঠে কমলা জবাব দিল, 'কি হয়েছে তাতে? ভদ্রলোকের বিপদে ভদ্রলোকেই দেখে থাকে! ছোঁয়াচ লেগে যদি আমার অসুখ করেই তো আমাকে হাসপাতালে দিও—আমাকে নিয়ে কাউকে বিব্রত হ'তে হবে না।'

মুন্সেফবাবু বলিলেন, 'কিন্তু পরের বাড়ি—এমন সময়ে—একটা লোক-লজ্জা তো আছে!'

কমলা ততক্ষণে দালান পার হইয়াছে, সেইখান হইতেই জবাব দিল, 'তাঁর স্ত্রী তো আছেন, আর আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি—'

ব্যাকুলভাবে কমলার মা বলিলেন, 'জানি নে বাবা তোমাদের ধিঙ্গিপনা! তা যাবো ব'লেই অমনি চললি? অন্ততঃ আর কাউকে দিই সঙ্গে। ও বুধিয়া!'

কমলা বাধা দিয়া কহিল, 'থাক বুধিয়া। নিজেরা প্রাণের ভয়ে যে বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াও না, সেখানে চাকরকে পাঠাতে লজ্জা করে না?···ওদের বুঝি প্রাণ নয়?···তা ছাড়া এই তো রাস্তাটা পেরিয়ে যাওয়া, এখনও আটটা বাজে নি। ভয়টাই বা কি?'

সে আর দাঁড়াইল না। তর তর করিয়া বাগানটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িল এবং দ্রুত চলিয়া নন্দদের বাড়ির দুয়ারে উপস্থিত হইল। কড়া নাড়ার শব্দে বিস্মিত হইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল বৃদ্ধ চাকরটা, কিন্তু সামনে কমলাকে দেখিয়া সহসা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

কমলা কহিল, 'তোমার মাইজীকে দেখতে এসেছি—'

সে পথ না ছাড়িয়াই আমৃতা আমৃতা করিয়া জবাব দিল, 'মাইজীর

বেমারি······বাবু······বড্ড বেমার—'

কমলা প্রায় ধমক দিয়াই কহিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। বেমারি ব'লেই তো দেখতে এসেছি। সরো, পথ ছাড়ো—'

চাকরটাকে প্রায় ঠেলিয়াই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু প্রথম ঘরে ঢুকিতেই যে দৃশ্য নজরে পড়িল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘরের মেঝেতে ব্যাগ প্রভৃতি ছড়ানো, সেখানে একটা যাত্রার আয়োজন চলিতেছিল, আর বিছানার উপর শুইয়া আছে নন্দ নিজেই। গায়ে একটা কম্বল চাপা, হ্যারিকেনের ম্লান আলোতে মুখের যতটা দেখা যাইতেছে, তাহা রোগ-রিবর্ণ, নিরতিশয় পাণ্ডুর।

কমলার পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়া উহাকে দেখিতে পাইয়াই নন্দ তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না, আবার শুইয়া পড়িয়া কহিল, 'আপনি যে হঠাৎ?'

কমলা দ্বার-পথেই অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, 'এ কি, আপনারও অসুখ?···আপনার স্ত্রী কোথা? তাঁকে কে দেখছে?'

নন্দ আঙুল দিয়া কোণের মাদুরটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'ঐটে পেতে বসুন। ওটা আজই গরম জলে কাচা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত ঐটেই নিরাপদ।'

কমলা কহিল, 'কিন্তু—'

নন্দ হাসিয়া জবাব দিল, 'বলছি। স্ত্রী আমার নেই। অসুখ আমারই।'

কমলা আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তবে—'

নন্দ কহিল, 'হ্যাঁ, স্ত্রীর কথাই বলেছি, তারও কারণ ছিল। সত্য কথাই বলব ভেবেছিলুম, কিন্তু দেখলুম যা ওঁদের ভয়, জানতে পারলে আমাকে আর ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে দেবেন না—সেই জন্যেই কিছুতে শেষ পর্যন্ত ভরসা ক'রে বলতে পারলুম না। অথচ এই বিদেশে একা-একাই বা থাকি কি ক'রে বলুন দেখি! বাধ্য হয়েই মিথ্যাচরণ করতে হলো। রোগটা খারাপ ব'লে এত বড় ধাপ্পাটাও চলে গেল। শেষ পর্যন্তও যেতো, যদি সত্যি-সত্যিই আপনি আজ দয়া না করতেন।'

কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। অনেকক্ষণ পরে কহিল, 'কিন্তু আপনার অমন চমৎকার হেল্‌থ্., অমন ফিজিক্—'

নন্দ কহিল, 'ঐ ফিজিক্‌ই কাল হ'লো। এম-এ পাস ক'রে ল' পড়বার সময় কী যে দুর্মতি হ'ল, মনে হ'ল গায়ের জোরে আর চেহারার ফর্মে সবাইকে

হারিয়ে দিতে হবে। উঠে পড়ে লাগলুম ব্যায়াম করতে, রোজ ছ ঘণ্টা ক'রে বারবেল চালাতে গিয়ে হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে বললে, 'টি-বি'। মা-বাবা নেই ; দাদা, বৌদি, ভাই-বোনেরা শোনামাত্র ভয়ে শিউরে উঠল। দেখলুম বাড়িতে থাকলে মুখে জলও দেবে না কেউ।...কেবল এই বুড়ো চাকর, ও আমাকে ছাড়ে নি। তাই ওকে সম্বল ক'রেই একা বাড়ি থেকে ভেসে পড়লুম। মায়ের খান-কতক গয়না ছিল আমার কাছে, তাই বেচে হাজার খানেক টাকা হাতে ক'রে মধুপুরে এসেছিলুম। মনে আশা ছিল নিশ্চয়ই সারবে, ডাক্তররা হয়ত অতটা বুঝতে পারেনি নি, তাঁরা বলেও দিলেন যে খুব খারাপ অবস্থা নয়।...ছিলুমও এখানে এসে ভালই, হঠাৎ কী যে হ'লো, আবার—'

কমলা কহিল, 'আর রক্ত উঠেছে কি?'

নন্দ কহিল, 'না রক্ত নয়! এমনি জ্বর চলছে, আর বুকে বড় যন্ত্রণা। কদিন ক'রে চেপে ধরে যখন, চুপ ক'রে শুয়ে থাকি, আবার একটু ছাড়া পেলেই বেরোই। ভেবেছিলুম জোর ক'রে রোগকে তাড়িয়ে দেবো। হয়ত দিতেও পারতুম, যদি না একটা চিন্তা মাথায় এসে ঢুকত। ডাক্তারেরা বলে, এ অবস্থায় ওসব কথা চিন্তা করতে নেই।...'

কমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াই ছিল। এইবার নন্দরই শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

নন্দ কহিল, 'এখানেই বসলেন!'

কমলা কহিল, 'তা হোক—। কিন্তু চিন্তাটা কি?'

নন্দ একটুখানি চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। হয়ত যন্ত্রণা বাড়িয়াছে মনে করিয়া কমলা প্রশ্ন করিল, 'বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেবো?'

নন্দ কহিল, 'না।...জীবনে মেয়েদের দিকে তাকাবার সুযোগ কোনদিনই পাই নি। এখানে এসে একজনকে দেখে পর্যন্ত কেমন একটা চিন্তা মাথায় ঢুকল, কেবলই মনে হ'তো, যদি ভাল থাকতুম তাহ'লে হয়ত তাকে পাবার আশা দুরাশা হ'তো না। এখনও যদি ভাল হই তাহ'লেও হয়ত—। সে যাক—কিন্তু আপনি হঠাৎ কেন এলেন, বললেন না তো?'

কমলার মুখ সহসা রাঙা হইয়া উঠিল। সে জবাব দিল, 'সে কথাও যাক। কিন্তু মালপত্তর এমন ছড়ানো কেন?'

নন্দ অপ্রতিভভাবে হাসিয়া জবাব দিল, 'অভিনয় যে আর বেশীদিন চলবে

না তা বুঝতে পেরেছিলুম। তাই ভেবেছিলুম, আজই ফিরে যাবো—। এখানে ঐ মিথ্যার আবরণই রেখে যেতে চাই—'

কমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, 'কিন্তু সেখানে কে দেখবে আপনাকে? বাড়ির কথা তো ঐ বললেন—'

নন্দ কহিল, 'এখানেই বা কে দেখত বলুন।···সেখানে গিয়ে হাসপাতালে যাবো ভেবেছিলুম। পৈতৃক বাড়িটার ভাগ আছে, তা ছাড়া হাতেও কিছু টাকা আছে। হাসপাতালেই একটা ভালো ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া যাবে। বুধিয়া তো রইলই—'

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আজই যেতে চান?···'

নন্দ কহিল, 'হ্যাঁ, এই দশটার ট্রেনে। অন্ধকার থাকতে থাকতে সরে পড়াই ভালো—কেউ দেখতে পাবে না।'

কমলা নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া কহিল, 'তাহ'লে তো আর বেশী দেরি নেই। আচ্ছা আমিই জিনিসপত্র গুছিয়ে ছিচ্ছি—। বুধিয়াকে গাড়ি ডাকতে বলুন।'

নন্দ কৃতজ্ঞকণ্ঠে কহিল, 'তাহ'লে তো বেঁচে যাই—'

তাহার পর চাকরকে গাড়ি ডাকিতে বলিয়া কতকটা যেন আপন মনেই কহিল, 'ভগবান যাবার আগে তবু একবার মুখ তুলে চাইলেন—'

কমলা কথা কহিল না। জিনিসপত্র সামান্যই, অল্প সময়ের মধ্যেই গোছানো শেষ হইয়া গেল। বাকী রহিল নন্দর বিছানাটা। কমলা কহিল, 'চলুন গাড়িতে গিয়ে বসবেন, বুধিয়া ঐ বিছানাটা বেঁধে নিক—'

নন্দ উঠিয়া বসিয়া বুধিয়াকে ডাকিতে যাইতেছিল, কমলা বাধা দিয়া কহিল, 'ও থাক্, আমিই ধরছি।'

নন্দ আর কথা কহিল না। কমলার কাঁধেই সম্পূর্ণ ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়িতে উঠিল। বাক্সগুলি নিচে রাখিয়া, গোটা-দুই বালিশের সাহায্যে তাহাকে যতটা সম্ভব সচ্ছন্দে বসাইয়া দিয়া কমলা কহিল, 'ষ্টেশনে বুধিয়া নামিয়ে নিতে পারবে তো?'

নন্দ বলিল, 'তা পারবে'খন।···আপনার এ দয়া যে আমি জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন ভুলতে পারবনা, একথা আপনাকে জানানোও বাহুল্য।··· কিন্তু এতক্ষণ আপনি রইলেন এখানে, তার জন্যে কোন কথা কথা উঠবে না তো?'

কমলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। কেমন একটা বিকৃত ভারী গলায় জবাব দিল, 'সে তুর্নাম থেকে আপনার স্ত্রীই বাঁচাবেন আমাকে, তাঁর পরিচয় আমি ছাড়া আর কারও জানবার দরকার কি ?'

নন্দ একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

ততক্ষণে বুধিয়া মালপত্র লইয়া আসিয়াছে। কমলা শুধু ছুটি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নিজের বাড়ির রাস্তা ধরিল।

গঙ্গাপুত্র

কনখলে গেলে আমি এক-আধবার অবশ্যই শ্মশানঘাটে যাই। স্থানটি নিরিবিলি বলেও বটে, ওখানেই আমার মাকে দাহ করা হয়েছে বলেও বটে। এখন অবশ্য ওখানে বড় বড় আশ্রম হয়েছে, একটি তো খুবই বড়, চারিদিক থেকে মুক্ত স্থানটুকুকে নষ্ট করার চেষ্টার অবধি নেই। আগের সে নির্জন শান্তি আর নেই। তবে আকর্ষণও একটি জুটেছে, এক গঙ্গাপুত্র। যাকে আমরা কলকাতায় ডোম বলি, মড়া পোড়ানোর সহায়তা করে। ওখানে আবার চিতায় আগুন দিয়েই মৃতের আত্মীয়রা স্নান ক'রে ঘরে ফিরে যান, এই গঙ্গাপুত্রই দাহ করার প্রায় সব কাজ করে। আত্মীয়রা পরের দিন সকালে এসে নাভি গঙ্গায় দিয়ে চিতা ধুয়ে দেন। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই প্রথা ছিল, ঠিক এখনকার কথা বলতে পারব না।

এই গঙ্গাপুত্রটি সম্বন্ধে আকর্ষণের হেতু—হঠাৎই আবিষ্কার করেছিলুম, সে বাঙালী। না, উদ্বাস্তু নয়, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। অতদূর থেকে এই কাজ করার জন্যে উত্তর প্রদেশেরও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে কেন এসেছে—এ কৌতূহল স্বাভাবিক।

জিজ্ঞাসা করেছি বৈকি। শুনে হাসে শুধু, কোন উত্তর দেয় না। শুধু মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকটা দেখায়। আমিই বা কদিন তার কাছে যাই—থাকিই বা হরিদ্বারে কদিন—নিত্য খোঁচালে হয়ত একদিন বলে ফেলত।

কিন্তু বছর পাঁচ-ছয় পরে একদিন, হঠাৎ পরিচয়ের মতোই হঠাৎ আবিষ্কার করলুম—সে শিক্ষিতও। একটু-আধটু ইস্কুলে পড়া বিদ্যে নয়, রীতিমতোই শিক্ষিত। যে ইংরেজী শব্দ সে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করল তাতেই সেকথা

প্রমাণিত হ'ল। এতদিন কথাবার্তা তার জীবিকার উপযোগী ভাবেই বলত, কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস সহজে যায় না, একই লোকের সঙ্গে বেশীদিন কথা বলতে বলতে কোনদিন না কোনদিন সে-অভ্যাস প্রকাশ পাবেই।

তখনই ঘাঁটালুম না। কারণ অদূরেই এক চিতা জ্বলছে, সেদিকে তার মনোযোগ দেওয়া দরকার। সেদিন সন্ধ্যাবেলা এলুম একবার—সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলা ওদিকে যেতুম না, বেলা ৪টা নাগাদ খুব জনবিরল থাকত জায়গাটা বলে সেই সময়েই যেতুম—তবু, আজ আবার এমন অসময়ে টর্চ হাতে এদিকে দেখেও—খুব বিস্মিত হ'ল না, বরং ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে এমনভাবে তাকাল যে মনে হ'ল বিকেলের বেফাঁশ কথাটা সম্বন্ধে সেও সচেতন, এই আক্রমণটা প্রত্যাশাই করছিল।

তখন ওর কোন কাজ ছিল না। একটা চালাঘর ছিল ওর নিজের কিন্তু রান্নাবান্না বড় একটা করত না। কাছের হোটেল থেকে ভাত কিনে খেত, কিংবা পয়সা কম থাকলে সদাব্রত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে (যারা টাকায় ষোল খানা হিসেবে—এখন চারখানায় ঠেকেছে—রুটি বিক্রী করে, যাতে ক্রেতারা কিনে সাধুভোজন করাতে পারেন) রুটি কিনে খায়! তবে নাকি ঘরে চালডাল থাকে—কোনদিন কোন টাকাপয়সা আমদানি না হ'লে চিতার কাঠই টেনে এনে ভাত রাঁধে।

সে বেশ সহজ কণ্ঠেই বলল, 'আসুন বাবু। আজ ও ঘরটা খালি আছে—ওখানে বসার সুবিধে, এখানে কোথায় আর বসবেন—সাপ বিছে কত কি থাকতে পারে—বিছুট তো আছেই—মাটিতে কি জলের ধারে বসা নিরাপদ নয়।'

'ও ঘরটা' অর্থে শ্মশানযাত্রীদের বসার ঘর। তবে শ্মশানযাত্রী খুব কমই বসে, দূরান্তর থেকে এলে এবং সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে তারাই বসে। সন্ধ্যার সময় বেশির ভাগই বসেন সাধু ব্রহ্মচারীর দল, কেউ বা নীরবে বসে থাকেন গঙ্গার দিকে চেয়ে, কেউ বা শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক জুড়ে দেন বা জ্ঞানার্থীদের উপদেশ দেন তারস্বরে—তাঁদের জ্ঞান দূরের বড় রাস্তা থেকে যাতে কিছু শ্রোতা আকর্ষণ করতে পারে—এই আশায়। কখনও কখনও এঁদের জ্ঞানের প্রচণ্ডতার ঠেলায় মৌনী সাধু-মহাৎমারা বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে গঙ্গাতীরে বসেন।

বসলাম ঘরে গিয়ে। বসে ওকে বেঞ্চির পাশের জায়গাটা দেখাতে জিভ

কাটল, বলল, 'তাই কি পারি। দিনরাত মড়া ঘাঁটছি, আসলে তো ডোমই।' বলে সামনের ধুলো-বালির ওপরই বসে পড়ল।

তাই বলে আর কোন ভণিতা করল না, বৃথা বাক্যব্যয়ও না। বলল, 'আপনি আসবেন আবার তখনই বুঝেছিলাম। হঠাৎই শব্দটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।'

তারপর সামান্য কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'হ্যাঁ বাবু, আমি লেখা-পড়া জানা লোক। জাতে ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সোদপুরের কাছে ভোলায় বাড়ি। লেখাপড়া জানি বলতে পণ্ডিত নই, তবে কেমিস্ট্রীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি· এস-সি· পাস করেছি। এইটুকু পর্যন্ত আমার লেখা-পড়া। এম· এস-সি· পড়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হয়ে উঠল না। শৈশবে বাবা মারা গিছলেন, মামার বাড়ি মানুষ, তিনিও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ তবু বোন ভাগ্নেকে ফেলেন নি, হয়ত দেনা করেও পড়াতেন কিন্তু বি· এস-সি·'র রেজাল্ট বেরোবার আগেই মারা গেলেন, মাও গেলেন তার মাসখানেক পরে।

'উপায় রইল না আর পড়ার। টিউশ্যনী ক'রে পড়া ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা—তাতে কোনমতে হয়ত পাস করা যায়, তবে ভাল ফল আশা করা যায় না। বিশেষ আমার যা ইচ্ছে ছিল—রিসার্চ করার, তার জন্যে বৃত্তি পাওয়ার মতো ততো ভাল ফল হত না। আর ইচ্ছেও ছিল না। মনটা কেমন ভেঙে গেল। তা ছাড়াও, মামী আর মামাতো বোন রয়েছে, তাদের দেখা তো কর্তব্য।'

আবারও চুপ করল লোকটি। আমি কিছু অসহিষ্ণুভাবেই বলে উঠলুম, 'তার পর?'

'বলছি বাবু। সবই খুলে বলব বলে ঠিক ক'রে রেখেছি মনে মনে। আপনি চলে যাবার পর এই দু'ঘণ্টা ধরে এই কথাই ভেবেছি।

'চাকরি নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি। সরকারী চাকরির চেষ্টা যে করি নি তা নয়, কিন্তু তার আগেই একটা ইস্কুল-মাস্টারী জুটে গেল! সায়েন্সের টিচার, মাইনে কম তবে টিউশ্যনীর সুযোগ আছে। পরীক্ষার খাতা দেখা, স্কুলপাঠ্য বই লেখা—এতে চলে যায়। বছর খানেকের মধ্যেই অসাধ্য সাধনের মতো ক'রে বোনটার বিয়ে দিলুম। দেশের বাড়ির একটা অংশ ছিল, সরিকদেরই সেটা বেচে বোনের বিয়ের খরচ উঠল খানিকটা। মামার কাছে ঋণ অনেক, এ তার কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি বলতে পারেন।

'কিছুই নেই সঙ্গতি—দেশের বাড়িও গেছে। থাকি মামার বাড়ি। সে বাড়িও এতটুকু এবং বহু পুরনো, তবু বিয়ের জন্যে আক্রমণ চলছিলই, মাস্টারী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এবার মামীও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সুতরাং কনের অভাব হ'ল না। শুধু তাই নয়, গরিব ইস্কুল মাস্টারের ভাগ্যে এক রূপসী মেয়েই জুটল।

'আনন্দ হবার কথা, এ জীবনের একটা বড় রকমের বিজয় লাভ ভাবার কথা—কিন্তু কোনটাই হ'ল না। কারণ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলুম এ বিবাহে সে সুখী নয়। সে যে রূপসী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, বোধ হয় বহু পুরুষের মুগ্ধ স্তুতি এবং অপর মেয়েদের ঈর্ষাই তাকে সচেতন করেছিল, বোধ হয় ইচ্ছা ছিল ফিল্মের নায়িকা হবে—নিতান্ত সুযোগ-সুবিধে ঘটে নি, আর বাবার অবস্থা আমার থেকেও খারাপ—তাই এ বিয়ে করতে হয়েছিল। আশাভঙ্গের অসন্তোষ তার কথাবার্তায় কি আচরণে ঢাকা থাকত না।

'তবু ঘর করতে হল। এক বছরের মধ্যে একটি ছেলেও হ'ল। হয়ত আরও হ'ত—তবে আমি আর বোঝা বাড়াতে চাই নি। অবশ্য তিনিও বিশেষ সুযোগ দিলেন না। পাড়ায় একটি টাউট ছিল, নিজে দিনকতক ফিল্ম্ ডিরেকটারী করেছিল কিন্তু পর পর কটা ছবি ফ্লপ করায় কেউ টাকা দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত টাউটে পরিণত হয়েছিল। বোম্বের ফিল্ম্ বাজারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে এমনি নানা মিথ্যে বলে মেয়েগুলোকে নিয়ে যেত—তারপর তাদের কি গতি হত কেউ জানে না। তার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কিভাবে যোগাযোগ হয়েছিল জানি না, তিনি দু বছরের শিশু-পুত্রকে ফেলে তার সঙ্গে ভেগে পড়লেন। বাপের বাড়ি থেকে কিছুই আনতে পারেন নি, কিন্তু আমার মামীমা কিছু গহনা দিয়েছিলেন—সেইগুলো নিয়েই ভাগ্যস্রোতে ভাসলেন।

'ছেলেকে দিদিমার বাড়ি পাঠানোর কথা অনেকে বলেছিল। আমি রাজী হই নি। মামীমাই মানুষ করতে লাগলেন, তবে যে জন্ম-অভাগা তার সেটুকু স্নেহও অদৃষ্টে পাবার কথা নয়—অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। বছর চারেক বাদে মামীও মারা গেলেন। এক পুরনো ঝি ছিল, খুব বুড়ি, সে সংসার দেখতে লাগল। আমি ছেলেকে একটা মিশনারী স্কুলে দিলুম, তাদের বোর্ডিং ছিল। মানে ছোট ছেলে রাখার মতো বোর্ডিং। তার জন্যে আমাকে পরিশ্রম আরও বাড়াতে হ'ল। কোচিং ক্লাস, টিউশ্যনী—

তারপর রাত জেগে নোট বই, কোশ্চেন-অ্যানসার জাতীয় বই লেখা।

'ছেলেকে ভাল ক'রেই মানুষ করতে চেয়েছিলুম। এমনি তার কেরিয়ার দেখে সকলেই বাহবা দিত, কুড়ি বছরে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করল এবং নিজের চেষ্টায় একটা বড় বিদেশী ফার্মে সেল্‌স্ প্রোমোটার-এর চাকরিও পেয়ে গেল। রূপবান বিদ্বান ছেলে, গর্ব হবারই কথা। কিন্তু স্ত্রীর বেলায় যা হয়েছিল ওর বেলায়ও তাই হ'ল। ছেলে শুধু যে পর হয়ে গেল তাই নয়—আমাকে একটু লুক-ডাউনও করতে লাগল। আমার মতো লোকের এত টাকা খরচ করে মিশনারী ইস্কুলে পাঠানো ঠিক হয় নি। বুড়ি ঝির কাছে রাখলেই ভাল হ'ত। বছর দুই পরেই যখন চাকরিতে বড় একটা প্রমোশন হ'ল তখন কোম্পানি থেকে দিচ্ছে বলে আলাদা একটা ফ্ল্যাট নিল। বলল, 'এ কাজে হামেশাই পার্টি দিতে হয়—বড় বড় আপিসারদের এনটারটেন করতে হয়—সে এ বাড়িতে হওয়া সম্ভব নয়'।

'বুঝলুম। দোষ আমারই। এখন আর স্রোত উল্টো দিকে বওয়ানো যায় না। খুবই একা পড়েছিলুম—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই আমার মামাতো বোন রাণু বিধবা হয়ে একটি মেয়ে নিয়ে এসে এ বাড়ি উঠল। রাণু আমাকে নিজের ভাই হিসেবেই দেখত, কাজেই যত্নআত্তির কোন অভাব রইল না। আমার তখন প্রয়োজনও ছিল। সে বুড়ি ঝি গেছে— দিনরাত পরিশ্রম দুশ্চিন্তা আর হোটেলে খাওয়া, এ আর চলছিল না। বয়সও তখন বাবু ধরুন পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁচেছে।

'ভাগ্নী বিপাশা দেখতে খুব ভাল না হলেও একটা আল্‌গা চটক্ ছিল। লেখাপড়াতেও ভাল। রাণুর স্বামী অত্যন্ত খরচে ছিলেন। মার্চেন্ট আপিসের কেরানী, ভরসার মধ্যে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটি—তেমনি দেনাও ছিল বিপুল। কাজেই বিশেষ কিছু টাকাকড়ি নিয়ে আসতে পারে নি। মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে আমাকেই দিতে হয়। সে সামর্থ্য আমার নেই। মানে এতদিনের বিয়ের বাজারে খরচার হিসেব বহুদূর এগিয়ে এসেছে। বিপাশা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বয়সেও আমার ছেলের কাছাকাছি—সে গিয়ে ছেলেকে ধরল, 'এই ভালোদা, আমাকে একটা চাকরি দেখে দে'।

'কোন অসুবিধে ছিল না। বিপাশা গ্র্যাজুয়েট। ছেলে চাকরি দেখে দিল, ওদের আপিসেই, স্টেনোর কাজ। শর্টহ্যাণ্ড জানত না—তবে তাতে আটকাল না, অমার ছেলের তখন আপিসে আরও প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। চাকরি

পাবার পর শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপ-করা শিখিয়ে নিল।

'আমার একটা—ইংরেজিতে যাকে বলে মিসগিভিং—ছিলই। সেটাই অবিলম্বে সত্য হ'ল, মাস তিনেক পরেই ওরা রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করল। বিয়ে হয়ে যাবার পর আমাদের জানাল—বরের বাবা ও মেয়ের মাকে। পার্টি দিল গ্র্যাণ্ড হোটেলে। বলা বাহুল্য কেউই যাই নি আমরা। রাণু তো ঝিকে পর্যন্ত মুখ দেখাতে লজ্জা পেত। বিশেষ একদিন আমার ছেলে যখন 'রঙীন' অবস্থায় এসে শাশুড়িকে উপদেশ দিয়ে গেল—'তোমরাও বিয়ে করে নাও না। এভাবে জীবন কাটিয়ে লাভ কি। কাজিন তো, আইনে আটকায় না।'

'তাও সয়েছিলুম বাবু। বোনটার মুখ চেয়েই সয়েছিলুম। অবশ্য বলবেন, না সয়ে আর উপায় কি, ছেলে কি ভাগ্নী কেউই তো তোমার এক্তেজার নয়। তারা স্বাধীন, টাকা আছে—তাদের আর কি ক'রে শাসন করবে। তা আমিও জানতুম। তবু কিছু করার কথা তখন চিন্তাও করি নি।

'কিন্তু একদিন আমার মাছের রক্তও গরম হয়ে উঠল। সহ্যের সীমা ছাড়াল।

'বিপাশা নিজেই এসে হাজির হ'ল। না, সুখের বিন্দুমাত্র চিহ্নও তার মুখে ছিল না। বরং মনে হ'ল কাঁদতে কাঁদতে তার মুখটাই বিকৃত হয়ে গেছে। অমন রঙ কালি হয়ে গেছে—যেন ধুঁকছে। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল—যাকে বলে ডুকরে কেঁদে ওঠা।

'ভাগ্যে তখন রাণু ছিল না, ষষ্ঠীতলায় পূজো দিতে গিছল।

'কী ব্যাপার রে! চুপ কর্ চুপ কর্। কি হয়েছে কি? অসুখ-বিসুখ ওর?' জিজ্ঞাসা করি। ছেলের নামটাও উচ্চারণ করতে ঘৃণা বোধ হ'ত।

'ক্রমে সবই শুনলুম। ছেলে—কী বলব আপনাকে বাবু—পূর্ণ বিকার-গ্রস্ত, একরকম পাগল বলতে পারেন হয়ত—এসব বইতে পড়ে থাকবেন—আমিও পড়েছি। প্রথম তত বুঝতে পারে নি বিপাশা, ক্রমে এই রোগটা দেখা দিল। প্রতি রাত্রে ওকে বেদম মারে—তবে তার তৃপ্তি।

'গা খুলে দেখাল সে সব। সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর কঠিন আঘাতের চিহ্ন।

'আমার কিন্তু মায়া বা দয়ার চেয়ে রাগটাই হল বেশী প্রচণ্ড। যা মুখে এল তাই বলে গাল দিলুম। 'বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। এখন আমার কাছে এসেছ কেন। আমার ছেলে কেমন তা আমাকে একবার জিজ্ঞাসা

করলেই পারতে। যাও, এখন চলে যাও। মাকে অনেক আঘাত দিয়েছ—আর দিতে দেব না।'

'মাথা হেঁট করেই চলে গেল সে। কিন্তু আমার দিনের আহার রাতের ঘুম কেড়ে নিল। যতই ভাবি ততই মাথা গরম হয়ে ওঠে। বোনকে স্তোক দিই—অন্য কারণ দেখাই কিন্তু আমিও ক্রমশ পাগল হয়ে উঠলুম। ঐ ছেলেকে—আমার স্ত্রীর ঐ অবদানটিকে নিশ্চিহ্ন না করলে চলবে না—আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে না।

'শেষে দ্বিতীয়দিন—মামার দরুন একটা মোটা বাঁশের লাঠি ছিল, সেইটে হাতে ক'রে বেরোলুম। ছোটবেলায় সিমলে ব্যায়াম সমিতির আখড়ায় লাঠি তলোয়ার দুই-ই খেলেছি—অভ্যেস না থাকলেও কোন্ আঘাত মারাত্মক তা ভুলি নি। ওদের বাঁশদ্রোণীর বাড়ি যখন পৌঁছলুম তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পাঁচিল ডিঙোতে হবে ভেবেছিলুম, কিন্তু দেখলুম সদর দরজা খোলা —হাঁ হাঁ করছে। বোধ হয় যে চাকর সেও কোথাও ফূর্তি করতে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চাপা চিৎকার কানে গেছে—'আমাকে একেবারে মেরে ফ্যালো, শেষ করে দাও, আমি আর পারছি না'।

'ওপরে সামনেই ওদের বসার ঘর, তার সঙ্গে শোবার। দেখলুম মেয়েটাকে ফেলে অবিরাম লাথি মারছে আমার ছেলে, 'হ্যাঁ, তাই মারব। মর্ না, মরিস না তো'।

'আমি লাঠি বাগিয়ে এগিয়েছি—ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ রাক্ষসটা আর একটা সাংঘাতিক লাথি মারল। আমি আর থাকতে পারলুম না। সজোরে মোক্ষম মার মারলুম এক ঘা। সেই এক ঘায়েই একটা "কোঁক" এই ধরনের গলার শব্দ ক'রে পড়ল ছেলেটা। আর নাড়ল না, কোন সাড়া-শব্দ নেই।

'তখন মাথারও ঠিক নেই, দৃষ্টিরও স্বাভাবিক শক্তি নেই। তবু খানিকটা দেখে মনে হ'ল—মরেই গেছে। এমন এক ঘায়ে যে মরবে তা জানি না, সত্যিই বলছি বাবু। কিন্তু বিপাশা অত আঘাতেও মরে নি। শুধু তাই নয়, তার মনও ওর মধ্যেই দ্রুত কাজ করেছে। বলে উঠল, 'তুমি চলে যাও মামা, এখনই চলে যাও। আমি বলব, আমি সইতে না পেরে এ কাজ করেছি। এখনই চাকরটা আসবে, তাকে মদ কিনতে পাঠিয়েছে, কোথায় গেছে তা জানি না। যে কোন সময়ে এসে পড়তে পারে। যাও মামা, দুটি

পায়ে পড়ি তোমার'—

'বলতে বলতেই সে লাঠিটা টেনে নিয়ে হাত ধরার জায়গাটা নিজের আঁচলে মুছে—মানে আমার আঙুলের চিহ্নটা মুছে—নিজে বার বার চেপে ধরতে লাগল। তখনও তার মন এমনভাবে কাজ করছে—এ যেন ভাবাই যায় না।

'কিন্তু বাবু তাই করলুম আমি, কাপুরুষের মতো। চলেই এলুম।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেই বলতে শুরু করলে আবার।

'কে পুলিস ডেকেছিল তা জানি না, কী হয়েছিল তাও না। খবর পেয়ে আমরাও গিছলাম বৈকি। আমি আর রাণু। বিচারও একটা হ'ল। বিপাশার কথাই করোনার এবং পরে জজ বিশ্বাস করলেন। ডাক্তারও পরীক্ষা ক'রে বলেছেন নির্মমভাবে মার খেয়েছে মেয়েটা। বেকসুর ছাড়া পেল বিপাশা।

'তারপর তাদের কি হল আমি আর জানি না। খবর নিই নি। সব ছেড়ে নানা জায়গায় ঘুরেছি পাগলের মতো। শেষে প্রায়শ্চিত্তের এই পথটাই বেছে নিয়েছি। যদি এতেই আমার অনিচ্ছাকৃত পাপের শেষ হয়। ছেলে মেরেছি বলে পাপ বলছি না, সেটা গোপন করলুম—মেয়েটার ওপর সে দায় চাপিয়ে—এই পাপ।'

স্মরণীয় দিন

ভোর থেকেই হৈ-হৈ শুরু হয়েছে। শুধু ভোর থেকে কেন—কাল রাত একটা থেকেই। হয়ত সেই জন্যেই বুধনের শরীর আজ এত খারাপ লাগছে। সে কী গোলমাল—শাঁক, হুলু, কাঁসর-ঘণ্টা, 'বন্দেমাতরম্' 'জয় হিন্দ্' 'নেতাজী কি জয়' 'গান্ধিজী কি জয়'—সবগুলো এক সঙ্গে। একটা বিয়ে বাড়ির গণ্ডগোলই অসহ্য মনে হয়, আর এ যেন দেশ-জোড়া বিয়ে-বাড়ি। তাই কি থামল শিগ্‌গির? ওধারে চালিয়েছে রাত তিনটে পর্যন্ত, এধারে পাঁচটা না বাজতে বাজতে আবার শুরু করেছে।

বুধন প্রাণপণ চেষ্টায় জানলা পর্যন্ত এগিয়ে আসে, কতকটা বুকে হেঁটেই। মেঝেটা ঠাণ্ডা লাগে, কেমন যেন শির-শির করে গা, কিন্তু উপায় কি? ঘরটাই ঠাণ্ডা, যেমন অন্ধকার তেমনি স্যাঁৎসেঁতে। তবু এই ঘরের ভাড়া কুড়ি টাকা

মাসে। ওরা বারোজন থাকে এখানে, তিনজন রিক্সাওয়ালা—তাকে নিয়ে ; আর বাকী গোয়ালা আছে, মুটে আছে মেছো আছে। সবাইকারই অবস্থা এখন ভাল কেবল তার ছাড়া। তবু কেউই এ ঘরে শোয় নি কোনদিন, বধুন তো নিজে চিরকাল লোকের বাড়ির রোয়াকে নয়তো রাস্তায় পেভ্‌মেণ্টে শুয়ে কাটিয়েছে, কিন্তু ইদানীং এই গোলমালে আর বাইরে শোবার উপায় নেই, এরই মধ্যে গাদাগাদি ক'রে শোয় সবাই। কারুরই বিছানার বালাই নেই—যে দু'ভাই মাছ বেচে তাদের একটা ছেঁড়া কম্বল আছে, ধনরাজ মুটে একটা তুলোর কম্বল কিনেছে সম্প্রতি, শনিচর আর লছমনের মাদুর আছে—বাকী সকলেরই চট্‌ ভরসা। কারুর ছেঁড়া এবং ময়লা, কারুর বা নতুন একেবারে। শীত এলে গায়ে দেবার ব্যবস্থাও ঐ চট।

কিন্তু তাতে কারুরই কোন অসন্তোষ নেই। এটা তাদের আরাম করার জায়গা নয়, এটা শুধু পয়সা রোজগারের জায়গা। কোন রকমে দিন কাটানো এখানে। দেশে জমি আছে গরু-মোষ আছে কিন্তু সে পর্যাপ্ত নয় বলেই এখানে আসতে হয়েছে, সকলেরই ঝোঁক সেইখানে আরও জমি কিনবে, মোষ বলদ কিনবে—সেখানে ভাল ক'রে ভোজ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যে খুব বেশী স্বপ্ন দেখে সে বৌয়ের জন্য সোনার চুড়ি গড়িয়ে নেবার কথা ভাবে। অবশ্য হ্যাঁ—এখান থেকে, এই ঘর থেকেই বড়লোক হয়ে গেছে বৈকি, শ্যামরতি শিয়ালদার বাজারে মাছ বেচত, হঠাৎ কি ক'রে যোগাযোগ ক'রে নিলে, পেলে কী একটা কণ্ট্রোলের দোকান, তা থেকে এইসব যুদ্ধের ব্যাপারে ঠিকদারী নিয়ে একেবারে লাল হয়ে গেছে। বরানগরে জমি কিনেছে বাড়ি উঠবে শিগ্‌গির। এখন শ্যামরতি সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, হাতে পরে হাতঘড়ি। টিকি ছোট হয়ে হয়ে টেরিতে মিশে গিয়েছে।

তবে বুধনের বরাত তেমন নয়। তার দেশে কিছুই নেই। মাত্র এক বিঘে জমি ভিটে, একটা বলদ গরু পর্যন্ত নেই। বাবা এই বুড়ো বয়সেও পরের ক্ষেতে মজুরী করে। দাদা গিরিধারী দত্তদের বাড়িতে চাকরি করে—বাসন মাজা ঘর ধোওয়া' সব কাজ করতে হয়। ওরা জাতে আহীর, এসব কাজ করলে ওদের জাত যাবার কথা—তবু করতে হয় গোপনে—উপায় নেই। দেশের লোক এখানে ওর বিশেষ নেই, শুধু এই শনিচর, তা ও অবস্থা বুঝে কথাটা গোপন রাখে। শনিচর লোক খুবই ভাল—বুধনও পরের বাড়ি চাকরি করবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিল কিন্তু শনিচরই নিজে জামিন

হয়ে রিক্সা-বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে। বলেছে, 'জোয়ান ছেলে তুই, বাসন মেজে মরবি কেন? রিক্সা টান—হাজার হোক স্বাধীন ব্যবসা, টাকাও ঢের বেশী রোজগার হবে।'

রোজগার হয়েছিল বেশী—ঠিকই। কিছু টাকা সে বাপকে পাঠিয়েও ছিল ওদিকে। বাবার দুধের খুব শখ, একটা গরু কেনবার জন্যে দেড়শ টাকা পাঠিয়েছিল সে থোক্—তাতে অবশ্য কুলোয় নি, পঞ্চাশ টাকা আরও দেনা হয়েছিল গরু কিনতে কিন্তু তাতে বুধনের ভয় ছিল না। সে ঠিক করেছিল নিজে একটুখানি কষ্ট ক'রে দু-তিন কিস্তিতে দেনাটা শোধ ক'রে দেব। দাদা গিরিধারী যা টাকা পাঠায় তাতে সংসার—খরচাই সেখানে কুলোয় না, মা আছে বাবা আছে তার দাদার বৌ আছে তার মেয়ে আছে—আজকালকার দিনে খরচ কি কম? বাবা আর মজুরী খেটে কত পায়? ওরা সকলে বুধনের উপর ভরসা করে বেশী—সেই জন্যই এখনও সে বিয়ে করে নি, অন্তত আর দু'টো বিঘে জমি না কিনে সে বিয়ে করবেও না। ভাল জমি দু'বিঘের দাম কম ক'রেও তিনশ'টাকা। কমদামী জমিও পাওয়া যায় অবশ্য কিন্তু তাতে লাভ কি, অন্তত দশ মণ ধান যে জমিতে না হয়, সে জমি কিনে লাভ নেই। গয়া জেলায় যেখানে ওদের বাড়ি সেখানে তেমন জমির অভাব নেই—ধান বলো, গম বলো, আখ বলো—যা দেবে তাই হবে। ধনরাজদের দেশে অবশ্য বড় গোল-মাল; দারভাঙা জেলায় ওদের বাড়ি, কুশী নদীর দৌরাত্ম্যে কিচ্ছু করবার জো নেই বেচারীদের, কটা আমগাছ আছে তাই ভরসা। তবে শোনা যাচ্ছে—অন্তত ধনরাজ তাই বলে বেড়ায়—কুশী নদীতে শিগ্‌গীরই বাঁধ দিয়ে না খাল কাটিয়ে কী একটা কাণ্ড-কারখানা করা হবে। তা'হলেই ওদের বরাত ফিরবে।

তা সে যার যাই হোক—বুধনের নিজের দেশই ভাল। পোস্তর চাষ করার যদি অনুমতি পাওয়া যেত তাহ'লে ওদের এক বিঘে জমিই যথেষ্ট। এক বিঘে পোস্তর চাষে যা আফিং হয়, তার আয় কি কম? কিন্তু ওরা বড় গরীব, তদ্বির তদারক করতে পারে নি বলে আবগারীর হুকুম পাওয়া যায় নি।

তবে তাতেও দুঃখ ছিল না বুধনের। কলকাতায় এসেছে যখন সে, তখন তার উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে প্রত্যেকেরই নিজের শক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস থাকে। খেটে টাকা রোজগার ক'রে সে জমি কিনবে—দু' বিঘে তিন বিঘে, পাঁচ বিঘে। পাঁচ বিঘে জমি কেনা এমন কিছুই কঠিন কাজ নয়, ছ-সাতশ টাকা হ'লেই হয়ে যায়। পাঁচ বিঘে জমি কেনার পর আর সে এখানে থাকবে

না, দেশে গিয়ে বিয়ে-থা ক'রে চাষবাস ক'রবে। হ্যাঁ—আরও একটা খরচ আছে অবশ্য, বলদ। তা সে-ই বা আর কত, একজোড়া চারশ টাকাই নিক্ —বড়জোর ভাল হ'লে পাঁচশ। আর না হয় আরও শ'চারেক টাকা দিয়ে একটা মোষ কিনবে, মোষের দুধ হয় বেশী, ছেলেপিলে খেয়েও ঘি করতে পারবে সে। একটা পরিবারের আর কি লাগে, সম্পন্ন গৃহস্থের মতো চালাতে পারবে সে।

বাস্তবিক, এই হাজার দেড়েক টাকা জমতে দেরিও হ'ত না—যদি দিনকাল আগের মতো থাকত। সে খেটেছে অসুরের মত, নিজের ভালো খাওয়া কিম্বা ভালো থাকার কথা একবারও ভাবে নি। দেশে দশটি ক'রে টাকা সংসার খরচের জন্যে পাঠিয়ে বাকী সব টাকাই সে জমাত। মধ্যে, খালি দাদার মেয়েটার অসুখের জন্যে কুড়িটা টাকা বেশী পাঠাতে হয়েছিল। তবু তাতেও দুঃখ ছিল না ওর, আগে আগে এক বেলায় মালিকের প্রাপ্য দু'টাকা দিয়েও দেড় টাকা দু'টাকা রোজগার করেছে সে অনায়াসে। এমন কি এক-একদিন বেশীও। তার ওপর বিকেলে যার ঠিকা, তার অসুখ করলে ডবল খাটুনিও খেটেছে সে—পয়সার জন্যে শরীরের তোয়াক্কা করে নি। শনিচর অবশ্য সাবধান করেছিল অনেকবারই, খাওয়া আর বিশ্রাম, দুটোই দরকার শরীরের—এ কথাটা বারবারই সে বলেছে কিন্তু বিশ্রামের কি দরকার সে কথাটা এতদিন বুধন বোঝে নি মোটে। ক্ষিদে পেলে শরীর ঝিমিয়ে আসে সেজন্যে খাওয়া দরকার—বিশ্রাম কি জন্যে? কৈ কষ্ট তো সে অনুভব করে নি কখনও, তার পা তো কোনদিন ভেরে আসে নি, বসে থাকবে কেন সে শুধু শুধু? ঘুম অবশ্য রাত্রে দরকার ঠিকই—তবে একটা রাত না ঘুমোলে কি হয়? এমনিতেই তার রাত্রে ঘুমোতে ইচ্ছে করত না, কাজ না থাকলেও সে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত এদের সঙ্গে হৈ-হৈ করেছে, ডুগি বাজিয়ে গান গেয়েছে সকলের সঙ্গে। রাত আশ্চর্য, রাত ভারি মিষ্টি। রাতে কি ঘুমোতে ইচ্ছে করে? বিশেষ ক'রে রাত্রে রিক্সা চালাতে তার ভারি ভাল লাগে। রোজগারের ঠিক নেই, প্রায়ই কম রোজগার হয় বলে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিনের ঠিকা নিয়েছিল, নইলে দিনে কি আছে? রাস্তা তেতে আগুন, পিচ গলে পায়ে লেগে যায়। গাড়ি ঘোড়া মোটরলরীর ভিড়ে মাথার মধ্যে হয়ে যায় গোলমাল! অথচ রাত্রে এ সব কিছু নেই। মিষ্টি হাওয়া দেয়, পথ ঠাণ্ডা থাকে, ভিড় নেই কিছু না। বেশী রাত্রে যারা গাড়ি চড়ে মেজাজও তাদের খুশী থাকে, মধ্যে মধ্যে

বকশিশ চাইলে পাওয়া যায়। আর চুপ ক'রে বসে থাকতেই বা কি আরাম! সব বাড়িগুলো নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'দিকে, আলোগুলো জ্বলছে নিঃশব্দে আর সামনে কালো কালো পিচ্ বাঁধানো রাস্তাগুলো পড়ে আছে কি এক রকমের অজানা অজগরের মতো, বসে থাকতে থাকতে যেন নেশা লাগে। দিনে বেশীক্ষণ যাত্রী না পেলে বসে থাকতে বিরক্তি বোধ হয় কিন্তু রাত্রে চলা আর বসে থাকা—দুই-ই আরামের।

নাঃ—চলছিল ভালই। কাজটা তার ভাল লেগেছিল খুব। খাওয়া অবশ্য ভাল জুটত না ঠিকই, কিন্তু সবাই যা খায় সে-ও সে-ও তো তাই খেয়েছে। সকালে তেলেভাজা ডালপুরী কিংবা মালপো কিংবা ফুলুরী আর চা আর দুপুরবেলা দেড়পোয়া ছাতু। বিকেলে কোনদিন ছোলাভাজা কোনদিন চাঁপের খই—কোন কোন দিন কিছুই খেত না। রাত্রে ভাত। সেটা এখানে সবাই মিলে-মিশে রান্না হয়, ভাত ডাল কিংবা ভাত আর একটা তরকারি ; এক-একদিন মাছও জুটে যায়। যারা মাছ বেচে—তিন-চারদিন বরফ দেবার পর যখন মাছ নরম হয়ে আসে তখন সস্তায় ছাড়ে তারা। কোন কোনদিন ধন-রাজও নিয়ে আসে মাছ, মুফ্‌তি—মাছের মোট বওয়ার বকশিশ হিসাবে। একই জেলের তিন চার মোট মাছ বইলে কুঁচো মাছ এক আধমুঠো সে দেয় কিংবা এক আধটা কচি পোনা।···এর বেশী কি খায় মানুষ, দরকারই বা কি? সবাই তো এই খেয়েই ভাল আছে। সে-ও তো সুস্থই ছিল, দেহের বলও তো কৈ কমেছে বলে টের পায় নি একবারও। কী যে পোড়া রোগ তার ধরল, তার পর থেকেই শুরু হ'ল তার যা কিছু গোলমাল।

ভগবান যেন একসঙ্গে তাকে দু'দিক থেকে মারলেন। ওধারে হাঙ্গামা বাধল বছরখানেক আগে থেকে। এক বছরই তো? ঠিক এক বছর হ'ল আজ। কত রিক্সাওয়ালা মারা গেল তার ঠিক নেই, কত রিক্সা নষ্ট হয়ে গেল। তবু তো বাপ-মার আশীর্বাদে তার কোন অনিষ্ট হয় নি। প্রাণ আছে, গাড়িও আছে। কিন্তু কিছুটা ক্ষতি হ'ল বৈ-কি! কত রাস্তায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, কত দিন গেল সাঁঝবাতি আইনে (দিনের বেলাতেও যে সাঁঝ-বাতি আইন হয়—এমন কথা সে এর আগে শোনে নি কখনও), কতদিন হাঙ্গামা বাঁধার জন্যে পালিয়ে এসে বসে থাকতে হ'ল বাসায়। তার উপর সন্ধ্যে থেকে সাঁঝ-বাতি আইন চলার জন্যে রাত্রে যার ঠিকা তাকেও এক-একদিন ছেড়ে দিতে হচ্ছে! নইলে সে খায় কি? মালিকই ডেকে

বললেন নিজে। কথাটাও হক্‌দারী কথা। এমনি ক'রে রোজগারের সময় আর সুবিধা সব এল কমে, অথচ তাদের ভাড়া এমন কিছু বাড়ল না। আগে যা বেড়েছিল, জিনিসপত্রের দাম আর ঠিকার টাকা বাড়াবার জন্যে, প্রায় তা-ই রইল, হাঙ্গামার কোন সুবিধাই ওরা পেল না। কিন্তু মুটেদের কত সুবিধা হয়ে গেল। একটু যে সাহস করতে পারে তারই পয়সা। ঐ তো ধনরাজ মুটে, মুসলমান ফলওয়ালা কিংবা দপ্তরীর মোট বয়ে তিন আনার জায়গায় আট আনা ক'রে পাচ্ছে। এমন কিছু বিপদের ব্যাপারও না—দপ্তরী পাড়ার মোড়ে নয় তো শিয়ালদা স্টেশনে তাদের মুটে এসে মোট তুলে দেয়, সেখানে থেকে হিন্দু পাড়ায় যেতে হয় ওকে। মুসলমান পাড়ায় ঢুকতে হয় না, সেখানে থেকে মোটও নিতে হয় না বরং তাদের চেক্ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বিলের তাগাদা ক'রে এক টাকা ক'রে দস্তুরী পায় সে। একখানা চিঠি হিন্দু-পাড়ায় পৌঁছে দিলেই চার আনা পয়সা। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর কারবার বন্ধ হয় নি—বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়, অথচ যাওয়া আসা বন্ধ ; আর তারই সুযোগ নিয়ে ধনরাজের মতো ক'টা মুটে ফুলে ফেঁপে উঠল। মরে নি যে তা নয়—দু'একজন একটু বেশী লোভ করতে গিয়ে মরেছেও—কিন্তু ধনরাজের মতো হুঁশিয়ার যারা তাদের তো কিছুই হয় নি।

সে-ও না হয় মোটই বইত রিক্সা ছেড়ে, তাতে কোন লজ্জার কারণ নেই, যদি তার শরীরটা ভাল থাকত। কী যে বেয়াড়া রোগ তার ঢুকল! ঘুষঘুষে জ্বর, অল্প অল্প কাশি আর বুকে ব্যথা। এ আর যাচ্ছে না কিছুতে। ক্রমেই যেন দুর্বল ক'রে ফেলছে। কত টোট্‌কা খেল, পাঁচনও খেয়েছে—তবু কিছুতে জ্বর যাচ্ছে না। যা-ও বা রোজগারের দিন পায়—অর্ধেক দিন বেরোতে পারে না কাজে। মালিক প্রথম প্রথম কিছু বলেন নি কিন্তু প্রায়ই কামাই হওয়ায় রাগারাগি করেছেন। অগত্যা ওকে রাতের ঠিকাদারকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যেদিন পারে বেরোতে সেদিন সে বেরোয়—নইলে ওকে ছেড়ে দিতে হয়। তার দরুন সে এক পয়সাও পায় না। চোখের সামনে দিয়ে তারই রিক্সা নিয়ে গুল্লু বেরিয়ে যায়, বসে বসে দেখে সে। উপায় কি?

কবে যে ভাল হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারখানায় সে গিয়েছিল, পাড়ার ডাক্তারের কাছে। দু-এক শিশি দাওয়াই যে সে পয়সা খরচ ক'রে খেতে পারে না তা নয় কিন্তু ডাক্তারবাবু কোন দাওয়াই দেন নি। শুধু পরামর্শ দিয়েছেন হাসপাতালে যেতে। রোগ নাকি শক্ত, সময় লাগবে, পয়সা লাগবে

গের। তার চেয়ে হাসপাতালে যাওয়াই ভাল। হাসপাতালের নাম শুনলেই বুধনের ভয় করে, সেখানে গেলে নাকি কেউই বাঁচে না, শুধু শুধু মেথরের ছোঁওয়া ডোমের ছোঁওয়া খেয়ে জাত যায়। না, হাসপাতালে সে যাবে না। এই তো সামান্য জ্বর, আর একটু কাশি—এর জন্যে হাসপাতাল যাবে কেন? দেশে গেলেই সেরে যাবে তার অসুখ, দেশে যাবার মতো ক'টা টাকা জমাতে পারলে দেশেই চলে যাবে সে। রোগটা একটু কমলেই দু'চার দিন খেটে নেবে, টাকা-কুড়ি হাতে থাকবে আর গাড়ি ভাড়া—এই যথেষ্ট।

বাইরের গোলমাল ক্রমেই বাড়ছে। জানলার মধ্যে দিয়ে উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিল সে। না, কিছুই দেখা যায় না। কোনমতে বেরিয়ে গলিতে বসতে পারলেও মোড়ের এক ফালি বড় রাস্তা দেখা যায়। কাশির একটা ধমক সামলে নিয়ে অতি কষ্টে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, দুরজায় শেকল তুলে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু এখান থেকেও ভাল দেখা যায় না—সরু গলির মধ্য দিয়ে যে-টুকু বড় রাস্তা নজরে আসে, তাতে ভাল ক'রে বোঝা যায় না কিছুই। একটু একটু ক'রে থেমে থেমে, সে গলির মোড়ে এসে পেভমেণ্টের ওপরই বসে পড়ল।

হ্যাঁ—উৎসব বটে। দলে দলে ছেলেরা যাচ্ছে ঢাক বাজিয়ে, প্রত্যেকের পরনে পাজামা, খদ্দরের শার্ট আর মাথায় গান্ধী টুপি। সামনে যারা যাচ্ছে তাদের হাতে তিনরঙ্গা নিশান একটা ক'রে। বড় ছেলের দল আগে, তার পর মাঝারি, তারপর ছোট। একটা দল এমনি ক'রে চলে গেল, আবার আর একদল, এমনি সার বেঁধে কদম ফেলে ফেলে এগিয়ে এল। এরা হয়ত ভিন্ন পাড়ার দল কিংবা অন্য কোন ইস্কুলের। সবাই বাড়িতে বাড়িতে তিনরঙ্গা নিশান টাঙ্গিয়েছে, কাগজের শেকলে আর ফুলে সাজিয়েছে—কাদের সব ছবি তার সঙ্গে। এর ভেতর দু'জনকে চেনে বুধন, মহাত্মাজী আর নেতাজী। নেতাজী মগের মুলুকে আংরেজদের সঙ্গে ভা-রি লড়াই লাগিয়েছিলেন—বহুত জব্দ করেছিলেন ওদের।

ঐ দেখ, বাহা রে বাহা, এরা আবার কারা এল! এ খুকীরা কি ইচ্ছে ক'রে অমনি শাড়ি পরেছে? হ্যাঁ, তাইতো! আগে চার চার ক'রে আট থাক মেয়ের পরনে জাফরাণী রঙের শাড়ি তারপর আট থাক্ সাদা, আবার আট থাক্ সবুজ। ওদের হাতের ঐ নিশানের মতই জ্যান্ত, চলন্ত নিশান হয়ে চলেছে তারা।···আবার এল একদল লোক ঢাক বাজাতে বাজাতে। কী হৈ

হৈ, এত গোলমালে কানে যেন তালা লাগে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া হয় নি—আজও এত বেলা পর্যন্ত অমনি আছে। কিন্তু কী খাবে, তার হাতে পয়সা-কড়ি সব শেষ। যখন একটু ভাল থাকে তখন ওরাই দয়া ক'রে চারটি চারটি ভাত দেয়—অসুখ করলে চুপ-চাপ পড়ে থাকে। শুক্‌নো মুড়ি জোটে কোনদিন, কোনদিন তাও না। ওর ভাই এসে সেদিন একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল, সেটা সে শনিচরের হাতেই দিয়েছে—এমনি আর কত খাওয়া যায়? পরশু গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু কোন-মতে জমার টাকাই তুলতে পারে নি। শরীর খারাপ ছিল, দশ মিনিটের পথ আধ ঘণ্টা লেগেছে তার—গাহক বিরক্ত হয়েছে।···

বাপরে বাপ, একটু কম পড়েছিল পাঁচ মিনিট, আবার কি হল্লা! ব্যাপারটা কি? কী হ'ল তাই যে বুঝতে পারছে না। সে জিজ্ঞাসা করেছিল ওর ঘরের ভাই-বেরাদারদের, তারা ভাল বলতে পারে নি। শুধু বলেছে যে আজাদী এসেছে কাল। কিন্তু সেটা আবার কি? ওদের বাড়িওয়ালার ছেলেকেও প্রশ্ন করেছে সে—বাঙালীর ছেলে বহুত ভাল জানে শোনে—সে বলেছে স্বাধীনতা আসছে। হিন্দী ক'রে বলেছে 'স্বতন্ত্রতা'! 'আজাদী'ও যেমন দুর্বোধ্য তার কাছে 'স্বতন্ত্রতা'ও তেমনি। শেষে আজ সকালে ধনরাজ তাকে খবরটা দিয়েছে; আংরেজরা চলে যাচ্ছে মুলুক ছেড়ে, মহাত্‌মাজীর আর পণ্ডিতজীর রাজ মিলে গেছে। কথাটা ওর বিশ্বাস হয় নি। আংরেজদের সে চেনে, বাবার মুখে দাদীর মুখে সে অনেক কাহিনী শুনেছে ওদের। এতবড় ফেরেববাজ আর জবরদস্ত জাত আর নেই। এই তো এত ভারী লড়াই গেল, কৈ কেউ হারাতে পারলে ওদের? আর এ লড়াই না কিছু না—অমনি ওরা চলে গেল দেশ ছেড়ে? মহাত্‌মাজীকে যে 'রাজ' দিয়ে গেল—তিনি তো ঐ বেলেঘাটায় গনিমিঞার বাগিচায় বসে। রাজ কৈ পেলেন তিনি? ওসব ঝুট বাত—সে জানে।

আঃ—আর এই কাল থেকে হল্লা শুরু হয়েছে বটে একটা, 'হিন্দু মুসলিম এক হো!' এত পয়সা ওরা পাচ্ছে কোথায়? লরী তো ঘুরছে কাল রাত থেকে সমানে। তাই কি একটা দুটো? অমন দু-তিনশ লরী বোধ হয় বেরিয়েছে এ পাড়াতেই। ছেলেবুড়ো হিন্দু-মুসলমান বোঝাই হয়ে ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে সমানে—ওদের ক্ষিদেও পায় না, আশ্চর্য! খুব তামাসা মিলে গিয়েছে ওদের।

সহসা বুধনের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঐ তিনতলা বাড়ির দিদিমণি, বুধন যার নাম দিয়েছে লখিয়া—বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, সত্যি। বুধনের মনে হয় লখিয়া দিদিমণির মতো সুন্দর আর নেই। মাজা রং, বড় বড় চোখ, আর লম্বা চোখের পাতা—তাতে কাজল টানা, মিশ কালো এক বোঝা চুল—আর কেমন ফিট্‌ফাট। বয়স কত হবে তা বুধন বুঝতে পারে না—কুড়ি একুশ কিংবা সতেরো আঠারো, ওর গুলিয়ে যায় আন্দাজ করতে গেলে। কখনও মনে হয় ছেলেমানুষ, কখনও মনে হয় ঢের বড় সে বুধনের চেয়ে। নামটা সে শুনেছে কিন্তু বুঝতে পারে না। কী একটা বলে যেন ডাকেন বড়বাবু মানে ওর বাবা—কিছুতেই উচ্চারণ হয় না বুধনের। তাই তো সে লখিয়া নাম দিয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল ওর জীর্ণ বুকের মধ্যে থেকে। লখিয়া ওর বাঁধা খদ্দের ছিল এক কালে। কী করে সে তা জানে না বুধন, পড়ে কিংবা নোক্‌রি করে কিংবা এমনি ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রিক্সা চড়ে খুব। ওকে নিয়ে সে পৌঁছে দেয় নি কলকাতায় এমন রাস্তাই নেই। দূর পাল্লা পর্যন্ত গিয়েছে সে, এখান থেকে শ্যামবাজার, ওধারে খিদিরপুর। লখিয়া আশ্চর্য হয়ে যেত ওর ক্ষমতা দেখে। ওর সেই স-প্রশংস বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বুধনের বুকটা আরও ফুলে উঠেছে যেন, পায়ের পেশীতে পেয়েছে আরও ক্ষমতা।

ওর মনে হ'ত এমন গাহককে টেনে সুখ আছে। হাল্‌কা ওজন কিন্তু সেজন্যেও নয়—কেন যে তাকেই কেবল টানতে ইচ্ছে করত তা বুধন বোঝে না; তবে এটা সে জানে যে পাছে লখিয়া আর আর কারুর রিক্সায় যায় কিংবা শেষ পর্যন্ত বাস-এ চড়ে এই ভয়ে সে ভাড়া অনেক কম ক'রে নিয়েছে তার কাছ থেকে। মনকে সে বুঝিয়েছে, যে বারো মাস ওর রিক্সা চড়ে—ওর বাঁধা খদ্দের, তার কাছ থেকে কিছু কম নেওয়াই উচিত। নইলে বারো মাসের গাহক থাকবে কেন?···লখিয়াও ওকে পছন্দ করত খুব, ওকে পেলে আর কারুর রিক্সায় সে চড়ত না, কখনও কখনও সে আগে থাকতে ওকে খবর দিয়ে রাখত—কখন তার রিক্সা দরকার হবে। সে-সব সময়ে বুধন কিছুতেই অন্য ভাড়া নিত না, ডবল পয়সা পেলেও না। এ নিয়ে তার দেশোয়ালী ও ঘরের লোকেরা অনেক ঠাট্টা করেছে কিন্তু সে কোন কথায় কান দেয় নি। এটুকু না করলে খদ্দের টিকবে কেন? সে তো ইচ্ছা করলেই অন্য রিক্সা নিতে পারে—রিক্সার অভাব আছে কিছু? সে যখন তাকে খোঁজে তার মুখ চায়,

তখন বুধনও খাতির করতে বাধ্য ওকে। পয়সাটা এমন কিছু বড় জিনিস নয়—ইমানটা বড়, ভালবাসাটা বড়।

লখিয়া ওকে সত্যিই স্নেহ করত। অন্তত বুধনের তাই মনে হয়েছে। এক দিন কী একটা জরুরী কাজ ছিল দিদিমণির। তাকে বেরোতে দেখে বুধন অন্য দিনের মতোই হাসিমুখে এগিয়ে গেছে রিক্সা নিয়ে কিন্তু লখিয়া ঘাড় নেড়ে বলেছে, 'আমায় বহুত জল্‌দি যেতে হবে রে—আজ ট্যাক্সি চাই।'

বুধন প্রশ্ন করেছে, 'কাঁহা জাইয়েগা আপ?'

'চৌরঙ্গী।'

চৌরঙ্গী! দীর্ঘ পথ বটে। তবু বুধন ইতস্তত করে নি, শুধু জেনে নিয়েছে ক'মিনিট হাতে আছে। তারপর জিদ ক'রে ও লখিয়াকে গাড়িতে তুলেছে। সেদিন ভগবান যেন জোরও দিয়েছিলেন ওর পায়ে অসুরের মতো। ঘোড়া কি, ঘোড়ার চেয়ে ও জোরে ছুটেছে—ট্যাক্সি-মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সেদিন অবশ্য তার পুরস্কারও সে পেয়েছিল, লখিয়া একটা গোটা টাকা ব্যাগ থেকে বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে হেসে বলেছিল, 'বহুত আচ্ছা!' তারপর রিক্সা থেকে নামতে গিয়ে শাড়ির আঁচল পায়ে বেধে পড়ে যাচ্ছিল—ওর কাঁধটা ধরে ফেলে সামলে নেয়। ওর লোহার মতো পেশীবহুল সবল কাঁধ—পরিশ্রমে উষ্ণ আর ঘামে পিছল—ছেড়ে দেবার পর একটু বিস্মিতভাবেই তাকিয়েছিল লখিয়া, বোধ হয় প্রশ্ন করতে চেয়েছিল, 'তোর গা কি লোহার তৈরী?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু বলে নি।

তা হোক—সেদিনের সে স্পর্শটুকুর কথা বুধন জীবনে ভুলবে না। এ কোন দিন সে কল্পনা করে নি, তবু তার তরুণ সুস্থ মন কামনা করেছে বৈকি, একটুখানি স্পর্শ ঐ কোমল হাতের। আজও সেদিনের সে আকস্মিক সৌভাগ্যের কথাটা ভাবলে ওর কাঁধের সেই জায়গাটা কেমন যেন গরম হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ গাহককে সে একচেটে করতে পারে নি, ইদানীং প্রায় তার শরীর খারাপ যায়, তাছাড়া কোনদিন বেরোতে পারলেও আগের মতো গতি আর তার থাকে না। কাজে দেরি হয়ে যায়, পিছনের রিক্সাগুলো পাশ কাটিয়ে চলে যায়—মধ্যে মধ্যে ওকে হয়ত রিক্সা থামিয়ে দম নিতে হয়। লখিয়া তাতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে—ইদানীং আর উঠতে চায় না। তাতেই সন্দেহ হয় যে আগে সে রোজ ওর গাড়িতে চড়ত সুবিধার জন্যই, ওর প্রতি স্নেহ-

বশত নয়। তবু মনকে সে সান্ত্বনা দেয়, কী করবে, কাজের ক্ষতি হয় বলেই তো। একটু সুস্থ হয়ে যদি আসতে পারে সে দেশ থেকে তো দেখিয়ে দেবে লখিয়াকে বুধন বুধনই আছে।

লখিয়াকে দেখে আজ বুধন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। উৎসবের সুর তার বুকেও লেগেছে বৈকি, তাকেও উন্মনা ক'রে তুলেছে। এমন দিনে কিছুতেই বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে, কোন মতে এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে চায় মন। আর কিছু না হোক্—শুধু ঐ জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারলেও ভাল লাগে!

আচ্ছা, আজ একবার লখিয়াকে নিয়ে ঘুরে এলে কি হয়?

আসতে চাইবে না? যদি এমনি সে চড়ায়, পয়সা না নিয়ে? এই-তো কত লোক মজা দেখবার জন্যে যাচ্ছে রিক্সা ক'রে—আজ তো ঘুরে বেড়াবারই দিন। গুল্লু ঐ মোড়েই আছে, সে দেখেছে কোথা থেকে একটা ক্ষেপ দিয়ে ফিরে এল, বুধন বললে কি আর ঘণ্টাখানেকের জন্যে গাড়ি ছেড়ে দেবে না? তা দেবে, লোক খারাপ নয় গুল্লু।

সে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে গেল তেতলা বাড়িটার দিকে। খাওয়া নেই বটে কাল থেকে, তবু শরীর যেন অনেকটা সুস্থ লাগছে।

সেলাম করে বললে, 'কঁহি জাইয়েগা মেম্‌সাব?'

লখিয়া যেন একটু পেছিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'না।'

'চলিয়ে না—' কণ্ঠে যেন অনুনয়ের সুর বুধনের, 'হাম আভি লাতা হায় গাড়ি, এক মিনিট্‌মে লাবেগা।'

'না না, দরকার নেই।' একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলে লখিয়া।

তবু ইতস্তত ক'রে বুধন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে কথাটা, 'আজ আজাদীকে রোজ হ্যায়, চলিয়ে থোড়া ঘুমায়কে লে আয়েগা। কেরায়া মৎ দেনা—'

'নেহি নেহি, তুম যাও!'

লখিয়া আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

ওর পাশে আর একটি যে মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে নীচু গলায় প্রশ্ন করলে, 'তুই তো রিক্সায় যাবি বলছিলি, তবে এমন অফার ছেড়ে দিলি যে?'

'ওর চেহারা দেখছিস না! কিছুদিন থেকে দেখছি ঐ রকম। I suspect

T. B., ওকে avoid করাই ভাল।'

'বেচারী! তোকে রিক্সায় চড়াবার কি একান্ত ইচ্ছে ওর!...বোধ হয় তোর—' কথাটা শেষ করার আগেই লখিয়া তার গাল টিপে দিয়ে বলে, 'আস্পদ্দা! চুপ কর পোড়ারমুখী!'

ওদের কথা বুধন বুঝতে পারে না তবে খানিকটা যেন কি অস্পষ্টভাবে সন্দেহ করে।

ওর কি অসুখ তা হ'লে খুব খারাপ, তা হ'লে কি আর সারবে না? লখিয়া কি সেই ভয়েই ওর গাড়িতে চড়ে না?

সে ধীরে ধীরে আবার এসে পেভ্‌মেণ্টে বসে পড়ে। কাশি আর জ্বর—আর কেমন যেন একটা দুর্বলতা। এটুকু সারবে না? পাগল। কুড়ি টাকাতেও তার দরকার নেই। দশটা টাকা হাতে এলেই সে চলে যাবে দেশে। শনিচরের কাছে ধার চাইতে তার লজ্জা করে, ওরাই তো বলতে গেলে খাওয়াচ্ছে। দাদার মাইনের টাকার ওপর ওদের সংসার চলে—তাও চাওয়া সম্ভব নয়। না, সে নিজেই রোজগার ক'রে নেবে, যেমন ক'রে হোক—এই পনেরোটা টাকা।

ক্রমে বেলা বাড়ে। প্রভাত থেকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ—দিন এক সময়ে শেষ হয়ে আসে। রাস্তায় জনস্রোতের যেন ছেদ নেই, উৎসাহ কারুর একটু কমে নি। দুপুরে যেটা সামান্য পাতলা হয়ে এসেছিল—সন্ধ্যায় সেই ভিড় আরও ঘন হয়ে উঠল। কত লোক যে বুধনকে মাড়িয়ে গেল, কত লোক যে ধাক্কা মারলে তার হিসেব নেই। লরি বোঝাই লোক তখনও তেমনি চেঁচাচ্ছে 'হিন্দু মুসলমান এক হো!' 'মহাত্‌মাজী কী জয়!' 'নেতাজী কী জয়!' ঘরে ঘরে আলো, ট্রাম বাস লোকের ভিড়ে ভেঙে পড়ছে। স্বাধীনতার দিন আজ, আজাদীর দিন—এই স্মরণীয় দিনটিকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করবার কি আপ্রাণ চেষ্টা সবাইকার! উৎসবের এতটুকু অঙ্গহানি না হয়—উৎসাহে না কোথাও ভাঁটা পড়ে।

বুধন সন্ধ্যার পরও তেমনি বসে রইল। বাসায় হয়ত ওরা এতক্ষণ এসে গিয়েছে। ভাত রান্না শেষ হয়ে এল বোধ হয়। তবু ওর উঠতে ইচ্ছে করে না। জীবনের স্রোত, আনন্দের স্রোত ওর সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ও সেই দিকে চেয়ে থাকে আর ঠিক কি কারণে

এই উন্মত্ততা তাই বোঝবার চেষ্টা করে। স্বাধীন কারা হ'ল—মুক্ত কারা হ'ল —আজাদীতে কার কি সুবিধে হ'ল, কথাটা কিছুতেই ওর মাথায় যায় না। ইংরেজ থাকলে কি অসুবিধা হচ্ছিল তাও সে জানে না—সত্যি চলে গেল কিনা, গেলেই বা কি সুবিধা হবে তাও বোঝে না। শুধু বিহ্বল, মূক-বিস্ময়ে বসে বসে লক্ষ্য করে আনন্দের এই উন্মত্ত সমারোহকে।

আর ভাবে, কবে সে একটু সুস্থ হয়ে অন্তত পনেরোটি টাকা উপার্জন করতে পারবে!

প্রতিশোধ

আমাদের যোগেন পণ্ডিত মশাইয়ের মাথার ঠিক আছে এ অপবাদ অবশ্য কখনও শত্রুতেও দেয় নি, তাই বলে তিনি যে এমন কাণ্ড ক'রে বসবেন, তা-ই বা কে ভেবেছিল। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য! গ্রামে আগেকার দিনে তাঁকে পাগলা পণ্ডিত বলে লোকে উল্লেখ করত—নামটা এতদিনে ঠিক সার্থক হ'ল।

উত্তর মালিহাটা হরসুন্দরী গোবিন্দরাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্মের দিন থেকেই পণ্ডিত মশাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—বরং বলা যায় যে তিনিই এর জন্ম দিয়েছিলেন। শুধু ইংরেজীর লোক নন ব'লেই হেডমাস্টার হ'তে পারেন নি, হেড-পণ্ডিত হয়ে ছিলেন।

এম.এ.-তে প্রথম হয়ে যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাংখ্য-বেদান্ত-কাব্যতীর্থ সরকারী শিক্ষা বিভাগেই বড় চাকরি পেয়েছিলেন, সেখানে টিকে থাকলে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মাইনে বেড়ে এতদিনে মোটা পেন্‌সন নিয়ে আরাম করতে পারতেন কিন্তু নিতান্ত গ্রহ বিরূপ তাই এমন দুর্বুদ্ধি হ'ল—অসহযোগ আন্দোলনের সময় চাকরি ছেড়ে বাড়িতে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য বাড়ির সবাই এতে ছি ছি ক'রে উঠেছিল। তখনও ওঁর বাবা বেঁচে ছিলেন, তিনি স্পষ্টই মুখের ওপর বলে দিলেন, 'এতদিন পড়ালুম আবার এখনও বিধবা মেয়ের মতো বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াব—সে আমি পারব না।'

কথাটা পণ্ডিত মশাইয়ের প্রাণে বড় লেগেছিল। তিনি সেইদিনই দেশ ও ভিটা ত্যাগ ক'রে এই উত্তর মালিহাটায় চলে এলেন, তারপর আর একবারই মাত্র বাড়ি গিয়েছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধের সময়। মালিহাটার এক বড় ব্যবসায়ীর

ছেলে ছিল তাঁর সহপাঠী। সেই সূত্রে তিনি আগেও কয়েকবার এখানে এসে-ছিলেন। যখনই আসতেন তখনই গ্রামের অবস্থাটা তাঁকে বড় পীড়া দিত। কয়েকটি মাড়োয়ারী মহাজন এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেলের ও ধানভানার কল বসিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন কিন্তু গ্রামের অধিবাসীদের দিকে তাঁরা কখনও ফিরে চান নি। অস্বাস্থ্যে আর অশিক্ষায় তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। ম্যালেরিয়া তো তুচ্ছ, এমন রোগ নেই যা এখানে মহামারীরূপে দেখা দিত না। প্রত্যেকটি বাড়ির প্রত্যেকটি লোককে সহজ অবস্থাতে দেখলেও মনে হত মুমূর্ষু। ভাঙাবাড়ি, চালে খড় নেই, পরনে শত-ছিন্ন কাপড় ও ততোধিক ছেঁড়া জামা, মুখের চেহারা পাণ্ডুর শুষ্ক—এই হচ্ছে সেখানকার সাধারণ লোকের মোটামুটি পরিচয়। পেট-মোটা, হাত-পা কাঠি, চুল পাতলা ও চোখ হল্‌দে—এ তো প্রায় সবাইকারই। অথচ, সব চেয়ে দুঃখের হ'চ্ছে এই যে—এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়ও তারা খোঁজে না। যতদিন পারে ঐ সব কলে চাকরি করে, যে কদিন শয্যাশায়ী থাকে সে কদিন রোজগারই হয় না। জমি অর্ধেক চাষ হয়, অর্ধেক অনাবাদী পড়ে থাকে। মহাজনদের কল চালাবার অসুবিধা হয় বলে জনকতক ক'রে হিন্দুস্থানী মজুরও আনিয়ে রেখেছেন—তারা একটা জায়গায় বস্তি ক'রে থাকে, ফলে গ্রাম আরও নোংরা, আরও ধূলিমলিন হয়ে ওঠে।

মালিহাটার কথাটা বরাবরই যোগেন পণ্ডিত মশাইয়ের মনে ছিল, তিনি বন্ধুত্বের সূত্র ধরে পৌঁছে সোজা ঐ মহাজনদেরই শরণাপন্ন হলেন। বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁরা বহু পয়সাই এ গ্রাম থেকে করেছেন—তার প্রতিদানে কিছু খরচ করা উচিত। শিক্ষা না পেলে এরা মানুষের মতো বাঁচতেও পারবে না। তাছাড়া তাঁদেরও তো ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের শিক্ষা দেবারই বা কি ব্যবস্থা করছেন তাঁরা?

মাড়োয়ারীরা বুঝলেন। একজন মহাজন তখনই দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন—অবশ্য শর্ত এই যে তাঁর বাবা গোবিন্দরাম কানোড়িয়ার নামটা ওর মধ্যে থাকা দরকার! উৎসাহিত পণ্ডিত মশাই আঙুলে পৈতা জড়িয়ে গেলেন জমিদারের কাছে, তাঁর দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিলই, তিনি জমি দিলেন, কিছু টাকাও। তবে একটা কথা বলে দিলেন—তাঁরও মায়ের নামটা ঐ সঙ্গে থাকা চাই। পণ্ডিত মশাই দুটো নাম জুড়ে সমস্যার সমাধান করলেন।

ইস্কুল-বাড়ি উঠল, কমিটি হ'ল। হেডমাস্টার এলেন ইংরেজী জানা লোক,

পণ্ডিত মশাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে হোস্টেলের একপ্রান্তে একটি মাটির ঘর দখল ক'রে বসলেন। তাইতেই তিনি মহা খুশী।

কিন্তু যত পরিশ্রমই করুন আর ইস্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতই মাথা ঘামান—একটি কাজ তাঁর কখনও বন্ধ থাকে নি, সেটা হ'ল তাঁর চরকা কাটা। দিনের বেলা সময় না পেলে রাত্রেও অন্তত আধ ঘণ্টা চরকা নিয়ে বসবেনই। এ নিয়ে লাঞ্ছনা তাঁকে কম সইতে হয় নি, লোকে বিদ্রূপ করেছে প্রকাশ্যেই, কিন্তু পণ্ডিত মশাই তাঁর নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। তিনি বলতেন, 'এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের অর্ধেক লোক যদি চরকা কাটে তো স্বরাজ সেই মুহূর্তে আসবে। বিদেশী বণিকরা এদেশ ধরে রেখেছে নিজেদের পণ্য বেচবার জন্যে, সেই বাজারটি বন্ধ করলেই ওরা অনায়াসে ছেড়ে চলে যাবে। তোমাদের যা দরকার তা যদি তোমরা নিজেরাই তৈরি ক'রে নাও তো বিদেশী জিনিস কেনবার প্রয়োজনই যে থাকবে না। চরকা তো একটা প্রতীক, আসলে নিজেদের স্বাবলম্বী হ'তে হবে, ওটা তারই স্মারক।'

বলাবাহুল্য যে তাঁর ওসব কথায় কেউ কান দিত না। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর জেদও ছিল অনন্যসাধারণ—কোন ছেলে কোন সময়ে তিন মাসের বেশী চরকা কাটে নি কিন্তু তিনি চিরকাল নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা ক'রে এসেছেন তাদের দিয়ে চরকা কাটাতে। কোন নিস্ফলতাই তাঁর উৎসাহকে কমাতে পারে নি।

অবশ্য কিছুটা কাজ যে হয়েছিল সেটা বোঝা গেল উনিশ শ' ত্রিশ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনে। উত্তর মালিহাটার মতো গ্রাম থেকেও কতকগুলি ছোক্‌রা এগিয়ে গেল স্বেচ্ছায় কারাবরণ করতে। দেশী মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে সার্জেণ্টের পেরেক-তোলা বুটের লাথি খেলে, খোয়ার ওপর দিয়ে হেঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে গেল গুর্খারা। তবু যে তারা এগিয়ে যেতে ভয় পেলে না, সেইটে দেখে পণ্ডিত মশাইয়ের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি নিজে প্রত্যক্ষ-ভাবে কাজে নামেন নি, সে জন্যও বিদ্রূপ সইতে হয়েছে ঢের কিন্তু তিনি বলেছেন যে, 'আমার কাজ সোজাসুজি কাজ করা নয়—আমার কাজ কর্মী তৈরি করা। বেশী দায়িত্ব আমারই কাঁধে এটা আমি বিশ্বাস করি।' এটাকে কাপুরুষতা বলে ছেলেরা প্রচার করতে লাগল (অবশ্য যারা ঘর ছেড়ে যায় নি), ছেলেদের অভিভাবকরা তাঁকে সাংঘাতিক চরিত্রের লোক বলে স্থির করলেন। কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের প্রশান্ত মুখে কোন নিন্দা বা কোন অভিযোগেরই ছাপ পড়ল না।

তাই ব'লে তাঁর কাজও বন্ধ রইল না—কারণ আবার যখন দু বছর পরেই অন্য আন্দোলন এল, তখনও দেখা গেল উত্তর মালিহাটা থেকে কর্মীরা এগিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকরা এবার রীতিমত আন্দোলন শুরু করলেন, স্কুল-কমিটির বৈঠকও বসল কিন্তু যেহেতু পণ্ডিত মশাই ইস্কুলের মধ্যে কোন রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালান না এবং ঠিক ইস্কুলের কোন ছাত্রকে তিনি আন্দোলনে প্ররোচিত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি, সেই হেতু তাঁকে ধরা-ছোঁওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে পণ্ডিত মশাই করেছেনও অনেক কাজ। মহাজনদের তোয়াজ ক'রে একটি ডাক্তারখানা স্থাপন করেছেন যা থেকে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সব কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারে। আর করেছেন একটি তাঁতশালা ও একটি জুতোর কারখানা—সম্পূর্ণ সমবায় ব্যবস্থায়। অবশ্য এর কোনটাই টিকল না বেশীদিন, শুধু ডাক্তারখানাটাই কোন মতে টিম টিম ক'রে বিনামূল্যে কুইনাইন দেবার স্থান হয়ে রইল। কিন্তু ব্যর্থতা আজও পণ্ডিত মশাইকে দমাতে পারল না। তিনি হাল তো ছাড়লেনই না, কাউকে দোষও দিলেন না। বললেন, 'আমারই শক্তির অভাব, ঠিক মতো ওদের বুঝিয়ে দিতে পারি নি এর উপকারিতা, তা ছাড়া এতদিনের পরাধীনতায় সমস্ত চৈতন্য যাদের জড়, তাদের কি অত সহজে জাগানো যায়? সময় লাগবে বৈকি!'

পণ্ডিত মশাই বুড়ো হয়ে পড়ছেন, আর অবসর না নিলে চলে না। অথচ তাঁর আশ্রয় অন্য কোথাও নেই। তা ছাড়া উত্তর মালিহাটার এই ইস্কুলটি তাঁর অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, এখান থেকে সরিয়ে দিলে বুড়ো মানুষের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে এ নিয়েও অনেকে দুশ্চিন্তায় পড়লেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল যে তাঁর ব্যাপারটা 'স্পেশাল কেস্' ক'রে স্কুল-কমিটি তাঁকে মাসিক কুড়ি টাকা পেন্‌সন দেবেন এবং যতদিন তিনি বাঁচবেন বা স্বেচ্ছায় অন্য কোথাও না যাবেন, হোস্টেল-সংলগ্ন ঐ কুটিরটিতেও তিনি বসবাস করতে পারবেন।

পণ্ডিত মশাইকে খুব ঘটা ক'রে বিদায় অভিনন্দন জানানো হ'ল। রায়বাহাদুর বিহারীমল কানোড়িয়া সভাপতিত্ব করলেন। অভিনন্দনের উত্তর দিতে গিয়ে কিন্তু যোগেন পণ্ডিত মশায়ের ঠোঁটও কাঁপল না, চোখও সজল হয়ে উঠল না। বরং তিনি মুচকি হেসেই বললেন, 'বুড়োকে আপনারা তাড়াতে চাইলেও বুড়ো সহজে যাবে না। আপনাদের ঘাড়ে চেপেই রইলাম—

কাজ আমার এখনও যে কিছুই সারা হয় নি। অবসর নেওয়ার সময় কই? তবে হ্যাঁ, মাস্টারী চাকরিটা গেল বটে কিন্তু ছেলেরা ছাড়বে কি? মনে তো হয় না!'

সত্যিই ছেলেরা ছাড়ল না।

পণ্ডিত মশাই চরকা কাটাটা দুপুরবেলা ক'রে নিলেন, সকাল-সন্ধ্যায় ছেলেরা যায় নিয়মিত পড়তে। রীতিমত কোচিং ক্লাসে পরিণত হ'ত তাঁর ঘরটা। পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুধু বার বার বলতেন ছেলেদের, 'দাসত্ব আমাদের দৈহিক ততটা নয় যতটা মানসিক। এতদিনের অধীনতায় মনটার যে পরিবর্তন হয়েছে—জীবনে চলবার পথে, এগিয়ে যাবার পথে যত আবর্জনা সে-ই জোগাবে। চিন্তাটাকে স্বাধীন, গতিশীল করতে হবে, তবে যদি জাতটার কিছু উন্নতি হয়। কাপুরুষতা সব পাপের আধার-Cowardice itself is a sin—সত্য কথা বলবার, সত্য পথে চলবার সাহসটা যেন মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। সব চেয়ে ভয় করি আমরা—কতকগুলো প্রথাকে, সংস্কারকে, আর সেই-খানটায় হয়েছে যত গোলমাল। বাহ্যত ওগুলোকে অত্যন্ত নিরাপদ ও দুর্বল বলে মনে হয় কিন্তু তবু আমাদের শতকরা একশ জনেরই বোধ হয় ওদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে চলবার সাহস নেই'—এমনি আরও কত কথা। ছেলেরা অধিকাংশই সে সব কথা বুঝত না। মন দিয়ে শোনবারও প্রয়োজন বোধ করত না, কারণ ওগুলো তো পাগলা পণ্ডিত মশাইয়ের পাগলামি। ওঁর কাছ থেকে পড়াটা আদায় করতে হ'লে বকুনিটা সইতে হবে—উপায় কি?

কিন্তু ওদের এই তাচ্ছিল্যে পণ্ডিত মশাইয়ের যে খুব ক্ষতি হ'ত তা মনে হয় না। তিনি প্রশান্ত মুখে হাসতেন। আমরা কেউ অনুযোগ করলে বলতেন, 'ওরে, ওদের দোষ কি, আমরা যেঐ রকম ক'রেই মানুষ হচ্ছি বংশপরম্পরায়।'

আমরা হয়ত তার উত্তরে বলতুম, 'তাই যদি জানেন তো মিছিমিছি বকে দম নষ্ট করেন কেন?'

তাতেও তিনি হেসে জবাব দিতেন, 'গীতা পুরাণ আমাদের দেশে চেঁচিয়ে পড়বার নিয়ম আছে, কেন জানিস? যে সব লোকেরা পড়তে পারে না, তাদের কানে যদি এর কিছুও যায় এবং তার অর্ধ-মাত্রাও কারুর মাথায় ঢোকে তো তার মুক্তি কেউ রুখতে পারবে না। এতগুলো ছেলেকে এতদিন ধরে বলছি তাতে কারুর কি কিছু কাজ হবে না? নিশ্চয়ই হবে—আর তাহ'লেই আমার চেঁচানো সার্থক!'

তাঁর নির্লজ্জতা দেখে আমরাই হাল ছেড়ে দিতাম।

কিন্তু গোলমাল বাধল উনিশ শ'বিয়াল্লিশ সালের অগাস্ট মাসে। নেতারা সব যখন জেলে গেলেন, তখন দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত স্বতঃস্ফুর্ত, স্বতঃপ্রণোদিত বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। উত্তর মালিহাটার ছেলেরাও সে উত্তেজনার জোয়ারে নিজেদের ঠিক রাখতে পারলে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যে পণ্ডিত মশাই এতদিন ধরে সব রাজনৈতিক আন্দোলনেই ছেলেদের প্রেরণা জুগিয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে, তিনি এবার বিষম বিগড়ে দাঁড়ালেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে সবাইকে নিষেধ করতে লাগলেন, 'ওরে ভুল, ভুল, এ পথ আমাদের নয়। যে লোকটা তোদের পঙ্কশয্যা থেকে তুলে এত উঁচুতে নিয়ে এলেন, তাঁর আজীবন সাধনাটাকে মাটি করিস নি তোরা!'

ছেলেরা বিস্মিত হয়ে বললে, 'এ কি বলছেন পণ্ডিত মশাই? তিনি নিজেই যে মন্ত্র দিয়েছেন করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—এবার যে অন্যরকম ব্যবস্থা।'

'ওরে মন্ত্র তিনি দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে মরবার—মারবার নয়। জাতীয় আন্দোলনে আমরা সত্যাগ্রহী। যে পথ সোজা নয়, সে পথ মিথ্যা—আমাদের পথ তা নয়। সাহস থাকে সোজা পথে এগিয়ে যা, বুক ফুলিয়ে মরে তোরা দেখিয়ে দে তোদের শক্তি ওদের চেয়ে বেশী, তোদের সঙ্কল্পকে আর ওরা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমি বলছি তোদের—তিনি কক্‌খনো এরকম চান নি।'

অনেকে শুনল ওঁর কথা, অনেকে শুনল না। কিন্তু যারা শুনল, তারাও শ্রদ্ধা হারাল। অনেকখানি সর্ববাদিসম্মতভাবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে ওঁর মাথার আর ঠিক নেই, গোলমাল হ'তে শুরু করেছে।

কিন্তু গোলমালটা যে পুরোপুরি ভীমরতি সেটা এতদিন পরে টের পাওয়া গেল। অথচ ঠিক ভীমরতির বয়সও তো ওঁর হয় নি।

এই সেদিনের কথা—কলকাতায় ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেল, তাতেই যথেষ্ট উত্তেজনা। আবার সে উত্তাপ শান্ত হ'তে না হ'তে নোয়াখালিতে আগুন জ্বলে উঠল। উত্তর মালিহাটা হিন্দুপ্রধান গ্রাম, মুসলমান যে কঘর আছে, গ্রামের প্রান্তে, তারা নিতান্তই নগণ্য—অবস্থাও তাদের ভাল নয়। সুতরাং ঠিক সংঘর্ষ যাকে বলে এখানে তা বাধবার সম্ভাবনা ছিল না কখনই, আমরা কতকটা নিশ্চিন্তে ছিলাম। কিন্তু গ্রামের ছেলেরা হঠাৎ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে

উঠল, তারা বললে, ‘এ ব্যাপার আমরা আর বরদাস্ত করব না। আমরা এর শোধ নেব। আমাদের ছাত্তের কাছে যারা আছে, তাদের ওপরেই শোধ তুলব—তারপর অদৃষ্টে যা আছে হবে। মনুষ্যত্ব, ন্যায়, কোন কথা শুনতে আমরা প্রস্তুত নই।’

কথাটা কি ক’রে পণ্ডিত মশাইয়ের কানে উঠল তা জানি না, তিনি তাঁর কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ছেলের দলটির খোঁজে। তারা ওঁকে দেখেই বলে উঠল, ‘পণ্ডিত মশাই এবার আর কিন্তু কোন কথা শুনছি না আপনার। আমাদের যা মনে আছে তা করবই—’

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন যোগেন পণ্ডিত। বললেন, ‘নিশ্চয়ই। কিন্তু তোরা কি চাস?’

‘আমরা চাই প্রতিশোধ নিতে।’

‘আমিও তাই চাই। আমার বুড়ো মানুষের রক্তও ফুটছে রাগে। কিন্তু একটা কথা বাবারা—’

‘কী কথা আবার? এ আপনার যত গণ্ডগোল—’

‘গ্যাখ্—অনেকদিন তোদের কাছে আছি, তোদের সবাইকেই কিছু না কিছু পড়িয়েছি। আমার কিছু দাবি তোদের ওপর আছে এটা মানিস্ তো?’

‘মানি স্যার।’

‘তা হ’লে সেই দাবি এবার পূরণ কর্। গুরু-ঋণ শোধের সময় এবার এসেছে।…একটি ভিক্ষা চাইব তোদের কাছে—বল্ দিবি?’

‘কী বলছেন পণ্ডিতমশাই, ওতে যে আমাদের অপরাধ হয়। বলুন কি চান।’

‘যা চাইব তাই দিবি?’

‘নিশ্চয়ই দেব—’

‘তবে এই শোধটা আমাকে নিতে দে, তোরা কিছু করিস নি। বল্ আমার ওপর ছেড়ে দিবি?’

ওরা বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়— ভেবে পায় না এসব কি বলছেন উনি, তবু বুড়ো মানুষের মিনতি ঠেলাও যায় না। ওদের কথা দিতে হয়—যোগেন পণ্ডিতমশাই শপথ করিয়ে নেন।

যাবার সময় বলে যান, ‘কালই দেখতে পাবি তোরা কি করি।’…

পরের দিন দেখা গেল হোস্টেলের হাতায় একটা গোরুর গাড়ি এসে

দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই নিজেই অতি কষ্টে ওঁর সব জিনিসপত্র এনে গাড়িতে বোঝাই দিচ্ছেন। একটা যাত্রার আয়োজন।

'এ কী কাণ্ড পণ্ডিতমশাই? কোথায় চললেন।'

'যাচ্ছি বাবা প্রতিশোধ নিতে।'

'কিন্তু কোথায়—কী ব্যাপার কি?'

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'যাচ্ছি ঐ মুসলমান পাড়াতে। যে ক-টা দিন বাঁচি ঐখানেই থাকব, ওদের মধ্যে।'

বিস্ময়ে কারও মুখে কথা সরল না। পণ্ডিতমশাই কিন্তু বলেই চললেন, 'আজ থেকে ওদেরই শুধু লেখাপড়া শেখাব—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, প্রয়োজন হলে জীবন দিয়ে এই কথাটাই ওদের বুঝিয়ে দিয়ে যাব যে আমাদের কাছ থেকে ওদের কোন ভয় নেই, কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। মানুষ হিসেবে দেশবাসী হিসেবে ওরা আর আমরা সমান।···সেইটেই হবে এ অন্যায়ের ঠিকমতো প্রতিশোধ। হিংসায় হিংসাই বাড়ে—বিদ্বেষে শুধু বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তাতে কি এ পাপ মরে? মনের মধ্যে শুধু অসন্তোষ জমা হ'তে থাকে।···যে সংস্কার যে ধারণা যে কুশিক্ষা এমন কাজে প্রেরণা দিতে পারে, সেইগুলোকে দূর করতে পারাই হ'ল সত্যকারের প্রতিশোধ। আজ থেকে সেই কর্তব্যই বেছে নিলুম।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'সত্যি কথা ভেবে ছাখ্‌ তো বাবারা, অন্যায় কি আমাদের তরফ থেকেই কিছু কম ছিল? আমরা কি ওদের মনে এই বিদ্বেষ জমা হয়ে ওঠার সুযোগ দিই নি কিছুই—? হয়ত বাইরের লোক ওদের নাচিয়েছে কিন্তু আমাদের দোষ যদি কিছু না থাকত তো তারা নাচাতে পারত কি?···যদি পারি তো সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, ওদের মধ্যে আমাদের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসা জাগিয়ে। এই আমার পথ।'

অনুনয় বিনয় উপরোধ অনুরোধ—কিছুতে পণ্ডিতমশাইকে নিরস্ত করা গেল না। সেই শিখা ও যজ্ঞোপবীতধারী লোকটি প্রশান্ত মুখে মালপত্রের পিছু পিছু ঐ পাড়াটিতে গিয়ে ঢুকলেন। সেই দিন থেকে আজও আছেন। হয়ত চিরকালই থাকবেন।

অন্নপাপ

প্রশান্ত যতই বোঝাক, লক্ষ্মীর মন থেকে সংশয় যেন কিছুতেই যেতে চায় না। একটি মাত্র ছেলে ওর, কেমন যেন দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। খায়-দায়, বাহ্যত কোন অসুখও নেই—অথচ ছেলে কেবলই রোগা হয়। এর আর কি কারণ থাকতে পারে ওর বাপের পাপ ছাড়া?

প্রশান্ত হাসে। বলে, 'বেশ তো, পাপই না হয় হচ্ছে কিন্তু পাপে কাউকে মরতে দেখেছ? একটা রোগের উপলক্ষ তো চাই। ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ছেলেটাকে ভাল ক'রে খেতে দাও।'

লক্ষ্মী তাতে রেগে যায়। বলে, 'খেতে না দিয়ে আমি ছেলেটাকে রোগা ক'রে ফেলছি, না? যেমন আধ সের দুধ আগে খেত এখনও তাই খাচ্ছে। আগেও সাবু খেত এখনও তাই খায়। দুধ যে বাড়িয়ে দেব সে উপায়ও তো নেই—ক'বার বেশী দুধ দিয়ে দেখলাম, ওর চেয়ে বেশী খেলেই ওর পেট ছাড়ে।'

'তবে আমার পাপের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাক!' উদাসীন কণ্ঠে বলে প্রশান্ত।

একবার সে ঠকেছে পঞ্চাশ সালে। ওর দেশের সবাই লক্ষপতি হয়ে গেল—সবাই মানে অবশ্য ওর আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবরা—অথচ প্রশান্ত যে তিমিরে সেই তিমিরে। সে যে সেই কালোবাজারের সুযোগ নেয় নি তাতে কি দুর্ভিক্ষ হওয়া বন্ধ ছিল, না মানুষ কিছু কম মরেছে? যা হবার তা হবেই—শুধু শুধু সে কিছু লাভে বঞ্চিত হয় কেন?

তা'ছাড়া—মনকে সে প্রবোধ দেয়—গবর্ণমেণ্ট এবার হুঁশিয়ার, কেন্দ্রীয় সরকার নজর রেখেছেন কড়া, কেন্দ্রে কতকটা জাতীয় সরকারও প্রতিষ্ঠিত আছে, সুতরাং পঞ্চাশ সালের মতো দুর্ভিক্ষ কিছুতেই হবে না। আর তখনকার চেয়ে এখন টাকাও সস্তা হয়েছে ঢের, ক'বছর যুদ্ধ চলবার ফলে সবাই বেশ শাঁসালো হয়ে উঠেছে। কাজেই, তখনকার বিশ টাকা আর এখনকার ত্রিশ টাকায় ঢের তফাৎ। ওরা চাল নিয়ে যদি ফাট্‌কা খেলেই একটু তো এমন কিছু পাপের ভাগী হ'তে হবে না। অবশ্য মরছে বটে দু'একজন—সে তো

এমনিই কত মরে, বছর-বছরই মরে। যখন তিন টাকা চালের মণ ছিল তখনও মরেছে। প্রশান্ত চালের ফাট্‌কা না খেললেও মরত। কারণ দাম বাড়াবার লোকের অভাব নেই।

প্রশান্তরা তো তবু একটা কাজ করেছে—এখনও পর্যন্ত পঁয়ত্রিশের ওপর উঠতে দেয় নি। হবিব মিঞা আর লোচন চক্রবর্তীর দলের হাতে থাকলে এত দিনে ষাটে উঠে যেত। প্রশান্ত আর তার মতো আর কয়েকটি অল্পবয়সী ছোকরা এবার এই কাজে নামায় বরং হবিব, গণি, লোচন—ওদের অসুবিধাই হয়েছে। বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যেই ওরা দামটাকে রেখে দেয়, যেমন দেখে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অমনি নিজেরা ইচ্ছে করে কমাতে থাকে। তাতে যেটুকু লোকসান হবার কথা সেটুটু পরে পুষিয়ে নেয়—ফলে সবটা জড়িয়ে হয়ত লাভ কিছু কম থাকে কিন্তু লোকসান তো কিছুতেই হয় না, তবে আর ভাবনা কি? মোট ছ' হাজার টাকা নিয়ে সে নেমেছিল এ কাজে, মানে ঐ টাকাটাই চিহ্নিত ক'রে নিয়েছিল, যায় ঐটে যাবে, আসে ঐটে থেকেই আসবে। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সেই ছ' হাজার এই ক'মাসেই ফুলে ফেঁপে আটাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। আরও যদি কিছু মূলধন এখনও বার করে তাহ'লে লক্ষপতি হতে বেশী দেরি হয় না কিন্তু প্রশান্ত তা করবে না। হাজার হোক ফাট্‌কা—জুয়াতে বেশী মূলধন ঘর থেকে যে বার করে সে আহাম্মক।

প্রশান্ত আর কী পয়সা করেছে! সত্যি, ভাবলেও হাসি পায় ওর। লক্ষ্মী এতেই ভয়ে অস্থির—চাল নিয়ে কী কাণ্ড লোকে করছে তা যদি জানত। ওদের ছেলে রোগাও হয় না, মরেও না। এক-একটা নৌকোর মাঝিই লাল হয়ে গেল এই হিড়িকে। ধান যারা কাটতে যায় তারা কুড়ি মণ ক'রে চাল নিয়ে আসতে পারে, এমন হুকুম আছে। সে হুকুম দেন হাকিম, একটা সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হয়। আগে আগে সেই চিরকুটটুকু নেবার জন্য একটা ক'রে লোক খাড়া করতে হ'ত; সে নিত এক টাকা আর পেশকারকে দিতে হ'ত চার টাকা। অবশ্য এক লোককে দশ বার হাজির করলেও দোষ হয় না—তবু সে টাকাটা পেশকার (হুজুরের ভাগ আছে কি না সেটা প্রশান্ত হলফ করে বলতে পারবে না) ছাড়ে কেন? এখন আর লোক খাড়া করতে হয় না, পেশকারকে পাঁচ টাকা দিলেই 'পাস' পাওয়া যায়। এক-একটা মাঝি এমনি বিশ, ত্রিশ চল্লিশ, পঞ্চাশ এমন কি একশো' দেড়শো'ও পাস নিয়ে রওনা

হয়ে যায় বরিশাল—মানে নিজের হিম্মৎ বুঝে, যে যতখানা নৌকো যোগাড় করতে পারে!

তার পরের ব্যাপারটা আরও সোজা। চাল বোঝাই ক'রে আসবার পথে সিভিল সাপ্লাই-এর ঘাঁটি পড়ে বটে কতকগুলো, কিন্তু তাতেও চিন্তার কোন কারণ নেই। বন্দোবস্ত হয়ে গেছে বহু দিনের আসা-যাওয়ায় আদান-প্রদানে। এখন কাজটা চলে কলের মতো—মসৃণ নিরুদ্বেগে। মণকরা দু'টাকা ঘুষ, কর্তারা এখন উঠে কষ্ট ক'রে দেখেনও না অনেক সময়—ঠিক কত চাল যাচ্ছে। কোথাও দু'টাকার বেশীও ধরা হয় অবশ্য। সে যাই হোক, যেখানে যা দর হিসেব ক'রে মাঝিরাই পৌঁছে দিয়ে যায় সিভিল সাপ্লাইয়ের নৌকোতে, তাঁরা পাটার কাঠ তুলে অন্যমনস্কভাবে টাকাটা ভেতরে ফেলে রাখেন, সব সময় গুণেও দেখেন না। দিনান্তে একবার সে টাকা তুলে গুণে-গেঁথে ভাগ হয়ে যায়!

এমনি ক'রে এক-একটা মাঝি কি কম পয়সা করেছে! প্রশান্তর হাত কামড়াতে ইচ্ছে হয়, কথাটা মনে হ'লে। সে যদি ভদ্রলোক এবং ব্রাহ্মণ জমিদারের বংশে না জন্মে মাঝি হয়ে জন্মাত! মাঝিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তারা সরল সত্যি কথাই বলে, কেউ বলে কুড়ি হাজার টাকা করেছে, কেউ বলে চব্বিশ হাজার। অনবরতই তারা আনাগোনা করছে—হবে না-ই বা কেন, সব দিয়ে থুয়েও ঢের থাকে। তা ছাড়া চোরেরও ধর্মবোধ আছে, এক ঘাঁটিতে সিন্নি চড়ালে অন্য ঘাঁটিতে চড়াতে হয় না। থানা-পুলিসেও সেই ব্যবস্থা! তবে খুচরো-খাচরা দু-এক টাকা—এখানে ওখানে, সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। 'টাকা কোথায় রাখো?' এমন প্রশ্নও যে না করেছে তাদের তা নয়। মাটিতে পুঁতে রাখে তারা, ব্যাঙ্ক পোস্টাফিস ওসব বোঝে না—'পরহস্তগতম্ ধনম্' যে কোন কাজের কথা নয়, মোটামুটি এ কথাটা তারা জানে।

সুতরাং—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় কি? যারা টাকাটা খরচ করতে জানে না, এমন কি খাটাতেও না—ভগবান তাদেরই এমন ক'রে পয়সা দিচ্ছেন। অন্ধকার মাটির গর্ভে—কত কাগজের টাকা পচে যাবে, কত টাকায় হয় তো উই ধরবে! কী লোকসান ঐশ্বর্যের, কী অপব্যবহার! ছিঃ ছিঃ!···

ওর একটা এজেন্সীও আছে বরিশালে। সেটা দেখে ওর ভাই। আগে সেখানে বেশ দু'পয়সা হ'ত। চাল কিনে সরকারী কাঁটায় ওজন করিয়ে

নিজের গুদামে রাখতে হ'ত। তার পর মোটামুটি কেনা হ'লে সরকার টাকাটা দিতেন এক এক থোকে। একটা কমিশন, আর গুদাম ভাড়া। ওজন করবার সময় সার্টিফিকেট যাঁরা লেখেন তাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে—পুকুর-চুরি না হোক—মোটামুটি কিছু আসত বৈকি! অপরে পুকুরচুরিই করেছে। হিসাব গভর্ণমেণ্ট প্রায়ই নিতেন না—যদি বা কখনও চাইতেন তো সরকারকে বোকা বোঝাতে কতক্ষণ! পচে যাওয়া আছে, ইঁদুরে খাওয়া আছে—নষ্ট হবার সরকারী সম্মতি-প্রাপ্ত কত পথই তো খোলা!

এখন বরং একটু অসুবিধা হয়েছে। সরকারী গুদামে তুলে দিতে হয় চাল, নিজেরা মারবার কোন উপায় নেই। চাল কেনবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—ওদের মাত্র ত্রিশ হাজার মণের বরাদ্দ। মণকরা এক আনা না ছ' পয়সা, এমনি কি একটা কমিশন আছে, খবরও রাখে না প্রশান্ত। যে ভাইটা আছে তার খরচাটা চলে গেলেই হ'ল। গুদামের লোকসান, যেটা আগে ওদের লাভ ছিল, সেটা হয়ত সরকারী কর্মচারীরা পায় কিন্তু তার ইতিহাসটা পর্যন্ত আর জানবার উপায় নেই। তবে ভায়া কি আর কিছু কিছু এমনি পাচার করছেন না কালোবাজারে?···প্রশান্ত হাসে মনে মনে, কিছু নিজস্ব টাকার কি মূল্য তা আজকাল দশ বছরের ছেলেও বোঝে।

অবশ্য—চাল আর সরকারকে এ বছর বেশী কিনতেও হয় নি। ছেলেবেলায় কলঙ্কভঞ্জন যাত্রা শুনতে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে—সে কথা আজও মনে আছে ওর। জটিলা-কুটিলাকে সহস্র-ছিদ্র কলসী দিয়ে বলা হয়েছিল জল তুলে আনতে—সতী হ'লে না কি ঠিক নিয়ে আসতে পারবে, যে সতী নয় তার কলসী খালি হয়ে যাবে নিমেষে। কেউ পারলে না, শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলেন শ্রীমতী।···তা চাল কেনার এই সরকারী ব্যবস্থাটা হয়েছে সেই সহস্র-ছিদ্র কলসী। কোন সতীই এতে শেষ পর্যন্ত চাল তুলে ঘরে আনতে পারবে না। চাল তো নেই-ই, সব মাঝিরা আর বাবুরা শেষ ক'রে দিলে। এক এদিক-ওদিক থেকে ধর-পাকড় ক'রে চোরাই মাল যা আটকাতে পারে। মধ্যে মধ্যে কিছু আটক করতে হয়, চাষার বাড়ি থেকেও বটে—নৌকো থেকেও বটে। নইলে চাকরি থাকে না। তা ছাড়া—সাধু এবং কর্তব্যপরায়ণও দু'চারজন আছেন বৈকি! কিন্তু সে এতই কম যে আঙুলে গুণতে গেলেও কুলোয় না। আর চাকরি রাখার জন্য যাঁরা ধরেন তাঁদেরও মজা চমৎকার, ধরলেন হয়ত বিশ হাজার মণ, শেষ পর্যন্ত সরকারী খাতায় লেখা রইল তিনশো,মণ-বাকী,

যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে, নির্বিবাদে পাচার হয়ে গেল।

নাঃ—চাল যে বলে লক্ষ্মী, তার প্রমাণ এবার প্রত্যক্ষ পেলে প্রশান্ত। দুঃখ এই যে সে নিজে কিছু করতে পারলে না, যা করেছে তা না করার মধ্যেই ওকে আর করা বলে না…যে এ বাজারে চাল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে সে-ই লাল। আর ওর স্ত্রী বলে কি না এ কাজ ছেড়ে দিতে! আরে—এতে যদি পাপ হ'ত আর সে পাপে মানুষ মরত তা হ'লে ওদের গাঁ কেন—আশে-পাশের কত গ্রাম, এই বিক্রমপুরের বাইরেও কত গ্রাম আছে, সেখানকার অধিকাংশ লোকে এই কাজ করছে আজকাল—সব তো শ্মশান হয়ে যেত। কারুরই তো বাঁচবার কথা নয় শুধু এ বছর কেন, পঞ্চাশ সাল থেকেই তো কাণ্ড চলছে—না-হ'লে ঐ হবিব-টবিব, ওরা তো এত দিনে মরে ভূত হয়ে যেত। কী না করেছে ওরা, মানুষের মুখের ভাত নিয়ে মানুষের বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন নিয়ে!

ও সব বাজে কথা। মেয়েলি কথাতে কান দিতে গেলে পুরুষের পয়সা রোজগার চলে না।

তার চেয়ে যেটা সহজ এবং যুক্তিযুক্ত প্রশান্ত সেটাই করে। ঢাকা থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসে, ঔষধ-পত্রে বিস্তর টাকা খরচ করে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এ ডাক্তার যদি সারাতে না পারে তো কলকাতায় নিয়ে যাবে খোকাকে। শিশু-রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন সেখানে কত, একজনকে দেখালেই হবে। ভগবান যখন পয়সা ওকে প্রচুর দিচ্ছেন, তখন কার্পণ্য করবে না কিছুতেই। এক ছেলে, তার জন্য যা কিছু করতে হয় করবে, তা বলে ঐ সব কুসংস্কার, ছিঃ!

শহর থেকে যেদিন ডাক্তার এলেন, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় লক্ষ্মী এসে বললে, 'ওগো শুনেছ?'

প্রশান্ত তখন কী একটা হিসাব দেখছিল। বাবা মরবার পর জমি-জায়গার হিসাবও ওকেই দেখতে হয়। মুখ না তুলেই বললে, 'কী?'

'আক্কেল আলি তার মেয়েটাকে না কি বেচে দিয়েছে কাকে সাত টাকায়।'

'তাতে তোমার কি?' অন্যমনস্ক ভাবেই জবাব দেয় প্রশান্ত।

'ওমা কি বলছ? সন্তানকে বেচে দিলে, তাও সাতটি টাকার জন্যে?'

'কি করবে? ওর বৌয়ের পরনে একটা ট্যানা পর্যন্ত নেই। ঘরের বার

হয়ে কাজ করবে তা পারে না। সাত টাকা দিয়ে একখানা কাপড় কিনেছে হয়ত।'

লক্ষ্মীর দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বর দুই-ই সহসা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সে বলে, 'ওগো না, ওর বৌ আজও ঘরের বার হ'তে পারছে না দিনের বেলায়। কিন্তু ইজ্জতের চেয়েও পেটের জ্বালা যে বড়, সাত টাকায় সাত সের চাল কিনে এনেছে।'

'তাই না কি?' বলে প্রশান্ত আবার কাজে মন দেয়।

আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে লক্ষ্মী বোধ হয় আরও কিছু বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়ে ওঠে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যায়।

ঠিক দোরের বাইরে পা দিয়েছে সে সবে, প্রশান্ত বলে, 'শোন।'

'কী গো?' বিস্মিত কণ্ঠে লক্ষ্মী প্রশ্ন করে।

'কাপড়ের কণ্ট্রোল নিয়ে গোলাম সারোয়ার, সালেক আর আমাদের যোগেন সাহা লাল হয়ে উঠল—তা তো চোখেই দেখছ। যোগেন সাহা স্ত্রীর নামে তিনখানা আর শালার নামে একখানা বাড়ি কিনেছে ঢাকায়। ওদের দোকানে কাপড় আসে আর সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি ব্ল্যাক মার্কেট হয়ে যায়—অথচ কাপড়ের অভাবেই আক্কেলের ভাজ গত বৈশাখে গলায় দড়ি দিয়েছিল। মনসুরের মেয়েটাও—কৈ যোগেন সাহার ছেলে-মেয়েরা তো সুস্থই আছে। গোলাম কি সালেকের বাড়ির কাউকে সাপে খেয়েছে কিংবা তাদের মাথায় বাজ পড়েছে বলেও তো শুনি নি।'

'আমি কি তোমাকে আর কিছু বলেছি? রোজ রোজ এক কথা কেন? শ্রান্ত কণ্ঠে বলে লক্ষ্মী।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা লোচন চক্রবর্তী এলেন বেড়াতে। প্রশান্তর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো নয়ই, বিশেষ সদ্ভাবও ছিল না। সুতরাং প্রশান্ত বেশ একটু বিস্মিত হয়।

'কি খবর লোচনকাকা?'

'বলছি বাবা। একটু তামাক দিতে বলো—' বলে বেশ জাঁকিয়ে বসেন লোচন চক্রবর্তী। তার পর চা ও তামাকের সঙ্গে গলাটা খাটো ক'রে যা বলেন তার মর্মার্থ হ'ল এই: মুন্সিহাটার সরকারী গুদামে প্রায় আড়াই হাজার মণ চাল 'মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য' বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সেটা ফেলতে সার দেবার জন্য নাম-মাত্র মূল্যে সরকার বাহাদুর বিক্রী করবেন এই রকম স্থির

হয়। সেই উপলক্ষে একটা নিলামও হয় এবং লোচন চক্রবর্তী সে নিলাম ডেকে নেন। এসব ঘটনা ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এখন কথা হচ্ছে যে জমিতে সার এসব দেশে চাষীরা বিশেষ দেয় না, ওসব বোঝেও না। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে যদি বসে থাকতে হয় তো সারেরও অযোগ্য হয়ে যাবে চাল, গুদাম-ভাড়াটা সুদ্ধ যাবে ঘর থেকে। ও-ধারের সরকারী গুদামের যাঁরা কর্তা তাঁদের কিন্তু অনেকেরই সঙ্গে প্রশান্তর বিশেষ আলাপ আছে। আর তাঁদের যে অর্থ সম্বন্ধে আগ্রহের অভাব আছে এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না। সুতরাং এই 'মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য' আড়াই হাজার মণ যদি সেই গুদামে চালান ক'রে সেখান থেকে আড়াই হাজার মণ বার ক'রে আনতে পারা যায় তো—দশ বারো হাজার টাকা ওদের ঘুষ দিয়েও যথেষ্ট টাকা বাঁচে। প্রশান্তর কি মনে হয়?

প্রশান্ত অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কিন্তু যে গুদোমের ওপর আমার সব চেয়ে বেশী হাত, তাদের গুদোমে সবে এই সেদিন চাল উঠেছে; চালও নতুন—জল পড়ে নষ্ট হয়েছে বলা চলে না। তারা কি কৈফিয়ত দেবে?'

লোচন হঠাৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বলে উঠলেন, 'কি মুশকিল আমি কি তাই বলছি! একটু কষ্ট ক'রে সব বস্তার সঙ্গেই চারটি চারটি মিশিয়ে দেবে। সে তাঁদেরও করতে হবে না, আমিই সব বন্দোবস্ত ক'রে দেব। তাহলে ভাল চাল বলেই সব চলে যাবে কাকে-বকেও টের পাবে না। ছ'-সাত হাজার মণ চাল থাকে এক একটা গুদোমে, তার সঙ্গে আড়াই হাজার মণ মিশোতে কতক্ষণ।'

প্রশান্ত নিজের অজ্ঞাতেই যেন একবার শিউরে ওঠে। বলে, 'কিন্তু কাকা সেই বিষাক্ত চাল খাবে তো সবাই আমাদেরই দেশের লোক?'

'ধুয়ে বেরিয়ে যাবে বাবাজী, ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। পচা পোকাধরা চাল কখনও থাকে, জলে পড়লেই তো ভেসে বেরিয়ে যাবে! চাল ধুতে দেখ নি? ...এ তো ঢের ভাল বাবাজী, কর্তারা যে মণ-করা পাঁচপো পাথর মেশান তার চেয়ে এ ঢের ভাল। প্রতি গরাসে কাঁকর, শহরের লোকের ভাত খেতে গেলেই চোখে জল আসে। সে দুর্দশা কি আমি দেখি নি মনে করছ?'

প্রশান্ত তবুও ইতস্তত করছে দেখে লোচন কানে কানে বললেন, 'তোমার কোন ঝুঁকি নেই বাবা, তুমি শুধু কথাটা ব'লে বন্দোবস্ত ক'রে দাও, কাজ মিটে

গেলে পুরোপুরি দশটি হাজার টাকা তোমাকে দিয়ে দেব। নি-খরচায়, বিনা পরিশ্রমে টাকাটা ঘরে উঠবে, নিট্ লাভ!'

লোভে আর বিবেকে মন দুলতে থাকে প্রশান্তর। শেষ পর্যন্ত লোভেরই জয় হয়। বলে, 'দেখি কি করতে পারি, শালা রাজী হবে বলে তো মনে হয় না।'

কিন্তু খোকা দিন দিন শুকোতেই থাকে। শহরের ডাক্তার এসে বলে গেছেন কৃমি। সেইমতো চিকিৎসা চলে, তাতেও কোন কাজ হয় না। খাওয়া কমে যাচ্ছে দিন দিন। একটু জোর ক'রে খাওয়াতে গেলে বদ্-হজম হয়। খিটখিটে মেজাজ হয়ে গেছে, রাত্রিতে ভাল ক'রে ঘুমোয় না, কাঁদে প্রায় সারা রাতই। লিভার খারাপ হয়েছে সন্দেহ করেন মুন্সিহাটার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। মেয়েরা বলে এঁড়ে লেগেছে। কিন্তু লক্ষ্মী তার প্রতিবাদ করে। সে সম্ভাবনাই নাকি হয় নি তার। অথচ তার সোনার খোকা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং প্রশান্ত এইবার চঞ্চল না হয়ে পারে না। বহু কষ্টের খোকা তার। বিয়ের পর পুরো চারটি বছর তার ছেলে-মেয়ে হয় নি। সবাই ভেবেছিল হবে না আর কোন দিনই। বন্ধ্যা দুর্নাম এড়াবার জন্যে লক্ষ্মী করে নি এমন কোন কাজই নেই। হোমে পূর্ণাহুতি দেওয়া পোড়া কলা, বেগুনের পোকা, কত কি খেয়েছে কোন্ মনসা গাছে ঢিল বেঁধে দিয়ে আসতে হয়, কোন্ শিবের বার করতে হয় নিয়ম ক'রে কিছুই বাদ যায় নি তার। তার পর সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে এই ছেলে এল তার। ফুটফুটে পদ্মফুলের মতো শিশু। কাগজের মতো সাদা রং, বড় বড় চোখ আর রেশমের মতো নরম ঘন চুল। প্রথম প্রথম প্রশান্ত এক মিনিটও বুক থেকে নামাত না, কাজকর্ম সব চুলোয় যেতে বসেছিল ওর ছেলের জন্য। চোখ ফেরাতেই ইচ্ছে করে না ছেলের মুখ থেকে—কোথায় যাবে তাকে ফেলে! তার পর ধীরে ধীরে দু'বছরের ছেলে হ'ল, কথা কইতে শিখল, হাঁটতে শিখল বেশ এমন সময় এ কী বিপত্তি?

প্রশান্ত স্থির করল সে একাই কলকাতাতে যাবে। আগে একজন স্পেশালিস্টকে খুলে বলবে সব ব্যাপারটা, যদি না দেখিয়ে হয়তো ভাল, নইলে সেই ডাক্তারকেই সে এখানে নিয়ে আসবে। কত আর নেবেন তিনি, হাজার না হয় দু'হাজার টাকা? প্লেনে আসবেন প্লেনে যাবেন। ঢাকা থেকে এই পথটা স্টীমার আছে, মোটর আছে, বেশী দেরি হবে না। চিকিৎসা না হয় কিছু রাজকীয়ই হবে। কিন্তু তাই বলে, কলকাতায় এখন যা হাঙ্গামা,

কলকাতাতে সে খোকা কিংবা লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে পারবে না।...

কলকাতায় পৌঁছে প্রথমটা সে হোটেলেই উঠবে ভেবেছিল কিন্তু দিন-কাল খারাপ বলে নির্বান্ধব স্থানে উঠতে ভরসা হ'ল না। কাকা থাকেন বালিগঞ্জের দিকে, বাপের মাসতুতো ভাই—সেখানেই ওঠা স্থির করলে। ওদের দেশের লোক অতিথি দেখলে বিরক্ত হয় না, কারণ অতিথির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করার রেওয়াজ ওদের নেই। আপন লোকের মতো সহজ ব্যবহার করে বলেই কোন পক্ষে মনের মধ্যে কোন সঙ্কোচ থাকে না। গ্রাম-সম্পর্ক থাকলেও তারা সহজে ওঠে, এ তো নিকট-আত্মীয়।

কাকার বাসায় সে এর আগেও এসেছে দু'একবার। খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে ও থমকে গেল। সদরের সামনে দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে, একসঙ্গে দুজন ডাক্তার বেরিয়ে আসছেন। তাঁদের ঠিক পেছনেই সসম্ভ্রম-বিনয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছেন কাকা আর খুড়তুতো ভাই নরেশ। অসুখ তো বটেই—গুরুতর অসুখ নিশ্চয়, নইলে দু'জন ডাক্তার ডাকতে হ'ত না। সে আস্তে আস্তে পেছন ফিরবে ভাবছে এমন সময় কাকার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সুতরাং আর পিছনো সম্ভব হ'ল না। মুখে উদ্বেগের ভাব এনে এগিয়ে যেতে হ'ল।

'ব্যাপার কি কাকা?'

'আর বাবা—ব্যাপার! ধনে-প্রাণে মরতে বসেছি। তোমার কাকীমার কলেরা হয়েছিল পরশু, কাল থেকে সে একটু ভাল তো নরেশের খুকীটার শুরু হয়েছে কাল রাত্তির থেকে।'

'কী সর্বনাশ! কলেরা?'

একটা শৈত্য যেন ওর মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতে থাকে ধীরে ধীরে।

কিন্তু পিছোবার অবকাশ দেন না কাকা। ডাক্তাররা ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছেন, হাতের মধ্যে টাকাও গুঁজে দেওয়া হয়ে গেছে নরেশও এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'চল বাবা, ভিতরে চল। ভয়ের কোন কারণ নেই। একটা ঘরে বন্ধ ক'রে ফেলেছি রোগীকে, তা ছাড়া বাড়িতে যত দূর সম্ভব প্রিকশন্ নেওয়া হয়েছে। আর ঠিক ছোঁয়াচ লেগেও তো হচ্ছে না একই কারণে সবার হচ্ছে বলা যায়। যতক্ষণ যার কনস্টিটিউশন শক্ত আছে সে রোগের সঙ্গে লড়াই করছে যে পারছে না সে আত্মসমর্পণ করছে।'

অগত্যা শুষ্ক মুখে ও শুষ্ক কণ্ঠে প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢোকে। ভাগ্যিস স্টেশনে নেমেই সে কিছু খেয়ে নিয়েছিল খালি পেটে নাকি থাকতে নেই এসব রোগে।

নরেশ বললে, 'আমাদের বাড়িটাই এত দিন ভাল ছিল তার কারণ আমরা র‍্যাশনের চাল খেতুম না। পাড়া তো শেষ হয়ে গেল একেবারে কোন্ বাড়ি থেকে মরে নি?'

'চাল?' থম্‌কে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে প্রশান্ত।

'চাল বৈকি! চাল থেকেই তো হচ্ছে।' ওর কাকা কণ্ঠে জোর দেন, 'কী যে চাল র‍্যাশনে দিতে আরম্ভ করেছে, পচা চাল মেশানো কিংবা অন্য কোন দেশের বিষাক্ত চাল কি না কে জানে—অর্ধেক চাল গলে পাঁক হয়ে যায়, অর্ধেক শক্ত থাকে। যেমন দুর্গন্ধ হয় তাতে, তেমনি অখাদ্য। খেতে বসলে মনে হয় পিণ্ডি খাবার কাজটা ইহজন্মেই সারা হয়ে গেল। আর ঐ চাল খেয়েই তো অসুখ হচ্ছে ঘর ঘর। কী ভীষণ টাইপের কলেরা যে হচ্ছে কি বলব। ধরছে আর চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে শেষ। শুধু তাই, কী এক রকম ঘা বেরোচ্ছে সব ছেলেমেয়েদের—না ফোড়া, না পাঁচড়া—ছোট ছোট অসংখ্য বেরোচ্ছে সকলকার গায়ে, আবার তার সঙ্গে ফোস্কার মতো কি সব বেরোচ্ছে, নানান-খানা। ডাক্তাররা বলছেন, সব ঐ চাল থেকেই হচ্ছে।'

ততক্ষণে ওরা ওপরের ঘরে এসে বসেছে। নরেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আটা তো পাওয়াই যায় না একে, তার ওপর সে যা পাওয়া যায় অখাদ্য। বলে যে, তেঁতুল-বীচি না কি গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আটার সঙ্গে, কি দেয় তা ঈশ্বর জানেন, কোনবার তেতো কোনবার গুমো গন্ধ হচ্ছে—তার ওপর না যায় ভাল ক'রে মাখা না যায় বেলা।...ছেলে-পুলে—ওরাই তো ভবিষ্যৎ বংশধর, ওদের ওপরই পৃথিবীর ভার পড়বে একদিন—কি ক'রে যে বাঁচাব তাই ভাবি। আগে জানতুম ভাতে ভেজাল চলে না, এখন চালসুদ্ধ ভেজাল আসছে—'

প্রশান্ত ভাবছিলনিজের অবস্থাটা—কি করবে, কি ক'রে এদের আতিথেয়-তার হাত থেকে বাঁচবে, সেই কথাটাই তখন থেকে চিন্তা করছে। সে এইবার প্রশ্ন করল, 'সেই চালই তো খাচ্ছেন এখনও?'

'সে চাল কি আর আমরা খেতাম? মাগীরা ঐ দক্ষিণ দেশ থেকে লুকিয়ে ঘুষ দিয়ে বার ক'রে এনে চাল বেচে, তাই কিনি বরাবর বেশী দাম দিয়েও।

মধ্যে ছিল না একদম, তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে চাল না নিলে অন্য র‍্যাশন দিতে চায় না, তাই কিছু নিয়েছিলাম এ হপ্তায়। তাতেই এই বিপত্তি। অবশ্য কাল আবার ভাল চাল কিনেছি, কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গেল।'

কর্তব্যটা এতক্ষণে মনে এল প্রশান্তর। নরেশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, 'খুকীকে কি স্যালাইন দিতে হচ্ছে?'

'না, ঠিক অতটা সিরিয়াস অবস্থা ওর নয়। প্রথম থেকেই ডাক্তার ডাকা হয়েছিল বলে—। এমনি কি সব ইন্‌জেক্‌শ্যন দিয়েছে। এখন একটু ভালর দিকে, যদিও পেচ্ছাপ হয় নি এখনও, তবু ওঁরা বললেন যে ভয়ের কারণটা কেটে গেছে অনেক।'

এইবার ওঁরা প্রশান্তর আগমনের কারণ খোঁজ করলেন। প্রশান্ত ছেলের অসুখ তিলকে তাল ক'রে বর্ণনা করলে এবং জানালে যে তিনটের মধ্যে ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ক'রে সন্ধ্যার গাড়িতেই আবার রওনা হয়ে যেতে হবে তাকে। এ অবস্থায় ওঁদের এই বিপদ দেখে যেতেও অবশ্য ওর ইচ্ছে করছে না কিন্তু সেখানে ছেলেটার যা অবস্থা, লক্ষ্মী একা আছে, সেও পাগলের মতো হয়ে আছে একেবারে—সুতরাং অবিলম্বে তার ওষুধ নিয়ে পৌঁছনো দরকার।

'না না, সে কি কথা, নিশ্চয়ই।' কাকা প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন, 'আমরা তো যা-হোক শহরের মধ্যে রয়েছি, ডাক্তার বলো ওষুধ বলো পয়সা ফেললেই পাব।···বৌমা সেখানে একা আছেন আর বাচ্ছাটার অত অসুখ। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। আমাদের কথা ভেবো না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খুকী ভাল হয়ে যাবেই। ঘাগুলোর জন্যেই যা দুর্ভাবনা—ডাক্তারের পরামর্শ মতো ফলের রসটা বেশী ক'রে খাওয়াতে শুরু করেছি বটে কিন্তু ফল পাওয়া যায় না একে, তার ওপর কী যে দর হয়েছে, কত ফল খাওয়াই বলো! তবু তো আমি মোটা আয় করি, নরেশেরও প্র্যাক্‌টিস্ মন্দ জমে নি—যারা ছাঁ-পোষা মানুষ তাদের কথা ভাব দিকি বাবা! চিকিৎসা করাবারই উপায় নেই! ওষুধ, ভালো ওষুধ খুঁজলেই কালোবাজারে চার-পাঁচ গুণ দাম দিয়ে কিনতে হবে। ওষুধেই এদের জোর বেশী কি না, জানে প্রাণের দায়ে কিনতেই হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশান্তকে স্নানাহার করতে হ'ল। তবে কাকা অবশ্য সত্যিই বাড়ি খুব পরিষ্কার রেখেছেন। ফিনাইল ও ব্লিচিং পাউডারে বাড়ি আচ্ছন্ন, মাছি নেই বললেই হয়; তবু সে বেলা দু'টোর মধ্যে বেরিয়ে পড়ল।

না, আর ফিরে আসবার সময় তার হবে না। ডাক্তারের বাড়ি থেকে

বেরিয়ে যেতে হবে তাকে শ্যামবাজার, সেখানে একটু বিষয়-কর্ম আছে, তার পর যাবে ওর এক বন্ধুর বাড়ি চোরবাগানে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে স্টেশনে চলে যাবে।

কাকা সাবধান ক'রে দিলেন, 'দেখো বাবাজী, দিনকাল ভারী খারাপ। তুমি নতুন মানুষ নও অবিশ্যি, তবু কোথায় যে কি গোলমাল বাধে আজকাল, কিছু বলা যায় না। দেখে-শুনে পথ চলো।'

প্রশান্তর মনের মধ্যে একটা কাঁটা কোথায় যেন খচ-খচ করছিলই। সত্যি, সন্তান ওর কাছে যেমন প্রিয়, আর পাঁচজনের কাছেও তো তেমনি। তাদের আহার এবং ওষুধ নিয়ে জুয়াখেলাটা সত্যিই বড় খারাপ। নিজের ছেলের ম্লান মুখ মনে পড়ছিল আর মনে হচ্ছিল লক্ষ্মীর কথা। কে জানে তার কথাই সত্য কি না তার ঠিক কি—

কিন্তু ডাক্তার চৌধুরীর কথায় আবার সে চাঙ্গা হয়ে উঠল! ডাক্তার বললেন, 'ও অমন হয়ই। উইক্ লিভার, যতটা খাদ্য দরকার ঠিক ততটা নিতে পারছে না তাই শুকিয়ে যাচ্ছে। ও-সব ঠিক হয়ে যাবে। এই ওষুধ দিচ্ছ রোজ দু'বার খাওয়াবেন আর এই য়্যাসিডটা প্রত্যেক বার দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াবেন, কেমন? দশ ফোঁটা ক'রে; দুধ কেটে গেলে ভয় পাবেন না— একটু একটু ক'রে দুধ বাড়ান। এক সের দুধ, দেড় ছটাক মাছ, এক ছটাক মাখন, দু' আউন্স ফলের রস, টোস্ট, ভাত সব গুছিয়ে খাওয়াবেন যেমন লিখে দিচ্ছি তেমনি ভাবে, তিন ঘণ্টা অন্তর। ছেলে আপনার দু' মাসের মধ্যেই মোটা হয়ে যাবে দেখবেন—'

ডাক্তারের কাছ থেকে বেরিয়ে ওষুধ তৈরী করিয়ে প্রশান্ত একেবারে স্টেশনে এসে বসল। কোথাও যাবার কোন প্রয়োজন নেই তার—কলেরার পাড়া থেকে বেরোবার জন্যই ও-সব কথা বলতে হয়েছিল। এইখানেই বেশ থাকবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত। নটায় তো গাড়ি—এটুকু সময় কেটেই যাবে।

যাক—সে নিশ্চিন্ত। 'আসল কথাটা সে বুঝতে পেরেছে। পাপ না ঘোড়ার ডিম। এই য়্যাসিডেই পাপ কেটে যাবে। ওষুধটা সে বেশী পরিমাণেই তৈরী করিয়ে নিয়েছে। কে জানে ওখানের শহরে পাওয়া যাবে কি না, আর সেও যাওয়া-আসা হাঙ্গামা কম না।

পাপ? হুঁ—! মনে মনে হাসে প্রশান্ত। এই তো ডাক্তার যে ফিরিস্তিটি

দিলেন ছেলের খাওয়ার, অস্যাধু উপায়ে পয়সা না করলে কি ক'রে যোগাত সে? আজকালকার বাজারে, সোজা কথা? না, অপরের ছেলে-মেয়ের কি হচ্ছে তা দেখতে গেলে নিজের ছেলে-মেয়েকে বাঁচানো যায় না।

বসে থাকতে থাকতে ওদিকের স্টেশনে কি গাড়ি এসে লাগল। হুড়মুড় ক'রে মেয়েছেলেরা নামতে লাগল কাঁধে বস্তা নিয়ে নিয়ে। সবেতেই চাল আছে বোঝাই, কারুর কাছে আধ মণ, কারুর কাছে পঁচিশ সের, কারুর কাছে বা পুরো এক মণই। টিকিট কেউ করে নি, টিকিট-কলেক্টরদের কত পয়সা দিতে হবে তা জানাই আছে, হাতে বার ক'রে নিয়ে আসছে একে একে—ওদের হাতে গুণে দিয়ে চলে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। টিকিট করলেও এ পয়সাটা ওদের দিতে হ'ত—মিছিমিছি ওটা বাজে খরচ হয় কেন? শুধু তো এরা নয়, পথে গার্ড আছে, সেখানে স্টেশনমাস্টার আছে, পুলিস আছে। এখানেও পুলিস আছে, সিভিল সাপ্লাইয়ের লোক আছে। একটি মেয়েকে ডেকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসাবাদ করলে, মণ-করা তিন টাকা ওদের খরচা হয়। যে কোন লোক ধরলেই হ'ল—তাকে পয়সা দিতে হবে। হাফ প্যান্ট আর খাকী শার্ট-পরা লোক ওদের কাছে বিভীষিকা। বালিগঞ্জ স্টেশনে হিন্দুস্থানী মুটেগুলোসুদ্ধ পয়সা আদায় করে। এছাড়া মধ্যে মধ্যে—অবশ্য সে খুব দৈবাৎ—সিভিল সাপ্লাইয়ের লরী এসে লাগে। দু-চারজনের চাল বাজেয়াপ্তও হয়। কিন্তু সে লোকসানও ওরা খরচের মধ্যে ধরে দাম ফেলে। পোষায়? পোষায় বৈকি! এইতেই তো বেঁচে আছে তারা। এই ভাবে নিয়ে আসার ফলে দেশে দাম বাড়ছে হু-হু ক'রে, তবে অত দেখতে গেলে আর চলে না।

এই তো—প্রশান্ত মনকে সান্ত্বনা দেয়। মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে চোরা কারবার করছে না এমন লোকই নেই। পাপে তো সবাই মরে গেল একেবারে। যত্ত সব—!

স্টীমার থেকে নেমে নৌকো। উদ্বিগ্ন প্রশান্ত কেবল মাঝিকে তাড়া লাগায়, 'ওরে, এমন ভাবে চললে যে রাত শেষ হয়ে যাবে। দিনে দিনে পেঁৗছনো তো হবেই না, রাত দশটার মধ্যেও তো পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

মাঝি সেই হানিফই বটে, ওর বহুদিনের চেনা আর পুরনো মাঝি, কিন্তু তাকে দেখে আর চেনবার উপায় নেই। কঙ্কালসার হয়ে গেছে এই ক'মাসেই, যেন হঠাৎ বুড়ো হয়ে গিয়েছে সে।

একটু ম্লান হেসে হানিফ বললে, 'আর বাবু, একদিন অন্তর এক বেলা জুটছে—কী খেয়ে জলের সঙ্গে লড়ব বলুন দেখি?'

তার পর একটু থেমে বললে, 'ও-সালে ছেলেটার অসুখে যথাসর্বস্ব বেরিয়ে গেল বাবু, কিছু থাকলে কি আর এই কাজ করতাম, চাল আনতে বেরিয়ে গেলে আজ আমার পয়সা খায় কে? আমার চাচা লাল হয়ে উঠল। কিছু নেই, সম্বল না থাকলে চাল কিনব কোথা থেকে? ওদের সঙ্গে ভাড়া খাটতে গেলে কিছু বেশী হয়ত পাওয়া যেত কিন্তু আমার বৌডা আবার যেতে দিতে চায় না কিছুতে, বলে শুধু শুধু ও-পাপে যাবার দরকার নেই। অন্নপাপ মহাপাপ—ভাতের চাল নিয়ে অমন কাণ্ড করতে দেব না তোকে কিছুতেই। ছেলেপুলের ঘর, অত পাপ সইবে না। তাতে একবেলা জোটে ভাল, না জোটে তাও ভাল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হানিফ চুপ করে।

প্রশান্তর হাসি পায় ওর কথা শুনে। সব মেয়েরই ঐ এক বুলি। ভাগ্যিস ও হানিফের মতো দুর্বল-চিত্ত লোক নয়, কোন কুসংস্কারের ধার ধারে না—নইলে ঐহানিফের অবস্থাই হত। যুগের ধর্মকে কি কেউ ঠেকাতে পারে? একা সে পুণ্যবান হলে আর বাঁচতে হবে না। টাকাই সব।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পাঁচ-সাতটা নৌকো যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ওধারের খাল থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল ওদের সামনেই। বড় বড় নৌকো—নিশ্চয়ই চাল বোঝাই। সেই অন্ধকারের মধ্যেই প্রাণপণে উৎসুক চোখে চেয়ে থাকে প্রশান্ত, আর মনে মনে হিসাব করে, কত চাল আছে সব কটা নৌকোয়, কতটা আয় হবে এবারের যাত্রায় ওদের—সবসুদ্ধ!···

বলা বাহুল্য, ডাক্তার চৌধুরীর ওষুধ আর খাদ্যতালিকায় খোকন সেরেই ওঠে ক্রমে ক্রমে।

প্রশান্ত লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বিজয়গর্বের হাসি হাসে, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে পাপের পয়সাতে ছেলে সেরেই ওঠে। কি বলো?'

নীলামটা সে নিজে ডেকে নেয় নি কেন, মনে মনে আপসোস করে প্রশান্ত। তা'হলে সব লাভটাই ওর হতে পারত। মিছিমিছি ঐ বুড়ো লোচন চক্রবর্তীটা—

সুদূর কলকাতার কলেরা আর অজানা চর্মরোগের স্মৃতি মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে কবে। এই সুযোগ পয়সা রোজগারের। ওর ছেলে সুস্থ থাকলেই হ'ল।

শুধু লক্ষ্মীর মন এখনও সন্দেহদোলায় দোলে। এতকালের সংস্কার ও ধারণা ওর মনে বার বার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিবেক বলে একটা কি অদৃশ্য শক্তি আজও ওকে পীড়া দেয় অন্তরে অন্তরে। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না কার ধারণাটা ঠিক—তার, না তার স্বামীর?

আদিপর্ব

হরকিষেণ দাস ভুতোরিয়া তাঁর জীবন-যুদ্ধ তথা এই অবিশ্বাস্য উত্থানের কথা সগর্বে সকলকে শোনাতেন বারবার—আর তা শোনাবার মতোই তো—কেবল একটি কথা ছাড়া। তিনি যে বাঙালী, এই সামান্য তথ্যটুকু ভুলে যেতে কখনও ভুল হয় নি তাঁর।

হরকিষেণ দাসের পিতা ছিলেন তাঁর জীবনের আদিপর্বে সামান্য একটি ছোট্ট মুদিখানার মালিক। বরানগরের এক গলির মধ্যে খাপরার চালের ঘর, তাতেই চাল ডাল আলু ডিম থেকে কিছু মশলা, মায় মুড়ি মুড়কি সবই রাখতেন! তাঁর নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না—'লালার দোকান' বলেই জানত সবাই। গৃহিণীদের অগোছালো স্বভাবের জন্য রাঁধতে বসলে একটা না একটা কিছুর অভাব পড়েই, আর তখনই 'যা তো একবার লালার দোকানে—দু' পয়সার সর্ষে নিয়ে আয়। পয়সা? ওবেলা দেবোখন। অথবা পাঁচ-ফোড়ন, কিংবা আলু।'

এইভাবেই তিনি কি টাকা জমিয়েছিলেন তা কেউ জানে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামায় নি কখনও। হঠাৎ পঞ্চাশ সালে মন্বন্তরের বাজারে এ দোকানে ঝাঁপ টেনে দিয়ে এক উকিলবাবুর নিচের তলা ভাড়া নিয়ে যখন কাপড় আর চালের কারবার শুরু করলেন, তখনই সবাই চমকে উঠল।

উকিলবাবু ভাড়া একটু বেশিই চেয়েছিলেন, ত্রিশ টাকার অনেক কমে ঐ পাড়ায় অমন তিনখানা ঘর ঢের পাওয়া যেত তখন কিন্তু উকিলবাবুর বাড়ি ভাড়া নেওয়ার মধ্যে অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সরকার জুলুম করলে উকিলবাবু নিজেরই প্রাণের দায়ে তা ঠেকাবেন।

তবে সরকার জুলুম করেন নি। বছর দুইয়ের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠে বড় ব্যবসার দিকে হাত বাড়ালেন রণছোড়লালজী। (বলা বাহুল্য এ নাম

শিতে হয়েছিল উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—আসল নাম ছিল ঝণ্ডুলাল), কাপড়ের ব্যবসায় বড় মাপের হাত লাগালেন।

কিন্তু এই সময় অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো।

বহু লোককে ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত করে টাকা করেছিলেন রণছোড়জী, নিজের ছেলে ভালভাবে খাবে বলে—কিন্তু ছেলের ভাগ্যে সে সুখভোগ ছিল না।

স্বাধীনতা উৎসবে বাজী তৈরী করতে গিয়ে ওঁর একুশ বছরের ছেলে বিস্ফোরণে প্রাণ হারাল।

একমাত্র ছেলে।

বিয়ে দেবেন সব ঠিক। আগেই দিতেন, নতুন মর্যাদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বড় ঘরের মেয়ে আনবেন, এই জন্যেই অপেক্ষা করেছেন। বনেদী বড়লোকরা এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বড়লোকদের একটু নিচু চোখেই দেখে। তবু শেষ পর্যন্ত জালানদের বাড়িরই মেয়ে পাওয়া গিছল, কিন্তু সে বধূ তলাসীর আগেই বর চলে গেল।

এর পর স্বামী-স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে উঠবেন এ স্বাভাবিক। স্ত্রীই বেশি। তিনি ভাল ভাল কাপড় গয়না রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করলেন। তাঁকে সামলাতেই ঝণ্ডুলাল তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন একটি বৃদ্ধা দাসী সঙ্গে নিয়ে।

বহু তীর্থে ঘোরার পর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা ঝণ্ডুলালের—ছেলে তো গেছেই, কারবারটা কেন যায়? কর্মচারীরা কি করছে কে জানে। কিন্তু গৃহিণী রাজী হলেন না—তিনি বললেন, 'তিনি আর একবার কাশী যাবেন। রাত্রে স্বপ্ন পেয়েছেন বাবা বিশ্বনাথ যেন কাশী যাবারই আদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় ওখানে কোনো বড় সাধুর দেখা পাবো—যিনি আমায় মুন্নাকে দেখাতে পারবেন। সত্যিই তো, অত বড় তীর্থ, বাবার স্থান, কাশী বলে পৃথিবীর বাইরে—শুনেছি ওখানে কখনও সাধুর অভাব হয় না।'

'হ্যাঁ, ঋষিকেশ হরিদ্বার পুষ্কর ঘুরলে, কত সাধুর পায়ে পড়লে—তাতে হলো না, কাশীতে সাধু পাবে। আজকাল কাশী মানেই চোর-জোচ্চোর-বদমাইশের জায়গা!···ওধারে কী হচ্ছে তার ঠিক নেই—'

স্ত্রী সংক্ষেপে বললেন, 'বেশ, আমাকে বনারসে নামিয়ে দিয়ে তুমি কলকাতা চলে যাও, আমি একাই বেশ যেতে পারব!'

সত্যিই কিছু তা সম্ভব নয়—শোকাতাপা মহিলাকে—বিশেষ যার কাছে টাকাকড়ি থাকবে, কাশীর মতো জায়গায় একা ছেড়ে দেওয়া। অগত্যা স্বামীকেও নামতে হলো।

প্রথম দিন স্নান সেরে মন্দিরে যাবেন পুজো দিতে—মন্দিরে ঢোকার আগেই বড় দরজাটার কপাটে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রমহিলা, 'কেন বাবা আমার ছেলেকে কেড়ে নিলে অমন ভাবে, আমি তো কোনো পাপ করি নি। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও বাবা—তোমার মহিমা লোকে দেখুক।'

বহুক্ষণ কেঁদে শ্রান্ত হয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—ঐভাবে ওঁকে কাঁদতে দেখে পূজার্থীরা অনেকেই দাঁড়িয়ে গেছেন, কেউ কেউ সমবেদনায় চুকচুক শব্দ করছেন, ঝণ্টুলালের লজ্জার সীমা নেই—'একটা পাঁচ-ছ বছরের ছেলে, হাফপ্যাণ্ট পরা, প্রায় দিগম্বর, মহিলার আঁচলটা চেপে ধরে ডাকল, 'মা-মাই গে!'

কবিদের ভাষায় বিদ্যুৎপৃষ্টের মতোই চমকে উঠলেন, এবং ছেলেটাকে দেখে একেবারে বুকে তুলে নিলেন।

এই—এই জন্যেই বাবা স্বপ্ন দিয়েছেন, বাবাই একে পাঠিয়েছেন।

মহিলা নিঃসংশয় একেবারে।

কে এ, কাদের ছেলে, হারিয়ে গেছে কি না, এর বাবা মা হয়ত একে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, একে নিয়ে গেলে পুলিস কেস হবে—এসব সামান্য তথ্য প্রবল ইচ্ছার বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন মহিলা।

দর্শনেও আর গেলেন না, বাবা ওর কান্নার পুজা গ্রহণ করেছেন, এই বিশ্বাসে নবলব্ধ ছেলেকে বলতে গেলে আঁচল ঢাকা দিয়ে নিয়ে দ্রুত বাঁশ-ফাটকার পথ ধরলেন। অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি গাড়ি বা রিকশা পাওয়া যায় বাসায় ফেরবার। সঙ্গে দাসীটির হাতে অনেক খুচরো টাকা-পয়সা দিয়ে, 'তুই সকলকে ভিক্ষে দিতে দিতে আয়'—বলে এগিয়ে গেলেন। পয়সা কাড়াকাড়িতে সকলের মনোযোগ সেদিকেই যাবে এটুকু তিনি জানতেন—এ জ্ঞান ব্যবসাদার গৃহিণীর মজ্জাগত।

বাসায় ফিরেও অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন ঝণ্টুলাল, কী জাতের ছেলে, কাদের ছেলে তার ঠিক নেই; অজাত কুজাত তো বটেই, নইলে অমন

উদোম আতুড় গায়ে ঘুরে বেড়াবে কেন, ভিখিরীর ছেলেই হবে, কে জানে কেউ কোনো বদ মতলবে লেলিয়ে দিয়েছে কিনা—সব খবর পেয়ে লুঠতরাজ করবে, কি পুলিস এনে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গৃহিণীর ঐ এক কথা। বাবা দিয়েছেন, তার আবার জাত কি, অত বিচারই বা কি!

ছেলেটাকে নাম জিজ্ঞেস করলে বলে, টুকু। আর কিছু জানে না। অনেক জেরা করে, ওর অসংলগ্ন কথা থেকে যা জানা গেল, ওর আগের কথা কিছু মনে নেই। বছর দুই হলো একদল লোকের সঙ্গে ঘুরছে। একজনের নাম বুধন, আর একজনের নাম নীলু, এই জানে সে। খেতে দিত কিন্তু জামাকাপড় দিত না। যখন-তখন মারত। এই ভাবে ছিল। কোথায় একটা কি ইস্টিশানে এনেছিল; কোথাও যাবে বলে। ও ঘুমিয়ে আছে মনে করে তারা গল্প করছিল নিজেদের মধ্যে ট্রেনে, কে একজন আসবে তার কাছে ওকে বেচে দেবে। সে ওকে কানা করে ভিখিরী বানাবে। সেই শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল। গাড়ি আসতে ওরা বোধহয় সেই লোকটাকে খুঁজছে—ও ছুটে পালিয়ে গিয়ে পেছনের দিকে একটা গাড়িতে উঠে পড়েছে। তারপর এখানে সবাই হুড়হুড় করে নেমে পড়ছে দেখে এখানেই নেমেছে। সে গতকালের কথা, তখন থেকে ঘুরছে। খাবারের দোকানে ভিক্ষে করে কাল কিছু খেতে পেয়েছিল। গঙ্গার ঘাটে একটা সাধু থাকে। তার কাছে রাত্রে শুয়ে ছিল। সেই সাধুই ওকে বিশ্বনাথের গলির সামনে এনে বলেছে, আগে গিয়ে মন্দির পাবি। সেখানে ভাল বড় ঘরের মেয়েছেলে দেখলে 'মা' বলে ভিক্ষে চাস, অনেক পাবি। চাই কি কেউ আশ্রয়ও দিতে পারে।

এই সাধুর নির্দেশকেও বিশ্বনাথের কৃপা বলে ধরে নিলেন ভদ্রমহিলা, স্বামীর কোনো কথাতেই আর কান দিলেন না।

তা ভদ্রমহিলা যে কিছুমাত্র মন্দ কাজ করেন নি, বছর কতক পরে রণছোড়জীও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

লেখাপড়া অবশ্য বেশি কিছু হয় নি। সে চেষ্টাও করেন নি ঝণ্ডুলাল। ঘরে মাস্টার রেখে পড়িয়েছিলেন, অঙ্ক, ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী। তারপর বছর দশেক বয়স হতেই দোকানে নিয়ে যেতে শুরু করলেন।

এইবার তাক লেগে গেল কর্তার। ব্যবসায় এমন সহজাত আশ্চর্য প্রতিভা

আর কারও মধ্যে দেখেন নি এতখানি বয়সে। যেমন খদ্দেরদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার, তেমনি সময় বুঝে মধুর মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া—মুখে মুখে বড় বড় হিসেব করে ফেলা—মনে হয় পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জন্মেছে ছেলেটা। নিশ্চয় আগের জন্মে কোনো বড় শেঠ ছিল।

বিশ্বনাথের দান, কিন্তু ঝণ্ডুলাল এক বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, সেই জন্যেই নাম রাখা হয়েছিল হরকিষেণ।

হরকিষেণ পনেরো বছর বয়সেই এ দোকানের সম্পূর্ণ ভার নিল, বছর দুইয়ের মধ্যে কারবার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলল। কুড়ি বছর বয়সেই বাপকে বুঝিয়ে নতুন দুটো ব্যবসায় হাত দিল। টাকা এই ছেলেরই রোজগার বলতে গেলে—বাধা দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না।

মা এবার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ছেলের।

সে ব্যবস্থাও ছেলেই করে নিল। এক বড় ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ওদের ওখানে এসেছিলেন একটা দুষ্প্রাপ্য কী জিনিসের খোঁজে, কাশ্মীরী হাল্‌কা কম্বল বা ঐ ধরনের কিছু—এটা হরকিষেণের নতুন দোকান—অত অল্পবয়সী ছেলের প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি, আশ্চর্য কথাবার্তা দেখে আকৃষ্ট হলেন। ঠিকানা নিয়ে পরের দিনই পুরনো দোকানে গিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও।

বাবা তো অবাক। পরিচয় পেয়ে বললেন, 'বাপ রে, আপনি ক্রোড়পতি, আমি সামান্য লোক—আমার ঘরে মেয়ে দেবেন!'

'আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি ক্রোড়পতি হতে ওর বিশেষ দেরি হবে না। মেয়ে দেখতে খুব খারাপ নয়। আমি কলকাতাতেই একটা বাড়ি লিখে দেব—জামাইকেই লিখে দেব—আর ও যদি বড় কারবারে যেতে চায়—আমি সাহায্য করব।'

ভীরু বৃদ্ধ পরে একসময় স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও শেঠজীকে ছেলের প্রাপ্তি-রহস্য জানিয়েছিলেন। ওঁর নিজের ছেলে নয়, কুড়িয়ে পাওয়া। জাতকুল কিছু জানেন না, বিশ্বনাথের দান বলেই নিয়েছেন ওঁরা।

'আর কেউ জানে? মানে আমাদের দেশী লোকের মধ্যে?'

'না।'

'জেনেও দিয়েছেন?'

'নিশ্চয়।'

'ব্যস। আমিও বিশ্বনাথের দান বলেই মেনে নেব। পোষ্যপুত্র তো লোকের বাপের গোত্র ধরেই কাজ করে!'

এইবার হরকিষেণ তাঁর আশ্চর্য প্রতিভায় বিকশিত ও উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতি হয়ে উঠলেন।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে দুটো বড় কারখানা স্থাপিত হলো—বিরাট মূলধন নিয়ে। ওঁর শক্তির কথা ছড়িয়ে যেতে ওঁর কারবারে টাকা লগ্নী করার লোকের অভাব হয় নি।

ওঁর এই সাফল্যের মধ্যে একমাত্র দুঃখ এই, মা এতটা দেখে যেতে পারলেন না।

এই একটি মানুষকে হরকিষেণ দাস সত্যি সত্যিই ভালবাসতেন এবং দেবীর মতো ভক্তি করতেন—বাবাকেও ভক্তি করতেন তবে এতটা নয়। অবশ্য মা খুশি হয়েছেন ওঁর সাফল্যে। তাঁর অনুমান যে মিথ্যা নয়—সত্যিই এ ছেলে বিশ্বনাথের দান—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এই ভেবে তৃপ্ত হয়েছেন —যেটুকু সাফল্যলাভ করেছিলেন হরকিষেণ দাস তাই দেখেই।

বাবাও মারা গেলেন ঠিক যেদিন মীরাট থেকে রুড়কী যাবার পথে এক হাজার একর জমি কেনা সম্পূর্ণ হলো—সেই দিনই। এইখানে মোদী নগরের মতো একদা ভগবতী নগরে গড়ে উঠবে তাঁর বিবিধ কারখানার কমপ্লেক্স—মা ভগবতী দেবীর নামে এই তাঁর সঙ্কল্প ও স্বপ্ন। তবে বাবা কথাটা শুনে গেছেন, 'পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদও করে গেছেন, বলেছেন, সব থেকে খুশি হবেন বেটা তোর মা, স্বর্গ থেকে তোকে রক্ষা করবেন—এখন বুঝছি তাঁরও সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশেই জন্ম ছিল।'

এই জমি কেনা যেদিন শেষ হবে—অর্থাৎ দলিল হবে,সেইদিনই তিনি কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পূজো দিয়ে আসবেন—এ সঙ্কল্প ওঁর ছিলই। আর কিছু না—যদি স্বর্গ থাকে, মা খুশি হবেন এই ভেবেই।

কিন্তু রণছোড়জীর দেহান্ত হতে জিনিসটা পিছিয়ে গেল। মারা গেলেন তিনি কলকাতার বাড়িতেই, এখানে শ্রাদ্ধশান্তি করলেন খুব ঘটা করেই—এছাড়া যেখানে যেখানে ওঁর কারখানা বা কারবার আছে, সেখানেও সব

কর্মীদের পরিতোষ সহকারে 'ভোজনের' ব্যবস্থা হলো। ব্রাহ্মণদের গরদের জোড় দিয়ে বিদায়, কাঙালী ভোজন, কোনোটারই ত্রুটি ঘটল না। হাসপাতালে হাসপাতালে ফল ও মিষ্টান্নও পাঠালেন স্ত্রীর নির্দেশে।

এইসব হাঙ্গাম চুকতে না চুকতে ওঁকে দিল্লী আসতে হয়েছিল। ওখানেই হেড-অফিস এখন, বিরাট দশতলা বাড়ির তিনতলা জুড়ে অফিস। বড় সাহেবের খাস কামরায় আসল বোখারার কার্পেট পাতা, সুন্দরী শিক্ষিতা সেক্রেটারী, আরও সুন্দরী রিসেপ্‌সনিষ্ট। এছাড়াও কিছু কিছু মেয়ে রেখেছেন মাইনে করে। 'অফিসার লোগ'দের মনস্তুষ্টির জন্য মদ ও মেয়েমানুষ দুটিরই প্রয়োজন হয়। নিজে অত নিচে নামেন না—সেক্রেটারি ও রিসেপ্‌সনিষ্টতেই কাজ চলে যায়। তাদের এতই টাকা দেন—মাইনের বাইরে অবশ্য ; রেট খারাপ করা উচিত নয়—যে তারা ক্রীতদাসীর মতোই বাধ্য। যে কোনো রকমে তাঁর তুষ্টি বিধান করতে ব্যগ্র তারা। বাইরে গেলে একজনকে সঙ্গে নেন, নিজে গাড়ি চালিয়ে যান বেশ কিছু দূরে যেতে হলেও, তারা স্বেচ্ছায়, পথে যেতে যেতেই তাঁর শ্রম অপনোদন ও চিত্তে আনন্দ দান করে নানা নূতন নূতন উপায়ে।

কিন্তু তাই বলে তিনি এদের কাউকে মাথায় চড়তে দেন নি, পায়েই রেখেছেন, রূপোর চাবুকেই দুরস্ত থাকে তারা।

দিল্লী আসবার এবার যেটা জরুরী প্রয়োজন—একটা এক্‌স্‌প্লোসিভের কারখানার পারমিট আদায় করা। কদিনে বহু পিপে বিলিতী সুরা, অনেক-গুলি মেয়ে এবং কয়েক লক্ষ টাকা খরচ ক'রে—অনেকখানি আশ্বাস পেয়ে হৃষ্ট-চিত্তে এবার হরকিষেণ দাস কাশী যাত্রা করলেন।

বাঙালী কর্মচারী ও বন্ধুরা বলতে এসেছিলেন, আপনার এখন কালাশৌচ, মন্দিরে যাওয়া উচিত নয়। উনি বলেছিলেন, শিবের মন্দিরে যেতে দোষ নাই। তাছাড়া আমি তো এই প্রথম যাচ্ছি না।

আসল কথাটা বলা গেল না বলেই এত কথার অবতারণা।

দর্শনের আগে গঙ্গায় স্নান করতে হবে। ওঁর আগমনবার্তা রটে যেতে তো দেরি হয় না—যেমন ভিক্ষার্থীর ভিড়, তেমনি অন্য কৌতূহলীরও। ঘাট-পাণ্ডাদের মিলিত চেষ্টায় কোনোমতে স্নান সেরে উঠে এসে, সঙ্গী পুরুষ সেক্রেটারিকে (এইটেই আসল একান্ত সচিব— মেয়েছেলে শুধু আপিস

সাজানো আসবাব—উনি বলেন) বললেন', এবার এদের কিছু কিছু ভিক্ষা দিয়ে ভিড় কমাও।'

অবশ্যই সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে তারা, একই লোক বহুবার ঘুরে ফিরে আসে। তা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই কেজিয়া-মারামারি পর্যন্ত। তিন-চারজন সেক্রেটারি উত্তমপ্রসাদকে সাহায্য করছিলেন তবু—সামলানো শক্ত।

হরকিষেণ দাস একটু দূরে সরে গিয়ে তামাশা দেখার মতোই দেখেছিলেন। এ এক আশ্চর্য তৃপ্তি। এমন সুযোগ যে তাঁর জীবনে কোনোদিন আসবে তা কে ভেবেছিল।

আবার মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিকও দেখছিলেন—তার মধ্যেই সহসা চোখ পড়ল কয়েক ধাপ ওপরের সিঁড়িতে এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর দিকে।

রোগশীর্ণ চেহারার বুড়ি' বোধ হয় পক্ষাঘাতে পা দুটো অচল হয়ে গেছে—শুকিয়েও গেছে ক্রমশঃ—আকুল হয়ে কী সব বলছে, বোধ হয় ভিক্ষাই চাইছে, দাতার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে—কিন্তু ঐ হৈ-চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে তা তাঁদের কানে যাবে কেন!

বড়ই দুর্দশা। কত বয়স তা কে জানে, দেখলে তো মনে হয় দুশো বছর হয়ে গেছে। মাথার চুল শণের নুড়ি, চোখ কোটরগত, গায়ের চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে দোমড়ানো কাগজের মতো হয়ে গেছে, দাঁত নেই একটাও—মুখখানা গহ্বরের মতো, তা দিয়ে যথেষ্ট শব্দ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করারও শক্তি নেই দেহে।

সত্যিই কি এত বয়স হয়েছে বুড়ির?

না। হরকিষেণ দাস জানেন, তা হয় নি।

শুধু এই জীবন্ত কঙ্কালের জীবনধারণ চেষ্টার ব্যর্থ সকরুণ প্রচেষ্টার জন্যেই কি এমন ভ্রূ কুঁচকে একদৃষ্টে চেয়ে নেই।

মানুষটাকে চিনতে পেরেছেন তিনি।

তীক্ষ্ণ প্রখর দৃষ্টি হরকিষেণের, তার চেয়েও বিস্ময়কর তাঁর স্মৃতিশক্তি। তিন সাড়েতিন বছরের কথাও তাঁর মনে আছে। এ মানুষটাকে তো তিনি শেষ যখন দেখেছেন তখন তাঁর বয়স ছয়।

ভুল হবার কোনো কারণ নেই।

ওঁর গর্ভধারিণী মা।

হ্যাঁ, চোখের ওপরের ঐ আঁচিলটা ভুলে যাবার কোনো কারণ নেই। বড় আঁচিলের পাশে আর একটা ছোট আঁচিল—এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন। এমনভাবে আর কারও সঙ্গে মিলবে তা সম্ভব নয়।

মনে আছে বৈকি, সবই মনে আছে।

নিজের কাহিনী এই মা-বাবাকে যা বলেছিলেন, তার অনেকটাই সত্য, তবে সবটা তো বলেন নি। সেই বয়সেই বুঝেছিলেন, বলা যায় না। বলা উচিত নয়।

ওদের দেশ মেদিনীপুরের দিকে কোথায়।

পঞ্চাশ সালে চাল কেনার তাগিদে যখন সামান্য যা জমি মায় ভিটে পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়, তখন ওর সেই জন্মদাতা বাবা হাঁটা পথে কলকাতায় চলে আসে, ভিক্ষা বা কর্মের খোঁজে। এমন অনেকেই এসেছে তখন, হাজারে হাজারে, অথচ তখনও মার্কিন পয়সা বাতাসে উড়তে আরম্ভ করে নি। টুকু ওঁর ডাক নাম, এটাও সত্য—টুকু তখন এক বছরের।

তারপর উপবাস, অর্ধ উপবাস, হতাশার, কান্নার দীর্ঘ ইতিহাস। বাবা মারা গেল, মা ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে অসাধ্যসাধনে লাগল।

শেষে তার নিজের শরীরের অবস্থা এমন হলো যে উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘোরে—কাজ করবে কি। দিনরাতের চাকরি তখন মিলছে, লোকের হাতে পয়সা আসছে ভাল রকমই। কিন্তু ছেলেসুদ্ধ কেউ রাখতে চায় না। শেষে একটি বৌ—কিছুদিন ধরে চেনাজানা হয়েছে, তার স্বামী বদলী হয়ে যাচ্ছে গোরখপুর—প্রস্তাব করল, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমাকে খাওয়া পরা ছাড়া ত্রিশ টাকা মাইনে দেব। ছেলেটাকে কারও কাছে রেখে যাও, তুমি তাদের টাকাটা পাঠিও, যারা রাখতে রাজী হবে তাদের।

ওর মা আবার শুরু করল দোরে দোরে ঘোরা। কিন্তু পাঁচ-ছ বছরের ছেলে কে রাখবে? সবাই বলে, তিরিশ টাকায় কি আজকাল খাওয়া পরা হয় একটা ছেলের? ও আমাদের কোনো কাজেও লাগাবে না—পাঁচ-ছ বছরের ছেলে কি কাজ করবে? মিছিমিছি একটা দায়িত্ব—ছেলে কোথায় পালিয়ে যাবে কি করবে—তুমি আমাদের দায়ী করবে।

রাজী হয়ে গেল বুধন বলে এক হিন্দুস্থানী গোয়ালা। তার খাটাল যাদবপুরের দিকে কোথায়—বহু জায়গায় দুধ যুগিয়ে বেড়ায়। মন্দ লোক বলে খাটাল-টাটাল কিছু নেই-শিয়ালদা বাজার থেকে দুধ কিনে যোগান দেয়।

সে আর তার এক অ্যাসিস্টাণ্ট দুজনে মিলে রোজহুর দৈনিক এক মণ দুধ যোগান দেয়।

সে বললে, বুড়ি মা, আমার কাছে রেখে যাও। তোমায় কিছু পাঠাতে হবে না। আর কিছু না পারুক, গোবর কুড়োতে পারবে তো। আমার ওখানে ঢের লোক খায়— একটা বাচ্ছা খাবে, সে কেউ টেরও পাবে না। ডাল ভাত একটু দুধ, এ আমি দিতে পারব।

ওর মা বুধনকে অজস্র আশীর্বাদ করে ছেলেকে ওর হাতে সঁপে দিল।

কিন্তু কোথায় বা সে খাটাল আর কোথায় বা গয়লা বাড়ি।

এরা নিয়ে গিয়ে এক পুরনো বস্তি অঞ্চলে একটা আরও পুরনো খালি বাড়ির একটা ঘরে পুরে চাবি দিল। পরে জেনেছিলেন হরকিষেণ পাড়াটাকে বাগমারি বলে। ঘরে একটা চৌকি, তার ওপর একখানা ছেঁড়া তোশক পাতা ছিল। বুধনের অ্যাসিস্টাণ্ট এসে একবার সকালে 'বাইরে' অর্থাৎ পাইখানায় নিয়ে যেত—স্নানটান তো ওদের বোধহয় কল্পনার অতীত—আর একটা কলাই-করা কাঁসিতে খানিকটা ডেলা পাকানো ভাত আর একটা তরকারি দিয়ে যেত, রাত্রের জন্যে তখনই রেখে যেত খান তিনেক রুটি। একটা হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল আর একটা খালি মাটির গামলা। বলে দিত, ঝাড়া ফিরতে বা পিসাব করতে হলে ওতেই করবি। লেকিন মনে থাকে যেন, সবেরে তোকেই সাফ করতে হবে!

বেশি কিছু বললেই বড় একটা ছোরা দেখাত।

সবচেয়ে কষ্ট হতো শিশু টুকুর রাত্রিবেলা। যেমন বুকচাপা অন্ধকার, তেমনি মশা। অন্ধকারে খালি বাড়িতে কত কি মনে হতো, ভূত প্রেত রাক্ষস—গল্পে শোনা মার কাছে যত রকম ভয়ের কথা মনে পড়ত।

তবে বেশিদিন ভুগতে হয়নি। তিন দিন মোটে। তারপরই ওরা তাকে নিয়ে ট্রেনে চেপেছিল। গয়া লাইনের গাড়ি—পরবর্তী জীবনে সে স্টেশনটা দেখেছেন হরকিষেণ, সাসারামের কাছে একটা ছোট স্টেশন।

সেইটেই ভুল হয়েছিল। ডাকগাড়ি ওখানে দু মিনিট থামে। নির্জন বলে ওখানের কথাই ভেবেছিল ওরা। ভিড়ের মধ্যে লোক উঠতেও যেমন দেরি লাগে, নামতেও তেমনি। সেইটুকু উৎকণ্ঠা এবং অনুসন্ধানের অবসরে টুকু পালিয়েছিল।

তারপর—টুকু এদের কাছে যা বলেছিল সব সত্যি। কাশীতে এসে

ঘুরতে ঘুরতে চেয়ে চিন্তে কিছু খাবার পেলেও তাতে পেট ভরে নি। ঐ সাধু তাকে রাত্রি পর্যন্ত ঐ ভাবে ঘুরতে দেখে ডেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পেট ভরে খাইয়েছেনও। রাত্রে কাছে নিয়ে শুয়েছেন। এতটার বদলে তিনি যদি কিছু আরাম আদায় করে-থাকেন সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হরকিষেণও ধরেন নি। পরে খোঁজ করে ছিলেন সাধুর—তাঁকে একটা মন্দির বানিয়ে দেবেন বলে, কিন্তু সাধু তার আগেই দেহ রেখেছেন।

অতীত স্বপ্নের মধ্যে কিছুটা সময় কেটে গেছে তাতে ভুল নেই, সঙ্গীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই।

তবে সে খুবই অল্প সময়। স্মৃতি মানুষের মনে ফিল্মের চেয়েও দ্রুত সরে সরে যায়।

উনি ঘুম ভাঙার মতো একবার মাথাটা নাড়া দিয়ে নিয়ে ডাকলেন বিজয়বাবু।

একটি তরুণ ছেলে-তরুণ হলেও পুরনো কর্মচারী, কর্মদক্ষ বলে মালিকের প্রিয় এগিয়ে কাছে এল, বলুন স্যার।

ঐ যে বুড়িটাকে দেখছেন, একটা ডুলি ডেকে এনে তাতে চাপিয়ে—না না, আপনাকে হাত দিতে হবে না, ডুলিওলাদের যথেষ্ট পয়সা দিলে তুলে নেবে—এখানকার কৌড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যান।

কৌড়িয়া হাসপাতাল মানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—স্বামীজীদের আমার নাম করে বলুন, একে একটু আশ্রয় দিতে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। বলবেন আমি বলেছি, সেজন্যে যা খরচা হয়, সব আমি দেব, আমি থোক পাঁচ দশ হাজার দিয়ে দেব। বাকি জীবনটা যাতে একটু আশ্রয় আর দুটি ভাত পায় তাঁরা যেন দয়া করে ব্যবস্থা করে দেন।…এই নিন, তিনশো টাকা দিয়ে দিলাম, যা খরচা দরকার হয় করবেন, কোনো সঙ্কোচ করবেন না।

একজন সঙ্গী বললেন, 'আপনার চেনাজানা নাকি কেউ হুজুর?'

কঠিন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন হরকিষেণ, 'কেন চেনাজানা না হলে কাউকে কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য করতে দেখেননি নাকি?'

প্রশ্নকর্তা কুঁকড়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন।

ঘাটিয়াল বলল, 'লেকিন হুজুর, ওকে এক ভিখিরী এনে বসিয়ে দিয়ে যায়—সে যদি খবর নেয়—কী বলব?'

'আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তাকে হাজতে পোরার ব্যবস্থা করব। এই বুড়ি পঙ্গু মানুষকে দিয়ে রোজগার করায়—কী কষ্ট পায় বুড়ি। দ্যাখো এখনই পাথর তেতে উঠেছে—ওর নড়বার ক্ষমতা নেই, বসে বসে পুড়বে। তাকে আমি জেলে দিয়ে ছাড়ব তবে আমার নাম।'

ঘাটিয়ালও ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন হরকিষেণ। তৃপ্তিলাভ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই, তবু মনে একটা দুশ্চিন্তা উঁকি মারছে—এতে ওর সেই আসল মা, ভগবতী মা সাক্ষাৎ, তিনি বিরূপ হচ্ছেন না তো?

মনে মনেই বলেন, না, মায়ী বুঝদার। বুঝবেন। ঐ গর্ভধারিণী মা অমন ভাবে ত্যাগ না করলে তো আমি তাঁকে পেতাম না। তিনিও আমাকে পেতেন না।

অস্ফুট কণ্ঠে বলেও ওঠেন একবার, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, তুমিই আমাকে ওঁর কাছে পাঠিয়েছ—তুমিই বুঝিয়ে বলো। তিনিই আমার যথার্থ মা, তিনি গোঁসা না করেন।'

মেয়ে

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—এই ইংরেজী প্রবাদটি বোধ করি ভগবানের বেলায়ও প্রযোজ্য। এ সংসারের কাণ্ডকারখানা দেখলে অন্তত সেই বিশ্বাসটাই দৃঢ় হয়। আসলে তাঁর সৃষ্টির কাজ ফুরিয়ে গেছে, এখন যেটুকু টুকটাক হচ্ছে সেটুকুর জন্যে তাঁকে আর দরকার হয় না, চালু কারখানার মত কতকটা আপনিই চলছে সে কাজটা—ফলে ভদ্রলোকের হাত একেবারে খালি। তাই এখন তিনি কেবল সদা-সর্বদা ফিকিরে থাকেন—কোথায় কি অঘটন ঘটিয়ে দিয়ে মজা দেখতে পারেন। অর্থাৎ স্বভাবটা দাঁড়িয়েছে তাঁর কতকটা আমাদের প্রমথবাবুর মত। কোথাও একটা ছোটখাটো 'মিসচীফ্' বাধাতে পারলে আনন্দের আর অন্ত থাকে না। নইলে এমন সব্ কাণ্ড হবে কেন বলুন!

কেউ ছেলের জন্য মাথা কুটছে—তার ঘরে আসছে সার সার মেয়ে;

আবার কেউ কেউ একটা মেয়ের জন্তে ব্যাকুল, তার ঘরে জন্মাচ্ছে সব ক'টিই ছেলে। যে খেতে দিতে পারে না, তার ভাগ্যে ঘটছে বছর বছর সন্তান-লাভ —আর দেখুন যে, কত ধনী গৃহিণী নিদেন একটি কানা-খোঁড়া ছেলের জন্তেও হাহাকার করছেন, তাবিজ মাদুলী কবচে হাজার হাজার টাকা অম্লানবদনে তুলে দিচ্ছেন রাজ্যের ঠগ জোচ্চোরদের হাতে—তবু তেমন একটিও পাচ্ছেন না তিনি।

এই তো দেখুন না আমাদের হাতীবাগানের সরলবাবু। ভদ্রলোকের ঘরে লক্ষ্মী আসছেন যেন যেচে—দোর ঠেলে। এমন কিছু ব্যবসায় বুদ্ধি নেই, সে বুদ্ধির দাবীও করেন না, তবু বছর বছর ছু'খানা করে বাড়ি কলকাতা শহরে কিনতেই হচ্ছে তাঁকে, নইলে অত টাকা করবেন কি? তবু কি তাঁর মনে সুখ আছে? একটুও না! কারণ টাকাও যেমন আসছে বন্যার স্রোতের মত, তেমনি মেয়েও আসছে বছর বছর। প্রতিবারেই ভাবছেন এবার ছেলে হবে— আর একটি, ছেলে হয়ে গেলেই এ-পাট তুলে দেবেন একেবারে, আর প্রতি-বারেই সব দৈবগণনা, আশা এবং অব্যর্থ মাদুলী ব্যর্থ ক'রে আসছে এক একটি কন্যা!

আবার ভবানীপুরের তারক দত্তর কথাই ধরুন। ঘর-আলোকরা পাঁচটি ছেলে; ছেলেগুলির বুদ্ধিসুদ্ধিও এই বয়সে যতটা বোঝা যায়—ভাল। অর্থাৎ মানুষ হবে বলেই আশা করা যায়, তবু মনে সুখ নেই তাঁদের। তারকবাবুর মা পর্যন্ত প্রতি শুক্রবারে সঙ্কটার ব্রত করছেন একটি মেয়ের জন্যে। মেয়ে না হলে নাকি তাড়াতাড়ি কুটুম্ব হয় না, নাতি-নাতনীর স্বাদ আহ্লাদও মেটে না। তারকবাবুর স্ত্রী জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন ছু'বেলা পাড়ার মেয়ে-ইস্কুল বসবার ও ছুটি হবার সময়। দল বেঁধে মেয়েদের যেতে দেখেন এলোচুল কিংবা বেণী ছুলিয়ে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আহা, তাঁর যদি এমনি একটি মেয়ে থাকত! ছেলে ছেলে যতই কর—ওদের ডানা গজালেই পর। মেয়েদের মতো বাপ-মার 'আত্তি-শো' কেউ হয় না।

এ তো গেল এই ছু'দিকের কথা।

আবার ছু'দিকই যার বজায় হয়েছ—ভগবান কি তার জন্যেও একটি কাঁটা তৈরী করে রাখেন না!

সেই জন্যেই তো বলছি—উনিও হাতের কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার শয়তানী বুদ্ধিতে বেশ পাকা হয়ে উঠেছেন।

বলছিলাম বিপাশাদের কথা। বিপাশারও অনেক সাধের মেয়ে। ওর আবার ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই মেয়ের শখ। প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সময় ওকে ক্ষেপাবার জন্য ওর বোনেরা কিংবা ওর বৌদি 'মেয়ে হবে' বললে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বলত 'তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা, মেয়েই হোক।···আমি এখন ছেলে চাই না।'

তাতে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করলে বলত, 'না বাপু, ছোটবেলা থেকেই আমার মেয়ের সাধ। ছেলেরা যেন কেমন পর পর—ওরা মায়ের কাজে আসে না। তাছাড়া, একটু বয়স হলেই ইয়ার-বগ্‌গা হয়ে ওঠে, মাকে এড়িয়ে চলে। মেয়েরা বেশ কাছে কাছেই থাকে!'

অবশ্য সে সাধ ওর মেটে নি। প্রথম সন্তান ওর ছেলেই হয়েছিল। শুধু প্রথম নয়—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়—সব ক'টিই তাই। তৃতীয়টি হবার সময় বিপাশা তো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল—'এবারেও ছেলে! মেয়ে হ'ল না!' এমন কি বিপাশার স্বামী নরেশও যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বলেছিল, 'না, ছেলে হয়েছে ভালই, তা বলছি না। তবে দু'টি ছেলে একটি মেয়ে—এইটিই বেশ মানানসই। একটা মেয়ে না থাকলে যেন বাড়ি মানায় না।···এখন অবশ্য তুমিই মানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু তুমি যখন বুড়ী হয়ে পড়বে, তখন তোমার তরুণী মেয়ে বাড়ি আলো করে ঘুরে বেড়াবে, সেইটিই বাঞ্ছনীয় নয় কি? তুমি কি বলো?' এই বলে মুখ টিপে হেসেছিল সে।

'আহা, মেয়ের বুঝি ঐটুকুই সার্থকতা! পুরুষ জাতটা এমনিই বটে।' ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল বিপাশা।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। ওদের আর ছেলেপুলে হবে না জেনে ওরা যখন নিশ্চিন্ত হতে বসেছে—এবং অন্তত কত বয়স হ'লে বড় ছেলের বিয়ে দেওয়া যায় সেই সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে গিয়ে বিপাশা ধমক খাচ্ছে নরেশের কাছে, তখন হঠাৎ একদিন এল এই খুকী!

ধপধপে ফরসা, একমাথা কালো চুল কোল-আলো-করা মেয়ে!

নরেশের তো আনন্দের সীমা রইল না, এমন কি নরেশের পিসিমা—তিনিই ওর মায়ের মতো, মানুষ করেছেন ছেলেবেলা থেকে—যৎপরোনাস্তি খুশি হয়ে উঠলেন। রীতিমত ঘটা করে আটকৌড়ে ও ষষ্ঠীপুজোর আয়োজন করলেন এবং এমনভাবেই অন্নপ্রাশনের ফর্দ নিয়ে নিত্য আলোচনা শুরু করলেন যে, সেটা নরেশের মত মোটা মাইনের লোকের পক্ষেও একটা

তুর্ভাবনার ব্যাপার হয়ে উঠল।

অর্থাৎ আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, এতদিনের পথ-চাওয়া কন্যারত্ন আসতে ওরা সকলেই সুখী হয়েছে।

কিন্তু সেইখানেই একটু গোলমাল রয়ে গেল!

বিপাশা পুরোপুরি সুখী হতে পারল না। একটা কাঁটা ওর আনন্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতে লাগল অবিরত। অথচ সে কাঁটাটা যে কোথায়, তা-ও সে মুখ ফুটে বলতে পারল না কাউকে। অন্তত অনেক দিন পর্যন্ত পারল না।

লজ্জা, সংকোচ, বিদ্রূপের ভয় এ-সব তো আছেই, তার সঙ্গে নিজেরও খানিকটা অবিশ্বাস—সব মিলিয়ে ওর মুখটা চেপে রইল। মনের কথাটা কাউকে বলতে পারল না খুলে।

অথচ, যে দারুণ সংশয়টি প্রথম দিন থেকেই কাঁটার মতো বিঁধছে খচ্‌খচ্‌ করে—সেটাকেও উড়িয়ে দিতে পারছে না কিছুতেই। বরং যত দিন যাচ্ছে, যত পূর্ব ইতিহাস নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, ততই যেন সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে।

ওর মনে হচ্ছে যে ওর এই খুকী—কোল-আলো-করা রাঙা টুকটুকে খুকী, আসলে ওর দিদি অসিতা ছাড়া আর কেউ নয়!

ইহজীবনে চিরকাল জ্বালিয়ে গেছে, আবার মরেও নিষ্কৃতি নেই—পরজন্মে আরও ভাল ক'রে জ্বালাতে একেবারে তার ঘরে এসে জেঁকে বসেছে।

এই সংশয় বা বিশ্বাসের মূল কারণটা বড় বিচিত্র এবং বিপাশা ছাড়া অন্য সকলের কাছে ঈষৎ হাস্যকরও হয়ত।

অসিতা ওর আপন বোন নয়, বড় জ্যাঠ্‌তুতো বোন। রংটা ময়লা হলেও দেখতে মন্দ ছিল না এবং জ্যাঠামশাইয়ের পয়সার জোর ছিল বলে বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। অসিতার বর যোগেশ ছিলেন পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার, নিজেদের বাড়ি, শ্বশুর মোটা মাইনের চাকরি করেন—এককথায় বাড়বাড়ন্ত সংসার। কিন্তু মেয়েটারই বরাত খারাপ। বিয়ের বছর তুই পরেই হঠাৎ শ্বশুর মারা গেলেন; সরকারী চাকরী—তখন শুধু পেনসন ভরসা ছিল। কিন্তু পেনসন পেয়ে খানিকটা বেচে যেতে পারলেও না হয় থোক্ কিছু হাতে আসত—কিন্তু ঠিক রিটায়ার হবার মুখেই মারা গেলেন ভদ্রলোক। ফলে সেদিক থেকে এক পয়সাও পাওয়া গেল না।

এদিকে বাপের মৃত্যুর পরই যোগেশবাবুর কেমন একরকম বৈরাগ্য দেখা দিল। তার মনে হ'ল সংসার নেহাৎ মায়া, জীবন অনিত্য ; সে জীবন বা সংসারের জন্য এত ছুটোছুটি করার কোন মানে হয় না। তিনি চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বসলেন। আর সহস্রজনের সহস্র অনুরোধেও কাজকর্ম করতে রাজী হলেন না। ওঁদের ধনী আত্মীয়-স্বজনের অভাব ছিল না। অনেকেই উদ্যোগী হয়ে চাকরির প্রস্তাব আনলেন—কেউ কেউ ব্যবসার প্রস্তাবও দিলেন। যুদ্ধের বাজারে চারিদিকে যখন অসংখ্য কারখানা খোলা হতে লাগল—তখনও অনেকে টানাটানি করেছে ওয়ার্কিং পার্টনার বা বেতন-ভোগী ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে কাজ করবার জন্য। কিন্তু যোগেশবাবু নির্বিকার। তিনি প্রসন্নমুখে বলেছেন 'আর ক'দিন আছি ভাই, এ ক'টা দিন আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে যেতে চাই না। মাকে ডেকে কাটিয়ে যেতে পারলেই খুশী।'

যদি কেউ প্রশ্ন করত, 'চলবে কিসে ?' উত্তর আসত সঙ্গে সঙ্গে, 'তুমি আমি কি চালাবার মালিক ?···ধরো আজ যদি আমি মরেই যাই, আমার বাচ্চাকাচ্চা কি না খেয়ে মরবে ?···না, না, অতটা অহংকার ভাল নয় নরেন (কি 'বিপুল' কি 'ক্ষেত্র'—পাত্রবিশেষে) এ সংসারে নিজেকে কর্তা ভাবা কিছু না ! তুমি আমি কে।'

অথবা বলতেন, আসলে সময় কই ? এই তো ক'দিনের পরমায়ু, তা সেটার যদি সবটুকুই এই সব ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকব তো মাকে ডাকব কখন ?'

কথায় কথায় ঠাকুর রামকৃষ্ণেরও উদাহরণ দিতেন, হাতের সিগারেটটাকে টাকার বিকল্প স্বরূপ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতেন, 'টাকা মাটি—মাটি টাকা !···এর বেশী কিছু নয়।'

এক্ষেত্রে সংসারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অসিতার শ্বশুরের যা সামান্য সঞ্চয় ছিল তা ঘটা ক'রে তাঁর শ্রাদ্ধ করতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। থাকার মধ্যে শাশুড়ীর ও তার কয়েকখানা গহনা। সেগুলো শেষ হলে ফার্নিচারে হাত পড়ল। তাতে অবশ্য দু'দিকেই সুবিধে হল কিছু কিছু। নগদ টাকাটা তো এলই, ঘরও খালি হ'ল। ঘর ভাড়া দেওয়া ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না—সামান্য বেশী ভাড়ার জন্য ওপরের ঘর দুটোই ভাড়াটেদের ছেড়ে দিয়ে ওদের নীচের সংকীর্ণ এবং স্যাঁৎসেঁতে দুটি ঘরে আশ্রয় নিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত।

যোগেশবাবু অর্থের ব্যাপারে এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে (এটা ওটা

মুখরোচক খাদ্য সম্বন্ধে ছেলেমানুষের মত আবদার করার ভঙ্গীতে) ঠাকুরকে আদর্শ করলেও বাকীটায় তা করার আবশ্যকতা বোঝেন নি। অসিতার ছোট্ট ঘর, অসংখ্য ছেলেমেয়েতে কিল-কিল করত। খাদ্যাভাবে শীর্ণ এবং রুগ্ন শিশুর পাল নিয়ে বেচারী পাগল হয়ে যেত দিনরাত! কান্না আর আবদার—যতক্ষণ জেগে থাকত এই দুটি চলত অবিরাম। ঘুমও তেমনি কম। অসিতা রাগ করে বলত, 'পয়সা থাকলে সব ক'টাকে আফিং ধরিয়ে দিতুম, পড়ে পড়ে ঝিমোত, আমি বাঁচতুম।'

অসিতারা যদি দূরে কোথাও থাকত তো বিপাশার এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারণ ছিল না। এমন তো কত দরিদ্র আত্মীয়ই আছে। কিন্তু সেইখানেই হয়েছে আরও মুশকিল। যাকে মেয়েলি কথায় বলে, 'কানের কাছে কানাইয়ের বাসা।' নরেশ যোগেশবাবুরই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি-ভাই এবং এই বিয়েতে অসিতার হাত ছিল অনেকখানিই। অর্থাৎ বলতে গেলে সে-ই ঘটকালি করেছে। সম্পর্কটা দূর হলেও এঁরা থাকতেন কাছাকাছি—এ পাড়া ওপাড়া। হেঁটে গেলেও আট-দশ মিমিটের বেশি লাগে না। ফলে শুধু যে ওদের দুরবস্থার কাহিনী নিত্য শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়, তাই নয়—দু'বেলা যখন-তখন অসিতা-বাহিনীর আক্রমণও সইতে হয় এবং শুধু যদি সেটা খরচের ব্যাপারই হ'ত—তাহ'লেও অতটা দুঃখ ছিল না; অসিতা যে বিপাশার জা, সে পরিচয়টা উহ্য হয়ে গিয়ে নরেশদের বাড়িতে সে যে ওর নিজের জ্যাঠতুতো বোন সেই পরিচয়ই প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর সেজন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু বাক্যবাণ সইতে হ'ত বিপাশাকে।

ইদানীং দুঃখে পড়ে অসিতার স্বভাবটাও বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়িতে এসে এদের প্রাচুর্যের মধ্যে কেবলই যেন ছোঁক ছোঁক করত। ছেলেমেয়েগুলোকে যা হোক কিছু খেতে দিতে তো হতই—নইলে বায়না আবদারে পাগল হ'তে হ'ত নিজেদেরই। এছাড়া আনাজ-কোনাজ চালডাল থেকে শুরু করে তেজপাতা লঙ্কা ফোড়ন ঘি তেল—মায় কাপড় জামা একটা না একটা কিছু চাইতই অসিতা অনবরত। ভিক্ষা নয়, যেন একটা দাবীর ভাবই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'এত আছে তোমাদের—কেন দেবে না'—এই ভাব। বিপাশার ছেলেদের জামাগুলো ছেঁড়া তো দূরে থাক পুরনো হ'তেও তর সইত না! দু'চারদিন পার হ'তে না হ'তে অম্লানবদনে 'ক্লেম্' ক'রে বসত অসিতা, 'এ তো পুরনো হয়ে গেছে, এ আর কদ্দিন পরাবি। দে

না, আমার ছেলেগুলো পরে বাঁচবে। তোরা বড়লোক, তোরাও যদি এমন পুরনো জামা পরাবি ছেলেদের তো আমাদের গতি কি হবে!'

আর এই পয়সার খোঁচা—এ যেন ওর মুখে লেগেই থাকত। 'তোরা বড়লোক, তোদের অভাব কি!' 'তোদের কথা ছেড়ে দে, তোরা গরীবের দুঃখু কি বুঝবি!' 'তোরা কি আমাদের আত্মীয় বলে মনে করিস!' ইত্যাদি—

হিংসে করত অসিতা ওকে, ভীষণ হিংসে করত। সে মনোভাব ইদানীং গোপনও করতে পারত না। চেষ্টাও করত না। সে তীব্র ঈর্ষার বিষে বিপাশা জর্জরিত হ'ত, সে আগুনে জ্বলে পুড়ে মরত কিন্তু কিছু বলতে পারত না। প্রথমত তারই বোন। দ্বিতীয়তঃ অসিতাই বলতে গেলে ওর এই সৌভাগ্যের কারণ। কথায় কথায় শোনাত, 'পেতিস কোথায় এমন সুখের শ্বশুরবাড়ি—আমি না থাকলে! ঐ তো তোর অন্য বোনদেরও বিয়ে হয়েছে, কই, তোর মতো ঘর-বর পেয়েছে কেউ!—তোকে ভালবাসি বলেই এত কাণ্ড করে এনেছিলুম এখানে। তা—' এই অবধি বলে চুপ করে যেত অসিতা। সে নীরবতা সহস্র বাণীর চেয়েও স্পষ্ট। এ 'তার' পরে যা উহ্য থাকত তা বিপাশা জানে।

'তা, তার খুব শোধ দিলি!' এই বলতে চাইত অসিতা।

অথচ এর চেয়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ যে কি করে শোধ দিতে হয় তা বিপাশা জানে না। ওর আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও ওকে যা সইতে হ'ত তা কম নয়। অসিতার উঞ্ছবৃত্তি পাড়ায় বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। লোকে বলত চাওয়া যেন ওর একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। দিনরাতই দেহি দেহি। এর চেয়ে সোজাসুজি ভিক্ষে করাও যে ভাল ছিল।

অসিতার যে উপায় ছিল না তা অবশ্য বিপাশা জানত। একপাল ছেলেমেয়ে, বুড়ো শাশুড়ী, শিশুর মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী। দিনে আট দশ কাপ চা চাই তাঁর, অন্ততঃ দু' প্যাকেট সিগারেট। ভরসার মধ্যে ওপর-তলার ঐ দুটো ঘরের ভাড়া। সুতরাং ভদ্রভাবে ভিক্ষা করা ছাড়া তার উপায় কি? তবু পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে দুর্ভিক্ষ-অবতারের মতো হৈ হৈ করে লোকের বাড়ি চড়াও হওয়া—দূর থেকে দেখলেও মাথাকাটা যেত বিপাশার। কিন্তু সে কী করবে? কী করতে পারে! মাঝে মাঝে নরেশকে তবু বলত, 'চল, এ বাড়ি বিক্রী করে অন্য কোথাও চলে যাই।' তবে সে যে সম্ভব নয়, তা তার চেয়ে বেশিও কেউ জানত না। এখনকার দিনে এমন

মনের মতো বাড়ি পাওয়া কি অত সহজ !

অসিতার যে বিশেষ ক'রে তার ওপরই কেন এত ঈর্ষা, তাও বিপাশা জানত বৈকি ! সে অসিতার ছোট বোন, এককালে নিজের ভাল অবস্থার সস্নেহ অধিকারেই প্রিয় বোনটিকে নিজের মতো সচ্ছল ও সম্পন্ন ঘরে এনেছিল চেষ্টা তদ্বির ক'রে—এখন সেই বোনই ওর চেয়ে উঁচুতে চলে গিয়েছে, তার কাছে মাথা হেঁট ক'রে এসে সাহায্য চাইতে হয়—এর চেয়ে কষ্টকর কি আছে ! অসিতা সব বোনদের মধ্যে বিপাশাকেই বেশী ভালবাসত, এটা বিপাশাও অস্বীকার করতে পারে না। সেইজন্য বলতে গেলে পড়ে মার খেতে হয় তাকে ! জোর ক'রে কিছু বলতে পারে না। কোথায় একটা সঙ্কোচে বাধে।

কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে অসিতার কথাবার্তা ভাবভঙ্গীতে জ্বালাটা যেন চলে গিয়েছিল; সে জায়গায় দেখা দিয়েছিল একটা সকরুণ ঈর্ষা। অনেকদিনই ভুগেছিল অসিতা, বছরখানেক ধরে প্রায়। অসংখ্য সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে অথচ পুষ্টিকর খাদ্য পায় নি একটুও, তার ওপর হাড়ভাঙা খাটুনি—সবটা জড়িয়ে শরীর ওর ভেঙে পড়েছিল বহুদিন আগেই। তবু সুদ্ধমাত্র যেন ইচ্ছাশক্তিতেই ও যমের সঙ্গে যুঝল এই এক বছর। ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়েই এত ক'রে বাঁচতে চেয়েছিল বেচারী, কিন্তু তা অসম্ভব বলেই পারল না।

ইদানীং এদের বাড়িতে এসে বলত—ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, —'যদি তোদেব এই ঘরে এসেও ক-টা মাস থাকতে পারতুম পিশু, তো আমার শরীর সেরে যেত !'

এক্ষেত্রে ভদ্রতা ক'রে বলা উচিত ছিল হয়ত যে, 'তা থাক না।' কিন্তু আশঙ্কায় কণ্টকিত বিপাশার গলা দিয়ে সে কথাটা বেরুত না ! চুপ ক'রে থাকত সে।

অথবা, হয়ত কোনদিন খাওা-দাওয়ার সময় এসে পড়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ছোটখাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'ভাবিস নি যে নজর দিচ্ছি পিশু—কিন্তু কতকাল যে এমনভাবে পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়ে খাই নি। পেট ভরে ভাত খাওয়া, তা-ই তো ভুলে গেছি।'

এসব ক্ষেত্রে বিপাশা বলত হয়ত, 'তা তুমি তো খেয়ে গেলেই পার !'

'না রে। তা আর হয় না। ছেলেপুলেরা রইল টাঙ্গিয়ে—আমি কোন্

লজ্জায় এসব জিনিস মুখে তুলব বল্ তো। আর ঐ পঙ্গপাল নিয়ে খেতেও চাওয়া যায় না।'

তারপর একটা বড়রকম নিঃশ্বাস ফেলে বলত, 'এ জন্মে আর কিছু হ'ল না—আসছে জন্মে সুদসুদ্ধ উশুল করব।···মরে আবার আমি জন্মাবই—এই বলে দিলুম!'

একেবারে মরবার কিছুদিন আগে থেকে বলতে আরম্ভ করেছিল এই কথাটা, 'তোর বড্ড মেয়ের সখ পিশু, তা তুই ভাবিস নি, আমি মরে তোর পেটেই আসব। তোর এই ঘরদোর, এই খাওয়াদাওয়া—আমার বড্ড পছন্দ। ইহজন্মে ভোগে হ'ল না, এই বাড়িতে জন্মে ভোগ করব।'

কিংবা বলত, 'সাধ আহ্লাদ তো বলতে গেলে কিছুই মিটল না এ জন্মে, আসছে জন্মে সব মেটাতে হবে। কোথায় আর যাব, তোর কাছেই আসব। তুই-ই মেটাস বাপু।—অবিশ্যি বলাও বাজে—তখন তো আর ফেলতে পারবি না। গরীব দিদি নয় যে ঘেন্না করবি, পেটে ধরলে নিজের টানেই যত্ন করতে হবে।'

কথাগুলো শুনতো আর শিউরে উঠত বিপাশা।

নরেশও রাগ করত। কথাগুলো তার কানে গেলে বলত, 'তোমার দিদি যা নজর দেয় বাপু তোমার সুখ-সৌভাগ্যে—একটা আপদবিপদ না হ'লে বাঁচি!···এ কী বদঅভ্যেস!'

অপমানে রাগে দুঃখে বিপাশার চোখে জল এসে যেত। কিন্তু সে করবেই বা কি—তাও বুঝতে পারত না। যত রাগই হোক—মৃত্যুপথযাত্রিণীকে তিরস্কার করতে কি কটুকথা বলতে মুখে বাধত। হাত-পা ফুলে গেছে, বলতে গেলে জলসুদ্ধ হজম হয় না—কটা দিনই বা বাঁচবে?।

অসিতা মারা গেল আষাঢ় মাসে। বিপাশার খুকী জন্মাল চৈত্রে। তা-ও প্রথমটা মেয়ে হওয়ার আনন্দে ওর অতটা খেয়াল হয় নি। ওর ঝি সুশীলাই প্রথম কথাটা মনে করিয়ে দিলে, হাসতে হাসতে বললে, 'ওমা, মাসিমা বাপু যা বললে তাই করলে নাকি? এ যে ঠিক দশ মাসের মাথাতেই তোমার মেয়ে হ'ল দেখছি!···সত্যিই তোমার আদর খেতে এল বুঝি ছাখ গে।'

ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল বিপাশার বুকের মধ্যে—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে।

সামান্য একটি কাঁটা। ভাল ক'রে বুঝি অনুভবও করা যায় নি তখন।

কিন্তু ধীরে ধীরে কথাটা পেয়ে বসল বিপাশাকে। যতই মন থেকে চিন্তাটা তাড়াতে চেষ্টা করে, ততই ঘুরে ফিরে অসিতার কথাগুলো মনে পড়ে, আর ওটা যেন দৃঢ়মূল হয় ওর মনে। ধমক দেয় মনকে, এই বিংশ শতাব্দীতে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য তো নয়ই—চিন্তামাত্রও হাস্যকর, মনকে একথাটাও বোঝাতে চেষ্টা করে—কিন্তু কোন ধমক কোন তাড়নাতেই সেটা যায় না মন থেকে।

একদিন নরেশকে বলতে গিয়েছিল কিন্তু সে গায়ে মাখে নি। মেয়েকে আদর করতে করতে বলেছিল, 'বেশ তো, যদি তাই হয়—মন্দ কি! তবু তো মেয়ে একটা পেলাম। গত জন্মে কি ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—এ জন্মে আমার কাছে এসেছে তাই ভাল।'

কিন্তু নরেশ যত সহজে কথাটা উড়িয়ে দেয়—বিপাশা তত সহজে ওড়াতে পারে না।

অসিতা মানেই সেই ঈর্ষা, সেই লোলুপতা, সেই উঞ্ছবৃত্তি! অসিতার স্মৃতি ওর মনের মধ্যে আগাগোড়া একটা অপ্রীতিকর, অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। অবিরাম জ্বালা। জ্বালা আর অপমান।

সেই অসিতা আবার এল কায়েম হয়ে! তাকে আদর করতে হবে, নাচাতে হবে, সাজাতে হবে—চিরদিন সইতে হবে?

তাছাড়া—ইহজন্মেও যদি তেমনি বরাত নিয়ে এসে থাকে? যদি তেমনি ভাগ্য হয়—এরও? ভাবতেও শিউরে ওঠে বিপাশা।

কথাটা পিসশাশুড়ীর কাছেও পাড়তে যায় সে। তিনি হেসে বলেন, 'পাগলীর কথা শোন একবার। বেশ বাপু, তাই যদি হয়ে থাকে, মানলুম তোমার সে দুঃখিনী দিদিই না হয় এসেছে—এ জন্মেও ভগবান তাকে দুঃখ দেবেন একথা ভাবছ কেন। আগের জন্মে কি মহাপাপ করেছিল, এ জন্মে তার শোধ হল। তা শোধও তো সে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা দিয়ে গেছে বাপু, আবারও কি ভগবান তাকে দুঃখ দেবেন।'

কিন্তু এসব কথাতে বিপাশা সান্ত্বনা পায় না। এরা যদি জোর করে বলত যে, এসব হয় না, জন্মান্তর বাজে কথা—তাহলে হয়ত তবু কিছু আশ্বাস পেত সে। সে কথা তো কেউই বললেন না জোর ক'রে। তাহ'লে কথাটা অবিশ্বাস্যও নয়, অসম্ভবও নয়।

তা হ'লে? সত্যিই কি অসিতা এল ওকে জ্বালাতে? এ জীবনে এত জ্বালিয়েও আশ মেটে নি তার? এত বিষ মনে ছিল?

ওর যেন কান্না পায়। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে!

যা সামান্য অস্বস্তি, সামান্য কাঁটা মনে হয়েছিল গোড়াতে—যা সহজেই মুছে যাবে আশা করা গিয়েছিল—তা-ই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ ক'রে শাখা প্রশাখা-পল্লবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল বিপাশাকে। চিন্তাটা মনের মধ্যে স্থির অবিচল এবং প্রধান হয়ে উঠল।

বরং বলা চলে সমস্ত সহজাত চিত্তবৃত্তিকে ছাড়িয়ে গেল।

অত সাধের মেয়ে তার, সেই মেয়ে যেন বিষ হয়ে উঠল ওর কাছে। মেয়ে আর মেয়ে নয়—দিদি অসিতা।

'হাড় জ্বালাতে এসেছে আমাকে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করতে এসেছে। এক জন্মে শত্রুতা ক'রে শোধ হয় নি—ভাল ক'রে শত্রুতা করতে এসেছে—' হয়ত মেয়েকে স্তন্যদান করতে করতে অস্ফুট কণ্ঠে বলে বিপাশা!

ওর মনে যে এই অত্যন্ত তুচ্ছ এবং হাস্যকর কথাটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে, পিসীমারা তা সন্দেহ মাত্র করতে পারেন না। আর তা পারেন না বলেই ওর আচার-আচরণ দুর্বোধ্য লাগে ওঁদের কাছে।

নরেশও অবাক হয়ে যায় ওর ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে। মেয়েটাকে যে অবহেলা করে বিপাশা—সেটা দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশঃ। অথচ কোন কারণ বুঝতে পারে না নরেশ। অনুযোগ করলে বিপাশা চুপ ক'রে থাকে, বেশি বললে রাগ করে।

সময়ে খাওয়ায় না মেয়েটাকে। সময়ে ঘুম পাড়ায় না। খালি গায়ে হয়ত জলের ওপর কিংবা ভিজে কাঁথায় পড়ে আছে—দেখেও দেখে না। কেঁদে ককিয়ে গেলেও কোলে তোলবার কথা মনে হয় না ওর। মার চেয়ে ওর ব্যবহারে বিমাতার লক্ষণই যেন প্রকাশ পায়।

অবশেষে নরেশ ও পিসীমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ওর আচরণ। একদিন নরেশের সঙ্গে তুমুল ঝগড়াই হয়ে গেল। আর সেই ঝগড়ার মুখে বিপাশা স্বীকার করলে ওর মনের আসল কথাটা, 'হ্যাঁ, কালসাপকে আমি দুধকলা খাইয়ে বড় করব! দায় পড়েছে আমার।…শত্তুর এসেছে জ্বালাতে পোড়াতে সে তো জানিই। যতই যা করো—ও মরবে না, আমাকে জ্বালিয়ে

শেষ ক'রে তবে যাবে। ওকে অত আদর-যত্ন করব কিসের জন্যে! ডাইনী রাক্কুসী! ও জন্মে আমার সুখের ঘরে বিষ ছড়িয়ে শান্তি হয় নি—এ জন্মে এসেছে বাড়াভাতে ছাই দিতে!'

কথাটা নরেশের মাথায় ঢুকতে তবুও দেরি হয়েছিল বৈকি! তারপর যখন গেল তখন অত রাগারাগির মধ্যেও হেসে ফেললে সে। না হেসে পারলে না। 'ও হরি! তুমি সেই একটা কুসংস্কারের বশে পেটের মেয়েটাকে মারতে বসেছ। কী তুমি! ছেলেমানুষ না পাগল! তুমি সত্যিই ঐ সব বাজে কথা বিশ্বাস করে বসে আছ!' অনেক ক'রে বোঝায় নরেশ, পিসীমাও তিরস্কার করেন, কিন্তু তাতে রাগারাগিই সার হয় শুধু। আর কোন ফল হয় না।

বিপাশার বিশ্বাস বটগাছের মতই ওর মনের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত মূল বিস্তার করেছে। সেটাকে স্থানচ্যুত করা আর সম্ভব হয় না কিছুতেই।

নরেশের মুখে খবর পেয়ে বিপাশার মা একদিন ছুটে এলেন। মেয়েকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, বকাবকিও করলেন কিছু কিছু। কিন্তু ফল হলো একেবারে উলটো। প্রথমটা ঘাড় গোঁজ ক'রে থেকে হঠাৎ খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলে মাকে, 'হুঁ! মার চেয়ে ব্যথিনী, তারে বলে ডান।—বলি ওকে পেটে ধরেছে কে, তুমি না আমি? আমার সন্তান—আমি বুঝব। ছেলে তিনটেকে কি তুমি মানুষ করেছিলে এসে—না অপর কেউ এসে করতে গেছে?'

মা তখনই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেলেন। এ অকারণ অপমানের দায়িত্ব তাঁরই—মনে ক'রে নরেশও যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই উপলক্ষে প্রায় একপক্ষকাল স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ রইল।

কিন্তু নরেশ ও তার পিসীমার সব আশঙ্কা এবং সম্ভবতঃ বিপাশার সব আশা ব্যর্থ ক'রে মেয়েটা টিকেই রইল। আজও বেঁচে আছে সে, বড়ও হয়েছে খানিকটা। সুশ্রী ও শান্তস্বভাব মেয়ে। বাবা আর ঠাকুরমা তো বটেই—আত্মীয়স্বজন সকলকারই প্রিয়। শুধু মা-ই তার বহু আকাঙ্ক্ষার ধন এই মনের-মত মেয়েটিকে নিয়ে সুখী হতে পারে না। সন্তানের প্রতি সহজাত স্নেহ এবং বদ্ধমূল সংস্কার—এই দোটানায় পড়ে সে-ই শুধু ক্ষতবিক্ষত হয়। অকারণ অর্থহীন এবং একান্ত হাস্যকর এই অশান্তিতে তারই সমস্ত জীবনটা যেন মরুভূমি হয়ে যায়।

সেই অশান্তির আগুন নরেশেরও লাগে। তাই মাঝে মাঝে তারও মনে হয়, মেয়েটা না হ'লেই ভাল হ'ত। এতদিন বেশ ছিল সে!

সন্তোষবাবু যে ভারত সরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী এ কথাটা এই অসুখে পড়বার পর রমা যেমনভাবে জানল, এমন আর কখনও জানে নি। অবশ্য সন্তোষবাবু সবিনয়ে বার বারই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে কথাটা তা নয়—তিনি সামান্য যেটুকু সমাজসেবার চেষ্টা করেন, তারই পুরস্কার হিসেবে লাকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। কিন্তু রমা তা বিশ্বাস করে না। ক্লাবের কাজ মানেই দলাদলি, ঝগড়া—আর সন্তোষবাবুর সমাজসেব মানে তো গোপনে ভোট সংগ্রহ ক'রে বছরের পর বছর ক্লাবের সম্পাদক থাকা। তাতে লোক তাঁকে এত ভালবাসবে সে সম্ভব নয়—বরং রমার বিশ্বাস, সে ভোটটাও লোকে তাঁকে পদমর্যাদার কারণেই দেয়; অর্থাৎ ভয়ে, ভক্তিতে নয়।

কারণ যাই হোক, এবারের এই ভারী অসুখটাতে রমা একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করেছে। অসুখের কষ্ট যতই হোক, মনে মনে নিজের কাছে রমা একথাটা স্বীকার না ক'রে পারে না, এই অসুখটা না করলে জীবনে তার মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যেত। সে যে এমন একটা বিশিষ্ট মানুষ, তার জন্য যে এত লোক উৎকণ্ঠিত হতে পারে—কই, এতকাল তো সে কখনও এমনভাবে অনুভব করে নি! এটা যদি পরমলাভ না হয় তো—মানবজীবনে লাভের সংজ্ঞা কি তা রমা জানে না।

প্রথম চারটে কি পাঁচটা দিন যা খবর পেতে দেরি হয়েছিল, তারপরই সারা দিল্লী এবং নিউদিল্লীর বাঙালী সমাজ যেন ভেঙে পড়ল। এদিকে ইন্দ্রপ্রস্থ, লোদী রোড থেকে শুরু ক'রে সুদূর করোলবাগ, টিমারপুর, পুষা পর্যন্ত যেখানে যত বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন—কে না এলেন তাকে দেখতে বা টেলিফোন না করলেন! টেলিফোন যন্ত্রটা তো সন্তোষবাবুর কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে! মুহুর্মুহুঃ বেজেই চলেছে—শুধু টেলিফোনের উত্তর দিতেই একটা লোক রাখা দরকার হয়ে পড়েছে। তাই বলে আসা-যাওয়ারও বিরাম নেই। রোশেনারা রোডের পাঁচুবাবুদের এগিয়ে দিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ঘণ্টা-ঘরের টুটু-ডলিরা এসে হাজির। তারা

গেল তো সব জিমণ্ডীর পালবাবুরা এলেন। তাঁরা থাকতে থাকতেই তিশ-হাজারীর ওধার থেকে অপূর্ববাবুরা। ফোয়ারার কাছ থেকে আশুবাবু রোজ আসতে পারেন না—ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু খবর নেন। বিনয়বাবু দু'বার ক'রে টেলিফোন করেন।

কিন্তু তবু—

সব সুখেরই শেষ বা মধ্যে একটা 'কিন্তু' থাকে বোধহয়।

রমারও এই পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির মধ্যে 'পুষ্পে কীটসম' কোথায় একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছিল। এ 'কিন্তু' যেন একটা মস্তবড় ফাঁক। সন্তোষবাবুর কাছে অপ্রতিভ হবার মতো একটা কারণ। লজ্জা অপমান এবং আত্মগ্লানি।

এই দিল্লীতেই তার দুই বোনেরও শ্বশুরবাড়ি।

এবং খুব বেশি দূরেও নয়। একজন থাকে নিকলসন রোডে, আর একজন আরও কাছে, বিড়লা মন্দির থেকে এক রশির মধ্যেই। তবু, যখন বলতে গেলে সারা দিল্লী ভেঙে পড়েছে ওদের বাসায়—ওর কুশল সংবাদের জন্য উদ্বেগ ও আকুলতা প্রকাশ করতে—তখন সবচেয়ে যাদের উদ্বিগ্ন ও আকুল হবার কথা, সেই দুটি মানুষ—রমার মায়ের পেটের আপন বোন দু'জন—তারাই এখনও আসে নি, একটিবারও।

সন্তোষবাবুর কাছে অপদস্থ হবার মতো এ-ই কি যথেষ্ট কারণ নয়? যেন তার বাপের বাড়ির তরফ থেকে তার কিছুমাত্র মূল্য নেই, অথবা কস্মিনকালে ছিলও না—যেটুকু মূল্য তার সন্তোষবাবুর স্ত্রী হিসেবেই।...এ নিয়ে সন্তোষ-বাবু যে টিট্‌কিরি দিচ্ছেন না, সে শুধু তাঁর ভদ্রতা—এমন কি রুগ্না স্ত্রীর প্রতি অনুকম্পাও বলা চলে।

এ নিয়ে টেনেবুনে মনকে একটা সান্ত্বনা দেবে রমা, এমন কোন অবলম্বনও কোথাও কিছু নেই।

একদিন তুলতে গিয়েছিল কথাটা, ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল, 'ইলুবুঁলু বোঁধ হঁয় এঁখনও খঁবরটা পায় নি। কেঁ-ই বা দেঁবে—!'

কিন্তু বেশিদূর এগোবার আগেই তার সেই শেষ অবলম্বনের মূলে প্রবল কুঠারাঘাত হ'ল। সহজ এবং প্রশান্ত-কণ্ঠে সন্তোষবাবু উত্তর দিলেন, 'খবর পেয়েছে বৈকি। সরলের সঙ্গে তো আমার দিনপাঁচেক আগেই দেখা হয়েছিল, ডাক্তারের ওখানেই,—সব শুনে গেল। সে কি আর ইলুকে বলে নি?'

তবু রমা বলতে গেল, 'ডাঁক্তারের ওঁখানে এঁসেছিল—তাঁহলে বোঁধ হঁয়

ওঁদেরও কারুর অসুখ বিসুখ করে থাকবে—'

'না না। এমনি এসেছিল। ক্লাবের কাজে। ডাক্তার যে ওদের ক্লাবের সেক্রেটারী।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে রমা বলছিল, 'ইলু কি আর বুলুকে খবর দিয়েছে?'

তেমনি সহজ কণ্ঠ সন্তোষবাবুর, 'ইলুকে খবর দিতে হবে কেন! প্রতাপ তো পরপর তিন দিন আমার অফিসে এল। তোমাকে সেটা বলা হয় নি। ওর অফিসের একটা ব্যাপারে সামান্য একটু গোলমাল ছিল—সে জন্যে ওকেই আসতে হয়েছিল। খবর সবাই পেয়েছে, তবে তাদেরও তো সংসার আছে, ছেলেপুলে আছে—আসা বললেই তো আসা যায় না! নিশ্চয় কিছু অসুবিধে আছে—'

কিন্তু এটা শুধুই মৌখিক সান্ত্বনা এবং নির্লিপ্ততা। রমা সেই সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের আড়ালে কোথায় একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপেরও আভাস পায়। হয়ত সেটা কল্পনা, এক একবার নিজেকে সেটাই বোঝাতে চেষ্টা করে—তবু কোথায় যেন একটু অপমান এবং পরাজয় তাকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত ক'রে তুলতেই থাকে।

অবশেষে একদিন সে লজ্জা এবং অপমানের কারণ দূর হল বৈকি!

ইলু আর বুলু দু'জনেই এসে হাজির হ'ল শেষ পর্যন্ত—দিদির খবর নিতে।

খোঁজখবর ক'রে, দু'জনার সুবিধা মিলিয়ে—বেশ যেন দল বেঁধেই এসেছে ওরা। আগেই দেওরকে দিয়ে ইলু খবর পাঠিয়েছিল, সন্ধ্যাবেলা আসবার সময় বুলুকে তুলে নিয়ে এসেছে। আসা-যাওয়ার কড়ারে 'ভট্ভটিয়া' ভাড়া করা হয়েছে, সে গাড়ি এখানে অপেক্ষা করবে ফেরার পথে বুলুকে নামিয়ে দেবে, সেখানেও হয়ত দাঁড়াতে হবে কিছুক্ষণ—তারপর ইলুকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেবে। রীতিমত সমারোহ ক'রে আসা বলা যেতে পারে।

কিন্তু ওদিক থেকে আগ্রহ যতই থাক, ওদের দেখে খুশি হতে পারলেন না সন্তোষবাবু। সেদিন দুপুর থেকেই রমার শরীরটা বেশী খারাপ হয়ে পড়েছিল। টেলিফোনে নার্সের মুখে খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন অফিস থেকে—আবার তাঁর মুখে খবর পেয়ে এসেছিলেন ডাক্তার সেন। সাধারণত ও সময় তিনি যেতেন না—কিন্তু সন্তোষবাবুর বাড়ি যখন, সাধারণ

নিয়ম খাটানো সম্ভব নয়—চারটের আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। তখনই দুটো ইঞ্জেকশুন দিয়ে গেছেন, আবার রাত আটটার সময় এসে আর একটা দিয়ে যাবেন বলেছেন। ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার জন্যে একটা ওষুধও দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, কোন কারণেই যেন কথাবার্তা বলতে দেওয়া না হয় বা কোন উত্তেজনার কারণ না ঘটে।

সেই থেকে সন্তোষবাবু নিজে পাহারা দিয়ে বসে আছেন। রোগিণীর শয়নগৃহের পাশের হলটিতেই বসেছেন তিনি—যত দর্শক এবং সংবাদপ্রার্থীকে সেইখান থেকেই বিদায় ক'রে দিচ্ছেন—ইঙ্গিতমাত্রে অবস্থাটা বুঝিয়ে।

কিন্তু এরা শালী, স্ত্রীর বোন। সহজে বিদায় ক'রে দেওয়া চলবে না। শুধু প্রারম্ভেই ব্যাকুলভাবে অবস্থার গুরুত্বজ্ঞাপক একটা ইঙ্গিত ক'রে হাতের ভঙ্গীতে নিস্তব্ধ থাকার অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছুই ক'রে উঠতে পারলেন না সন্তোষবাবু। কিন্তু তারাও ঢুকেছে দমকা ঝড়ের মতো—যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিয়ে, সে ইঙ্গিতে তাদের উচ্চকিত কণ্ঠ নেমে এলেও থামতে পারল না।

ইলুই শুরু করেছিল, 'কেমন আছে দিদি, জামাইবাবু? দেখুন না, শুনে পর্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করছি, তা আসবার কি জো আছে! ছোট ছেলেটার জ্বর, মেজটার আমাশা—এক মিনিট নড়বার উপায় নেই! কী বলব, যতক্ষণে ও অফিস থেকে এসে বসে ততক্ষণে আমি কাপড় কাচতে যেতে পাই। এক একদিন দুপুরে ভাতই খেতে পাই না। যেমন কপাল আমার, শাশুড়ী, ননদ জা সবই তো আছে—কেউ একবার কাঠি করে ছোঁয় না আমার ছেলেমেয়েদের। উলটে কাঁদলে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে ছেলেমেয়ে তৈরি করেছে বাবা, দিনেরাতে একটু ঘুমুবার উপায় নেই—বুলুর মতো ঝাড়া-হাত-পা হলে কী আর ভাবনা ছিল!'

কথাটা শেষ হবার আগেই বুলু ফোঁস ক'রে উঠল, 'হ্যাঁ, ওসব কথা ঐ বাইরে থেকে শুনতেই ভাল। কিসে ঝাড়া-হাত-পা দেখলে শুনি? নিজের একটা ছেলে—তা সে ঠাকুমার ন্যাওটা তাঁর কাছেই থাকে—স্বীকার করি, কিন্তু তেমনি দুই ভাশুরের মিলিয়ে বারোটি বাচ্চা যে! দুই জায়ের শরীর খারাপ—বাহানা তো লেগেই আছে, যেহেতু আমার নিজের ছেলের ঝঞ্ঝাট কম, আমি ঝাড়া-হাত-পা, সেই হেতু সবাই আশা করে যে আমিই সকলকে দেখব। আর তাই তো দেখতে হয়। সব কটির খাওয়া-দাওয়া, ইস্কুল যাওয়া —তার টিফিন, পোশাক, ইউনিফর্ম, সব তো আমার হাতে! বলে নিঃশ্বাস

ফেলবার সময় পাই না একটু!'

'তা হোক ভাই, তবু তোমার সুখের সংসার, জায়ে-জায়ে মিল, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়! তুমি বারোমাস তাদের করছ—একদিন যদি বেরিয়ে পড়ো তাহলে তারা একটা কথা বলবে না। আর আমার! শুনতেই একান্নবর্তী পরিবার, ঝাড়ু মারো অমন একান্নবর্তী সংসারে—যে যাকে পায় তাকে কথায় কাটে, কথার ধার কি!'

'তুই থাম্ ছোড়দি! ভাল—ঐ বাইরে থেকে দেখতেই ভাল। একদিন পান থেকে চুন খসুক দিকি, দেখি কেমন ভাল থাকি! এমনিই তো চিম্‌টি কেটে কেটে কথা যা শাশুড়ীর! সবাই বলে কী মিষ্টি মানুষ! ঘর করতে হ'লে বুঝতে পারত। মিছরির ছুরি একেবারে। আমার দিদিমা একটা কথা বলতেন, শেতল-বৌ কাঁটকী; তখন মানে বুঝতুম না, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি!'

কথাটা শুরু হয়েছিল চাপা ফিসফিসিনিতেই—কারণ ঘরে ঢোকবার মুখেই সন্তোষবাবুর সতর্কতামূলক দুই হাতের ভঙ্গীটা ছিল। কিন্তু উত্তেজনা ক্রমশ বেড়েই যায়—তখন আর বিধিনিষেধের বাঁধন মানতে চায় না কণ্ঠস্বর, গলা উচ্চগ্রামেই পেঁাছতে থাকে।

মাঝে যেমন দেওয়ালের ব্যবধান আছে, তেমনি দরজাও আছে। রোগিণীর সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব কয়েক হাত মাত্র। সন্তোষবাবু বিষম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, চাপা গলায় বলেন, 'আস্তে! অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ানো হয়েছে!'

এবার গলা নামল, কথা থামল না।

ইলু বললে, 'তাই তো বলছি। দিদি দুঃখ করত যে শ্বশুরবাড়ি কেউ কোথাও নেই, আদর-যত্ন করার লোক নেই। আপনি যেমন একা—একাই পুষিয়ে দিচ্ছেন। আমি তো পাঁচটার মধ্যে থেকেও একা—উলটে আমাদের ইনি—ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেন না, মা-বৌদি-বোনের বাক্যির চোটে! সে দিক দিয়ে বুলুর বরাতও ঢের ভাল!'

'তা যদি বললি, আমার কি এমন বরাত দেখিস তোরা তা জানি না। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় কখন বলতো! অফিসের কাজ, ক্লাবের কাজ, কালিবাড়ির কাজ—না হয় তো পাড়ার কাজ—কোনও দিনই তো রাত বারোটার আগে ফিরতে দেখি না। ভোরে উঠে আমি পড়ি ছেলেমেয়েদের নিয়ে—তারই ফাঁকে কখন চা খেয়ে সরে পড়ে, টেরই পাই না!'

এইভাবে দুই বোন নিজেদের ভাগ্য মিলিয়ে চলে—প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর উপলক্ষ করে। কণ্ঠস্বর চড়ে-নামে কিন্তু ফিসফিসিনিটাও এমন স্বরগ্রামে উচ্চারিত হয় যে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার পক্ষেও যথেষ্ট। নার্স এসে ভ্রূকুটি করে ফিরে যান, আত্মীয় অনুমান ক'রেই বোধ হয় শাসন করতে সাহস করেন না। ওদিক থেকে মাদকাচ্ছন্ন রমা দু'একবার উ-আঁ করে—সে শব্দ বোনেদের কানে না এলেও সন্তোষবাবু শুনতে পান ঠিকই।

অবশেষে মরীয়া হয়ে সন্তোষবাবু ওপাশের ঘরটা দেখিয়ে বলেন, 'ইলু-বুলু, তোমরা বরং ঐ ঘরটায় বসবে চলো।'

'না জামাইবাবু, আজ আমরা তাহলে চলি, দিদি তো ঘুমুচ্ছে, ভট্‌ভটিয়া-ওলাটাও এখনি তাগাদা দিতে শুরু করবে হয়ত—রাতও হল—আর এক দিন না হয় আসব!'

এই বলে—দুই বোন তেমনিই পরস্পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করতে করতে সরকারী বাসার সংকীর্ণ হাতা পেরিয়ে অপেক্ষমান ভট্‌ভটিয়ায় গিয়ে ওঠে। এই কোলাহলের ভেতর—ওরা কেন এসেছিল, সে কথাটা আর মনে থাকে না। সুতরাং 'দিদি কেমন আছে' সে তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরটাও জানা হয়ে ওঠে না।

বন্ধুমেধ

প্রবাল ক্লান্ত হয়ে ঝিলটার ধারে বসে পড়ল। তার পা আর চলছে না। সেই কাল রাত আটটার পর থেকেই হাঁটছে বলতে গেলে। মধ্যে মুরারির বাড়ি ঘণ্টা-তিনেক বিশ্রাম—বিশ্রাম তাকে বলে না—বিরতি, কারণ ঘুম তো আর হয় নি, পা দুটো ছুটি পেয়েছিল এই পর্যন্ত। মুরারির কথায় আর ব্যবহারে প্রবালের যা রাগ হয়েছিল তাতে শরীর সুস্থ হয়ে ওঠার থেকে আরও খারাপই হয়ে গেছে—সেই ছুটিটুকুও কোন কাজে লাগে নি। উঠে যখন রাস্তায় বেরিয়েছে আবার—পা দুটো পাথরের মতো ভারী আর আড়ষ্ট লেগেছে। তারপর বরং চলতে-চলতে কতকটা অসাড় হয়ে যাওয়ায় আর অত অসুবিধা হয় নি।

সবচেয়ে যেটা কষ্ট হচ্ছে, সেটা ক্ষিদের। খাওয়াই হয় নি বলতে গেলে

কিছু। সকাল সেই দুপুরের পর থেকেই কোন পুরো 'মীল' পেটে পড়ে নি। বিকেলে ওদের পার্টির আপিসে যা সেই কড়া তেতো চা এক কাপ আর একখানা লেড়ো বিস্কুট। আজ সকাল থেকেও—এ পর্যন্ত তিন-চার বার চা ছাড়া আর কিছু খেতে পায় নি। পায় নি মানে পারে নি। পকেটের যা অবস্থা, ঐ একটু ক'রে চা ছাড়া আর কিছু খেতে সাহস হয় নি। কতক্ষণ এভাবে চালাতে হবে তার ঠিক কি?

মুরারিটার কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনলে হ'ত বটে। কিন্তু রাস্কেলটার যা ব্যবহার—ওর কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতেই ইচ্ছে হয় নি আর। একটা টাকা ও অবশ্য অনায়াসে দিতে পারত, হয়ত প্রবালকে তাড়াবার জন্যে কষ্ট ক'রেও বেশী দিত। হয়ত দুটো টাকাও দিত চাইলে। তাতে—আর কিছু না হোক, দুপুরে এখানকার ঐ খাবারের দোকানটায় গরম রুটি-তরকারি পেট ভরে খেয়ে নেওয়া যেত। বড় রুটি একখানা দু'আনা ক'রে, তার সঙ্গে ডাল ফ্রী। চায়ের প্লেটে এক প্লেট আলুর তরকারি নিলে পনেরো নয়া এক্‌সট্রা। তাতেও কিছু দরকার ছিল না, ডাল-রুটিই যথেষ্ট। ঐ রুটি চার-পাঁচখানা খেয়ে নিতে পারলে ঘণ্টা-আট-দশ বেশ কাটানো যেত।

আসলে এমন হবে তাও তো বুঝতে পারে নি। তাহলে তো অন্তত বাড়ি থেকেও খেয়ে বেরোতে পারত। রুটি তো ওদের বাড়ি দুপুরেই করা থাকে, রুটি আর একটা আলুর তরকারি কিংবা জলের মতো খানিকটা ডাল। এ একেবারে বাঁধা রুটিন। ওর মা বলেন, 'আলুর তরকারি আমাদের বাস্তুদেবতা, নিত্যি পুজো ওঁর!'

খাবার করা থাকে, তার কারণ বিকেলে উনুন জ্বালার বিলাস ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঁচ টাকা মণ কয়লা হয়ে গেছে, এক-একখানা ঘুঁটে এক পয়সা—মানে এক টাকা শ'। কাঠের যে কত দাম তা জিগ্যেস করতেও সাহস হয় না। ওরা যদিচ শহরে থাকে না—কলকাতা থেকে মাইল আষ্টেক-দূরে বাস করে—বছর কুড়ি আগেও এসব জায়গাকে অজ পাড়াগাঁ ধরা হ'ত, আজও কেউ কেউ বিনয় ক'রে এগুলোকে গ্রাম বলেন—কিন্তু ওদের অবস্থা খাস কলকাতা শহরের থেকেও খারাপ দাঁড়িয়েছে। এই সব কলোনীর ভূমিকৃচ্ছ্রতা এমনই—কোন বাড়িতেই বিশেষ গাছপালা নেই। যা উঠোনে একটু-আধটু মাটি, স্বভাবতই লোকে সেখানে লাউ-কুমড়ো গাছ করতে উদ্যোগী হয়, যাতে তবু একটু আনাজের খরচা বাঁচে—আর যার অবস্থা একটু ভাল, সে দোপাটি

রজনীগন্ধা কিংবা টগর—এমনি সব সাধারণ ফুলের গাছ দেয় দু-একটা, যাতে প্রাত্যহিক পূজোর জন্যে ক'টা ফুল পাওয়া যায়।

কাজেই বড় গাছ—আগে থাকতে যা দু-একটা থেকে গেছে, নারকেল গাছ কি আম গাছ কি শিরীষ গাছ, ঠিক ঘর করার জায়গাটুকুতে পড়ে নি—আঙুলে গোনা যায়, এমন হয়ত এখনও আছে, তবে তাতে কাঠের দুঃখ ঘোচে না। সে গাছ কেউ কাটে না, কাটলেও তার আর কত কাঠ! প্রবালের বাবা পরেশবাবু গল্প করেন যে, যদিচ দেশে ওঁদের নিজস্ব জমি বিশেষ ছিল না, তবু আশপাশের বাগান থেকে কাঠকুটো বাঁশপাতা বাঁশেরগোড়া কঞ্চি সংগ্রহ ক'রেই বারো মাস রান্না চলত, কয়লা পাওয়া যেত না—কিন্তু কাঠ কেনার কথাও ভাবতে হয় নি কখনও।

এখানে সে সব সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করাও হাস্যকর মনে হয়। একবেলা একটা ছোট উনুনে রান্না হয়, তারই কয়লা কেনা ওদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পরেশবাবু বর্তমানে একটি দোকানে কাজ করেন, দেড়শ' টাকার মতো মাইনে পান। এর বেশী নয়—বরং কিছু কমও হ'তে পারে। এখান থেকে ববানগর যাতায়াতেই মাসে প্রায় কুড়ি টাকার মতো বেরিয়ে যায়। যা থাকে তার মধ্যেই প্রবালের পড়ার খরচ আছে; লোকের দোরে-দোরে ঘুরে হাফ-ফ্রী করিয়েছেন—ফ্রী-ই ছিল, ক্লাস নাইনে ফেল করার পর আর ফ্রী-শিপ রাখা যায় নি—বইও চেয়েচিন্তে ভিক্ষে-দুঃখ ক'রে এনে দেন, তবু খাতা-পেন্সিল-কাগজ—রকমারি চাঁদা, অর্ধেক মাইনে, টিফিন—সব জড়িয়ে খরচ আছে বৈকি। সেটা প্রবালও যে একেবারে বোঝে না তা নয়—কিন্তু এ তো এই বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থারই ফল। ওর বাবা যা চান—মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে পাস ক'রে কোনমতে ওঁরই মতো একটা চাকরি যোগাড় ক'রে সংসারের ভার লাঘব করা—সে তো এই ব্যবস্থাকেই দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী করা।

না, তা পারবে না প্রবাল আর। হাবুদা, নারারদা, জীবনদা, কাজলদা—এরা ওর চোখ খুলে দিয়েছে। যত কষ্টই পাক, সে নিজে কি তার বাবা-মায়েরা—সর্বপ্রযত্নে—দরকার হ'লে নিজেদের প্রাণ দিয়েও, এ ব্যবস্থাকে রদ করতে হবে, বদলে দিতে হবে আগামী দিনের নাগরিকদের জীবন-ব্যবস্থা। দুঃখভোগটা যে ভাগ্য নয়, সে ভাগ্য যে নিজেরাই ফিরিয়ে আনতে পারে, একথা এই মূর্খের দেশে এখনও অনেকে জানে না। ধীরে ধীরে শেখানোর

দিন চলে গেছে—এখন এমনি ক'রে চাবুক মেরেই শেখাতে হবে।

সবচেয়ে দুঃখ হয় ওর বাবাকে দেখে। কী জীবন! অথচ ভ্যাখো, ভদ্রলোক অম্লানবদনে সব সহ্য করছেন, ভাগ্যের ওপর দায় চাপিয়ে দিয়ে। দেশে থাকতেও এক গোলদারী দোকানে কাজ করতেন—ভাল চাকরি কিছু করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না, সামান্য কিছু জমি ছিল, তার সঙ্গে মাইনে যোগ হয়ে কোনমতে দিন চলত। হয়ত দোকান থেকে চুরি-দারিও কিছু করতেন—কে জানে, এসব তো পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল—যদিও উনি মানেন না। তারপর পার্টিশ্যানে যখন সব গোলমাল হয়ে গেল, পরেশবাবু যদি প্রথমেই চলে আসতেন কিংবা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতেন—এখান থেকে জমি বদলের ব্যবস্থা হ'তে পারত—উনি এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে এলেন যে—পথে স্ত্রী আর মেয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল—হারিয়ে গেল—খুঁজেই পাওয়া গেল না। এও পরেশবাবু বলেন ভাগ্য। তারপর এখানে এসে এক ভগ্নিপতির বাড়ি কিছুদিন থেকে—এক মুড়কি-বাতাসার দোকানে কাজ করার পর—এই চাকরিটি পান। সেই ভগ্নিপতিই জোর ক'রে বিয়ে দেন তাঁর খুড়তুতো বোনের সঙ্গে, এখানে এই জবরদখল জমির ব্যবস্থা ক'রে একখানা ছিটে বেড়ার ঘরও করিয়ে দেন। সৌভাগ্যের ব্যাপার, দেশ থেকে আসার সময় স্ত্রীর যা দু-একখানা সামান্য গয়না ছিল' রাহাজানি হবরে ভয়ে নিজের ল্যাঙ্গটের পকেটে রেখেছিলেন। সেইটেতেই যা হোক এখানে দাঁড়াতে পেরেছিলেন, নিছক ভগ্নিপতির দয়ার ওপর সবটাই নির্ভর করতে হয় নি।

সৌভাগ্য হোক আর দুর্ভাগ্য হোক—ভাল বা মন্দ—সবটাই যখন পরেশবাবু ভাগ্যের ওপর বরাত দিয়ে নির্বিচারে মেনে নেন, হা-হুতাশ বিলাপ কিছুই করেন না—তখন একমাত্র সন্তানের ব্যাপারটাও সেইভাবে মেনে নেন না কেন? কেন আশা করেন যে, প্রবাল হায়ায়সেকেণ্ডারী পাস ক'রে—যা হোক, যেখানে হোক একটা চাকরি খুঁজে নিয়ে সংসারে একটু স্বচ্ছলতা আনবে।···প্রবাল ক্লাস ইলেভেন-এ উঠে পড়া ছেড়ে দিয়ে—তাঁর নয়, সারা জাতির ভাগ্য ফেরাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে বলে এত অনুযোগ হা-হুতাশ করেন কেন? কেন এক-একদিন ডেকে কাছে বসিয়ে অনুনয়-বিনয় করেন, নিজের চেখের জল ফেলে ছেলের চোখ সজল করার চেষ্টা করেন? ভাবেন এইতেই ছেলের মন গলাবেন? ছোঃ!

না, প্রবালের মন আর অত সহজে গলবে না। গলেও নি এ ক'দিনে। হাঙ্গামা করা বা ছুটে গিয়ে ক'টা বোমা ফেলে আসা—এসব তো তুচ্ছ, মানুষ মারতেও কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বা অনুতাপ হয় না। হয় না বলেই ওর দল ওর ওপর বেশী নির্ভর করে। আর সেই জন্তেই কাল এই কাজের ভার দিয়েছিল। কাজও তো সেরে ফেলেই ছিল, সুখেনটা যে মরার সময়ও অমন হুশমনি করবে তা কে জানত—নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে এতক্ষণে তো বাড়িতে মার সেই ডাল আর 'বাস্তুদেবতা' আলুর তরকারি দিয়ে ভাত খাবার কথা।

বেইমান অজয়টাকে যখন মারে ওরা (অতগুলো লোক ছিল, পুলিসও তেড়ে এসেছে শেষ পর্যন্ত—তবু কাউকেই ধরতে পারে নি) পিটিয়ে মেরেছিল, ধরে নিয়ে গিয়ে বড় বাস-রাস্তার ধারে লোহার রড আর পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়েছিল। অনুনয়-বিনয় করেছিল অজয়, প্রাক্তন বন্ধু ও দলীয় সহকর্মীদের হাতে-পায়ে ধরেছিল, বলেছিল, 'ছেড়ে দে, আর কখনও-এমন করব না। দলে ফিরে আসব আবার—কথা দিচ্ছি, যে-কোন দিব্যি গালতে বলবি তাই গালব—প্লীজ প্লীজ, খোকা—তুই একটু বুঝিয়ে বল্ ভাই—'

খোকা অর্থাৎ প্রবাল। অজয় এককালে প্রবালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। অজয় যে এদের দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, এ দল ছেড়ে দিয়ে অন্য এক দলে যোগ দেবে—সেকথা গোপনে প্রবালকেই বলেছিল সে প্রথম। প্রবালই সে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে হাবুদাকে, প্রবালই এই শান্তিসেনা (শান্তিসেনা যদি হয়—শাস্তিসেনাই বা হবে না কেন?) গঠন ক'রে ওৎ পেতে থেকেছে—অজয়ের গতিবিধি প্রবালই সবচেয়ে ভাল জানত—নিরাপদে নির্বিবাদে ধরে নিয়ে গিয়ে 'কাম ফতেহ্' করেছে।

কাজ সারা হয়েছিল ঠিকই—তবে এত লোক যে কাজ করে তা নিঃশব্দে সারা যায় না। গোলমাল, লাঠিতে লাঠিতে ঠেকে ঠকাঠক শব্দ, আহতের আর্তনাদ,—এতে কিছু কিছু লোক ছুটে আসছিল, তাদের বোমা দিয়ে রোখা গেলেও, পুলিসের গাড়ি এসে পড়ায় পালাতে হয়েছিল।

অবশ্য তাতে বিশেষ অসুবিধা কিছু হয় নি। কাউকে হাতেনাতে ধরতে পারে নি পুলিস। অজয়েরও তখন এজাহার দেবার অবস্থা নেই, প্রাণ যেটুকু ধুক্‌ধুক্ করছিল গলার কাছে—হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই সাবাড় হয়ে গেছে। পোস্টমর্টেমে বলেছে নাকি যে, দেহের আসল হাড় একখানাও আস্ত ছিল না—এমন মারই দেওয়া হয়েছে, ভেঙে ছাতু হয়ে গেছে শালার সব

ক'খানা হাড়।...

পুলিস কিন্তু ধরতে না পারুক সন্দেহ করেছে ঠিকই, পাড়ায় বার বার এসেছে—জেরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, দু-একজনকে ধরেও নিয়ে গেছে, দুর্গা, গোবিন্দ—ওদের মারও দিয়েছে, কিন্তু কোন কথা বার করতে পারে নি। পারে নি এই জন্যে যে, তারা সত্যিই কিছু জানত না। এসব কাজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোককে বলবে এত বোকা প্রবালরা নয়।...জিজ্ঞাসাবাদ জেরা করেছে পাড়ার লোকদেরও, ঐ বড় রাস্তার ধারে যে-সব বাড়ির লোকেরা ছুটে আসছিল তাদের কাছেও গেছে, খোঁজ-খবর নিয়েছে, কিন্তু এমন কোন সাক্ষী পায় নি যার জোরে ওদের গাঁথতে পারে। তারা কতকটা ভয়ে—কতকটা সত্যিও বলেছে যে, আবছা অন্ধকারের সময় সেটা, কতকগুলো লোক দেখেছে এই পর্যন্ত, মুখ-চোখ-কান কিছুই ঠাহর হয় নি। কে ছিল তা তারা হলপ ক'রে বলতে পারবে না।

তবু, এ যাত্রা রেহাই পেলেও—ওদের সতর্ক হ'তে হয়েছে। নারাণদাই কথাটা তুলেছে, হাবুদাও সমর্থন করেছে কথাটা—এবার আর, অন্তত কিছুদিন অমন দল বেঁধে পিটিয়ে মারা ঠিক হবে না। মারতে হ'লে, শাস্তি দিতে কি বদলা নিতে হ'লে চোরা-গোপ্তা ছুরি কি দা দিয়ে কাজ সারতে হবে।

হাবুদা বলেছিল দার কথা। ধারালো দা। গড়িয়ার দিকে নাকি এক-বাস লোকের সামনে একজনের মাথা কেটে চলে গিছল—অনেকক্ষণ পর্যন্ত টের পায় নি। বড় মাংস-কাটা দা, তলোয়ারের মতো ধারালো, তাতে চোখের নিমেষে কেটে যায় গলা। কিন্তু কাজলদা সেকথা উড়িয়ে দিয়েছে। ওসব পাড়াগাঁর দিকে, অন্ধকারে দা ব্যবহার করা যায়, দা নিয়ে কি এখানে ঘোরা-ঘুরি করা যায়? এধরনের কাজে ভাল ছোরাই সুবিধে, কি অ্যাসিড। অ্যাসিডে আবার ভিড়ের মধ্যে বড় অসুবিধে—নিজেরই গা পুড়বে ফেটে গেলে, বেস্ট হচ্ছে ছোরা। সেদিন নাকি ঢাকুরের দিক থেকে একটা ছেলেকে তাড়া ক'রে এনে গড়িয়াহাট রোড-কাঁকুলিয়ার মোড়ে সাফ করেছে—গোলপার্কের কাছে—ব্যাপারটা কি ঘটছে তা আশপাশের লোক বোঝবার আগেই হাওয়া হয়ে গেছে। ছোরাটা অবশ্য স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছিল, তা আর কি করা যাবে? রক্তমাখা ছোরা হাতে তো পালানো যায় না। আঙুলের ছাপ? তুমি রেখে বসো দিকি, পুলিস কত লোককে ধরে ধরে আঙুলের ছাপ মেলাবে? ওদের দপ্তরে যা থাকে—দাগী আসামীর ছাপ, এরা তো কেউ আর দাগী আসামী নয়।

সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ছোরা ব্যবহারই সাব্যস্ত হয়েছে। তাই—সুখেনকে যখন সরানোর কথা উঠল, তখন ছোরাই দেওয়া হ'ল প্রবালকে। হ্যাঁ, প্রবাল ছাড়া এ কাজ করার মতো লোক কই? এত স্ট্রং নার্ভস্ আর কার? প্রবালও হাসিমুখে এ ভার নিয়েছিল। আঠারো বছর বয়স তার—সমস্ত পৃথিবী মনে হয় তার পায়ের তলায়, কোন কাজই কঠিন বা অসম্ভব মনে হয় না। বরং কঠিন কাজেই আনন্দ বেশী, কাজ যত দুঃসাহসিক হয়, ততই মনে হয় এ-ই ওর উপযুক্ত। দলের বাকী সকলের এ এক রকম স্বীকৃতিই—ওর অসামান্যতার। ও যে সাধারণ নয়, অসীম সাহস আর অসীম শক্তি ওর, সেই সঙ্গে কিছু বুদ্ধিও —এটা দলের সকলের স্বীকারই করা হয়ে গেল—এই কাজের ভার দেওয়ার ফলে।

সুখেন ওর বন্ধু। এককালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিল প্রবালের। প্রবালের সঙ্গে সে সম্পর্ক নষ্ট হবার মতো কোন আচরণ সে করে নি। তবে তাতে কি? দলের ডিসিপ্লিন—কী যেন বলে বাংলায়—নিয়ম? হ্যাঁ—নিয়মানুবর্তিতা রাখতে গেলে, এসব ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ভাবা চলে না। সুখেন ওদের দল ছেড়ে যেদিন চলে গেছে সেইদিন থেকেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে, আর এ অপরাধের একমাত্র শাস্তিই হ'ল—এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।

যে প্রথম থেকেই অপর দলে আছে—সে শত্রু হ'তে পারে, অপরাধী নয়। তার দল আমাদের দলের কাউকে মারলে আমরা তাদের ওপর বদলা নিতে পারি, তবে সে সাধারণভাবে, কিন্তু দলত্যাগ অন্য রকম জিনিস। এসব কাজে, বিশেষ বিপ্লবের পথে পা দিলে এ অপরাধ আর ক্ষমা করা চলে না। আমাদের মন্ত্রণা আমাদের কার্যপদ্ধতি আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে অন্য দলে যোগ দিলে যে সাংঘাতিক ক্ষতির সম্ভাবনা—দলের পাঁচটা লোককে মারলেও তত ক্ষতি হয় না।

অবশ্য হ্যাঁ, সুখেন ওদের 'ইনার সার্কল' যাকে বলে—তার মধ্যে কোন-দিনই ছিল না। হাবুদা আর কাজলদা প্রথম থেকেই ওকে একটু অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিল, ওরা মানুষ চেনে—তবু, কতটা ক্ষতি করতে পারে, ব্যক্তি ধরে ধরে বিচার করা চলে না। সে যাক্‌গে, এ অপরাধের একটিই শাস্তি নির্দিষ্ট আছে, সুখেনের বেলায়ই বা অন্যথা হবে কেন?

প্রবালও অত সেন্টিমেন্টাল জীব নয়—সেও বন্ধু বলে ইতস্ততঃ করে নি, মাথা ঘামায় নি।

সহজ কাজ, সহজেই সেরে চলে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু ঐ শালা সুখেনটা, মরবার সময় পর্যন্ত বেইমানী ক'রে গেল।

সুখেনও জানত যে, এত সহজে অব্যাহতি পাবে না। তাই নিজের বর্তমান দলের বেশ কয়েকজন লোক ছাড়া সে ক'দিন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলও না। নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন—এ-দল ছাড়ার পরই—ওদের ঘাঁটি নিবারণ কলোনীতে, পরেশদের বাড়ি ঘাপ্‌টি মেরে আছে—কিন্তু আজ এখানে আসতে হবে জানত প্রবাল। মা'র অসুখ করেছে, খুব বাড়াবাড়ি—এ খবর পেয়ে স্থির থাকতে পারবে না। তাই এদিক-ওদিক না গিয়ে সুখেনের বাড়ির দিকেই নজর রেখেছিল।

সুখেন এসেও ছিল ঠিক। না, দলবল নিয়ে আসে নি। দলবল নিয়ে এলে মারামারি অনিবার্য, লাঠি, ছোরা, বোমা—সবই চলবে। এসেছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে,—নির্জন অন্ধকার পথ ধরে ধরেই। কারুরই চোখে পড়ে নি—প্রবালের ছাড়া।

প্রবালের চোখকে অত সহজে ধুলো দেওয়া যায় না। সে অন্ধকারেও সুখেনকে চিনতে পারে, স্রেফ ওর চলার ভঙ্গী দেখেই। মাকে দেখে তেমনই নিঃশব্দে পিছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়েছিল, এটা মেয়েদের যাওয়ার পথ বলে ধরে নিয়েছে সবাই, এ-দিকটায় কেউ থাকে না এ সময়ে। প্রবাল কেড্‌স জুতো পরে তৈরীই ছিল। নিঃশব্দে পিছু নিয়েছে। ফুলপ্যান্ট আর রঙীন গেঞ্জি গায়ে, সবুজ রঙের—অন্ধকারে ওকে দেখলেও যাতে কেউ চট ক'রে বুঝতে না পারে।

ঠিক সময়েই দ্রুত গিয়ে ধরেছিল, সুখেন কিছু টের পাবার আগেই। আর দেরি করলে সে ঘন বসতির মধ্যে গিয়ে পড়ত, সে অবসর দিলে চলবে না। চমকে উঠেছিল সুখেন, ভীষণ রকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরই প্রবালকে চিনতে পেরে একটু আশ্বস্তও হয়েছিল বোধ হয়। চাপা এবং বেশ কাঁপা-কাঁপা গলাতে বলে উঠেছিল, 'ও খোকা, তুই! আমি ভেবে-ছিলুম—।...একটা সিগারেট আছে রে, দিতে পারিস?'

এটা আর কিছু নয়, ভয় যে পায় নি সে তেমন—সে যে এ ভয়কে গ্রাহ্য করে না, এইটেই দেখাবার চেষ্টা। নইলে এমন একেবারে সিগারেট খাওয়ার জন্যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল না তার। কিংবা এমনও নয় যে, বহুদিন ধরে য়্যাব্‌স্‌কন্‌ড ক'রে বেড়াচ্ছে—কত দিন সিগারেট খেতে পায় নি।...এসব

চালাকি ভাল রকমই বোঝে প্রবাল।

তবে বোঝে যে, সেটা বুঝতে দেয় নি। সেও সহজভাবেই বলেছিল, 'আছে, নে। তোর কাছে ম্যাচেস আছে তো?' এই বলে—প্যাণ্টের পকেট থেকে সিগারেট বার করার ভঙ্গী ক'রে চোখের নিমেষে ছুরিটা বার ক'রে বিঁধিয়ে দিয়েছিল বিশেষ ছুটি পাঁজরার মধ্যে। সুখেনের দেহের কোথায় কি আছে তা ওর বিলক্ষণ জানা—বহুদিন একসঙ্গে খেলেছে, স্নান করেছে, পাশাপাশি এক বিছানায় শুয়েছে; খালিগায়ে দেখেছে বহুদিন, বহুবার। সুতরাং হিসেবে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। হাবুদা খুব ভাল ক'রে চিনিয়ে দিয়েছে—কোন্ পাঁজর—ক' নম্বরের নিচে বিঁধিয়ে দিতে পারলে মোক্ষম মার হয়—আর নো রিটার্ন।...

এ পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নে, নিরাপদে মসৃণভাবে হয়ে গিয়েছিল, গোল বাধাল সুখেনটা। একেবারে প্রাণপণ একটা চিৎকার ক'রে উঠল, আকাশ-ফাটা ধরনের, 'খোকা—এ কি করলি খোকা। আমি যে তোকে বিশ্বাস করে-ছিলুম। ওঃ, খোকা......!'

সন্ধ্যার অন্ধকারে এই পল্লী পরিবেশে সে বিকট মরণ-আর্তনাদ অনেকেরই কানে গেছে। ছুটে বেরিয়েও এসেছে কেউ কেউ। বিশেষ সুখেনের বাপ-কাকা—ওরা তো আসবেই। আজকাল রাত্রে চেঁচামেচি শুনলে অনেকেই বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না বটে—বোমাবাজির ভয়ে, কিন্তু যারা সুখেনের গলা চেনে, যারা তার আপন—তারা আসবে বৈকি।...

তারা এসেছে, খুঁজেও পেয়েছে সুখেনের লাশ।...

অগত্যাই পালাতে হয়েছে প্রবালকে। তখনই, সেই মুহূর্তে, এই একবস্ত্রে।

এমন যে হবে, এমন যে হ'তে পারে তা একবারও ভাবে নি প্রবাল। একটুও প্রস্তুত ছিল না সেজন্যে। নইলে খেয়ে আসত কিছু—যা হোক ক'রে দু-একটা টাকাও হাতিয়ে আনত।

কিন্তু এখন আর উপায় নেই। সুখেন যে কাকে 'খোকা' বলত—এ পাড়ার সবাই জানে। এ কাজ কে করেছে তাও জানতে বাকী নেই এতক্ষণ।

•

সেই থেকেই হাঁটছে প্রবাল। ছুটতে পারে নি, কারণ, ছোটা মানেই অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা—তবু প্রথমটা ছোটার মতো ক'রেই হাঁটতে হয়েছে। রাত বারোটার মধ্যে সাত-আট মাইল দূরে চলে এসেছে, তাও সোজা

রাস্তায় নয়, অনেক ঘুরে আসতে হয়েছে, মোট বোধ হয় তেরো-চোদ্দ মাইল হাঁটা হয়ে গেছে সেইটুকু আসতে।

কোথায় এসে পড়েছে আগে অত ভাবে নি। শুধুই দূরে যেতে হবে—এইটুকু মনে ছিল। পা যখন বিদ্রোহ করেছে তখনই ভাবতে শুরু করেছে, কোথায় একটু আশ্রয় নেওয়া যায়। আবছা-আবছা চিনেছে—দেশপ্রাণ পল্লী। তখন মনে পড়েছে মুরারির কথা। মুরারি ওর সঙ্গে পড়ত এককালে, তখন সেও ওদের কলোনীতে থাকত। এখন মামীমা ওকে পোষ্য নিতে এইখানে এসেছে। এককালে খুবই প্রীতির সম্পর্ক ছিল, বরং একটু প্রণয়ের সম্পর্কই ছিল বলা যায়—সেই ভরসাতে সে কোন দ্বিধা না ক'রেই আন্দাজে আন্দাজে মুরারির মামার বাড়ি গিয়ে উঠেছে, কড়া নেড়েছে।

কিন্তু এত রাত্রে ঐভাবে আসতে দেখেই মুরারি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। ঘরে ঢুকতে আলোয় হাতের কব্জির কাছে রক্তের দাগও লক্ষ্য করেছে, জামার সামনের দিকেও এক ফোঁটা।

শুষ্কমুখে বলেছে, 'গ্যাখ ভাই, মামা-মামীর আশ্রয়ে আছি, ওঁরা এইসব পলিটিক্যাল হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ একেবারে পছন্দ করেন না।...আমিও এর মধ্যে জড়াতে চাই না। আমার ভালও লাগে না। কেউই দেশের জন্যে বা দেশের লোকের জন্যে কিছু করে না—নিজের দলের হাতে শক্তি চায় নিজেদের সুবিধে হবে বলে—মিছিমিছি, তার জন্যে—আমি মরব আর অপরে মজা লুটবে—এত মারামারি কাটাকাটি আমার পছন্দ নয়। তুই ক্লান্ত হয়ে এসেছিস, বোস একটু—মামা-মামী ঘুমোচ্ছেন, আমি কিছু খাওয়াতেও পারব না, ওদিকের দরজা খুললেই ওঁদের ঘুম ভাঙবে—তবে ভাই প্লীজ, রাত শেষ হওয়ার আগেই চলে যাস।—আমি গ্যাখ স্বাধীন তো নই—আর তা ছাড়া, এসব খুন-জখমের ব্যাপার—এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লে টানাটানির শেষ থাকবে না।'

তখন মনে হয়েছিল একটা চড় কষিয়ে দেয় মুরারির গালে। ছোরাখানা থাকলে হয়তো ওকেও শেষ ক'রে দিত, নেহাৎ ওখানে ফেলে এসেছে—তাই। কিন্তু কিছুই করা গেল না শেষ পর্যন্ত। প্রাণ ভরে গালাগালও করতে পারল না। চেঁচামেচিতে যদি সত্যিই ওর মামা উঠে পড়ে—আর এই সব দেখে যদি লোক জড়ো ক'রে ধরিয়ে দেয়? সব পারে শালারা—! র', এ-ঝড়টা কেটে যাক, তারপর তুমিও আছ আর আমিও আছি। মনে মনে বলে প্রবাল

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে।...

'খোকা!'

স্পষ্ট, পরিষ্কার কণ্ঠে কে ডেকে ওঠে।

নিস্তব্ধ রাত্রির নির্জন পরিবেশ, হাওয়াও নেই তেমন বলে গাছপালায় মর্মর শব্দ পর্যন্ত উঠছে না।

তার মধ্যে এই ডাক—বেশ সরব শোনায়। সে ডাকের শব্দ যেন নিমেষে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, মনে হয় যেন ঝিলের ওপরে গিয়ে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে।

চমকে ওঠে প্রবাল, তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে সভয়ে চায় চারদিকে।

পরিষ্কার ঐ শালা সুখেনের গলা!

সুখেন! তাকে তো সে শেষ ক'রে দিয়ে এসেছে। যদিও প্রাণ থাকে—থাকবার কোন কারণ নেই, তবু যদি থাকে—সে হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে।...না, সে এখানে কি ক'রে আসবে?...

ওরই মনের ভুল।

সে ভয় পেয়ে গেল নাকি? ভয়ে ভুল শুনছে? নিজেরই মনের প্রতিধ্বনি?

তবু সাবধানে চারিদিক দেখে নিল। এই ঝিলটা কার তা জানে না, সম্ভবত আরও অনেকখানি লম্বা ছিল, সম্প্রতি খানিকটা বোজানো হয়েছে—সেই জন্যেই এখনও কিছুটা ফাঁকা পড়ে আছে ওদিকটা। দু'-একটা বড় গাছও আছে ঝিলের ধারে ধারে বা সেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে। বড় বড় গাছ। প্রবাল যেটার নিচে বসে আছে—বোধহয় শিরীষ গাছ সেটা, আম, তেঁতুল, ওদিকে বোধহয় আরও একটা শিরীষ গাছ। বেশ নির্জন।...এদিকে এখনও উদ্বাস্তু কলোনী হয় নি তেমন। আশেপাশে পুরনো আমলের পাকা বাড়ি সব, ফাঁক-ফাঁক—। সেই জন্যেই এখানে নিশ্চিন্তে বসে ছিল।

কিন্তু এ কি উৎপাত হ'ল! এখানে 'খোকা' বলে কে ডাকল তাকে?

বেশ ভাল ক'রে দেখে নিল। গাছের তলাগুলো, ঐ পিছনে পাকা বাড়িটা—সে বাড়িরও পিছন দিক এটা—তার পাঁচিলের ওপর উঠে বাগানের মধ্যে চোখ বুলোল। অন্ধকার, খুবই অন্ধকার, কাছাকাছি কোন আলোও নেই—তবু একটা মানুষ থাকলে বোঝা যাবে না, এমন নয়। বেশ ভাল ক'রেই দেখল চেয়ে চেয়ে—কেউ কোথাও নেই।

না, ওরই শোনার ভুল। যা চেঁচিয়েছিল কাল— ! এখনও যেন মনে হ'লে —শরীরের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।

সেই থেকেই ওর মনের মধ্যেটা ঐ—কী যেন বলে হাবুগ কথাটা—'শেকী' হয়ে গেছে। কেমন যেন বুকের মধ্যে কাঁপনের ভাব একটা, একটু ভয়-ভয়—একটু অপ্রস্তুত ভাব। কেন অপ্রস্তুত, কার কাছে—তা জানে না। একটু যেন লজ্জাই করছে ওর। একেই কি বিবেক বলে ?...ছোঃ !

অবশ্য, হ্যাঁ। প্রবালকে বিশ্বাস করেছিল ঠিকই। অনেক দিনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ওদের। বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝায়—সুখেনের সঙ্গে সেই রকমই ঘনিষ্ঠতা ছিল।

এই তো সেদিনও—গত বছরও এমন দিনে—সুখেনের বাড়িতে সব কারা এসে পড়েছিল, সুখেন রাত্রে প্রবালদের বাড়ি শুতে আসত। ওর সঙ্কীর্ণ তক্তাপোশের বিছানা—তাতেও কোন অসুবিধা বোধ করে নি কেউ। কারণ, অধিকাংশ সময়ই দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে শুয়ে থাকত। খুবই গরম, ঘাম হ'ত—কিন্তু তাও গ্রাহ্য করে নি।

ভালবাসাই ছিল ওদের। প্রগাঢ় ভালবাসা বললেও বোধহয় অন্যায় বলা হয় না। তবে তাই বলে যদি সে মনে ক'রে থাকে যে, ওদের এই সংগ্রামের মধ্যেও, বিপ্লবের এই আয়োজনে, ওদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঠিক থাকবে, প্রবাল অন্তত নিজে কোন অনিষ্ট করবে না—তাহলে বুঝতে হবে ওর মতো বোকা কেউ নেই।...প্রবাল কোন অন্যায় করেছে বলে মনে করে না। এ সময়, এ লড়াইয়ে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন দাম নেই।

'খোকা !'

আবার ! হঠাৎ মনে হ'ল প্রবালের, হৃদ্‌পিণ্ডটা তার ধ্বক ক'রে উঠে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এমন একটা অনুভূতি, ভয়ে—অকারণ, অস্পষ্ট, অজ্ঞাত একটা আতঙ্কে সর্বশরীর এমন অবশ হয়ে যাওয়া—এ আগে কখনও বোধ করে নি প্রবাল। পালাবে, কি চিৎকার করবে—এমন কি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবে, সে শক্তিও আর রইল না।

অথচ—শব্দটা এবার কাছে, খুব কাছেই হ'ল। মনে হচ্ছে পাশেই দাঁড়িয়ে ডাকছে শালা। খুব কাছে—

অনেকক্ষণ সময় লাগল অবশ হাত-পাগুলোকে সক্রিয় ক'রে নিয়ে ঘাড়

ঘুরিয়ে দেখতে। ভয়ে কাঁপছে তখনও হাত-পা এটা ঠিক, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে—তবু কোনমতে ফিরে তাকাল। এবার ওর নিশ্চিত মনে হয়েছিল যে, সুখেনকেই দেখতে পাবে—পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই গলা, সেই ডাক।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন পিছনে চাইল, চাইতে পারল, দেখল কেউ নেই। আবার একটু নড়ে চট ক'রে পিছনে ঘুরে গেল। শিরীষ গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে হয়ত লুকিয়ে আছে শালা—! কিন্তু না, সেখানেও কেউ নেই। ফাঁকা, শূন্য।...কছাকাছির মধ্যেও কাউকে দেখা গেল না, কোন জীবিত প্রাণী—একটা কুকুর-বেড়ালও না। ওর আগে ভয় হয়েছিল কোন পথের কুকুর না ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠে, এখন মনে হচ্ছে—একটা কুকুর ডাকলে ভাল হ'ত। তবুও মনে ভরসা পেত খানিকটা।

অন্ধকার রাত হ'লেও নক্ষত্রের আলোতে মোটামুটি আবছা আবছা দেখা যায়, বিশেষ ঐ ঝিল-বোজানো ফাঁকা জমিটার জন্যেও একটু আলোর আভাস আছে। আর একবার ভাল ক'রে দেখে এল চারদিক, কাছাকাছির মধ্যে গাছ-পালাগুলো—কেউ নেই।

আবারও একটা ভয় পেয়ে বসল ওকে। এ আর এক ভয়। বিষম অথচ আকারহীন আতঙ্ক একটা। ভয়টা যেন পায়ের দিক থেকে উঠে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল ওকে, অবশ ক'রে দিল সমস্ত দেহটা।

তবে কি—তবে কি—

ঐ যে ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে যে কথাটা—যা তখন বিশ্বাস করত—যে শব্দটা এখন উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়, এই নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় হবার পর—তবে কি একেই ভূত বলে? প্রেতাত্মা? ভূত বলে কি সত্যিই কিছু আছে? মা বলে যে অপঘাতে মরে সে ভূত হয়, সত্যিই কি তাই? সুখেন তাহ'লে—সুখেনই কি মৃত্যুর পর ভূত হয়ে তার পিছু নিয়েছে?

যাঃ, বাজে কথা যত সব!

ভয়ে আড়ষ্ট মনটাকে চাবুক মেরে সচেতন সক্রিয় ক'রে তুলতে চায়।

তাহ'লে তো শালা এতক্ষণ বদলা নিয়ে নিত। ছেড়ে কথা কইত নাকি? ও যত্ত সব বাজে কুসংস্কার। ঠিকই বলে হাবুদা, বুর্জোয়া বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের স্পিরিট নষ্ট ক'রে বশীভূত রাখার জন্যে মিথ্যা একটা ভয়ের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। একটা গল্পকথা, মূলহীন, সত্যের সঙ্গে সংস্রবহীন একটা গালগল্প ··

'খোকা!'

ঐ আবার!

'এই শালা সুখেন, চুপ কর না, কী পেয়েছিস কি আমাকে?...এই বুঝি তোর বদলা? মারার ক্ষমতা নেই—শালা পেছন থেকে ছোট ছেলের মতো ভয় দেখানো হচ্ছে!...তুমি এই মতলব এঁটেছ, এমনি ক'রে আমাকে পাগল করবে?...অত্‌ত সোজা নয়! এ শম্মা প্রবাল ভটচাজ যমকে পরোয়া করে না। তা করলে এ কাজ করতে যাবেই বা কেন? এ তো মরণের সঙ্গে খেলা করা—জানা কথাই।'

প্রবালের মনে হচ্ছিল কথাগুলো সে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ক'রেই বলছে। কিন্তু হঠাৎ এক সময় খেয়াল হ'ল,—কই, শব্দ তো কিছু বেরোচ্ছে না!

সে কেঁদে ফেলল এবার, 'এই সুখেন—কেন অমন করছিস? বদলা নিতে হয় সামনে আয়, বল্‌ কি বলবার আছে! মারতে হয় মার্‌,—আমি পালাব না!'

'খোকা!'

স্পষ্ট, পরিষ্কার। খুব কাছে। যেন মনে হ'ল ওর ঘাড়ের কাছে মুখ এনে কে ডাকল। একটা যেন নিঃশ্বাসের মতো গরম হাওয়াও লাগল গালের ওপর—

চিৎকার ক'রে উঠল প্রবাল।

বিকট বুকফাটা চিৎকার।

ঠিক যেমন সুখেন চেঁচিয়েছিল মরবার আগে।

তবে প্রবালের চিৎকারে কোন কথা ছিল না, কোন শব্দ উচ্চারিত হ'ল না। শুধুই একটা পৈশাচিক চিৎকার যেন—

তার পরই ছুটে গিয়ে ঝিলের মধ্যে ঝাঁপ দিল সে।

কিন্তু, সেইটেই মস্ত ভুল হ'ল। ঝিলে জল বেশী নেই, তবু এক মানুষের চেয়ে বেশী গভীর। প্রবালের হাতে-পায়ে যেটুকু জোর ছিল—এই উঠে ছুটে আসতেই শেষ হয়ে গেছে। জলে পড়ে আর হাত নাড়তে পারল না। একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই যেন। সাঁতার কাটা কি ভেসে থাকার জন্যেও যেটুকু হাত-পা নাড়া দরকার—তাও সে পারছে না।

সে চিৎকারে—কাছাকাছি বাড়ি থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলেন বৈকি!

ছুটোছুটি, টর্চ ধরে চারিদিক দেখা, ডাকাডাকি—যে বাড়ি থেকে কেউ বেরোয় নি—সে বাড়ির লোকদের।

কিছুই কেউ দেখতে পেল না। একজন বললেন অবশ্য যে, জলে ঝপ্ ক'রে কিছু পড়ার একটা আওয়াজ পেয়েছেন—কিন্তু কে, বা কি? জনৈক কেদারবাবু বললেন, 'বড় মাছ আছে তো, তারাই ঘাই দেয় মধ্যে-মধ্যে। জল যে নড়ছে একটু-একটু সেও সেই জন্যে—এইটুকু জলে লাফিয়ে পড়লে আর কোথায় যাবে?'...

কাজের কাজ যেটা হ'ল, হরিশবাবুর চন্দনাটা সন্ধ্যার আগে খাঁচার দোর খোলা পেয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেটাকে দেখতে পেলেন তিনি, শিরীষ গাছের ডালে-ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে, অন্ধকার বলে বেশীদূর কোথাও চলে যেতে পারছে না—অন্য গাছে বা দূর কোন বাড়িতে। হরিশবাবুর ছেলে খোকা সেই অন্ধকারেই গাছে উঠে ধরে ফেলল। বহুদিনের পাখী ওদের—আর খুব প্রিয়। ঠিক নাকি মানুষের মতো কথা বলে।...

ঝিলের জলে কিন্তু সত্যিই একটা লাশ ভেসে উঠল, পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ। তাও শেওলা-দামে জড়িয়ে গিয়েছিল বলে সবটা ভাসতে পারে নি। সবুজ মতো কী একটা আটকে আছে দেখে কেদারবাবুর স্ত্রী দু'চারজনকে ডেকে দেখালেন—তখন কাছে গিয়ে দেখে মানুষ বুঝতে পেরে পুলিসকে খবর দিল পাড়ার লোকেরা।

পুলিস তখনই আসতে পারে নি। তারা লোকজন এনে যখন তুলল—তখন আর সে লাশ সনাক্ত করার উপায় নেই, মাছে কি আর কিছুতে মুখটা খাব্‌লে-খাব্‌লে খেয়েছে, দেহটাও ফুলে উঠেছে। তবে বয়স অল্প তা বোঝা গেল।

পুলিসের লোক গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দিল ময়না-তদন্তের জন্যে। জেরা-জিজ্ঞাসাবাদও কিছু হ'ল—কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারল না। এ পাড়ার কেউ হারায় নি। এরা কিছু জানে না।

দ্বিতীয় পক্ষ

পারঘাটার উপরেই নরহরির পানের দোকান; তাহার পাশে মন্মথ বসিয়া

পরোটা ভাজে। আলুর দম, পরোটা ও রসগোল্লা এই তাহার সম্বল, কিন্তু ইহাতেই তাহার খুব বিক্রি।

এই দুটি দোকানের সামনে ইজারাদারের একটা তক্তাপোশ পাতা থাকে, তাহারই উপর—এপারের এই ঘাটে যাহাদের জীবিকা বাঁধা তাহারা সকলে বসিয়া জটলা করে রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত। ফলে নরহরির পান উড়িতে থাকে, মন্মথর চুলী হইতে টিকা ধরানো হয় বলিয়া তামাকের খরচাটা তাহারই লাগে। এই মজলিসে আলোচনা হয় না এমন বিষয় নাই, রাজার করোনেশন হইতে শুরু করিয়া জাপানে বিড়ালের মাংস খাওয়ার কথা, মায় শশধর মণ্ডলের লাঠিখেলার কথা পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। এমন কি দুই-তিনদিন বাদ দিয়া একই প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইলেও ক্ষতি নাই।

সাধারণতঃ শীতের রাত্রে একটু সকাল সকালই বৈঠক ভাঙে কিন্তু সেদিন অত রাত্রি হওয়া সত্ত্বেও সকলে বসিয়া ছিল। তাহার কারণ চৌধুরীবাবুদের বড়ছেলে নিখিল সেদিন বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া ফিরিবে; রাত্রি সাড়ে এগারোটার ট্রেনে পৌঁছিয়া ওপার হইতে নৌকা করিয়া যখন এপারে আসিবে তখন সকলে একবার নববধূকে দেখিয়া লইবে—এই ছিল উদ্দেশ্য।

গোবর্ধন শিহরিয়া উঠিয়া উনানের ধারে সরিয়া বসিয়া কহিল, 'বাতাস চালিয়েছে খুব। বৌ দেখতে গিয়ে নিমোনিয়া না ধরলে বাঁচি।'

মন্মথ দোকানের উপর হইতে হুঁকাটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, 'রাতটা কি সোজা হ'ল পালের পো? অঘ্রাণ মাসের দেড়-প্রহর রাত!'

নরহরি সেদিন সন্ধ্যা হইতেই অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল, সে এইবার অকারণে খানিকটা কাসিয়া লইয়া কহিল, 'কাল আমাকে অমূল্য ধরে পড়েছিল খুব, বুঝলি গোবর্ধন?'

গোবর্ধন কহিল, 'কে অমূল্য?'

বিরক্ত হইয়া নরহরি কহিল, 'খাগড়ার অমূল্য পরামাণিক, আবার কে। এরই মধ্যে ভুলে গেলি?'

গোবর্ধন কহিল, 'ওঃ—হ্যাঁ, তা কি বলছিল সে?'

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া নরহরি কহিল, 'আমাকে আবার বিয়ে করতে বলে। বলে 'কী-ই বা তোমার বয়স, এই বয়সে তুমি হাল ছেড়ে দেবে কেন? তাছাড়া একলার ঘর, ভাত-জল দেবারও লোক একটা চাই তো'।

অকস্মাৎ উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল। গোবর্ধন কহিল, 'অমূল্যর কি

মাথা খারাপ হয়েছে ? পঞ্চাশের ওপর বয়স হ'ল—এই বয়সে আবার বিয়ে ?'

পঞ্চা কহিল, 'না, না, বেশ আছ নরহরিদা, এই বয়সে একটা কচি মেয়ে এনে আর ঝঞ্ঝাট বাড়িও না। ছিঃ ছিঃ—সে শুধু একটা কেলেঙ্কারি বাধানো।'

অপ্রতিভ হইয়া নরহরি কহিল, 'আরে তোমরাও যেমন পাগল, আমি কি ঐসবে কান দিই ? বলছিল এমনি, ওর যেন কে আছে—'

সে চুপ করিয়া গেল। খানিকটা এ-কথা সে-কথার পর মন্মথ কহিল, 'অমূল্য কাল কখন এল নরহরি ?'

নরহরি প্রথমটা জবাব দিল না। কিন্তু প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে অগত্যা জবাব দিতে হইল ; কহিল, 'এখানে আসে নি—'

মন্মথ কহিল, 'তবে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথা ?'

নরহরি কহিল, 'দুপুরবেলা ঐ বড় রাস্তার ধার দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা।'

তাহার পরই বিরক্ত হইয়া কহিল, 'তুই আবার জেরা লাগালি যে খুব ! আমি কি মিছে কথা কইছি ?'

মন্মথর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়াছিল, হয়ত সে একটা কড়া জবাবই দিত, কিন্তু এই সময় ওপারে ট্রেনের আলো দেখা দিতেই, প্লাটফর্মের উপর যে বাজনদাররা অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা দিল বাজনা জুড়িয়া। এইসব গোলমালে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। সকলে ভিড় করিয়া ঘাটের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, শুধু নরহরি ও মন্মথ দোকান ফেলিয়া যাইতে পারিল না, সেইখান হইতেই গলা বাড়াইয়া রহিল।

খানিকটা পরেই প্রচুর হৈ-চৈ এবং বাজনাবাদ্যের মধ্যে বর-বধূর নৌকা এপারে ভিড়িল। য্যাসিটিলিনের আলোতে এমনি হয়ত ভাল করিয়াই দেখা যাইত কিন্তু লোকের ভিড়ে নরহরি বধূকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। তক্তাপোশের উপর দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াও শুধু একখানি সুগোল শুভ্র হাত এবং লাল বেনারসীর প্রান্তটুকু মাত্র দেখিতে পাইল। মোটরে উঠিবার সময় একবার একখানি চন্দনচর্চিত সুকুমার মুখ নজরে পড়িল বটে কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য, তাহাতে মুখ-চোখ কিছুই ঠাওর হইল না।

বর-বধূ চলিয়া যাইবার পর আরও কিছুক্ষণ বধূর রূপ লইয়া আলোচনা চলিল। নিখিলের বৌ যে রূপসী হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র ছিল না। সকলেই একবাক্যে নিখিলের ভাগ্যের প্রশংসা করিল এবং রূপসী স্ত্রী লাভটা কেলমাত্র ভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে, বারংবার এই কথাটাই প্রমাণ

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইভাবে মন্মথর প্রায় আরও আধ সের তামাক পুড়িবার পর সকলে যখন বিদায় লইল তখন রাত একটা বাজে।

নরহরি সমস্ত সময়টাই একরকম চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, সকলে চলিয়া গেলে মন্মথ যখন ডাকিয়া বলিল, 'আজ কি বাড়ি যেতে হবে না নাকি নরহরি?' তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। 'এই যে যাই'—বলিয়া উঠিয়া পড়িয়া সে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিল; তাহার পর হ্যারিকেনটা হাতে ঝুলাইয়া মন্মথর খান-দুই পরোটা গামছায় বাঁধিয়া লইয়া বাসার দিকে যাত্রা করিল।

ঘাটের নিকটেই নরহরির বাসা। নির্জন বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া কপাটের তালা খুলিতে খুলিতে তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। প্রায় ছয় মাস হইল তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, এই ছ'মাসেই ঘর-দুয়ার যেন ভূতের বাসা হইয়া উঠিয়াছে। কে-ই বা দেখাশুনা করে আর কে-ই বা সময়ে ভাতজল আগাইয়া দেয়! নরহরির মনে পড়িল, মৃত্যুশয্যায় পড়িবার আগের দিনও তাহার জন্য রাত্রি একটা পর্যন্ত বৌ জাগিয়া বসিয়া ছিল।...

কোনমতে ঠাণ্ডা পরোটা দুইখানা গিলিয়া নরহরি শুইয়া পড়িল। দাঁতের ব্যথার জন্য সে শীতকালে রাত্রে জল খাইতে পারিত না। তাহার বৌ যতদিন বাঁচিয়া ছিল, আহারের পর শুক্‌নো পাতা-লতা জ্বালিয়া প্রত্যহ তাহাকে চা প্রস্তুত করিয়া দিত। এখন আর কোনদিনই তাহার অদৃষ্টে সে-সব জোটে না।

ঠাণ্ডা, মলিন বিছানায় কাঁথামুড়ি দিয়া নরহরি শুইল বটে, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় চকিতের জন্য যে সুন্দর মুখখানি তাহার নজরে পড়িয়াছিল সেই মুখটাই বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল, আর সেই গৌরবর্ণ, সুগোল হাতটি!

নরহরি ভাবিতে লাগল তাহার অদৃষ্টের কথা। আর কিছুদিন আগেও যদি তাহার বৌটা মরিত তাহা হইলে বোধ করি তাহার বিবাহের প্রস্তাবে লোকে এতটা পরিহাস করিত না! আর কীই-বা তাহার এমন বেশী বয়স হইয়াছে? আরও পঁচিশটা বছর সে অনায়াসে বাঁচিবে! তাই যদি হয় তো, দীর্ঘকাল তাহাকে কি এমনি করিয়া দিন কাটাইতে হইবে?

রাগ ধরিতে লাগিল তাহার লোকগুলির উপর। বিশেষ করিয়া ঐ মন্মথটা, আস্ত শয়তান লোকটা! মরিত উহার নিজের বৌ, তো নরহরি দেখিয়া লইত কেমন সে নিজে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারে। তবু তো উহার ঘরে অন্য মেয়ে-ছেলে আছে।

কল্পনা-নেত্রে সে নিখিলের কথাটা ভাবিতে লাগিল। এতক্ষণে কত ছলে সে চুরি করিয়া তাহার বালিকা বধূকে দেখিয়া লইতেছে। আজ কালরাত্রি, কিন্তু তবুও কি তাহারা ছাড়িয়া দিতেছে, বৌ-ও নিখিলের দিকে চাহিয়া এতক্ষণে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে নিশ্চয়। দুজনেই ভাবিতেছে আর একটা দিন কাটিলে হয়।

ভাবিতে ভাবিতে নরহরির মাথা যেন গরম হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া একছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। গঙ্গার নৈশ বাতাসে অন্ধকার গাছগুলি ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, হাড়ের মধ্য অবধি যেন বাতাসে কাঁপাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু নরহরির সেদিন কিছুমাত্র ঠাণ্ডা বোধ হইল না। সে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে স্থির করিল যে, কালই অমূল্যকে একখানা চিঠি লিখিবে। সত্যসত্যই সে যদি একটা মেয়ে দেখিয়া দিতে পারে তো মন্দ কি? উহারই মধ্যে একটু ডাগর দেখিয়া—না হয় বিশ পঞ্চাশ টাকা সে খরচাই করিবে!

প্রস্তাবটা যতই ভাবিতে লাগিল ততই যেন তাহার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেকদিন ভগ্নীর কোন সংবাদ পায় নাই বলিয়া সে একখানা পোস্টকার্ড আনিয়া রাখিয়াছিল, সেই কার্ডটাই টানিয়া লইয়া নাকে চশমা লাগাইয়া গভীর রাত্রে সে চিঠি লিখিতে বসিল—

কিন্তু পাঠ পর্যন্ত লিখিয়াই নরহরি সহসা থামিয়া গেল। অকস্মাৎ মনে হইল তাহার দুই কানে যেন বহু লোকের উপহাসের হাসি তপ্তশলাকার মতো প্রবেশ করিল। সকলেই হাসিবে এবং টিটকারি দিবে, মায় ঐ মন্মথটা পর্যন্ত! আর যদি সে মেয়েটিও তাহাকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখে, ভাল না বাসে? বয়স যে তাহার সত্যই হইয়াছে তাহাতে তো কোনও সন্দেহ নাই।...

বহুক্ষণ নরহরি প্রদীপের আলোর সম্মুখে পোস্টকার্ড এবং দোয়াত কলম লইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সবগুলিই পুনরায় তুলিয়া রাখিয়া, ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তখনও চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু তাহার যেন মনে হইল রাত আর বেশী নাই।

বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে অনেকক্ষণ ঘুরিয়াও নরহরি সুস্থ হইতে পারিল না। চন্দনলিপ্ত একটি ললাট ও একখানি সুন্দর সুকুমার হাত তাহার বুকে যে বিষের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল তাহারই তীব্র দাহনে তাহার সারা দেহ যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল। বহুক্ষণ এইভাবে ছটফট করিয়া বেড়াইয়া অবশেষে

মন্মথর ঘরের কাছে গিয়া হাঁক দিল, 'মন্মথ, ও মন্মথ, আজ কি উঠবে না? রাত যে আর রইল না।'

অনেক হাঁকাহাঁকির পর ঘুম-চোখে মন্মথ বাহির হইয়া আসিল, 'ব্যাপার কি নরহরি? এত রাত্রে?'

নরহরি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, 'রাত আর কই হে? ভোর হ'ল যে।... হ্যাঁ, তাই বলছিলাম মন্মথ, সকলে যে আহা-মরি করে ঢলে পড়ল নিখিলবাবুর বৌকে দেখে, অতটা কিছু নয়। কুমীরের মতো হাঁ, মুলোর মতো দাঁত, এই টুকু-টুকু চোখ,—কোন্‌খানটায় সুন্দর ও?'

রায়বাড়ির অতিথি

পাঠ্যপুস্তকের বোঝা লইয়া স্কুলে স্কুলে ক্যানভাসিং করিয়া বেড়াইতেছিলাম, কৌতূহল চরিতার্থ করিবার মতো সময় তখন ঠিক ছিল না—কিন্তু তবুও অত বড় একটা বাড়ি খালি হা-হা করিতেছে দেখিয়া কৌতূহল সম্বরণ করিতেও পারিলাম না। মুটেটাকে প্রশ্ন করিলাম, 'এ বাড়িটা এমন হয়ে পড়ে কেন রে?'

সে আমার অজ্ঞতায় আশ্চর্য হইয়া জবাব দিল, 'এটা যে রায়বাড়ি গো মশায়।'

আমি কহিলাম, 'রায়বাড়ি তা কি হয়েছে। খালি কেন?'

সে কহিল, 'আরে ওটায় যে ভূত বেড়ায় গো। সে মস্ত ভূত।'

'ভূত।'

চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বীরভূমের তৃণবিরল, বৃক্ষবিরল প্রান্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা প্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে—একেবারে খালি। জঙ্গলের মধ্যে হইলে হয়ত এতটা আশ্চর্য বোধ হইত না, কিন্তু এমন একটা মাঠের মধ্যে এতবড় একটা বাড়ি খালি পড়িয়া আছে দেখিলে কেমন যেন বুকের মধ্যে গুর গুর করিয়া ওঠে। জানালা দরজা একখানাও নাই, বোধ করি ভূতের ভয় অগ্রাহ্য করিয়াই কেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, ঘরের দেওয়ালও এক আধ-জায়গায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তা পড়ুক—কিন্তু সকলের চেয়ে যেটা চোখে পড়ে সেটা হইতেছে ঘরে বাহিরে বাড়িটার অপরিসীম শূন্যতা। এরূপ ক্ষেত্রে

যে গাছ অবশ্যম্ভাবী, সেই বটগাছ পর্যন্ত বাড়িটার কোন ভাঙা কাটলে গজায় নাই। বাহিরের সমস্ত মাঠখানার মধ্যে শুধু একটা মুমূর্ষু খেজুর গাছ এখনও কোনও মতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এ লোকটিকে প্রশ্ন করিয়া কোনও লাভ নাই তাহা আগেই বুঝিয়াছিলাম; তাই সে বৃথা চেষ্টা আর না করিয়া সোজা স্কুলে চলিয়া গেলাম এবং কথায় কথয় মাস্টার মহাশয়দের কাছে কথাটা পাড়িলাম। কিন্তু তাঁহারা সকলেই প্রায় একসঙ্গে জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন। অনেক কষ্টে তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া একে একে তাঁহাদের কাহিনীগুলি শুনিয়া দেখিলাম যে, তিনটি সম্পূর্ণ তিন রকমের কাহিনী। তাহারই মধ্য হইতে একটা আপস করিয়া এবং খানিকটা নিজের কল্পনা মিশাইয়া যে গল্পটি খাড়া করিয়াছি, আজ তাহাই আপনাদের উপহার দিলাম। ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করিবেন, না করিতে চান, তাহাতেও ক্ষতি নাই।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বের কথা। তখন বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে জমিদার মাত্রেরই প্রায় রায় উপাধি থাকিত; এবং রায়-বংশ বলিতে অনেক জমিদার-বাড়িই বুঝাইত। কিন্তু তবুও এই বিশেষ রায় বাড়ির খ্যাতি তখন এত বেশি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, স্থানের নাম না করিয়া শুধু রায়বাবুরা কিংবা রায়-বাড়ি বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিত যে, এই বিশেষ জমিদার বংশের কথাই বলা হইতেছে। সমগ্র রাঢ়ে এত প্রতাপ আর কাহারও ছিল না, ইঁহাদের নামে বাঘে-গরুতে তো বটেই, বাঘে-ছাগলেও একঘাটে জল খাইত। অন্য সমস্ত জমিদাররা ইঁহাদের ভয় করিয়া চলিতেন এবং বিপদে আপদে ইঁহাদের ভরসাও রাখিতেন। কিংবদন্তী ছিল যে, ইঁহাদের একশত লাঠিয়ালের সম্মুখে পড়িলে কোম্পানীর সিপাহীরাও কামান-বন্দুক ফেলিয়া পলাইত।

এ হেন রায় বংশের শেষ জমিদার কন্দর্পনারায়ণ রায় যখন বহু বয়স পর্যন্ত নিঃসন্তান থাকিবার পর দত্তক পুত্র লইলেন তখন সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে, রায়-বংশের লক্ষ্মী এবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কারণ নিজেদের বংশের রক্তকে অবহেলা করিয়া তিনি দত্তক লইলেন স্ত্রীর ভগিনী-পুত্রকে। যদিচ সে লোকটিও জমিদার তথাপি তাঁহাদের বংশের লাম্পট্যের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। আশ্চর্য এই যে, তাঁহার স্ত্রী পর্যন্ত এ কার্যে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞাতিদের নিকট মাথা নোয়াইবার ভয়ে তিনি কাহারও কথায় কান দেন নাই, হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমিই মানুষ করে দিয়ে যাব, ভয় কি?'

কিন্তু মানুষ তাঁহাকে করিতে হইল না। দত্তক লইবার বৎসর খানেক পরেই তিনি সহসা একদিন শিকারে গিয়া আর ফিরিলেন না, সেইখানেই তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হইল। মা বা মাসী যাহাই বলুন—কীর্তিনারায়ণকে মানুষ করিবার ভার পড়িল তাঁহারই উপর, কিন্তু ছেলে যখন ষোল বছরেরটি হইল, তখন তিনি বার্ধক্যের দ্বারে পৌঁছিয়াছেন, প্রথম যৌবনের উদ্দামগতি সামলাইত পারেন—এত জোরে রাশ ধরিবার শক্তি তাঁহার আর ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলের বিবাহ দিলেন, কিন্তু বধূও বালিকা, সে স্বামীকে সামলাইতে পারিল না। আঠার বছর বয়সেই কীর্তিনারায়ণ বাহিরে নূতন নাচঘরের পত্তন করিল এবং প্রায় গুটি বার তের মোসাহেবকে পুষিতে শুরু করিল। মা বেগতিক দেখিয়া তাঁহার নিজের স্ত্রীধন পাঁচটি নৌকায় বোঝাই করিয়া কাশী যাইবার উদ্দেশ্যে নৌকায় চাপিলেন। জ্ঞাতিরা হাসিয়া কহিল, 'রায় বাড়ির লক্ষ্মী এবার নৌকোয় চাপলেন। এইবার নীলামের তারিখ দেখ—'

কীর্তিনারায়ণ লেখাপড়া বেশী শেখে নাই, কিন্তু শক্তির চর্চা করিয়াছিল। সবরকম অস্ত্রচালনা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতিতে সে ঐ বয়সেই যথেষ্ট নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতার বীর্য সে শক্তিকে কাজে লাগিতে দিল না, যাহার রক্তের সহিত উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ মিশিয়া রহিয়াছে, সে কেমন করিয়া রাজ্যপাট করিবে ?... মা যাত্রা করিবার দিন-দুই পরে অকস্মাৎ তাহার মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করিলেন, সে ভাবিল রায়-বংশের এতটা ঐশ্বর্য বাহিরে চলিয়া যাইবে! সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে ; সন্ধ্যার অন্ধকারে গা মিশাইয়া দশজন বাছাই করা লাঠিয়াল লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল, মুখে মুখোশ পরিয়া মায়ের নৌকা লুঠ করিতে —এবং লুঠ করিয়াও আনিল। মা যে নৌকায় ছিলেন শুধু সেইটিতে সে ঢোকে নাই—রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই বাকি চারখানি নৌকার জিনিস লইয়া সে দ্রুতগামী ছিপে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মায়ের নৌকা লুঠ করিয়া যে দস্যুবৃত্তি শুরু হইল, সে বৃত্তি আর থামিল না। নূতন যৌবনের এবং দৈহিক শক্তির নেশায় উন্মত্ত হইয়া সে যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল। রায়-বংশের বিখ্যাত লাঠিয়ালরা বিখ্যাত ডাকাতের দলে পরিণত হইল। সমস্ত রাঢ়ের লোকের ধন-প্রাণ এবং ইজ্জত বিপন্ন হইয়া উঠিল। কারণ শুধু ঐশ্বর্যই তাহারা লুঠ করিত না; স্ত্রীলোকও লুঠিয়া আনিত। বহু কুলবধূর সম্মান এবং সতীধর্মের অপঘাত ঘটিতে লাগিল ঐ নবনির্মিত

নাচঘরে। কীর্তিনারায়ণ তাহার বাপের দুর্নামকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গেল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সে সুন্দরী স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিত এবং চার পাঁচ দিন কিংবা সাত আট দিন নিজের কাছে রাখিয়া অনুচরদের দান করিত, এই ছিল তাহার কাছে রমণীর ইজ্জতের মূল্য।

তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়, কোম্পানী নিজের রাজত্ব সামলাইতেই ব্যস্ত, নবাবী আমলও আর নাই—সুতরাং তাহাকে বাধা দিবারও বিশেষ কেহ ছিল না। কীর্তিনারায়ণ একরকম প্রকাশ্যেই ব্যভিচার ও অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালাইল। লোকে ভাবিতে শুরু করিল যে ভগবান বুঝি নাই।

কিন্তু ভগবান যে আছেন, তাহা বোঝা গেল বছর পাঁচেক পরে। কেমন করিয়া, তাহাই বলি—

অকস্মাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে শক্তিপুরের রাজারা লক্ষ্ণৌ হইতে এক বাইজী আনাইয়াছেন, বাইজীটি শুধু বয়সেই তরুণী নয়, সুগায়িকা এবং রূপসী।

কীর্তিনারায়ণ একজন অনুচরকে ডাকিয়া আদেশ করিল, 'তুমি এখনই শক্তিপুরে রওনা হও। বাইজীকে আমার সেলাম দিয়ে আমার নিমন্ত্রণ জানিও, একরাত্রি তাকে এখানে আসতে হবে। ব'লো যে, পাঁচশ মোহর পাবে বখশিশ—আর এই দশখানা মোহর নিয়ে যাও, বায়না দিয়ে আসবে।'

পরের দিন অপরাহ্ণে অনুচরটি ফিরিয়া আসিল, একা এবং শুষ্কমুখে।

কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, 'কি হ'ল? কবে আসবে?'

সে জবাব দিল, 'আসবে না।'

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কীর্তিনারায়ণ কহিল, 'তার মানে?'

'বাইজী হিন্দু, তার স্বামী আছে। মানে সেই স্বামীই তার সারেঙ্গী। এখানকার সে অনেক বদ্‌নাম শুনেছে, তাই আসতে চায় না।'

কীর্তিনারায়ণ কহিল, 'হুঁ। লেঠেলদের তৈরী হতে বল্। আর বাদামকে বার কর।'

বাদাম কীর্তিনারায়ণের ঘোড়ার নাম, সে বাতাসেরও আগে যাইতে পারে, এমনি একটা খ্যাতি ছিল।

যথাসময়ে লাঠিয়ালরা তৈরী হইল, বাদামকে বাহির করা হইল। প্রায় পঞ্চাশটি তেজস্বী ঘোড়া মাঠের উপর দিয়া তীরবেগে ছুটিল শক্তিপুরের দিকে।

গ্রামবাসী যাহাদের কানে সে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ গেল, তাহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু বুজিল।

শক্তিপুরে বাইজীকে যেখানে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কিছু দূরে গিয়া সকলে থামিল। কীর্তিনারায়ণ ঘোড়ার উপর বসিয়াই একজনকে ডাকিয়া কহিল, 'বাইজীর বাড়িতে যা, গিয়ে আমার নাম করে শেষবার তাকে নিমন্ত্রণ জানা, আর বুঝিয়ে দে যে কীর্তিনারায়ণের খেয়াল যা হয়েছে, সে তা নেবেই ; কাজেই গোলমাল ক'রে কোনও লাভ নেই। যদি ভালমানুষিতে আসতে চায় তো আসুক, আমি গান শুনেই তাকে ছেড়ে দেব। হিন্দুস্থানী মেয়েতে আমার লোভ নেই।'

বাইজী ও তাহার স্বামী তখন লোকজনসুদ্ধ যাত্রারই আয়োজনে ব্যস্ত, রাত্রিতে চুপি চুপি নৌকা চাপিয়া যাত্রা করিবে—এই ছিল উদ্দেশ্য। কীর্তি-নারায়ণ যে সেইদিনই উপস্থিত হইতে পারিবে, তাহা সে আশঙ্কা করে নাই। বাহিরে ক্ষুরের শব্দ পাইয়াই সকলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। শক্তিপুরের যে দুইজন দারোয়ান ছিল, তাহারা বোধ করি বাতাসেই উবিয়া গেল।

বাইজীর স্বামী বা সারেঙ্গী বাহির হইয়া আসিয়া বিবর্ণমুখে কীর্তিনারায়ণের কথা শুনিল, তাহার পরে ভিতরে আসিয়া বাইজীকে প্রশ্ন করিল, 'কি করব বলো ? চল বরং যাই—ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে।'

হীরাবাই-এর চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে কহিল, 'ছিঃ!…ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে, আমি যাবো না।'

তাহার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। দস্যুর দল হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল ; বাইজীর স্বামী ও অন্যান্য ভৃত্যেরা নিচের তলায় লাঠি-সোঁটা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু সে দুর্ধর্ষ দলের সহিত তাহারা কতক্ষণ যুঝিবে ? তিন চারিটি লোক তিন-চার মিনিটের মধ্যেই পরলোকের পথে যাত্রা করিল এবং কীর্তিনারায়ণের আদেশে আহত সারেঙ্গীকে ধরিয়া আনিয়া একটা গাছের ডালে গলায় ফাঁস দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

হীরাবাই ছিল উপরের ঘরে। সে জানালা দিয়া সবই দেখিতেছিল এবং শুনিতেছিল। ইজ্জৎ বাঁচাইবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া সে শেষ উপায়ই বাছিয়া লইল। বিজয়ী কীর্তিনারায়ণ যখন দ্বিতলে পৌঁছিল, তখন হীরাবাই-এর মৃতদেহ চালের আড়ায় ঝুলিতেছে। তাহার সিঁথির সিঁদুর

তখনও জ্বলিতেছে, চোখে তাহার তখনও অভিশাপের জ্বালা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়া কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

জীবনে এই প্রথম কীর্তিনারায়ণ শিহরিয়া উঠিল; জীবনে এই প্রথম সে নিজের কীর্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কারণ বোধ হয় যে, এ-ই তাহার প্রথম পরাজয়, তাহার জেদ সে বজায় রাখিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে সে কেমন এক রকম গলার আওয়াজ করিয়া কহিল, 'মদ আছে কার কাছে রে? দে তো এক গ্লাস খাই।'

বিনোদ তাহার সর্বাপেক্ষা পুরাতন মোসাহেব এবং বন্ধু। সে কহিল, 'ভয় পেলি নাকি রে? তোর গায়ে কাঁটা দিয়েছে যে!'

ভয়! জোর করিয়া হাসিয়া কীর্তিনারায়ণ কহিল, 'রায়েদের ভয়? তুই কি স্বপন দেখছিস?...ভাবছি ছুঁড়িটা খুব ফাঁকি দিয়ে গেল—'

বিনোদ কহিল, 'যত অনিষ্টের মূল এই শক্তিপুরের লোকগুলো, ওরাই নিশ্চয় নানা কথা লাগিয়েছিল, তাই এরা কিছুতেই রাজী হ'ল না। দিই আগুন ধরিয়ে গাঁয়ে, ব্যাটারা জব্দ হোক্।'

কীর্তিনারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'না, আজ আর ভাল লাগছে না। আজ থাক্—ফেরবার হুকুম দে।'

ফিরিবার পথে সকলেই কেমন মুষড়িয়া রহিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দই পাওয়া যাইতেছিল না। সকলেরই মনে কেমন একটা সর্বনাশের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সকলেই কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল যে, কোথায় কী একটা বিপদ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এইবার এতদিনের অনাচারের একটা হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সকলে এক সময়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দ্বিতলের নাচঘরের সব কয়টি জানালা দিয়া উজ্জ্বল আলোক-ছটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সেইদিককার বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে অপরূপ এক নারীকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত!...

সাধারণত কীর্তিনারায়ণ বাড়িতে না থাকিলে নাচ-গানের আয়োজন হইতই না, বিশেষ করিয়া এ সুমিষ্ট সঙ্গীত কার? কোনও বাইজী বা নর্তকী তো আজ ছিল না!

আবার কীর্তিনারায়ণের দেহ শিহরিয়া উঠিল, জীবনে প্রথম সে অনুভব

করিল যে, সে ভয় পাইতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়াই সে প্রাণ-পণে ঘোড়া ছুটাইল নাচঘরের দিকে। রায়-বংশের ছেলে সে, ভয় পাইবে সামান্য নারীকণ্ঠের সঙ্গীতে? ··এখনই এ অকারণ আতঙ্কের শেষ করিতে হইবে!

নাচঘরের দেউড়ীতে যে দারোয়ান দুটি থাকিত, তাহাদের কাহাকেও দেখা গেল না, কীর্তিনারায়ণ অস্ফুটস্বরে কহিল, 'ব্যাটারা গেল কোথায়?···ম'ল নাকি?'

তাহার পর নিজের রসিকতায় নিজেই কেমন চমকিয়া উঠিয়া জোর করিয়া দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু নাচঘরের চৌকাঠে পা দিয়া আর তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল না। পা নিমেষে পাথরের মতো ভারী এবং অচল হইয়া উঠিল।

মেঝের মাঝখানে আসর ঘিরিয়া বসিয়া আছে তবলচী ও সারেঙ্গী; এখনও তাহাদের সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ, সারেঙ্গীর জিহ্বা এখনও বীভৎসভাবে ঝুলিয়া আছে; আর তাহাদেরই বাদ্যের তালে তালে 'ভাও' দিয়া গাহিতেছে হীরাবাই, তাহার ললাটে তেমনিই উজ্জ্বল সিন্দুররেখা—ঠোঁটের কোণে রক্ত এখনও তেমনি জমাট বাঁধিয়া আছে!

মুহূর্ত দুই সেইদিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কীর্তিনারায়ণ একটা বিকট চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সব কয়টি আলো একযোগে নিভিয়া গেল।

অনুচররা ছুটাছুটি করিয়া আলো সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর সকলে কীর্তিনারায়ণকে ধরাধরি করিয়া নাচঘরের ভিতর আনিয়া শোয়াইয়া মুখে-চোখে জল দিতে লাগিল। বৈদ্যও আসিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সংবাদ পাওয়া গেল—তাহা ভয়াবহ। দারোয়ান দুটিকে কে বা কাহারা গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া পিছনের বাঁশঝাড়ে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে এবং যে মেয়েটিকে আজ কয়দিন হইল পিতৃগৃহ হইতে জোর করিয়া ধরিয়া আনা হইয়াছিল, সে এতদিন পরে কে জানে কেন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে!···

পরদিন মধ্যাহ্ন নাগাদ কীর্তিনারায়ণের জ্ঞান হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল প্রবল জ্বর এবং রক্তবমন। তিন চারিজন প্রবীণ বৈদ্য আসিলেন, সকলে মিলিয়া নাড়ী টিপিয়া, উপসর্গ মিলাইয়া কহিলেন, 'রাজযক্ষ্মা; রক্ষা পাওয়া শক্ত।'

দুর্দান্ত রোগ—সেবা করে কে? যে বালিকা তাহার স্ত্রী, সে এতকাল অবহেলা সহিয়া রায়বাড়িতেই ছিল; এতদিন পরে তাহাকেই আনিয়া বসানো হইল মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে; সকলে কহিল যদি আয়তির জোর থাকে ত বাঁচিয়া উঠিবে।

কিন্তু সে একাই বা কি করে? সেইদিন রাত্রি প্রভাতেই বাড়ির দাসী-চাকর কয়টা পলায়ন করিল। কাহারা যেন সারারাত্রি ধরিয়া অন্ধকারে বাড়ির দ্বার জানালা আসবাব-পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে—নানা রকমে বাড়ির লোককে ভয় দেখাইয়াছে। সুতরাং হানা-বাড়িতে কেহই থাকিতে রাজী হইল না, অর্থলোভেও না। ইতিমধ্যে সেইদিনই দ্বিপ্রহরে বিনোদ নাচঘরের ছাদ হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিল।...

ইহার পরের ইতিহাস আরও সংক্ষিপ্ত। তিনদিন-রাত্রি অনবরত রক্তবমন করিয়া কীর্তিনারায়ণ সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের কীর্তির চরম জবাবদিহি করিবার জন্যই বোধ করি পরলোকে যাত্রা করিল। তাহার স্ত্রীকে শ্বশুর আসিয়া লইয়া গেলেন, লোকাভাবে বাড়িতে চাবি পড়িল।

কিন্তু চাবি পড়িলেও যাহারা অন্ধকারে গা লুকাইয়া আসে, সেই সব অশরীরী অভিশপ্তের দলের আসা-যাওয়ায় বাধা পড়িল না। বহুদূর পর্যন্ত গ্রামের লোক প্রত্যহ রাত্রে শুনিত, কাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া কাঁচের ঝাড়, আলমারি, সার্সি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছে। তাহাদের অট্টহাসির শব্দ বহুদূর পর্যন্ত বাতাসে অভিশাপ বর্ষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল!

জ্ঞাতিরা দিনের বেলায় আসিয়া বিপুল ঐশ্বর্য কিছু কিছু করিয়া সরাইতে শুরু করিল, কিন্তু রাত্রে কেহ বাড়িটার কাছে আসিতে কিংবা বাস করিতে রাজী হইল না। বহুদিন ধরিয়া নানা উপদ্রবের পর বাড়িটি আবার নিস্তব্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহার পর চার পাঁচ বৎসর ধরিয়া গ্রামে নানা অমঙ্গল দেখা দিয়া সমস্ত গ্রামকে শ্মশান করিয়া দিল। সেই হইতে আজও এ গ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে নাই; এ বাড়িও সেই হইতে এমনি করিয়া নিঃশব্দে এই মাঠের মধ্যে খাড়া হইয়া আছে। পথচারী ভিক্ষুক পর্যন্ত কেহ এখানে আশ্রয় লয় না। শতাব্দী পূর্বেকার কাহিনী আজ প্রবাদ হইয়া গেলেও, তাহার বিভীষিকাটা এখনও মোছে নাই!

ঘুম ভাঙিয়া চোখে আলো লাগিতেই ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল—ছয়টা বাজিয়া দশ মিনিট।

সর্বনাশ। ··তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ারটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিল যে সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল ঠিক তাই, পালেদের গিন্নী কলে নামিয়াছেন। সাড়ে সাতটার আগে আর কল পাইবার কোনও উপায় নাই। কাল রাত্রে বারবার সাড়ে পাঁচটার সময় উঠিবার সংকল্প করিয়া শুইলেও কার্যত তাহা হইয়া ওঠে নাই, কারণ একে এই অন্ধকার গলির মধ্যে একতলার ঘরে বিন্দুমাত্র হাওয়া ঢোকে না, তাহার উপর অসহ্য গুমোট পড়ায় সারারাত্রি ঘুম হয় নাই, ভোরের দিকে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় ঠাণ্ডা পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সতীশ 'অর ডান্‌লপের' বাড়ির কেরানী। পঁচিশ টাকায় ঢুকিয়াছিল, মাহিনা দশ বৎসরে দশ টাকা বাড়িয়া পঁয়ত্রিশে দাঁড়াইয়াছে। ছেলেপুলে সব-সুদ্ধ, মা ষষ্ঠীর কৃপায় সাতটি। কলিকাতার বাড়ি—তা হউক না কেন নিচের তলার স্যাঁতসেঁতে পুরাতন ঘর, তবুও সাত টাকার কম হয় না। বাকী টাকায় এতগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া গ্রাসাচ্ছাদন চালানো একরূপ অসম্ভব। তবুও ধার করিয়া, উঞ্ছবৃত্তি করিয়া চালাইতে হয়, নহিলে উপায় কি ?

বাড়িটিতে সবসুদ্ধ তের ঘর ভাড়াটে আছে ; ঐ একটি মাত্র কলতলা। তবু একরকমে চলিয়া যাইত, কিন্তু যত গোলযোগ পাল-গিন্নীকে লইয়া। পাল-গিন্নীর একটু শুচিবায়ু আছে। তিনি কলে নামিলে আর কাহারও সেদিকে যাইবার উপায় নাই। আবার তাঁহার শীঘ্র হয়ও না। অথচ ঝগড়া করার উপায় নাই, অন্ততঃ সতীশের নাই, কারণ আনাজ হইতে শুরু করিয়া দুধ পর্যন্ত অনেক জিনিসই সতীশের ঘরে প্রত্যহ আসে পাল-গিন্নীর ভাঁড়ার হইতে। কোনও জিনিস নোংরা হইয়া গেছে এরূপ সন্দেহ হইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সতীশের ঘরে চালান করেন। নোংরা না হইলেও সতীশদের অভাব লক্ষ্য করিয়া রাঁধা-ব্যঞ্জন তিনি রোজই দেন।

কিন্তু সেদিন বেশী বেলা করিবারও উপায় নাই সতীশের। বড়বাবুর কন্যার বিবাহ—তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন সাতটার সময় যাইতে হইবে।

তাঁহার বাড়িতে খাটিবার লোকের অভাব, অথচ বিবাহের কাজও তো বড় কম নয়, সুতরাং সতীশ প্রভৃতি অল্প মাহিনার কেরানীদের উপরই তাঁহার ভরসা।

বড়বাবু অত্যন্ত রগ-চটা লোক। সাতটা বলিয়া দিয়াছেন, সাতটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। সে মুখ কল্পনা করিয়া সতীশের শরীরে ঘাম দেখা দিল। সে মৃদুস্বরে ডাকিল, 'ওগো।'

'ওগো' অর্থাৎ সতীশের স্ত্রী বিমলা তখন ছেলেমেয়েদের ভিজা কাঁথাগুলি লইয়া তেতালার ছাদে উঠিয়াছে, মুখ্য উদ্দেশ্য সেগুলি শুকাইতে দেওয়া, গৌণ উদ্দেশ্য সেনেদের বৌয়ের কাছ হইতে যদি একটু তেল ধার পাওয়া যায়।

বার-দুই-তিন 'ওগো'কে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া সতীশ আরও বিব্রত হইয়া উঠিল। ছেলে-মেয়ে কাহারও টিকি দেখা যায় না, হতভাগাগুলো নিশ্চয় রাস্তায় খেলা করিতেছে—

জোরে একটা হাঁক দিল, 'সুধা।'

বছর-সাতেকের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেঁড়া ফ্রকের সবটাই প্রায় কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভিজা কাদা অর্থাৎ এইমাত্র কাদা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে উঠিয়া আসিয়াছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া সতীশ কহিল, 'এঁঃ—মেয়ে এসে দাঁড়ালেন দেখ না, সং—। যা তোর মাকে ডেকে আন্‌গে, বোধ হয় ছাদে আছে।…'

তারপর আপন মনেই বকিতে লাগিল, 'যাদের বিচ্ছিরি হয় তাদের সবই বিচ্ছিরি।'

পাল-গিন্নী কলে নামিলেই লজ্জা-সরমের বালাই আর তাঁহার থাকে না, কাজেই অন্য ভাড়াটেরা বাধ্য হইয়া যতটা সম্ভব নিজেরাই লজ্জা রক্ষা করিয়া চলে। সেই কারণেই সতীশ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না, নহিলে সে নিজেই পালগিন্নীকে অনুনয়-বিনয় করিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া লইত।

মিনিট-তিনেক পরেই বিমলা নামিয়া আসিল। সতীশ ঝাঁঝিয়া উঠিল, 'আচ্ছা, সব জেনে শুনে কী তোমার আক্কেল বল দিকিনি। আমি না হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম, তুমি আগে উঠে দিব্যি কাঁথা-ধুকুড়ি নিয়ে ছাদে উঠেছ? আমায় জাগিয়ে দাও নি। এখন পাল-গিন্নী যে কলে নামলেন, কি করে কি হয়?'

বিমলা কহিল, 'আহা, আজ পাল-গিন্নী যে সকাল করে কলে নেমেছে তা আমি কি করব? আমিই তো উঠে দেখলুম পাল-গিন্নী কলে রয়েছে।'

সতীশ অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে কহিল, 'কিন্তু তা বললে ত চলবে না, বড়বাবু তা হলে আর আস্ত রাখবে না। একটু পাল-গিন্নীকে বুঝিয়ে বলো, না হয় হাতে-পায়ে ধরো। চান না হয় আজ না-ই হ'ল, কিন্তু পাইখানায় গিয়ে মুখটা হাতটা ধুয়ে নিতে হবে তো। পাঁচ মিনিট হলেই হবে—'

বিমলা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, 'কল মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করেছে, এখন কি ছাড়বে?'

'বলো একটু কাকুতি-মিনতি করে।'

বিমলা বাহিরে গিয়া মিনিট পাঁচেক পরেই উৎফুল্ল মুখে ফিরিয়া আসিল, 'রাজী হয়েছে গো। খুব তাড়াতাড়ি নাও—'

সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া কোনও রকমে খানিকটা ছাই মুখে পুরিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতেই ছুটিল পায়খানার উদ্দেশে। বিমলা বড় ব্যলতিটা লইয়া ইত্যবসরে এক বালতি জল তুলিয়া সদরে রাখিয়া আসিল। সতীশ পায়খানা হইতে বাহির হইয়া মুখ ধুইতে না ধুইতে পাল-গিন্নী পুনরায় কলে নামিয়া পড়িলেন। তিনি যে এইটুকু ছাড়িয়াছেন, এই যথেষ্ট, এজন্য তাঁহাকে পুনরায় কল মাজিতে হইবে ধুইতে হইবে—কলতলা নোংরা হইয়া গিয়াছে।

বিমলা কহিল, 'সদরে জল রেখে এসেছি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনও রকমে একটু দিয়ে নাও মাথায়, সমস্ত দিনের ফের তো।'

সতীশ কহিল, 'বাঁচিয়েছ, একটু তেল-জল মাথায় না পড়লে কি খাটা যায়?

একটা ভাঙ্গা কলাইয়ের বাটি হইতে দুই আঙ্গুলে করিয়া একটু তেল মাথায় দিয়া মাথায় হাত ঘষিতে ঘষিতে ছুটিল সদরের দিকে। সাতটা বাজিতে আর বেশী দেরি নাই। দু'ঘটি জল মাথায় ঢালিয়া মাথাটা মুছিয়া লইল ঠিক এক মিনিটের মধ্যে, তাহার পর ভিজা কাপড় বাল্‌তির কাছেই ফেলিয়া গামছা পরিয়া ঘরে ঢুকিল। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাঙ্গা চিরুনিটা মাথায় চালাইতে চালাইতে কহিল, 'আমার কাচা কাপড়-জামা?'

সুধাকে সদরে কাপড় আর বালতির তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়া বিমলা তাড়াতাড়ি হাত মুছিতে মুছিতে আসিয়া একটা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি বাহির করিয়া দিল।

'খুব ফরসা হয়েছে তো গো।'

'কাল একবেলা ধরে কেচেছি যে। তার ওপর সুধাকে দিয়ে আধ পয়সার নীল আনিয়ে নিয়েছিলুম।'

সতীশ তখন কাপড়টা পরিয়া কোঁচাটাকে যতদূর সম্ভব ভদ্র করিবার চেষ্টায় ঘন ঘন হাত চালাইতেছে। কোঁচা ঠিক করিতে করিতেই কহিল, 'ছেলেপুলে-গুলো কাছাকাছি নেই তো। এখুনি আবার বায়না ধরবে হয়ত সঙ্গে যাবার।'

'সদরে শুধু সুধা আছে। ও কিছু বলবে না।···সত্যি, কি চশমখোর লোক বাপু। একটাকেও নিয়ে যেতে বললে তো পারত। কতই আর খেত?'

'চামার। চামার। যাক্ আমি চললুম, খুব সাবধানে থেকো। ফিরতে কত রাত হবে বলা যায় না তো। ছোট খোকাটাকে না হয় দুধ বার্লি দিও, ওর পেটটা ভাল নেই। আচ্ছা আসি তাহলে, দুর্গা দুর্গা—'

ঘড়িতে তখন আর মোটে সাত মিনিট সময় আছে। সোজাসুজি দৌড়াইতে হইবে, নহিলে রক্ষা নাই—

কিন্তু গলির মোড় পর্যন্ত যাইতে না যাইতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। উপরের একটা আলিসা হইতে কাকে অপকর্ম করিয়া দিল, বিমলার অনেক কষ্টে কাচা জামাটায় উপর!

এ্যাঁ—।!

মনে পড়িল আর একটিও আস্ত বা পরিষ্কার জামা নাই। তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নষ্ট করিবার মতো সময় তখন এক মুহূর্তও ছিল না। সে বিবর্ণ, বিমূঢ় মুখে ফিরিয়া আসিল ঘরে।

'ওগো শুনছ!'

'আবার ফিরে এলে যে। ও মা, এ কী সর্বনাশ হয়েছে গো?'

'কি হবে বিমল? কি প'রে মান রক্ষে করব? আমার যেন ধাত ছেড়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে।'

'ব্যস্ত হয়ো না, জামাটা খুলে ফেল। দেখি ঐটুকু যদি সাবধানে কেচে ফেলতে পারি—'

সতীশ জামা খুলিতে খুলিতে কান্নার সুরে কহিল, 'কিন্তু দাগ যে থাকবে—

বিমলা ত্বরিৎগতিতে যাইতে যাইতে কহিল, 'বাক্স খুলে বাবার দরুন চাদরটা বার করে নাও, চাবি ঐ আয়নার কাছে।'

'বাবা' অর্থাৎ সতীশের বাবা। এই পৈতৃক সিল্কের চাদরখানি পিঁজিয়া আসিলেও এখনও ঠাট বজায় ছিল। সতীশ সযত্নে সেখানি তুলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার নিজের তো কিনিবার পয়সা হইবে না, তবু দু-একদিন বিশেষ ব্যাপারে পরা চলিতে পারে।

কথাটা তাহার মনেই ছিল না। ভাগ্যে বিমলার উপস্থিত-বুদ্ধিটা অসাধারণ, না হইলে—

কিন্তু তাহাকে সেখানে সব রকম কাজ করিতে হইবে। সব সময় চাদর গায়ে চলিবে না। অথচ জামাসুদ্ধ খুলিয়া ফেলাও চলিবে না, কারণ ভিতরের গেঞ্জিটার আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

অত ভাবিতে গেলে চলে না। সতীশ তাড়াতাড়ি চাদরখানা টানিয়া বাহির করিল। ততক্ষণে বিমলা জামা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। খুবই সন্তর্পণে কাচিয়াছে, সামান্য একটু জায়গা ভিজিয়াছে মাত্র।

জামার উপরে চাদরটা জড়াইয়া আবার দুর্গা শ্রীহরি স্মরণ করিয়া সতীশ যাত্রা করিল—

গাড়ি ঢুকিতেই বড়বাবুর সহিত সাক্ষাৎ।

'কি হে, সাতটার সময় আসবার কথা, একেবারে আটটা বাজিয়ে এলে যে!'

তখন সাতটা বাজিয়া মাত্র পাঁচ মিনিট হইয়াছে। কিন্তু বড়বাবুদের মুখের উপর কথা কওয়া যায় না; সে নীরবে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। বড়বাবু পুনশ্চ কহিলেন, 'যাক্, আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, মনোরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে মাছটা কিনে নিয়ে এস দেখি। রাঘব জেলেকে বলাই আছে; শুধু জিনিসটা দেখে নেবে, আর ওজনটা দেখবে—। তারিণী পালকে পাঠিয়েছি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গেলাস খুরি কিনতে, তা এখনও দেখা নেই, যত্ত সব হয়েছে—হুঁ!!'

মনোরঞ্জন আর চিত্তরঞ্জন বড়বাবুর দুই অকাল-কুষ্মাণ্ড পুত্র। তারিণী পাল অফিসের আর একজন কেরানী।

মনোরঞ্জন রাস্তায় বাহির হইয়া সতীশকে কহিল, 'দেখুন, ভয়ানক দেনা হয়ে পড়েছে, এই মাছ থেকে অন্ততঃ দুটো তিনটে টাকা চাই, বেশী নিলে বাবা আবার টের পাবে। যাই হোক, এ-সব কথা যেন বাবার কানে না ওঠে, নইলে আমি বলে দেব যে টাকা আপনিই চুরি করেছেন, বাবা সেই কথাই বিশ্বাস করবে, চেনেন তো বাবাকে!'

সতীশ বিলক্ষণ চিনিত, তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল। সে অতি কষ্টে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'দেখবেন আমাকে বাঁচাবেন, আমায় ডোবাবেন না যেন।'

মনোরঞ্জন আশ্বাস দিয়া কহিল, 'সে সব কিচ্ছু ভয় নেই। বরং রাঘবের কাছ থেকে যদি কিছু দস্তুরী আদায় করতে পারেন তো সে আপনিই নেবেন, আমি চাই না।'

সতীশ নীরবে পথ চলিতে লাগিল, দস্তুরীর আশাতেও তেমন কিছু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না।

রাঘব জেলে অনেক মারামারি করিয়া আট আনা পয়সা দস্তুরী দিল সতীশকে, আর চার সের মাছ কম লইয়া মনোরঞ্জন আড়াই টাকা পকেটস্থ করিল।

ফিরিতেই বড়বাবু কহিলেন, 'কি হে, কত রইল?'

তখনও মাছ দেখা হয় নাই, ভাল কি মন্দ। মনোরঞ্জন ততক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছে, সতীশ দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

বড়বাবু খপ্ করিয়া ডানাদিকের পকেটে হাত ঢুকাইয়া কহিলেন, 'এই যে অনেক পয়সা দেখছি। আমার মাছ কিনবে তাতেও চুরি!'

সেই আট আনা পয়সা অম্লানবদনে নিজের ট্যাঁকে রাখিয়া কহিলেন, 'যাও, পাশে রমেশবাবুদের বাড়ি থেকে তোমাতে আর তারিণীতে কড়াগুলো নিয়ে এস দেখি, বামুনরা বসে আছে। ব্যাটাদের দু-টাকা ক'রে রোজ দিতে হবে—বসে থাকতে দিলে চলবে না তো।'

চারিপাশের লোকেরা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সতীশ মরীয়া হইয়া কহিল, 'আজ্ঞে ও আমার পয়সা, বাড়ি থেকে এনেছিলুম।'

বড়বাবু দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, 'ওঁর পয়সা! বাড়ি থেকে এনেছিলেন! নবাবের নাতি এসেছেন।...মাসের শেষ, আট আনা পয়সা বাড়িতে ছিল? যাও, যাও, যা বলছি করগে।'

তারিণী কানে কানে কহিল, 'আর কথা বাড়িও না, চলে এস।'

সতীশ মুখ লাল করিয়া বাহিরে আসিল। তরিণী সব কয়টি দাঁত বাহির করিয়া কহিল, 'ট্যাঁকে রাখতে হয় হে, পকেটে কি রাখে!'

সতীশ ঝাঁঝিয়া উঠিল, 'আমি অমন চোর নই, ও আমার পয়সা। বড়বাবু হয়েছে বলে যেন ধরাকে সরা দেখে। আমিও সোজা ছেলে নই, আমিও দেখে নোব—'

তারিণীও উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'মাইরি, আফিসে চাকরি করি বলে যেন ওর একেবারে কেনা গোলাম। ওর মেয়ের বিয়েতে সবাই আসবে নেমন্তন্ন

খেতে আর আমরা চাকরের মতো খাটব। হাত্তোর চাকরি—এক এক সময় ইচ্ছে হয় সতীশ, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একদিক পানে চলে যাই—'ইত্যাদি।

কড়া খুন্তী প্রভৃতি দুই দফায় বহিয়া আনা শেষ হইলে ফরমাশ হইল সেগুলা মাজাইয়া সাফ করাইবার ব্যবস্থা করিবার। ব্যবস্থা করা তো কত, নিজেদেরই করা, কারণ বারোমাসের চাকর ছাড়া বড়বাবু মাত্র একটি লোক বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহারও টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না।

তারিণী কেবলই সতীশকে বলে, 'করতে হবে তো চাকরের কাজ, বুঝতেই তো পারছ। সিল্কের চাদরখানা নাট করছ কেন খামকা, কোথাও খুলে রেখে দাও না!'

সতীশ শুকনো মুখে জবাব দেয়, 'কোথায় রাখব? যে চোরের জায়গা!'

তারিণী বলে, 'না হয় কোমরেই বাঁধ।'

সতীশ জবাব দেয় না।

কিন্তু কড়া মাজার পর গেলাস-খুরি ধোওয়া, কোটা তরকারীর ঝুড়ি ধুইয়া আনা ইত্যাদি কাজ আসিয়া পড়ে। একবার মনোরঞ্জন এক ফাঁকে আসিয়া কহিল, 'মাইরি, আপনার না হয় সিল্কের চাদরই আছে, কিন্তু আমরা সবাই তো দেখে নিয়েছি, এইবার খুলে রাখুন না!'

সতীশ জবাব না দিয়া বাজার হইতে কাটা সুপারি আনিতে চলিয়া গেল।

বড়বাবু একবার 'এদের সব এইবেলা বসিয়ে দাও গো। সকাল সকাল চারটি মাছের ঝোল দিয়ে' বলিয়াই যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাঁহার আর পাত্তা পাইবার উপায় রহিল না; এধারে কে-ই বা বসায়, আর কে-ই বা খোঁজ রাখে।

সতীশ বারোটার পর ক্ষুধার ঝোঁকে এক গ্লাস জল খাইয়া ফেলিল। চিত্তরঞ্জন পিছন হইতে বলিয়া গেল, 'বিয়ে-বাড়িতে সকাল থেকেই মুখ চলছে বুঝি!'

তারিণী কিন্তু কাজের ছেলে, সে ইতিমধ্যেই ভাজা মাছ খান তিন-চার চুরি করিয়া আনিয়া দুখানা সতীশের পকেটে ফেলিয়া দিয়া গেল, 'চট্ ক'রে বাইরে গিয়ে লুকিয়ে খেয়ে আয়!'

তিনটার সময় সতীশ বড়বাবুকে দেখিতে পাইয়া কহিল, 'বাড়ি থেকে দুটি ভাত খেয়ে আসি বড়বাবু, এখনই আসছি—'

বড়বাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি, এখনও খাওয়া হয়নি নাকি? বলে

গেলুম যে,—সব গেল কোথায়! নাঃ, যত্ত সব হয়েছে—তা তোমরা ও তো চেয়ে চিন্তে নেবে না, আবার বলা হচ্ছে, বাড়ি থেকে ছুটি খেয়ে আসি—'

বর ও বরযাত্রী সন্ধ্যার সময়ই আসিয়া পড়িল। লগ্ন সকাল সকাল।

তাহার পরই শুরু হইল বড়বাবুর দাপাদাপি—সতীশ চা আন, সতীশ পান কই? সতীশ চুরুট নিয়ে এস;…সে কি, দু কৌটো সিগারেট আনালুম, সিগারেট নেই কি? একটু রয়ে বসে চুরি করো হে, গলায় পা দিয়ে ডুবিও না …আপনি চা খান না, লেমোনেড্ খাবেন? সতীশ চট্ ক'রে—এই পাশের পানের দোকানে বলে এস—ওদিকে কতদূর তারিণী, বামুনদের বলবে যে এখুনি যদি এঁদের বসানো না যায় তাহলে আমি তাদের টাকা কাটব। সতীশ, আসনগুলো পাত; তারিণী ভেতর থেকে চুন আন দেখি—ওহে রমেশ, চট্‌পট্ এঁদের পাতা ক'রে ফেল, ঘোষাল যত বুড়ো হচ্ছে তত যেন ভীমরতি ধরছে। পাখাটা ফুল ফোর্সে দাও—'

তারপর ভোজন-পর্ব।

'সতীশ, এ-ধারে আর দুখানা মাছ! ঘোষাল দৌড়ে যাও, গরম লুচি আন, রমেন, চাট্‌নী রিপীট করো একবার, চুরি করার সুবিধে হবে বলে সতীশ চাদরটা কিছুতেই ছাড়ছে না, দেখেছ তারিণী? সতীশ, সন্দেশ ও-ধারে বেশী ক'রে—'

বরযাত্রীর পর কন্যাযাত্রী। গ্লাস খুরি কম পড়িয়াছে। বড়বাবু সতীশকে চুপি চুপি ডাকিয়া কহিলেন, 'সতীশ একটা উপকার করতে হবে ভাই—নইলে মান যায়, পাশের গলিতে ফেলা হয়েছে, আঁস্তাকুড় ঠিক নয় যদিও—গোটা-কতক গেলাস ততক্ষণ চুপি চুপি ধুয়ে এনে দাও, এর মধ্যে আমি আরও আনিয়ে নিচ্ছি—'

'সে কি মশায়! সত্তিকজাতের এঁটো—'

'দেখছ আমি দাঁড়িয়ে অপমান হচ্ছি, এখন কি ঐ সব বিধানের সময়? শরীরে তোমাদের দয়ামায়া নেই!'

সীতা যে স্ব-ইচ্ছায় কেন পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন সেটা সতীশের কাছে আজ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল।…

…সতীশরা যখন খাইতে বসিল তখন মাছের কালিয়ার আছে কাঁটা, রস-গোল্লার রস এবং কুমড়োর ডালনায় গন্ধ ছাড়িয়া গেছে। বড়বাবু বার কয়েক

'চেয়ে-চিন্তে নিও, তোমরা আবার যা লজ্জাবতী সব!' বলিয়া সরিয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে সতীশ বাড়ি ফিরিল। ক্লান্ত দেহ, মাথা টন্‌টন্ করিতেছে, হাতে পায়ে পরিশ্রমের জন্য দারুণ যন্ত্রণা। চাদরখানি খুলিয়া একপাশে রাখিয়া দিল; কাদা, কালিয়ার ঝোল, রস, দইতে মাখামাখি হইয়াছে। তাহার পর বিমলার উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে পকেট হইতে একে একে বাহির করিতে লাগিল একটি পেয়ালা, তাল-পাকানো খানিকটা সন্দেশ, খান কতক লুচি, রুমালে জড়ানো শুধু মাছ খান-কতক, একশিশি গোলাপজল, কাটা সুপারি, পানের মশলা, আর অসংখ্য সিগারেট। আনা-দুই পয়সাও।

বিমলা কহিল, 'এত ধরল ঐ ক'টা পকেটে?'

'চাদরটা থেকে খুব সুবিধে হয়েছে। চাদরটা আবার রিঠের জল ক'রে কাচতে হবে; জামাটাও—তোমার আবার খাটুনী বাড়ল আর কি! সিগারেট-গুলো তুলে রাখ, তেতালার গোপাল সেনকে দিলে আনা-আষ্টেক পয়সা অন্তত পাওয়া যাবে—শালা চামার, আনা কি যায় ওর চোখে ধুলো দিয়ে! ভাগ্যিস তারিণী ছিল—'

বিবাহ

পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রাম।

দশ-বারো ঘর ব্রাহ্মণ, আট-নয় ঘর কায়স্থ এবং মাত্র দুই ঘর বৈদ্য, বাকী সবই নীচু জাতের বাস। ইহারা প্রয়োজনমত ভদ্রলোকদের 'গোয়াল' বা 'কিষেণে'র কাজে আসে—বলদ জুড়িয়া দূর গ্রামে গো-গাড়ি করিয়া লইয়া যায়, ইহাদেরই জমি ভাগে জমা লইয়া চাষ করে এবং ধান ঘরে তুলিবার সময় হিসাব বুঝাইতে মারা পড়ে। ইহা ছাড়া প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভোগা এবং মহাজনের হাতে পায়ে ধরা—এ সব তো আছেই।

মহানন্দ দাস বৈষ্ণব।

পূর্বে কি জাত ছিল তাহা এখন জানা যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমাদের আর জাত কি, বৈষ্ণবের দাস, এই আমাদের পরিচয়।

অভিজ্ঞ লোকেরা চোখ টিপিয়া বলেন, জাত হারালে বৈষ্ণব, তা জান না?

ওসব কথা তোল কেন ?

যেমনি বেঁটে, তেমনি রোগা। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি কামাইবার অভ্যাস আছে কিন্তু সে প্রায় এক মাস অন্তর, বিধু পরামাণিক যখন সুদের টাকা দিতে আসে তখনই—। ছোট্ট একটি টিকি, গলায় মোটা তুলসীর মালা এবং নাসিকা ও ললাটে সূক্ষ্ম গোপীচন্দনের তিলক আঁকা।

একটি মেরজাই, ঘরে সাবান দিয়া কাচিয়া পরিলে প্রায় দুই বৎসর যায়, অতএব ঐ সুবিধা।

জমি জায়গা যে কিছু কিছু ছিল না তা নয়, কিন্তু সে বেশী নয় এবং তাহা অর্থ উপার্জনের মুখ্য পথও নয়। মহানন্দ যে দিন প্রথম এ গ্রামে বাস করিতে আসে সেইদিনই গ্রামের লোক কি করিয়া ধরিয়া ফেলে যে লোকটি মহাজন, এবং—বাঁচিয়া যায়। সেই হইতে আজ পর্যন্ত সকলকার দায়ে-অদায়ে দেখিতে ঐ একটি মাত্র মহানন্দ দাস। লোকটা সুদ একটু বেশী নেয় সত্য কিন্তু অর্ধ-রাত্রেও চাহিবামাত্র টাকা বাহির করিয়া দেয়। এ তল্লাটে যত মহাজন আছে মহানন্দের মত অত উঁচু মন কাহারও নয়, টাকা যতই না কেন বাকী পড়িয়া থাক্, উপযুক্ত বন্ধক দিলেই টাকা বাহির করে, কোনও কারণেই 'না' বলে না। লোকটার যে কত টাকা তাহা রায় পাড়ার পণ্ডিত মহাশয় পর্যন্ত অনুমান করিতে সাহস করেন নাই, তবু তাঁহার 'শট্‌কে' ও 'নামতা' ভাল করিয়াই পড়া আছে। তবে মহানন্দের বাড়ি কোনও দিন ডাকাত পড়ে নাই, সে কেবল এই একমাত্র কারণে যে, ডাকাতদেরও টাকা ধার করিবার প্রয়োজন হয়।

ভদ্রলোকেরা বন্ধক রাখেন গহনা, 'ছোটলোকেরা' রাখে বাসন। জমি-জায়গাও যে বন্ধক থাকে না তাহা নয় কিন্তু সে কদাচিৎ কখনও, নেহাৎ দায়ে পড়িলে তবে ; কারণ আদালতকে মহানন্দের বড় ভয়। তবু এই কয় বৎসরে মহানন্দের প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বিঘা ধানজমি দখলে আসিয়াছে, কেনে নাই সে এক কাঠাও। অলঙ্কার বন্ধকে সুদ বেশী, টাকাও কম। দশ টাকার অলঙ্কারে পাঁচ টাকার বেশী সে কোনও মতেই ধার দিতে প্রস্তুত নয়, এবং সুদও টাকায় চার পয়সা। অথচ আনুমানিক দেড় টাকা মূল্যের থালা আনিলে এক টাকা পর্যন্ত কেহ কেহ পাইয়াছে, চৌদ্দ আনা তো বটেই। সুদও টাকায় তিন পয়সা হিসাবে ; কারণ যাহারা অলঙ্কার বন্ধক দিতে আসে তাহাদের হিসাব 'বুঝাইয়া' দেওয়া শক্ত, দ্বিতীয়তঃ অলঙ্কার বিক্রয় করিতে সেই সদরে ছুটিতে হয়। বাসনের সুবিধা ঢের—স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়, ভাঙিলেও ক্ষতি নাই,—সুদের হিসাব

বোঝানো কিষাণদের এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়; দ্বিতীয়তঃ বিক্রয় করা সুবিধা, বাসনওয়ালা নিত্যই গ্রামে আসে।

মহানন্দের সংসারের মধ্যে কন্যা পাঁচী ও পাঁচীর মা এই দুইটি প্রাণী। খরচ মোটেই বেশী নয়—ছেলে যে হয় নাই, ইহাতে মহানন্দ সুখীই ছিল, ছেলের খরচ কি কম? মেয়েকে শুধু খাইতে দিলেই চুকিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি মেয়েকে লইয়াই অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। মেয়ে বড় হইয়াছে; পাঁচীর মা বলে,—বোধ হয় ষেটের পনেরোই হবে। বাপ ধমক দেয়, 'তুই তো সবই হিসেব রাখিস। বারো হয় ত ঢের।'···কিন্তু পাঁচী বড়ই হইয়াছে, সে কথা মহানন্দ নিজেও মনে মনে স্বীকার করে।

এ গ্রামে ঠিক ছোট জাত নয় অথচ বৈষ্ণব, এমন পাত্র ছিল না। দূর গ্রামে পাত্র আছে, তবে তাহারা বেশী টাকা চায়। টাকা পাইবে না শুনিলে পাঁচীর মায়ের বিবাহের তারিখ ও ঘটনাস্থল সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সুতরাং সুবিধা হয় না, চার-পাঁচশো' টাকা খরচ করিয়া মেয়ের বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা মহানন্দ মনে করে, মেয়েকে মারিয়া ফেলা ভাল। মাঝে মাঝে বলে, 'বিয়ে দেব না, ও আমার মেয়ে নয়—ছেলে। থাক ও ঘরে।'

কিন্তু পাঁচির মা বলে, 'নাতি-নাতনি না হলে এত পয়সা কাকে ধরে দেবে শুনি?'

—'এত তো কত পয়সা। নজর দিস নি বল্‌ছি পাঁচীর মা যখন-তখন। আজ যদি একটা, ভগবান না করুন, রোগ-নাড়া'ই হয়, তাহলে ও কটা টাকা তো ডাক্তার-ওষুধেই উড়ে যাবে।'

কিন্তু অত কষ্টের পয়সা পাঁচ ভূতে লুটিয়া খাইবে মনে করিয়া রীতিমত শঙ্কিতও হইয়া ওঠে। কাজেই পাত্র শেষ পর্যন্ত খুঁজিতেই হয়।

অশান্তি যখন সত্য সত্যই এইরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে তখন একদিন ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেমন করিয়া তাহাই বলি,—

শরতের শেষ—সন্ধ্যার দিকে যেন একটু গা-টা কেমন শির শির করে—বাহিরের ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া মহানন্দ তামাক টানিতে টানিতে একটা সুদের হিসাব মিলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গয়েশ্বরীখানি বেশ ভারীভুরি, পাঁচীর মায়ের ভারি পছন্দ হইয়াছে, হিসাবটা মিলিলেই আর ফিরত দিবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু হিসাবটা বড় অবাধ্যভাবে মিলিতে চাহিতেছিল না। শুধু কলুকের

পর কল্‌কে তামাক পুড়িতেছিল। তামাকের বাজে খরচটা মহানন্দ বন্ধ করিতে পারে নাই—বরং সে কথা কেহ তুলিলে বলিত, 'দুটো ত মোটে প্রাণী, মেয়েটার বিয়ে দিলেই পর হয়ে যাবে, একটা বাজে খরচ তো চাই-ই, নইলে এত পয়সা খাবে কে?'

বাহির হইতে সাড়া আসিল, 'বলি দাসের পো আছ নাকি?'

'যোগাই নাকি? এস, এস, দোর খোলা আছে!'

যোগাই ওরফে যোগেন এক বয়সী—সুখ দুঃখের কথা যেন উহার সহিতই জমে ভাল। যোগাই খদ্দরের চাদরটা বেশ করিয়া জড়াইয়া ঘরে ঢুকিল, এবং দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। মহানন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাদরের যে স্থানটা উচু হইয়া ছিল সেই দিকে চাহিয়া কহিল, 'শুধুই তামাক খেতে এসনি, দরকার পড়েছে বুঝি?'

যোগাই অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'আচ্ছা সে হবে, হবে। আগে হুঁকোটা দাও দিকিনি—'

যোগাই সংজাত—গোয়ালা, হুঁকা তাহাকে দেওয়া চলে; মহানন্দ হুঁকাটা বাড়াইয়া দিল। যোগাই মিনিট দুই নিঃশব্দে তামাক টানিয়া কহিল, 'গোটা দুই টাকা দিতে হবে এই রূপোর চরণচূড়টা 'রেখে।'

মহানন্দ কহিল, 'কই দাও দেখি।'

কিন্তু রূপার চরণচূড়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা থালাও বাহির হইল।

'এসব আবার কি?'

'এটা সুবলের মা জোর ক'রে গছিয়ে দিলে। বল কেন আর—বলে, যাচ্ছ তো অমনি এটা দিয়ে আমার জন্যে একটা টাকা নিয়ে এস—'

সুবলের মা কাওরার মেয়ে—পাড়ায় অনেকের বাড়ি বাসন মাজার কাজ করে; ইহার সহিত যোগাইয়ের নাম মিশিয়া একটা কুৎসা বাতাসে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজকাল মিলাইয়া গিয়াছে।

থালাখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রদীপের আলোয় দেখিয়া মহানন্দ শুষ্কস্বরে কহিল, 'ইস্কুলের ছেলেদের একটা থালা গতবার পুকুরের জলে হারিয়ে যায় আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। থালাখানা যা শুনেছি কতকটা এই রকমই দেখতে ছিল। যাক—মোদ্দা সুবলের মাকে এক টাকাই দেব আমি, কিন্তু তিনটি আনা কেটে নিয়ে।'

যোগাই 'ইস্কুলের থালা'র ধাক্কাটা সামলাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল, 'কেন?'

'আষাঢ় মাসে সুবলের অসুখের সময় যে কাঁসিখানা রেখে এক টাকা নেয়, তা গত মাসে বেচে সুদ-আসল আদায় হয় নি। তার দরুন তিন আনা কেটে নেব।'

'ও তিন আনা পয়সা না হয় ছেড়েই দাও না বাপু!'

চোখ প্রায় কপালে তুলিবার মতো করিয়া মহানন্দ কহিল, 'সেই সময়ই আমার পড়েছে কিনা! বলে টাকার অভাবে মেয়ের বিয়েই হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ! টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না!··ভাল কথা, আজ বাঁকড়ো থেকে একদল লোক রামায়ণ গাইতে এসেছে, শুনেছ?'

মহানন্দ কহিল, 'না শুনি নি!'

'ওই বারোয়ারী-তলার চালার নিচে গাইবে। তা প্রায় দশ-বারো জনা লোক হবে বটে! সব বৈষ্ণব শুনলুম; ঐখানে দেখ না, যদি পাত্তর জোটে!'

'পোড়া কপাল! রামায়ণের দলের লোকের সঙ্গে দেব মেয়ের বিয়ে!'

কিন্তু টাকা দিয়া যোগাইকে বিদায় করার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরিল। মহানন্দ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কথাটা যোগাই-এর কাছে যত সহজে ওড়ানো গেল—তত সহজে মন হইতে বিদায় লইল না। পরদিন অপরাহ্নে মেরজাইটা সাবান দিয়া কাচাইয়া লইয়া মহানন্দ বেড়াইতে বেড়াইতে বারোয়ারী তলায় উপস্থিত হইল।

বিস্মিত হইল সকলে। নকড়ি ভটচাজ্ কহিলেন, 'ওই! এ যে মহানন্দ দেখছি; কি মনে করে? তাগাদায় নাকি?'

গৌরগতিবাবু (ইঁহার শালা কোথাকার মুন্সিফ) কহিলেন, 'না হে না, পরকালের কথাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ঐ যে আমার সম্বন্ধী বলত না—'

মহানন্দ মৃদু হাসিয়া কহিল, 'না, শরীরটাও ভাল ছিল না, আর ভাবলুম এত দূর থেকে এসেছে ভগবানের নাম শোনাতে—একবার যাওয়া যাক! তাঁকে তো ভুলেই আছি—'

দলের মূল গায়ক যে তাহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দড়ির মতো পাকানো চেহারা—সামনের দিকে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অল্প দাড়ি আছে—তার কয়েক গাছি এখনও পাকে নাই। গলায় বেশ পুরু গোছের তুলসীর মালা।···সঙ্গের বাকী লোকেদের মধ্যে ষাট হইতে আরম্ভ করিয়া ষোল পর্যন্ত সব বয়সেরই লোক ছিল। তার মধ্যে দুই-একটি দেখিতে ভালই।

একটু পরেই গান আরম্ভ হইল। রামায়ণের কথা যেমন করিয়াই বলুক ভাল লাগে—ইহারা তো তবু মন্দ গাহে না। কিন্তু সেদিকে মহানন্দের মন ছিল না, মূল গায়েনের সম্মুখের থালাটি কেমন করিয়া পয়সা ও আধলায় ভরিয়া উঠিতেছিল, সেইদিকেই তাহার দৃষ্টি একাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা শুনিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব; ইহাদের অনেককে সত্য-সত্যই মাসে কুড়ি দিন শুধু নুন দিয়া ভাত খাইতে হয়, তাহা সে ভাল করিয়া জানিত; প্রায় সকলেই তাহার নিকট টাকা ধারে—অথচ পয়সা, আধলা, আনি পর্যন্ত অবিরাম পড়িতেছে, পাশের ধামাটা চাল, আলু, লাউ, বেগুন ও মশলায় প্রায় ভরিয়াই গিয়াছে। থালায় যে পয়সাগুলি জমিয়াছে তাহার একটা কাল্পনিক মোট হিসাব মনে মনে ঘুরিয়া সুদে আসলে বৎসরান্তে কত দাঁড়ায় সেই অঙ্কের রূপ ধারণ করিল। সে অঙ্ক যেন ক্রমশঃ বাড়িতেছে—পয়সা হইতে টাকায়, টাকা হইতে গিনিতে—তাহারা যেন চারি পাশের সমস্ত লোককে ছাইয়া ফেলিল। সহসা যেন মনে হইল নিজের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ ইহাদের কাছে তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। সে আর বসিতে পারিল না, অকারণে পাশের লোককে 'মাথা ধরেছে' এই মিথ্যা জবাবদিহি করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

পাঁচীর মা শুনিতে যায় নাই—শুনিতে চাহিলেও মহানন্দর কাছ হইতে পয়সা আদায় হইবে না, অথচ খালি হাতে শুনিতে যেন লজ্জা করে। যাহারা পয়সা দেয় তাহারা যেন চামরের স্পর্শ লইয়া ফিরিবার সময় বিশেষ করিয়া তাহারই দিকে চায়। এরূপ ঘটনা ইহার আগে ঘটিয়াছে।

তাই সে রীতিমত আশ্চর্য হইল মহানন্দ যখন রাত্রে ফিরিয়া কহিল, 'গান শুনতে গিয়েছিলাম।'

চক্ষুযুগল যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া পাঁচীর মা চাহিয়া রহিল; তাহার পর ক্ষুণ্নস্বরে প্রশ্ন করিল, 'কেমন গায়?'

'ছাই গায়। খালি পয়সা কুড়োবার মন্তর। লোকের যত নাকে কান্না আমার কাছে এসে। সুদ আমি আর কত নিই?'

পাঁচীর মা প্রতিবাদ করিল না—শুধু একটু মৃদু হাসিয়া নিজের কাজে গেল। কিন্তু মহানন্দ সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যেন এক বস্তা টাকা সে কোথা হইতে লইয়া আসিতেছিল, পথে হনুমানে কাড়িয়া লইয়াছে।

পরদিন সকালের দিকে খানিকটা গড়িমসি করিয়া বেলা আটটা নাগাদ সে বারোয়ারী তলার দিকে যাত্রা করিল। অধিকারী বাহিরে রোদে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া নিজের চটটা বিস্তৃত করিয়া দিল।

অতিথির পরিচয় সে ইতিমধ্যেই পাইয়াছে। যে লোকটা ইহাদের বাসন প্রভৃতি মাজার কাজ করিতেছে সে দূর হইতে দেখিয়া কহিয়াছিল,—'ওই ? মহানন্দ দাস এদিকে আসে কেন ?'

'কে ?'

'মহাজন মশাই। মেলা টাকা।'

মহানন্দ চটে বসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'মশাইয়ের নাম ?'

'আমার নাম শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস। বৈষ্ণব। মশায়ের ?'

'আমার নাম মহানন্দ দাস। আমিও বৈষ্ণব।'

'আসুন।'

রাধাগোবিন্দ হুঁকা বাড়াইয়া দিল। মহানন্দ কহিল, 'আপনাদের বাড়ি শুনলাম বাঁকুড়ায়।'

'সবাইয়ের নয়। তবে দল আমাদের বাঁকুড়ার। মানে আমার বাড়ি বাঁকুড়ায়।'

খানিক তামাক টানিবার পর মহানন্দ প্রশ্ন করিল, 'কি রকম রোজগার-পাতি হয় ?'

'আর মশায় রোজগার! আগে খুবই ছিল। দৈনিক পাঁচ টাকা হ'ত—। এখন দেড় টাকা সাত সিকেও হয় না। নয় পাঁচকড়ি ?'

ষোল-সতের বৎসরের একটি ছেলে কলাইয়ের বাটিতে চা খাইতে খাইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে-ই পাঁচকড়ি। সে সায় দিয়া কহিল, 'তাই ত! কাল প্রথম দিন, তাই মোটে দু'টাকা হয়েছে—'

পাঁচকড়ি সরিয়া গেলে মহানন্দ কহিল, 'এদের কি রকম কি দিতে হয় ?'

'কেউ চার পয়সা রোজ, কেউ ছ' পয়সা রোজ—আর খাওয়া; বাকি সব আমার।'

রাধাগোবিন্দ সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া উত্তর দিল। মহানন্দ কথাটা চাপা দিয়া কহিল, 'সবাই কি বৈষ্ণব ?' এক্ষেত্রে বৈষ্ণব অর্থে জাত বৈষ্ণব।

'হ্যাঁ, তা প্রায় সব-ই!'

'বিয়ে হয়েছে সকলের ?'

'সব। সব। এক এই পাঁচকড়ি ছিল বাকি, ওরও গেল আষাঢ়ে হয়ে গেছে।'

তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—'নাঃ, ঘর মশাই এক আমারই খালি, তা ছাড়া সবাইকারই ভর্তি আছে।'

মহানন্দ সমবেদনার স্বরে কহিল, 'আপনার কি পরিবার নেই ?'

আবারও দীর্ঘশ্বাস—

'না। প্রথম পক্ষকে ষোল বছরেরটি করলুম, সইল না। দ্বিতীয় পক্ষটি যা হোক ঘরকন্না করলেন, তা তিনিও গত বৈশাখে ফাঁকি দিলেন।...তাও যদি একটা ছেলেপুলে থাকত তাহলেও ভুলে থাকতুম।...আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না।'

মহানন্দ কহিল, 'তা তো বটেই।...আহা—'

রাধাগোবিন্দ হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া কহিল, 'কেন বিয়ের খোঁজ করছিলেন কেন ? মেয়ে আছে নাকি ?'

'হ্যাঁ, আমারই মেয়ে। যাই, আজ উঠি, বেলা হয়েছে।'

রাধাগোবিন্দ কহিল, 'বিকেলে আসবেন কিন্তু। বৈষ্ণবের চরণদর্শন কত ভাগ্যে তবে মেলে।'

মহানন্দ বিরস মুখে বাড়ির রাস্তা ধরিল। একটা তবু আশা ছিল, তাহাও গেল।

বাড়ি ফিরিলে পাঁচীর মা পা ধুইবার জল দিয়া কহিল, 'কোথায় গিয়েছিলে গো ?'

'ঐ বারোয়ারী তলায়। ওখানে আমাদের জাতের লোক এসেছে বেস্তর—তাই খোঁজ-খবর করতে গিয়েছিলুম।'

'হ'ল কিছু ?'

মহানন্দ মুখ-বিকৃত করিল—'নাঃ, সব বিয়ে হয়ে গেছে—।' তারপর খামকা অযাচিত ভাবেই বলিল—'যাই বল বাপু, অধিকারীর কিন্তু অনেক টাকা—চারটি করে পয়সা দলের লোকদের দিতে হয়, বাকী সব ওর—অবিশ্যি যাওয়া-আসার খরচা আছে কিন্তু সে আর কত ?'

কন্যার বিবাহের সহিত অধিকারীর টাকার কি সম্বন্ধ ভাবিয়া না পাইয়া পাঁচীর মা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। মহানন্দও পা ধুইয়া ঘরে আসিয়া খাতার

সম্মুখে বসিল, কিন্তু হিসাবে মন লাগিল না। এমন কি হারাণ ডোম একটা ঠাকুরবাড়ির বাটি বাঁধা দিয়া চার আনা পয়সা লইয়া গেল, তাহাকে গত মাসের সুদের কথাটা একবার বলা পর্যন্ত হইল না।

অপরাহ্নে মহানন্দ কহিল, 'যাবি নাকি গান শুনতে?'

পাঁচীর মা কহিল, 'হ্যাঁ:—পয়সা-কড়ি দেবে না, শুধু হাতে যেতে আমার বড় লজ্জা করে।'

মহানন্দ সহসা উদার হইয়া উঠিল। কহিল, 'মোহন শেখ আজ একটা লাউ দিয়ে গেছে না? ঐটেই নিয়ে চল্,—দিবি।'

তখনও গানের দেরি ছিল। মেয়েদের দিকে স-কন্যা পাঁচীর মাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে পুরুষের দিকে বসিতে যাইতেছিল, রাধাগোবিন্দ দেখিতে পাইয়া স-কলরবে অভ্যর্থনা করিল, 'এই যে, এই যে, আসুন, আসুন, সামনে বসুন।'

হরিচরণ টিপ্পনি কাটিলেন, 'মহানন্দর কি সত্যিই ধর্মে মতি হ'ল নাকি হে?'

গৌরগতি কহিলেন, 'আমার সম্বন্ধী বলে, বয়স বাড়লেই মরণের ভয় হয়, এ তাই—কিন্তু গায়েন অত খাতির করে কেন হে?'

রাধাগোবিন্দ তখন কহিতেছিল, 'বাবুদের বাড়ি থেকে গিন্নিমা বলে পাঠিয়েছেন যে চার দিন ওঁর বাড়িতে গান হবে। কুড়িটি টাকা নগদ আর একটা গরদের জোড়, প্যালা যা পড়বে সব আমার।'

মহানন্দ কহিল, 'বলেন কি?'

'এ আর এমন বেশী কথা কি?—সুপুরের বাবুরা গত বছর আমার পরিবারের জন্যে পর্যন্ত এক জোড়া শাড়ি দিয়েছিলেন।'

গান আরম্ভ হইল। কিন্তু মহানন্দের মনে হইতে লাগিল কুড়ি টাকা অনেক টাকা। সহসা যেন মনে হইল খঞ্জনীর বোলে টাকাই বাজিতেছে···

পরদিন সকালবেলা পাঁচকড়ি খুঁজিয়া খুঁজিয়া মহানন্দের বাড়ি গিয়া উপস্থিত—। সবে স্নান করিয়াছে, টেরি দিয়া অপর্যাপ্ত তেল ও জল তখনও গড়াইতেছে—

হাতে একটা বড় গোছের থালা, তাহার উপর পরিপাটী করিয়া একটা সিধা সাজানো; চাল, ডাল, আনাজ, ফল—মায় ঘি তেল পর্যন্ত। তাহার সহিত একখানি ধোয়া নূতন ধুতি।

পাঁচকড়ি থালা নামাইয়া কহিল, 'বাবাজী পাঠিয়ে দিলে, চান করে এনেছি

আমি, ঠাকুরের সেবা করে প্রসাদ পাবেন—'

কথাগুলি মুখস্থের মতোই শোনাইল। এত সকালে স্নান করানোর জন্ম পাঁচকড়ির মনটা বাবাজীর উপর একটু অপ্রসন্ন ছিল। যদিও তাহায় কোন প্রয়োজন ছিল না, পাঁচকড়ি স্নান না করিয়া আনিলেও সিধার উপকরণগুলি যাহারা দিয়াছে তাহাদের কথা মহানন্দের জানা ছিল এবং আপত্তি ছিল না।

যথারীতি 'এ কি' 'এ কি'—'এসব আবার কেন'?—'অপরাধী করা হয়' ইত্যাদির পর মহানন্দ বাড়ির ভিতর থালাটি লইয়া গেল।

পাঁচীর মা শুনিয়া অবাক হইয়া কহিল, 'সে কি গো, তুমি ওদের দেবে, না ওরা তোমাকে দিলে?'

মহানন্দ শুধু কহিল, 'হুঁ। থালাটা আজড়ে দে—'

ইহার পর আরও দুই-চারি দিন আসা-যাওয়া এবং জিনিসপত্র আদান-প্রদানের পর সহসা একদিন দমকা হাওয়ার মতো বাড়ি ঢুকিয়া মহানন্দ কহিল, 'সাথোক্ ভগবানকে ডেকেছিলি পাঁচীর মা, এতদিনে পাঁচীর আমার পাত্তরের মতো পাত্তর জুটল—'

পাঁচীর মা পুলকিত ভাবে রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিল, 'ওমা, কোথাকার পাত্তর গো? কে সম্বন্ধ আনলে?'

মহানন্দ কহিল, 'সাত পুরুষে বৈষ্ণব ওরা; ওর পিতামহ ছিলেন লোচন দাসের সাক্ষাৎ শিষ্য; কত জন্মের পুণ্যি থাকলে তবে ওরা বাড়িতে পা ধোয়—'

পাঁচীর মা কহিল, 'কে গো, তাই বলো না?'

মহানন্দ কাল সারারাত্রি জাগিয়া মনে মনে রিহার্স্যাল দিয়া রাখিয়াছে, সে অত সহজে কথা ভাঙ্গিবে কেন? সে কহিল, 'আর পয়সাই কি সামান্য? এই গাঁখানার মতো একখানা গাঁ কিনে ফেলতে পারে। ওদের আয় কত?'

পাঁচীর মা এবার ধৈর্য হারাইল, 'মরণ আর কি—আসল কথা কিছুতেই বলবে না—খালি যত বাজে কথা—কে ছেলে, কি বিত্যান্ত, নেশাখোর কি মাতাল তার ঠিক নেই—'

'বলিস কি পাঁচীর মা? জিভ খসে যাবে যে! মহাপুরুষ লোক ওঁরা—'

দুই হাত জোড় করিয়া মহানন্দ উদ্দেশে নমস্কার করিল। পাঁচীর মা যখন নিতান্তই রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছে তখন কথাটা ভাঙ্গিল, 'আমাদের এই বাবাজী, ঐ যাঁরা রামায়ণ গাইতে এসেছেন না, তাঁদেরই অধিকারী রাধা-

গোবিন্দ, উনি আমার পাঁচীকে চরণে স্থান দিতে রাজী হয়েছেন।'

বিস্ময়ে কিছুকাল বাক্যস্ফূর্তি হইল না, তাহার পর পাঁচীর মা সপ্তমে চড়িল, 'তুমি পাগল হয়েছ, না দেহে সত্যিই মানুষের চামড়া নেই? এঁ্যা—! ঐ বায়াত্তুরে বুড়োর সঙ্গে দেবে পাঁচীর বিয়ে? এঁ্যা!!! বাপ হয়ে কি ক'রে মুখে আনলে গো!'

'অমন নিজ্জলা মিথ্যে কথাগুলো মুখে আনিস নি পাঁচীর মা, অপরাধ হয়। বলি মানুষ আমরা চিনি না? চল্লিশের ওধারে কিছুতেই নয়। কেমন ঢল্‌ঢলে চেহারা, বরং আরও কম মনে হয়—'

পাঁচীর মা গালে হাত দিয়া কহিল, 'পোড়ার দশা। ঐ ব্রেবকাঠ মিন্‌ষেকে বলে ঢল্‌ঢলে চেহারা। ও সব হবে-টবে না বলে দিলুম—এইবার নিজমূর্তি ধরব—'

'হায় রে! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। একে তো একগাদা টাকা চায়, তাও না হয় ধার-কর্জ ক'রে দিলুম, কিন্তু যার সঙ্গেই দেবে, সে-ই পাঁচীকে নিয়ে চলে যাবে। বলি পাঁচটা নয় সাতটা নয় ঐ একটা, তাও যদি চোখের আড়াল হয় তাহলে আর মাগী বাঁচবে না, কেঁদে কেঁদেই মরবে। তার চেয়ে, মরুক গে, বললে যে দেশের জমি জায়গা বেচে সব টাকা এনে আমার হাতে দেবে—আর এইখানেই থাকবে—ভাবলুম ভালই হ'ল, বয়স একটু বেশী —তা আমার পাঁচীই বা কি ছেলেমানুষ?'

পাঁচীর মা রণচণ্ডী মূর্তিতে কাছে আসিয়া কহিল, 'তবে রে হাভাতে! টাকা নিয়ে মেয়ে বেচছ, আবার মেয়ের বয়স দেখছ! ঐ বাহাত্তুরের সঙ্গে আমার দুধের মেয়ে পাঁচীর তুলনা? টাকা সগ্‌গে যাবে—? আজই যদি দাঁত ছিরকুটে হয়ে যাও, টাকা কোথায় থাকবে রে?···বেরো আমার সামনে থেকে—'

মহানন্দ এতখানি বয়সে পাঁচীর মায়ের এমন মূর্তি দেখে নাই, সে বুঝিল যে এ মন্ত্রে চলিবে না আর কথা না কহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল—

দুপুরে আসিল পাঁচী ডাকিতে, 'বাবা, ভাত খাবে চল।'

'ভাত আজ আর খাব না। শরীরটা ভাল নেই।'

পাঁচীর মা বুঝিল; কহিল, 'ইঃ, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। না খেলে, আয় আমরা খেয়ে নিই।

কিন্তু রাত্রেও যখন খাইল না, তার পরদিনও খাইল না, তখন পাঁচীর মা প্রমাদ গণিল। নিজেই আসিল সাধিতে—কিন্তু মহানন্দের সেই এক কথা, 'এ প্রাণ আর রাখব না পাঁচীর মা, বাবাজীকে আমি কথা দিয়েছি—সে কথার নড়চড় আমার জীবন থাকতে হবে না। তার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। জীবনে কখনও কথার খেলাপ করি নি, জানিস তো!'

পাঁচীর মা তিরস্কার করিল, অনুনয় করিল, কাঁদিল, অভিমান করিল কিন্তু মহানন্দ অটল। সে জানিত যে স্ত্রীলোকের মন টলাইতে হইলে পুরুষের শুধু একটু দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন হয়—আর কিছু নয়। ঘটিলও তাই—দূর ভবিষ্যতে কন্যার বৈধব্যের অপেক্ষা বর্তমানে নিজের বৈধব্যের ভয়ই প্রবল হইল, পাঁচীর মা রাজী হইল। কন্যার অভিমানের কেহ খোঁজ লইল না, কন্যার মাতার অভিমান ভাসিয়া গেল, মহানন্দের অভিমানটা বড় হইয়া উঠিল।...

লেখাপড়া হইল—রাধাগোবিন্দ দাস, পিতা ৺নটবর দাস, সাকিন মৎসহরি গ্রাম, থানা রামসাগর, জিলা বাঁকুড়া, জাতি বৈষ্ণব, পেশা কথকতা। এতদ্বারা খোশ মেজাজে, বহাল তবিয়তে, অন্যের বিনানুরোধে প্রতিশ্রুত হইলেন যে মহানন্দ দাস মহাশয়, পিতা ৺ছ'কড়ি দাস, সাকিম ইত্যাদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কন্যা শ্রীমতী পাঁচুবালার সহিত উক্ত রাধাগোবিন্দ দাসের বিবাহ দিলে রাধাগোবিন্দ দাস কখনও পাঁচুবালাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিবে না এবং দেশের যাবতীয় জমি জায়গা বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা পাঁচুবালাকে দিবে, এবং পাঁচুবালার অভিভাবক বিধায় উহা মহানন্দের কাছেই থাকিবে। মহানন্দ দাস উক্ত টাকার মধ্য হইতে কিছু টাকায় স্বীয় জমির উপর কন্যা পাঁচুবালার জন্য পৃথক বাটী নির্মাণ করিয়া দিবেন,—ইত্যাদি।

গ্রামে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মহানন্দ পুরুষদের ধমক দিয়া বলিল, 'বাবুরা সব এক পয়সা সুদ দিতে হ'লে তো মরে যান। কই, কেউ মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পেরেছিল?...হুঁ!'

মেয়েরা পাঁচীর মাকে বিবিধ ছন্দে কথা শুনাইতে লাগিল। পাঁচীর মার শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া উপায় ছিল না। মহিলারা বিদায় লইলে মহানন্দ ভিতরে আসিয়া তর্জন করিত—'হিংসে, হিংসে, জানিস পাঁচীর মা, কোনও রকমে একটা সুপাত্র যোগাড় করেছি ত সব হিংসেয় ফেটে মরছে। ঐ তো কায়েত পাড়ার বদে সিংহি, দেয়নি ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে?...ও

সব আমার দেখা আছে।'

কিন্তু এত সব মূল্যবান কথাতেও পাঁচীর মা শান্ত হইতে পারিল না।...না হোক, তাহাতে মহানন্দের কিছু যায়-আসে না। কন্টিবদল করা তাহাদের সমাজে চলিত আছে—পাঁচীর যদি টাকা থাকে তবে তাহার কন্টিবদলের লোকও জুটিবে। কিন্তু পরে কি হইবে ভাবিয়া এখন এতগুলা টাকা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

পাত্রের সংসারে থাকিবার মধ্যে এক ভাই আছে। আরও জ্ঞাতি এবং কুটুম্ব-স্বজন আছে। রাধাগোবিন্দ সবিনয়ে ভাবী শ্বশুরকে কহিল, 'তাদের তো একটু খবর দেওয়া লাগে।'

মহানন্দ কহিল, 'নিশ্চয়! নইলে কেউ কোথাও আসবে না, নিমুড়ো নিছুড়ো ক'রে আমি মেয়ের বিয়ে দেব নাকি?'

স্থির হইল সংবাদ লইয়া পাঁচকড়ি যাইবে এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে যাহারা আসিতে ইচ্ছা করে ঐ পাঁচকড়ি লইয়া আসিবে।

এ ধারে বিবাহের আর একটি ছাড়া দিন নাই অগ্রহায়ণ মাসে—সামনে অকাল। এবং সে দিনটিও আগতপ্রায়।

সুতরাং উভয় পক্ষের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন পাঁচীর মা একাই করিতে লাগিল। বরযাত্রী একেবারে বিবাহের দিন সকালে আসিয়া পৌঁছিবে। উভয় পক্ষের আহারাদির যথেষ্ট ঘটা—সমগ্র গ্রাম নিমন্ত্রণ হইবে। বরযাত্রী আসিয়া সকালে খাইবে—তাহার একরূপ আয়োজন, আবার রাত্রে বিবাহের খাওয়া, তাহার অন্যরূপ আয়োজন, এমন কি, একথাও কানাঘুষা চলিতে লাগিল যে রাত্রের ভোজে রাবড়ি পর্যন্ত হইবে। ..রাধাগোবিন্দর সঙ্গেই যে অত টাকা ছিল, তাহা মহানন্দ কল্পনাও করে নাই।

বিবাহের দিন আসিল—বরযাত্রীও আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা বার বার খাইল এবং কিছু কিছু ছাঁদা বাঁধিল। খালি ভাই লেখাপড়ার কথাটা কি করিয়া জানিতে পারিয়া সহস্র তিরস্কার করিতে লাগিল। দেশের জায়গা জমিগুলি তাহার হাতেই চিরকাল থাকিবে—এই কথাই সে জানিত। রাধাগোবিন্দ তাহার পায়ে হাতে ধরিয়া শেষে কিছু নগদ টাকা দিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ঠাণ্ডা করিল।

বিবাহের সময় আসিল। গ্রামের লোক কেহ বা যোগ দিল, কেহ বা দিল না, কিন্তু তাহাতে মহানন্দের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

বাবুদের বাড়ি হইতে বিবাহ উপলক্ষে একটি চেলির জোড় রাধাগোবিন্দ উপহার পাইয়াছিল, সেইটি পরিয়া, ঐটুকু পথ তাও পাল্কী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

নির্বিঘ্নে চার হাত এক হইয়া গেল। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা কিছুরই ত্রুটি হইল না—মায় বাসর ঘরে নাচ পর্যন্ত। শুধু পাঁচী সেই যে গোড়া হইতে ঘাড় নিচু করিয়া ছিল, তাহাকে কেহ আর ঘাড় তোলাইতে পারিল না।...

পরদিন প্রাতে নূতন জামাতা মুখ ধুইতে ধুইতে তাহার সৌভাগ্যের কথা ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচীর যৌবনপুষ্ট চেহারাটা কাল হইতে মনে হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন তাহার সর্বদেহে আলোড়ন দেখা দিতেছে। একটা আনন্দের স্রোত বুকের মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই পুলকহিল্লোল যেন ক্রমে বাতাসে ছড়াইয়া যাইতেছে, রেণু রেণু হইয়া বিশ্বের প্রতি অণুতে মিশিতেছে—

সংবাদ আসিল, পাঁচকড়ি সকালে উঠিয়া বার দুই পায়খানায় গিয়া এবং একবার বমি করিয়া কেমন যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। দুইবার সুদীর্ঘ পথ রেল-ভ্রমণ, উপর্যুপরি আহার, এবং রাত্রি-জাগরণই অবশ্য তাহার কারণ—

বক্তার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। রাধাগোবিন্দের মনে হইল তাহার বুকের আনন্দ সব যেন এক হইয়া পেটের মধ্যে গিয়া তাল পাকাইতেছে—শেষে যেন সর্বদেহ অন্যভাবে আলোড়িত করিয়া বমনের আকারে বাহির হইল—

'ওমা, নতুন জামাইও যে বমি করছে গো!'

* * * *

সার্কল অফিসার ও হেলথ্ অফিসার আসিয়াছেন। হেড্ মাস্টার বুঝাইতে ছিলেন যে বোর্ডিংএর চারিপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো আবশ্যক। এতগুলি ছেলের শুভাশুভ—

'সবসুদ্ধ ক'জন পড়েছে?'

'বোধ হয় জনা সাত-আটের হয়েছে। গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা! রামায়ণ দলের অধিকারী আর ছোঁড়াটা মরেছে—আর একটা লোকও পড়েছিল গাঁজা খেয়ে বেঁচে উঠেছে। তা ছাড়া নিবারণবাবুর নাতনী মরেছে—আর কারুর খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে শুনছি মহাজন দাস মশাই-এর অবস্থাও খুব খারাপ!'

শিবকিঙ্করবাবু তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচার মতো বেঁচেছেন—একথা তিনি অনায়াসে বলতে পারেন। এই ভাবেই বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি অবশ্য। ছেলেবেলা থেকেই বার বার বলতেন, 'যদি বাঁচার মতো না বাঁচতে পারি তো মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?···কোনমতে একটা চাকরি-বাকরি ক'রে আর তাসপাশা খেলে আড্ডা দিয়ে যদি জীবন কাটাতে হয় তো পৃথিবীর ভার না বাড়িয়ে নিজের হাতেই নিজের জীবনে ছেদ টেনে দিয়ে একদিন চলে যাবো। তবু একটা লোকের স্থান খালি হবে, একটা খোরাক বাঁচবে। আমার চেয়ে কোন যোগ্যতর লোক হয়ত এতে কোন মহৎ কীর্তির সুযোগ পাবে!'

শিবকিঙ্কর সাহিত্যিক : কিন্তু সাহিত্যের একটি মাত্র শাখাতেই তাঁর কীর্তির গতিপথ সীমায়িত নয়। কবি—তাঁর কাব্যগ্রন্থ এই বাংলা দেশেও কয়েকটি ক'রে সংস্করণের গৌরব লাভ করেছে। ঔপন্যাসিক—হাজারে হাজারে বিক্রী হয় তাঁর উপন্যাস। এমন কি ছোট গল্পের বই (বাংলাদেশের গ্রন্থক্রেতা-সমাজে যা একান্ত অপাংক্তেয়) কয়েক হাজার করে কেটেছে। নাট্যকার—তাঁর নাটক ছাড়া বাংলা দেশের থিয়েটারগুলি অচল। সুরজ্ঞ—নিজের নাটকে নিজেই গান লেখেন এবং তাতে নিজেই সুর দেন। এতেও তিনি থেমে থাকেন নি—প্রায় বৃদ্ধ বয়সে আবার ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেছেন, রবীন্দ্র-নাথের মতো ও কীর্তিমাল্যও কণ্ঠে ধারণ করে যাবেন এ ভরসা তাঁর আছে। নট-নটীরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, ওঁর শিক্ষাদানপদ্ধতি অদ্ভুত, উনি নিজেই অভিনয়ে নামলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন, হয়ত বৃত্তি হিসেবেও তা যথেষ্ট সফলতা লাভ করত।

কিন্তু শিবকিঙ্করবাবু ক্ষণজন্মা নন। রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরদত্ত প্রতিভার অফুরন্ত ভাণ্ডার, শক্তির অক্ষয় তূণ নিয়ে আসে নি। এসবই তাঁর স্ব-কৃত। বাল্যকালে এক শিক্ষকের মুখে শুনেছিলেন পুরুষকারের অসাধ্য কিছুই নেই। কথাটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি—জীবনের কর্মক্ষেত্রে তা প্রমাণ করেও দিয়ে গেলেন।

উপন্যাস, নাটক, কবিতা—যা যখন ধরেছেন তার আগে পড়েছেন প্রচুর।

কলেজে পড়বার সময় দুটো টিউশ্যনী করতেন এবং সেই পয়সায় বই কিনতেন। দুটো লাইব্রেরীর মেম্বার ছিলেন; ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীর স্থায়ী কার্ড ছিল, টাকা জমা দিয়ে বই ঘরেও আনতেন।

রাত্রের নিদ্রা বহুদিন কমিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—সেই কৈশোর থেকেই। রাত দুটো পর্যন্ত জেগে প্রত্যহ বই পড়তেন—উঠতেন আবার ছটায়। আজও সে অভ্যাস আছে তাঁর।

বই যখন লিখতেন—তখনও সাধনা কম ছিল না। প্রথম উপন্যাসখানি তেইশবার আদ্যোপান্ত লিখেছিলেন। কাউকে পড়ান নি, পড়ে শোনানও নি, অপরের মতামত ধরে সংশোধন করেন নি, নিজের মনের মতো করতেই আগাগোড়া বাতিল করেছেন—বার বার। আজও—এতদিন পরেও—যে-কোন বই-ই অন্তত চারবার লেখেন আগাগোড়া। কঠোর পরিশ্রম হয়—দিনরাতে একুশ ঘণ্টা বাঁধা পরিশ্রম তাঁর, কাজের ঠাস-বুনুনি একেবারে। মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোন আজকাল, দুটো থেকে পাঁচটা। এছাড়া দিনরাতে প্রাকৃতিক কার্যে স্নানে ও আহারে ৪৫ মিনিটের বেশি ব্যয় হয় না তাঁর। বাকি সবটাই সাধনা। সভাসমিতি করেন না—কোন বিশেষ কারণ না থাকলে। থিয়েটারে বা স্টুডিও-তে যান—সে-ও পরিশ্রম করতেই। বিশ্রাম নেই, আরাম শব্দটির অর্থ জানেন না তিনি, শুধু সাফল্য। শুধু সিদ্ধি। এই-ই তাঁর একমাত্র মন্ত্র জীবনের।

শিবকিঙ্কর বিবাহ করেন নি।

বলতেন, "স্ত্রীলোক? বাপ্‌রে! ওরা মূর্তিমতী বাধা জীবনের। আর বিদ্যার সাধনাতে তো ওদের কোন স্থানই নেই—সাক্ষাৎ অবিদ্যা।"

রঙ্গমঞ্চে বা স্টুডিওতে কোন কোন রঙ্গিনী যে এই যশস্বী ধনী শিকারটিকে ধরতে চেষ্টা না করেছেন তা নয়—কিন্তু ঠকেছেন নিজেরাই। এক আধবার জৈব প্রয়োজন মিটিয়ে সরে পড়েছেন শিবকিঙ্করবাবু—কোথাও ধরা দেন নি। সেটাও যেন তাঁর ঘড়ি-ধরা ছক-কাটা ব্যাপার, শুধু প্রয়োজন। হিসাব করা সবটাই। ভাববিলাস তার মধ্যে নেই এতটুকু।

আত্মীয় স্বজন কেউ কেউ ছিল বৈকি বাড়িতে—সে কেবল সাংসারিক খুঁটি-নাটি দেখবার মতোই। বেশি রাখেন নি। ছেলেপুলে তো নয়ই। চেঁচামেচি হট্টগোলের কোন কারণ রাখলে চলবে না তাঁর, সাধনার ব্যাঘাত ওরা। অকর্মণ্য প্রমাণিত হ'লে আত্মীয় বা আত্মীয়া কাউকে নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিতে তাঁর বাধে নি এতটুকু, সে জায়গায় অপর কাউকে আনিয়ে নিয়েছেন। চাকর বা

কর্মচারীর মতোই দেখতেন তাদের।

অর্থাৎ সারা জীবনটা তাঁর—প্রতিটি মুহূর্ত পল অনুপলসুদ্ধ—একান্তভাবে সঁপে দিয়েছেন জীবনসাফল্যের বেদীমূলে। আর কিছু চান নি তিনি, আর কোনদিকে তাকান নি।

তবে নাকি সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

অনেক জানতেন শিবকিঙ্কর—এইটুকু জানতেন না। হঠাৎ একটা চরম ধাক্কা খেয়ে শিখলেন সেটা।

একদিন কোন এক থিয়েটারে নিজের নতুন নাটক রিহার্স্যাল দিতে দিতে অকস্মাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। ধরাধরি করে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। জ্ঞান হ'ল কয়েক ঘণ্টা পরে। কিন্তু তার পরেও দেখা গেল—দেহের এক দিকটা অসাড়। তিন মাস চিকিৎসার পর কোনমতে উঠে দাঁড়ালেন বটে কিন্তু চিকিৎসকরা কড়া হুকুম জারী করলেন, শুধু কর্ম নয়—কর্মক্ষেত্র থেকেও সরে থাকতে হবে কিছুকাল। কলকাতার বাইরে কোন নির্জন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকতে হবে—সেখানে বই নয়, খাতা-কলম নয়—এমন কি খবরের কাগজও থাকবে না। নিয়মিত ঔষধ ও একান্ত পরিমিত পথ্য—তার সঙ্গে পরিপূর্ণ মানসিক বিশ্রাম, এই চাই।

সুতরাং অনেক খোঁজ-খবরের পর শিমূলতলায় এক বাগানবাড়ি ভাড়া করা হ'ল। সঙ্গে গেলেন এক বিধবা বোন, এক দূর সম্পর্কের বেকার ভাইপো—এবং গুটি দুই ঝি-চাকর, ঔষধ পথ্য প্রভৃতি ডাক্তারের ফর্দ মিলিয়ে কিনে নেওয়া হ'ল। শুধু সঙ্গে রইল না কোনপ্রকার বই ও খাতা। চিকিৎসকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন শিবকিঙ্কর।

শিমূলতলায় গিয়ে বহুকাল পরে, এই-ই প্রথম, প্রকৃতির দিকে তাকালেন তিনি। চমকে উঠলেন একেবারে।

সার সার নীলাভ পাহাড়, একাধিক ঝরণা, সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং নীল আকাশ; বনশিউলির গন্ধেভরা সকাল-সন্ধ্যা; ঘুঘু ডাকা নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর—সবই যেন বিস্ময় তাঁর কাছে। অফুরন্ত বিস্ময়।

আর সে বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। তাঁদের বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে যে গরুটা গাছপালা ও ঘাস খেতে আসে—সে-ও যেন অভিনব, অদ্ভুত। কাঠ-বিড়ালীগুলো গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, মাঝে মাঝে এতটুকুটুকু দুটি হাতে

কী সব তুলে তুলে খায়—এত মজা লাগে দেখতে। ইচ্ছে হয় ওগুলোকে ধরে আদর করেন।

ডাক্তার বলেছেন খুব ঘুমোতে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু এই নতুন অভিজ্ঞতা তাঁকে এমন ভাবে নেশার মতো পেয়ে বসেছে যে ঘুমিয়ে এই আনন্দ-অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হ'তে একটুও ইচ্ছা করে না তাঁর। সারা দুপুর একটা হরিতকীতলায় ক্যাম্প চেয়ার পেতে বসে থাকেন—কখনও দূর আকাশে বিন্দুর মতো উড়ে যাওয়া চিলগুলোর গতিপথ লক্ষ্য করেন একদৃষ্টে, কখনও বা সামনের আমগাছের ডালে প্রথম উত্তুরে বাতাসের কাঁপন-লাগা গোলঞ্চ-লতার মধ্যে—দুই কাঠবেড়ালির ঝগড়া দেখেন।

বাগানের মালী মজুয়ার দুটো ছেলেমেয়ে খেলা ক'রে বেড়ায় বাগানে—ঝরে পড়া হরতুকীগুলো নিয়ে ঝগড়া করে, তাও যেন অপূর্ব। কষ্টিপাথরের মত নিকষ কালো চেহারা তাদের, পেটগুলো মোটা মোটা, একখানি চির-মাত্র সম্বল দুটো নগ্ন শিশু—দিনরাত খাবার জন্ত হাঁ হাঁ করছে। কিন্তু তাদেরও সুন্দর মনে হয় শিবকিঙ্করবাবুর। এদের তিনি দেখেছেন এতকাল—দেখিয়ে-ছেনও—কিন্তু সে শুধু বইয়ের মধ্য দিয়ে। যা কিছু পরিচয় এদের সঙ্গে সে বই পড়েই। এতকাল মনে হ'ত সে পরিচয়ই যথেষ্ট কিন্তু এবার সে ভুল ভাঙল। ছেলেগুলোকে কাছে ডেকে খাবার দেন তিনি, তাদের সঙ্গে গল্প করেন—এ-ও যেন এক নেশার মতো লাগে। এদের দেখে কী এক অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত ক্ষুধার আভাস জাগে মনে—মনের অবচেতনে তার যন্ত্রণা টের পান—যদিও সচেতন মনে তার কোন বর্ণনা দিতে পারেন না।

তবে কি বিবাহিত জীবন, স্ত্রী-পুত্রকন্তার সহস্র ঝঞ্ঝাট, অতি সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রা—এর মধ্যেও এমন একটা আনন্দরসের অস্তিত্ব আছে, যার স্বাদ তাঁর এই সার্থক ও সফল জীবনের সমস্ত কীর্তি-স্বাদের থেকেও বড়; আরও বৃহৎ, আরও মহৎ?

এখানে এসে ক্ষিদে বেড়েছে শিবকিঙ্করবাবুর। এটা ওটা খেতেও ইচ্ছা হয় তাঁর এখন। তাতেও অবাক লাগে। এতকাল—গত দীর্ঘ চল্লিশবছর অন্তত—খেয়েছেন অন্তমনস্ক হয়ে, জীবনধারণের জন্তই। চা ও কফি খেয়েছেন উৎসাহ ও উত্তমের আশায়—কাপের দিকে না চেয়েই। কী খাচ্ছেন কোনদিন চেয়ে দেখেন নি। আহার নিয়ে মাথাঘামানোকে এতকাল বর্বরতা ভেবে এসেছেন। আজ এখানে এসে প্রথম লক্ষ্য করলেন—ভাল খাওয়ার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে। আর তার মূল্যও কম নয়।

জীবনকে নতুন ক'রে দেখলেন এখানে এসে। অনাস্বাদিত অকল্পিত

সুবিস্তীর্ণ জীবন। অলিখিত এক মহান উপন্যাস। আশ্চর্য—এতকাল অমন অন্ধ হয়ে ছিলেন কী ক'রে ?

একদিন সকালে—হরতুকী তলায় বসেই ঘরে-ভাজা নিমকির সঙ্গে চা খাচ্ছেন শিবকিঙ্করবাবু (ডাক্তারকে টেলিগ্রাম ক'রে অনুমতি আনানো হয়েছে ; একখানি মাত্র খাবার অনুমতি পাওয়া গেছে বলে, একটু একটু ক'রে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন)—বাগানের ফটক খুলে ঢুকল হলদে কাপড়-পরা এক শিখ জ্যোতিষী।

আগে হ'লে 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে দিতেন, আজ সাগ্রহে কাছে ডাকলেন।

'ছাখো তো সর্দারজী হাতটা—'

সর্দারজী হাত দেখে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। একটু-আধটু বিপদের কথাও তুললেন। কিন্তু বেশী দূর এগোতে দিলেন না তাকে শিবকিঙ্কর। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করলেন, 'সর্দারজী তুমি সত্যিই হাত দেখার কিছু জানো ? ঠিক ক'রে বলো দিকি, আমি তোমার বকশিশ মারব না, তুমি নির্ভয়ে বলো।'

সর্দারজী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমি সত্যিই কিছু শিখেছি বাবুসাহেব। খুব বেশী না হ'লেও—কিছু জানি।'

'ছাখো তো আর কতকাল বাঁচব। ঠিক সত্যি কথা বলো। আমি দশ টাকা দেব তোমাকে। ভাল ক'রে গুণে দেখে বলো।'

সর্দারজী অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন হাতের দিকে। কী সব গণনা করলেন হাতের একটা কাগজের গায়ে। তারপর বললেন, 'আপনার কত বয়স হ'ল বাবুজী—ছাপ্পান্ন ?'

'হ্যাঁ—পুরো ছাপ্পান্ন।'

একটু ইতস্তত ক'রে সর্দার বললেন, 'আমার হিসেবে বাবুজী আপনার আর এক বছর মাত্র পরমায়ু আছে। তবে আমার ভুলও হ'তে পারে। তাছাড়া নিজের কর্মে অনেক সময় পরমায়ু বেড়েও যায়,—অবশ্য কমেও।'

সর্দারজীকে দশটি টাকা দিয়ে বিদায় করলেন শিবকিঙ্কর। আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন আরাম ক'রে। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর এক কাপ আনাতে হবে। নিমকিটা খেয়ে নিয়েছিলেন কথা কইতে কইতেই, চা খাওয়া হয় নি।

আর এক বছর ?

মোটে এক বছর ?

দূর আকাশের দিকে তাকালেন শিবকিঙ্কর চোখ তুলে। নীল আকাশ আর সাদা মেঘ ঝলমল করছে শরতের রোদে। গাছের ডালে ডালে ঘন সবুজের সমারোহ। প্রকৃতিতে যেন এক বিরাট উৎসব জেগেছে এক অজানা আনন্দের।

কিছুই তো ভোগ করা হয় নি জীবনে। ভাল খাদ্য, ভাল শয্যা, মুক্ত প্রকৃতি, সুখী দাম্পত্য জীবন—কিছুই নয়। কত প্রেমের কথা লিখেছেন নিজের গল্পে উপন্যাসে, কত দাম্পত্য জীবনের মনোহর চিত্র এঁকেছেন—তা নিজের জীবনে কিন্তু একান্ত অনাস্বাদিত রয়ে গেল। গৃহসুখ, সন্তান-সঙ্গ—কোন কিছুই জুটল না অদৃষ্টে।

কী পেলেন তিনি এতকাল কঠোর পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্র-সাধনা করে?

যশ, সম্মান এবং অর্থ?

তাও তো ভোগ করার জন্যে থামতে পারেন নি একদিনও। যদি সেটাও উপভোগ করার মতো অবসর পেতেন একটু। কী হবে এই যশ এবং সম্মান—তিনি মারা গেলে? তিনি তো দেখতে আসবেনই না—বিধবা স্ত্রী এবং সন্তানও রেখে যেতে পারবেন না এমন কাউকে—যারা সেটা দেখে বা ভোগ করে। অর্থ—হ্যাঁ অর্থ নেবার মতো আত্মীয় ঢের আছে। যাদের তিনি ইহজীবনে পরান্নভোজী, পরধন-লোলুপ বলে অবজ্ঞা ক'রে এসেছেন, তারাই মহানন্দে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেবে, বড় জোর ঝগড়া করবে।

হয়ত কাউকে দান ক'রে যেতে পারেন। কিন্তু তাতেই বা তাঁর এই পরিশ্রমের, এই আত্মবঞ্চনার সার্থকতা কী?

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবকিঙ্করবাবু।

ভুল যদি বা ভাঙল—এত দেরিতে ভাঙল!

মোটে ছাপ্পান্ন বছর বয়স তাঁর—এই বয়সে কত লোক নতুন ক'রে সংসার পেতেছে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এই বয়সে বেশ সুস্থ সবল জোয়ান আছে। শুধু তিনিই বুড়ো হয়ে পড়েছেন, অথর্ব। এবং নিজের দোষেই তা হয়েছে।

জ্যোতিষী বলে গেল নিজের কর্মে অনেক সময় আয়ু বাড়ে কমে—তিনি কমাবারই সাধনা করেছেন যে। বাড়বার কোন উপায় নেই।

আচ্ছা,—আর পাঁচটা বছর সময় পাওয়া যায় না?

পাঁচটা বছর মোটে?

বাঁচবার মতো বাঁচতেন তাহ'লে এই কটা বছর।

বিয়ে করতেন। হ্যাঁ, বিয়েও করতেন বৈকি। বয়স্কা মেয়ে, কী বিধবা—অনেকেই ধন্য হয়ে যেত তাঁকে পেয়ে। তারপর ঘুরে বেড়াতেন দেশে দেশে।

জীবনটাকে একটু একটু ক'রে চেখে চেখে অনুভব করতেন—সমস্ত রসটুকু।

"মানবজীবন রসে যত আছে স্বাদ
ইচ্ছা হয় বার বার মিটাইয়া সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দ-মদিরা-ধারা নব নব স্রোতে।"

মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের পংক্তি কটা। তাঁরও মনোভাব ঠিক এই নয় কি?

হে ঈশ্বর। কোনমতে আর পাঁচটা বছর দিতে পারো না? তা হলে তিনি তাঁর জীবনের দশ বছর পরমায়ু নিজেই কমিয়ে দিতে রাজী আছেন—এই পাঁচ বছরের বিনিময়ে।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন সপাং ক'রে চাবুক মারল একটা—

মোটে এক বছরই তো তাঁর সম্বল। তা থেকে দশ বছর দিয়ে পাঁচ বছর কিনবেন কি ক'রে?

দূরে একটা চিল ডাকছে কোথায় একটানা সুরে—চি-চি ক'রে। ঘুঘু ডাকছে—ঘু-ঘু-ঘু। ঘু-ঘু-ঘু।

দূর পাহাড়ের কোলে কোলে সাদা মেঘ জমেছে, সবটা জড়িয়ে যেন স্বপ্নলোক মনে হচ্ছে এই পৃথিবীকে।

সারা পৃথিবীর উপরে একটা অমৃতাঞ্জন।

কান চোখ মাথা—কী অনির্বচনীয় একটা তৃপ্তি, কী সুনিবিড় শান্তিই না পাচ্ছে।

প্রথম হেমন্তের শিরশিরে মিষ্টি বাতাস।

সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়িয়ে যাচ্ছে।

এতকাল এ সবের কোন খবরই রাখতেন না তিনি, কোন দিকে কখনও তাকান নি। ঘরের মধ্যে পাখার নিচে বসে এক মনে লিখছেন, না হয় পড়েছেন। ইদানীং আবার কাঁচ এঁটে এয়ার-কণ্ডিশনিং ক'রে নিয়েছিলেন নিজের ঘরখানা—বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

কেন তাকান নি এতকাল বাইরের দিকে, কেন সম্পর্ক রাখেন নি পৃথিবীর সঙ্গে। কি নির্বোধ তিনি।

এক বছর। এক বছর সময় আছে?

তাই বা মন্দ কি?

এখনও বোধহয় সামান্য একটু সময় আছে। এখনও কিছু হয়ত আনন্দ আদায় ক'রে নিতে পারেন জীবন থেকে। সত্যিকারের আনন্দ কিছু।

থাক না এ সব পড়ে। এই খ্যাতি, এই নাম, এই অর্থ—তার সঙ্গে এই সব আপাত-স্নেহশীল অর্থলোলুপ আত্মীয়ের দল।

জীবনকে এখনও অনুভব করা হয় নি সব। এখনও একটা বৃহত্তর দিক বাকী রয়ে গেছে।

আচ্ছা,—এখন নিঃশব্দে, এক বস্ত্রে যদি বেরিয়ে পড়েন এই প্রকৃতির মধ্যে? পথে যেতে যেতে কাজ পান কাজ করবেন—ভিক্ষা করে খেতে হয়, না হয় তা-ই করবেন, সে-ও তো এক রকম জীবন। সেটাই বা অনাস্বাদিত থাকবে কেন? মাঠে মাঠে অন্যমনে ঘুরে বেড়াবেন—পাহাড় ঝরণা গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে। এই পৃথিবীতে সল্প কদিনের যা মেয়াদ আছে তারই মধ্যে এই শ্যামা বসুন্ধরার যতটুকু পারেন দেখে নেবেন—পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে, এই প্রথম মুখোমুখি পরিচয় করবেন।

মন্দ কি?

শিবকিঙ্করবাবু পায়চারি করতে করতেই ফটকের ধারে এলেন। মজুয়ার ছেলেমেয়ে দুটো বাইরে খেলা করছিল, তাদের ডেকে পকেট উজাড় ক'রে সব টাকাপয়সা দিয়ে দিলেন, চশমাখানা খুলে দিলেন তাদের খেলা করতে। তারিপর আস্তে আস্তে একপা একপা করে এগিয়ে চললেন। গলিটা ছাড়িয়ে ঐ মাঠ, নীলাবরণ ঝরণা, তার ওপারে ঐ ছবিতে আঁকা সামান্য গ্রাম।

ঐ তো ভাল। ওখানেই তিনি যাবেন।

তারপর আরও দূরে কোথাও—আরও দূরে।

বিপুলা এই পৃথিবীর মধ্যে যতদূর যেতে পারেন যাবেন—যতটা দেখতে পারেন দেখবেন। তারপর এক সময়, সময় ঘনিয়ে এলে এই পৃথিবীর শ্যাম অঞ্চলে কোথাও শেষশয্যা পাতবেন—যশ থেকে বহুদূরে, খ্যাতি থেকে—এই নীরস নিঃসঙ্গ জীবন থেকে বহুদূরে কোথাও। যেখানে এই দীর্ঘ জীবনের নির্বুদ্ধিতার এতটুকু ইতিহাস পৌঁছবে না, এমন কোথাও।

শিবকিঙ্করবাবু এগিয়েই চললেন।

কলকাতা শহরটা দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে চলেছে শুধু এই জন্য যে, এখনও কোন কোন এমন লোক আছে যারা একটু ফাঁকায় থাকতে চায়, কলকাতার ঘিঞ্জি গলির পচা চাপা দুর্গন্ধ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। কিন্তু সেই দক্ষিণ উপ-কণ্ঠেও যে এমন গলি আছে তা কে জানত।

বাস্তবিক সে গলি কলকাতাতেও খুব সুলভ নয়। পুরো ছ' ফুট চওড়া হবে কিনা সন্দেহ—তারই মধ্যে তিনটে বাঁক এবং দুধারের দু' সারি বাড়ির দুটো খোলা নর্দমা। এ ছাড়া মানব-বসতির আরও একটি অঙ্গ, যা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অথচ যার উল্লেখও সভ্য মানুষ প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়—বাড়ি-পিছু এমন একটি বা দুটি সে কক্ষ তো রয়েছেই এবং সেগুলিকে সাফ্ করবার প্রবেশপথও এই গলির দিকে অবারিত হয়ে থাকে অহর্নিশি।

তবু আশ্চর্য, পঙ্কে যেমন পঙ্কজ থাকে—তেমনি এই সংকীর্ণ, নোংরা দুর্গন্ধ-ময় গলিতেই থাকতেন আমাদের মহেশদা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের বেঁটে-খাটো টাক-চকচকে মানুষটি, মুখে ও চোখে সর্বদাই একটি শান্ত মিষ্ট কৌতুকের হাসি —পাঁচহাতি ধুতিটি প'রে নিজের অদ্বিতীয় ঘরের চৌকাঠে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, সে গলি দিয়ে যে যেত সে-ই মনে করত মহেশদা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। আর জানাতেনও প্রত্যেককেই, যাকে দেখতেন তাকেই হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করতেন—'এই যে ভাই, ভাল ? বাড়ির সব খবর ভাল ?'

এ গলির অধিকাংশই ভাড়াটে। যে হতভাগ্যদের আয় কম (বা নামমাত্র) অথচ সে আয়টুকু বজায় রাখতে কলকাতার কাছে থাকা প্রয়োজন, তারা না হ'লে এ গলিতে থাকবে কে ? যারা মজুরী খাটে না বলে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যে থাকবার সম্মান পেয়েছে অথচ দিন-মজুরদের চেয়েও যাদের আয় কম, তারাই এই গলির অন্ধকার হাওয়া-বাতাস-হীন বাড়িতে দু' একখানি ঘর ভাড়া ক'রে থেকে প্রাণপণে মৃত্যু ও অস্বাস্থ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছে। কিন্তু মহেশদা-ই বোধহয় একমাত্র লোক এ পাড়ায়—যিনি ভাড়াটে নন। এটা তাঁর পৈতৃক ভিটা।

তাঁর বাবারও এটা পৈতৃক বাড়ি ছিল। তিন ভাই বলে কর্তা নিজের ভাগে পেয়েছিলেন মাত্র দুটি ঘর ও একটুখানি ফালি জমি। সে সম্পত্তি যখন মহেশদা-

দের তিন ভাইকে ভাগ ক'রে নিতে হ'ল—তখন ছোট দু'ভাইকে ঘর দুখানা ছেড়ে মহেশদা নিলেন সেই ফালি জমিটুকু, এককাঠারও কম। তবে পাড়ার লোকের অনুগ্রহে সেজন্য যৎসামান্য 'ওয়েল্‌টি মণি' পেয়েছিলেন—চারশো টাকা।

তাতেই এই ঘরটি তোলা সম্ভব হয়েছিল। নইলে সেদিনও তাঁর নিজের আয় থেকে জমিয়ে ঘর করবার মত অবস্থা ছিল না—আজ তো নেই-ই। সেটা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার দিন—জিনিসপত্র সবই সস্তা, তবুও টাকাটা এতই নগণ্য যে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল ও টিনের চালের এই দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘর, চার-পাঁচ রান্না ঘর ও সঙ্কীর্ণতম একটি পাইখানা ক'রে নিতেও সেদিন বেশ কষ্ট হয়েছিল। এসব ক'রে, বাড়ির ভেতর দিকে যে স্থানটুকু ছিল, যাকে কোন কবিরও উঠান বলে কল্পনা করতে বাধে—সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন একজন লোকের নিঃশ্বাস নেবার মতোও যথেষ্ট বাতাস ওখানে নেই। বোধহয় সেই জন্যেই, মহেশদা আমাদের ছুটে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াতেন, তাঁর ঘরের চৌকাঠে। হোক গলি সংকীর্ণ—তবু তাতে বেশী বাতাস আছে।

শুধু যে এর ভেতর হাসিমুখখানি অক্ষয় ক'রে রেখেছিলেন মহেশদা তাই নয়, এর ভেতর একটুখানি শখও জীইয়ে রেখেছিলেন। তিনি বাঁশী বাজাতেন, এবং ভালই বাজাতেন। খুব ভোরে ঐ গলির অধিবাসীদের ঘুম ভাঙত তাঁর ক্ল্যারিওনেটের সুরে—ভোরবেলা তিনি প্রত্যহ অভ্যাস করতেন। দু'একবার ঐ গলি দিয়ে যাতায়াত করতে করতে আমরাও শুনেছি সে বাঁশীর তান, মনে পড়ে গেছে কবিগুরুর 'বাঁশী' কবিতা—'গলির মোড়ে থাকেন কান্ত-বাবু, যত্নে পাট করা চুল, শৌখিন মানুষটি!' এজন্য মহেশদার খাতিরও ছিল, যাত্রা থিয়েটার হ'লে ডাক পড়ত। পাড়ায় দু'একবার ঐকতান সমিতি করবারও চেষ্টা হয়েছে—তার প্রত্যেকটিতেই মহেশদা ছিলেন। তবে তার দলাদলিতে থাকতেন না কোন দিনই, কেউ এসে ডাকলেই যেতেন, না ডাকলে ঘরে বসে বাঁশী বাজাতেন, নয়ত দোরে দাঁড়িয়ে এই গলির পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য যাত্রীর দিকে নিজের সহাস্য দৃষ্টি ও মিষ্টভাষা' প্রসারিত ক'রে দিতেন।

আশ্চর্য এই যে, এতদিনের এত পরিচিত লোক, যারা প্রয়োজন হ'লেই ওঁকে ডেকে নিয়ে গেছে, নয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে আড্ডা দিয়েছে—দিনের পর দিন, তারা কেউ ভেবে দেখেনি যে ওঁর কিসে চলে। কি করে চলে, কী কাজ করেন, কতটাকা আয়—এ নিয়ে কখনও কেউ মাথা ঘামায়নি। এমন সর্বদা-তুষ্ট ভাব ছিল তাঁর মুখে চোখে, এমন অপরিসীম স্থৈর্য ও প্রশান্তি, এমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ যে, কেউ কখনও কল্পনা করতে পারত না মহেশদার অর্থাভাব

আছে, বা থাকা সম্ভব। বোধহয় সেইজন্যেই কখনও কারুও মনে কথাটা জাগে নি।

যেদিন জানলুম সেদিন আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। মহেশদা লেখাপড়া জানতেন না, সুপারিশ ধরবারও লোক ছিল না কেউ, সুতরাং এক বিলিতী বইয়ের দোকানে বেয়ারার কাজে ভর্তি হয়েছিলেন। মস্তবড় দোকান, আগে মালিক ছিল সাহেব—গত মহাযুদ্ধের আগেই হাত পাল্‌টে এসে পড়ে এক মারোয়াড়ীর হাতে, কিন্তু তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি বরং অবনতি হয়েছিল। তখন যা মাইনে ছিল নতুন মালিক এসে তা কমিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে নাকি কারবার রাখা সম্ভব নয়। সে সময় অনেকেই কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, শুধু মহেশদা ভরসা পান নি—তখনই তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে, এমন শক্তি বা মুরুব্বি নেই যে অন্যত্র কাজ জুটিয়ে নেবেন। অগত্যা পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে কমে পঁচিশ টাকা মাইনেতেই তাঁকে টিকে থাকতে হ'ল।

এসব কথা আমরা কেউ জানি না। তাঁর কোন অন্তরঙ্গ লোকও বোধহয় জানত না, আত্মীয় তো কেউ ছিলই না। তাঁর যে ভাই দুটির জন্যে অত ত্যাগ করলেন মহেশদা, তারা বহুদিন আগেই নিজেদের হিস্সা নামমাত্র মূল্যে অপরকে বেচে দিয়ে চলে গেছে। সেখানে এখন মস্ত দোতলা ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে—তাতে চার ঘর ভাড়াটে। ওঁর দক্ষিণ দিকটা সম্পূর্ণ আবৃত ক'রে সেই বাড়িটি ওঁরই ভ্রাতৃপ্রীতি ঘোষণা করছে।

যাই হোক—পাড়ার লোক ওঁর অবস্থা সম্বন্ধে প্রথম সচেতন হয়ে উঠল একেবারে ১৩৫০ সালে—মন্বন্তরের বছর। বাজারে চাল ৩৫।৩৬ টাকা মণ হয়ে গেছে। তখনও রেশন হয় নি—দু'একটা কণ্ট্রোলের দোকান হয়েছে বটে, সেখানে রাত বারোটা থেকে লোক জমতে থাকে, লাইন হয় কোন কোন ক্ষেত্রে এক মাইল দেড় মাইল লম্বা—বেলা আটটা নাগাদ দোর খুলে জন-কতককে একসের ক'রে চাল দিয়েই সে সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বাকী চাল কোন্ আশ্চর্য কৌশলে বেরিয়ে গিয়ে কালোবাজারে প্রবেশ করে, তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। যারা পায় তারাও বেশীর ভাগই গৃহস্থ নয়—আবার বিক্রী করার জন্যই অত কষ্ট করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো মহেশদার পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর নটায় অফিস, আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এক রবিবার, তা রবিবার অধিকাংশ কণ্ট্রোলের দোকান বন্ধ থাকে। দু'একটি যা খোলা থাকে সেখানে গিয়ে দু'একদিন মহেশদা বেলা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে চলে এসেছেন। ছেলেমেয়েরাও তখন খুব ছোট, বড়টি বছর-সাতেকের, তাদের পক্ষেও সেখানে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

সম্ভব হ'ত পাড়ার লঙ্গরখানায় গিয়ে বজরা মিশনো খিচুড়ী খেয়ে আসা।

কিন্তু তা মহেশদা বা তাঁর স্ত্রী কেউই পারেন নি। পাড়ায় গিয়ে কাউকে অবস্থা জানিয়ে হাত পাততেও পারেন নি। পেরেছেন শুধু দিনের পর দিন উপবাস করতে। তার ফলে যখন স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলের চেহারা ভয়াবহ কঙ্কালে পরিণত হয়ে উঠল তখন আমাদের নজরে পড়ল অবস্থাটা। তাও খুব সহজে পড়েনি, কারণ তখন কঙ্কাল দেখে দেখে সবাই অভ্যস্ত। ওটাতে চমকে ওঠবার আর কোন কারণ খুঁজে পেতুম না।

আরও বিপদ এই যে—এই দীর্ঘ উপবাসে, শুধু নিজের নয়, নিজের থেকেও প্রিয় সন্তানদের উপবাসেও—তাঁর মুখের প্রশান্তি তো নষ্ট হয় নি। দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে, মুখ হয়ে উঠেছে পাণ্ডুর, বিবর্ণ ; গোল মুখখানি লম্বা হয়ে রগ ও গাল ঢুকে বীভৎস হয়ে উঠেছে, তবু সেই শুষ্ক মুখে ও কোটরগত চক্ষুতে হাসির অভাব হয়নি, প্রীতিসম্ভাষণেরও না। কে বুঝবে বলুন যে অমন নিশ্চিন্তভাবে মিষ্ট করে যে হাসতে পারে আজ হয়ত এক সপ্তাহ সপরিবারে সে উপোস করে আছে!

কিন্তু তবু এক সময়ে ওঁদের চেহারাটা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে নজর না পড়ে উপায় রইল না। মহেশদাকে ভালবাসত অনেকেই, তাদের নিজেদের অবস্থা যতই খারাপ হোক, নিজেদের আরও বঞ্চিত ক'রে ওঁদের এক মুষ্টি দিতে আটকাল না। এ গলি, ওপাশের গলির সব লোক মিলে একজনের ওপর ভার দিলেন, চাঁদাও উঠল কিছু, কিন্তু সেই টাকাতে বার্লি এবং হর্লিকস যখন গিয়ে পৌঁছল তখন আর তাঁদের প্রায় কারুরই তা খাবার মতো অবস্থা নেই।

তখন আরও মনোযোগ গেল সকলকার। ছুটোছুটি ব্যস্ততার সীমা রইল না। অবশেষে একটা য়্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বৌদির তখন আর চোখ চাইবার মতো অবস্থাও নেই, তবু একবার প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু বললেন, 'আমাকে আর টানাটানি করছ কেন ভাই, পারো তো ওঁকে আর ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচাও!'

সত্যিই তাঁকে আর টানাটানি করে লাভ হ'ল না। হাসপাতালে অবশ্য চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। তবু বৌদি মারা গেলেন দিন-সাতেক পরেই, আর ছুটি ছেলেমেয়ে যমের সঙ্গে যুঝল প্রাণপণে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও যেতে হ'ল। শুধু মহেশদাই সেরে উঠলেন অনেক কষ্টে, আর বড় ছেলেমেয়ে ছুটি।...

মহেশদা আবার ফিরে এলেন তাঁর সেই একমাত্র ঘরে। স্ত্রী নেই, ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিও গেছে—নিজেকে রান্না করতে হয়—একবেলা হ'লেও কষ্টকর তো বটেই—তবু তাঁর মুখের হাসি মিলোয় না। এতদিনে জেনেছিলুম যে

তাঁর বেতন পঁচিশ টাকা। যমের মুখ থেকে অর্ধেক রফা ক'রে ফিরে আসার পরে সাতটি টাকা মাগ্‌গী ভাতা ব্যবস্থা হয়েছিল অফিসে—কিন্তু আর তাঁকে উপবাস করিতে না হয় সেদিকে এবার আমরা দৃষ্টি রেখেছিলুম। পাড়ার তখন একটি লোক কালোবাজার ধরে হু-হু ক'রে উঠছে, সেই হঠাৎ-বড়লোকটিকে তাতিয়েই আমরা ওঁর জন্যে রাত্রে একটা বাংলা হিসেব রাখার কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম—তার জন্য মাইনে পেতেন না, কিছু কিছু চাল পেতেন। তা হোক, তাতে পেট ভরে।

মহেশদার জীবনযাত্রাটা অতঃপর খুব ছন্দোবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভোরে উঠে বাঁশী বাজাতেন (একটু গায়ে বল পাবার পরই ওটা আবার ধরেছিলেন) তারপর উনানে আঁচ দিয়ে রান্না ক'রে নিজে খেয়ে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে চলে যেতেন অফিসে। যাবার সময় বাড়িতে চাবি দিয়ে যেতেন—ছেলেমেয়ে দুটো বেলা দশটা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় খেলে বেড়াত—তার পরে যেত পাড়ার পাঠশালায় পড়তে। ঐখানেই বিনামূল্যে পড়বার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। পাঠশালা থেকে বেরিয়েও তাদের ঐ অবস্থা, কারণ সাড়ে ছটার কম মহেশদা ফিরতে পারতেন না কোনদিনই—অফিস থেকে বেরিয়ে সারা বাজার ঘুরতে হ'ত, ওরই মধ্যে যদি কোন আনাজ সস্তায় পাওয়া যায় এই আশায়, কিংবা দু-চার পয়সায় কোন চুনোমাছ। বাড়ি ফিরে, যেদিন মাছ আনতেন সেদিন শুকনো পাতা-টাতা জ্বেলে সেটা একটু রান্না ক'রে নিতেন, নইলে সকালের জল দেওয়া ভাত নিজেও খেতেন, ছেলেমেয়েদেরও খাইয়ে দিতেন তখনই। তারপর আবার যেতে হ'ত নতুন চাকরিতে। ঘরে আলো জ্বেলে ছেলেদের পড়তে বসিয়ে, বাইরে থেকে চাবি দিয়ে চলে যেতেন, ফিরে এসে দেখতেন তারা বইয়ের পাশে পড়ে অগাধে ঘুমোচ্ছে। তাদের তুলে নিয়ে বিছানায় শুতে যেতেন। এই ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন। খালি রবিবার দিনে একটু ব্যতিক্রম হ'ত, দুপুরবেলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর একটা খালি থলি নিয়ে যেতেন বহুদূরের অপেক্ষাকৃত, বৃক্ষবহুল অঞ্চলে, সারা দুপুর ধরে শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে বেড়াতেন। এতে ইন্ধনের খরচা অনেক কমত।

এভাবে যে সুখে ছিলেন না, তা বোধহয় কাউকেই বলবার দরকার নেই। ছেলেমেয়ে দুটো রীতিমত অসভ্য হয়ে উঠেছিল, পড়াশুনো তো হচ্ছিলই না। নিজেরও কষ্টের সীমা ছিল না। এ গলিতে যাঁরা থাকেন তাঁদের নিজেদের অবস্থাই শোচনীয়, সুতরাং তাঁদের পরোপকারের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না —এক-আধদিন তবু তাঁরাই প্রাণপণে নিমন্ত্রণ করতেন;—কেউ কেউ সন্ধ্যেবেলা

সামান্য সামান্য রান্নাকরা তরকারী দিয়ে যেতেন। সকালের তরকারী গরমের দিনে প্রায়ই খারাপ হয়ে যেত—শুধু নুন আর তেঁতুল দিয়ে ভাত খাওয়া ছাড়া তখন উপায় থাকত না।

যাঁদের বিনামূল্যে হিতোপদেশ দেওয়া স্বভাব, তাঁরা কেউ কেউ সদুপদেশ দিয়েছেন বৈকি।

'মহেশ, ডাগর দেখে একটি মেয়ে খুঁজে—গরিবের ঘরের মেয়ে, আর একটি সংসার করো। এমন ক'রে আর কতকাল পারবে?'

মহেশদা নির্বিরোধ মানুষ, পরের সব কথাতে সায় দেওয়াই তাঁর চিরকালের অভ্যাস, কিন্তু এই একটি ব্যাপারে দেখেছি তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা, তিনি হাত দুটি জোড় ক'রে, সবিনয়ে হ'লেও বেশ দৃঢ়স্বরে বলতেন, 'ঐটি মাপ করতে হবে দয়াময়, ও কাজ আর না।'

হিতাকাঙ্ক্ষীরা হয়ত বোঝাতে চেষ্টা করতেন,—'কিন্তু একা মানুষ, ছেলে-মেয়ে দুটোর কথাও তো ভাবতে হবে? ও দুটো যে বাঁদর তৈরী হচ্ছে।'

'তা হোক প্রভু—তবু তো বেঁচে আছে। মুখে তো দুটো ভাত দিতে পারছি, ঐ আমার ঢের। মানুষ না হয় মোট বয়ে খাবে, সেও ভাল। আবার একজনকে ঘরে এনে তাঁকে শুকিয়ে রাখব, ছেলেমেয়েগুলোও উপোস করবে—সেটা আর ইচ্ছা ক'রে হ'তে দেব না।'

এইভাবেই যখন এক বছর, এমনকি তিন বছরও কেটে গেল, তখন আমরা ও নিয়ে চিন্তা করাও ছেড়ে দিলুম। মহেশদা' আর সংসার করবেন না—এটা সকলকারই একরকম বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেল। হিতাকাঙ্ক্ষীরাও সদুপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিলেন। এমন সময়ে এই এক অঘটন—

পূর্ববঙ্গে গোলমালের ফলে অকস্মাৎ তখন লোক আমদানি শুরু হয়েছে। পথঘাট ভরে গেছে আশ্রয়-প্রার্থীতে, শিবিরে শিবিরে লোক উপছে উঠেছে, সরকারী বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানই পেরে উঠছে না সামলাতে—এমন অবস্থা। তার ঢেউ কিছু এ গলিতেও এসে পৌঁচেছে বৈকি। আত্মীয়তার সুদূরতম সূত্র ধরে লোক এসে উঠছে প্রত্যহ। একখানি ঘরের অধিবাসীর সংখ্যা সতেরতে এসে ঠেকেছে। তারা দিনের বেলা বাইরে বাইরে কাটায়, রাত্রে কোনমতে এসে শোয়। তবু এখনও লোক বেড়েই চলেছে—তাদের আশ্রয় আর আহার কোনমতেই বুঝি জোটানো যায় না।

এইভাবেই মালতী আর মালতীর মা একদা এ পাড়ায় এসে পৌঁছলেন। নোয়াখালিতে বাড়ি, সেখানেও অবস্থা ভাল ছিল না, এখানে এসেছেন একে-

বারেই নিঃস্ব হয়ে। দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের ঠিকানা জোগাড় ক'রে এসেছিলেন, তিনি বহুদিন এ পাড়া থেকে চলে গিয়েছেন, কোথায় গিয়েছেন সে খোঁজ কেউই রাখে না। কোন্ অফিসে কী কাজ করেন তাও মালতীর মা জানেন না।

সুতরাং একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবারই কথা। রাস্তাতে কাটল তাঁদের সারাদিন। মালতীর মা কেবলই কাঁদেন। মালতী কাঠ হয়ে বসে রইল। এমন অবস্থাতে পাড়ার লোকেরও স্থির থাকা কঠিন। সকলে গিয়ে সেই হঠাৎ-বড়-লোক দেবীদাসবাবুর শরণাপন্ন হলেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে শুনে দেবীদাসবাবু আশ্রয় দিতে রাজী হলেন। কথা হ'ল যে উনি মাতা কন্যা দুজনকেই খেতে ও থাকতে দেবেন—কিন্তু মাইনে বলে কিছু দেবেন না। কারণ তাঁর একটি লোকেরই দরকার ছিল, দুটি লোককে পুষতে হ'লে আর পেরে উঠবেন কি করে?···মালতীর মা এই শর্তেই যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন।

এখানে থাকতে থাকতে ক্রমশ মালতীর মার সঙ্গে সকলকারই পরিচয় হ'ল। বেশ মানুষটি। হাসিখুশী, সদালাপী, সরল। কিন্তু মালতীর জন্যেই তাঁর মনে শান্তি নেই। মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশের কম নয়। ওর মাও তা গোপন করেন না। বলেন, 'ঠিক হিসাব তো নাই—তা এক কুড়ির কম না।' শ্যামবর্ণ, শ্রীহীন মেয়ে, তার ওপর একটি পা খোঁড়া। এ মেয়ে পার হওয়া কঠিন। বিশেষত, সহায় সম্বল নেই যখন কোন রকমই। মালতীর মাও সে আশা করেন না—শুধু কাঁদেন হাউ হাউ ক'রে প্রসঙ্গটা উঠলেই।

কিন্তু কী ক'রে কি হ'ল, দেবীদাসবাবুর প্রসন্ন দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির ওপর। বোধহয় ও ভূতের মত খাটত বলেই। সংসারের সকলের সেবা করতে পারলেই যেন মালতীর জীবন সার্থক হয়, তাকে কেউ হুকুম না করলে তার ক্ষোভের কারণ ঘটে। মালতীর মাও নিজের মত করেই তাঁর সংসারে খাটেন—সেজন্যেও কৃতজ্ঞতার কারণ ছিল দেবীদাসবাবুর। এই বাজারে ত্রিশ টাকার কম একটা রাঁধুনী পাওয়া যায় না—তিনি বিনা বেতনে দুটি লোক পেয়েছেন।

তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, দেবীদাসবাবুর তখন চালে, কাপড়ে, ঔষধে, লোহায়, সিমেন্টে ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কালো বাজারের হলদে সোনা তাল হয়ে উঠছে সিন্দুকে। জমি আর বাড়ি নিত্য কিনছেন একটা না একটা। একদা খোসমেজাজে তিনি বলে ফেললেন, 'মালতীর একটা সম্বন্ধ দেখুন। দু'গাছা বালা, কানের একটা কিছু—আর দানের বাসন-কোসন, বরকনের জামা-কাপড় ঘর-খরচা সব আমি দেব। বরযাত্রীও খাওয়াবো কিছু। এতে যদি পাত্র পান তো আপত্তি নেই। নগদ টাকা দেব না, কিংবা আর গয়নাও দিতে পারব না।'

পাড়ার তিন চারটি উৎসাহী তরুণ খুঁজে খুঁজে একটি পাত্র জুটিয়েও ফেললে। কোন্ এক কারখানায়-কাজ করে। একটি পক্ষ সম্প্রতি গত হয়েছে, তবে ছেলেপুলে বেশী নেই—একটি। বিড়ি ছাড়া অন্য কোন নেশা নেই—নিজের একটা মাটির বাড়িও আছে। সেইখানেই দেখাদেখি হয়ে কথা পাকা হয়ে গেল। বিয়ের দিনও ধার্য হয়ে গেল।

দেবীদাসবাবু শুধু বরযাত্রী নয়—কন্যাযাত্রী হিসেবে পাড়ার দু'চারজনকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। মহেশদাকেও বাদ দেননি, কারণ ওঁকে হাত পুড়িয়ে খেতে হয় বলে সুযোগ সুবিধা পেলেই ওঁকে সকলে নিমন্ত্রণ করত। আর যারা এ বিয়েতে উৎসাহী, তাদেরও বলা হয়েছিল।

গহনা এসেছে, কাপড় এসেছে—দান-সামগ্রীও তৈরী। বধূবেশে সেজে বসে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে মালতী। রূপ ও রূপো—দুটোরই দৈন্য তার, কে জানে শ্বশুরঘরের লোক কেমন ভাবে তাকে নেবে। ওর মায়ের চোখেও জল; এমন আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই—এজন্যে সকলেই বার বার তাঁকে তিরস্কার করছে, তবু তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

লগ্ন ছিল সাতটায়। সন্ধ্যার মধ্যেই বরের এসে পড়বার কথা। কিন্তু সাতটা বেজে গেল, সাড়ে সাতটা বেজে গেল—তবু দেখা নেই। পূর্ববঙ্গের প্রথানুযায়ী বরকে আনতে লোক গিয়েছিল, সেও ফেরে না। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। দেবীবাসবাবু সাইকেল ক'রে আর একজনকে পাঠালেন।···

ভাগ্যে শেষরাত্রে আর একটা লগ্ন আছে—

রাত নটা নাগাদ যখন সকলেরই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে এসেছে, কনে পিঁড়ির ওপরই উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে এবং মা মাথা খুঁড়ছেন, তখন সে ছেলে দুটি ফিরল। ম্লান মুখ···মাথা হেঁট ক'রে এসে দাঁড়াল।

'কী হে, কী ব্যাপার? বর কই?'·· সহস্র প্রশ্ন চারদিক থেকে।

প্রথমত তারা উত্তরই দিতে পারে না। অবশেষে যা বলল তার মর্মার্থ হ'ল এই—মালতীদের কোন আত্মীয় তাদের ভার নিতে খোঁজ ক'রে এগিয়ে না এলেও, ইতিমধ্যে তাদেরই কে খোঁজ ক'রে বরের বাড়ি জানিয়ে এসেছে যে ও মেয়েকে গুণ্ডাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সাতদিন পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। তাতেই বর আর রাজী নয়। ব্রাহ্মণের ঘর, তায় গরীব—ও মেয়ে এনে কি ফ্যাসাদে পড়বে সে? যদি একঘরে করে সবাই? তা ছাড়া সে-ই বা ওকে নিয়ে ঘর করবে কেমন ক'রে, জেনে শুনে?···ছেলেরা অনেক বুঝিয়েছে, তার পায়ে পর্যন্ত ধরেছে, এতক্ষণ ধরে অনুনয়-বিনয়ের চূড়ান্ত করে দিয়েছে, কিন্তু

কোনই ফল হয় নি। তার ঐ এক কথা, 'না চেহারা ভাল, না পাচ্ছি পয়সা—তবে কিসের জন্যে জেনেশুনে এ কাজ করব বলুন ?'

শুনে আমরা সকলেই স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা চারিদিকে। তারপর দেবীদাসবাবু মালতীর মাকে প্রশ্ন করলেন, 'এ কথা কি ঠিক ?'

তিনি ঘাড় হেঁট ক'রে বললেন, 'মিছা কথা তো বলি নাই কখনও, কথা ঠিকই। তবে উয়ার দোষ কি বাবু ?···তা ছাড়া অর দেহটা ত নষ্ট হয় নাই।'

দেবীদাসবাবু ক্ষেপে গেলেন যেন, 'মিছা কথা তো বলি নাই ! ন্যাকা।···তবে এতদিন এ কথা গোপন করেছিলে কেন ? আমার জাত মারলে কেন ? ঐ মেয়ের হাতে আমি ভাত পর্যন্ত খেয়েছি।···যখন বিয়ের সম্বন্ধ করছি তখন বলো নি কেন ? মিছিমিছি আমি তো এমন অপমানিত হতুম না তাহ'লে !'

তিনি অকথ্য গালাগাল দিতে লাগলেন।

আমরা কী বা বলব।—ওঁদের এই গোপন করাটা, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের কারুরই ভাল লাগে নি।

হঠাৎ মহেশদা এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেবীদা, একটা কথা বলব ?'

'কী বলুন। আমার মশাই এখন মাথার ঠিক নেই।'

'আপনারা তো দোজবরে দিচ্ছিলেনই—যদি আপত্তি না থাকে ত আমাকে দিন, আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি।'

'সে কি !···এই সব জেনেও আপনি নেবেন ?'

'হ্যাঁ— আমার কোন আপত্তি নেই। যদি ওঁদের থাকে ত সে কথা আলাদা। তবে একটা কথা, ওর মাকে জানিয়ে দিন, আমি বড়ই গরীব, আমার ঘরে এলে হয়ত সবদিন পেট পুরে খেতে দিতে পারব না। কিন্তু উপবাস করলেও সসম্মানে থাকবে !'

আবারও কিছুক্ষণ তেমনি নীরবতা চারিদিকে।

'ত্যাখো মহেশ, ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু ক'রে ব'সো না। ভাল ক'রে ভেবে ত্যাখো।'

'আমি তো ঝোঁকের মাথায় কিছু করি না দেবীদা, ভেবেই দেখেছি।'

আমরা তখন সকলেই তেতে উঠেছি। অপরে সৎসাহস দেখালে বাহবা দেওয়া সহজ। আমরা সবাই মহেশদাকে অভিনন্দিত করলাম।

সেইদিনই শেষ রাত্রের লগ্নে মালতীর সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়ে গেল।

মহেশদা তেমনিই আছেন। ভোরে উঠে বাঁশী বাজান। তেমনি অবসর সময়ে

দাঁড়িয়ে থাকেন পাঁচি ধুতিখানি পরে রাস্তার দিকে সহাস্যমুখ ও হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে। এতটুকু বদলান নি ভদ্রলোক।

সহপাঠী

ওদের প্রথম আলাপটা হয়েছিল হঠাৎ—সামান্য একটা তর্কের ফলে। কল্যাণ সহপাঠীদের এই মেয়েদের-গায়ে-পড়া স্বভাবটা একেবারেই দেখতে পারত না, আর তাই নিয়ে বাদানুবাদ হ'ত প্রায়ই। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথম কলেজে পড়তে এসেছে ওরা—ওদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ মনটা এই সময় প্রথম স্ত্রী-সচেতন হয়ে ওঠে। কৈশোরের অবসানে যৌবনের প্রথম পাদস্পর্শ টের পাওয়া যায় এই সচেতনতার মধ্যেই। তার ওপর হাতের কাছে যদি এত-গুলি সহপাঠিনী থাকে, আর তারাও যদি কিছুটা লজ্জা, কিছুটা সংকোচ এবং কিছুটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে একটা আল্‌তো ব্যবধান রচনা করে রাখে তাহ'লে সে সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল ও আলোচনার স্পৃহা থাকাটা অস্বা-ভাবিক নয়, এমন কি খুব দোষেরও বলতে পারি না। ওটা পুরুষের সহজাত মানব-ধর্ম। মেয়েরা যদি ঐ আল্‌তো ব্যবধানের ভাবটা কিংবা ঔদাসীন্যের মিথ্যা মুখোশটা ঘুচিয়ে দিয়ে সহজ হতে পারত তাহ'লে হয়ত এ পক্ষেও কৌতূহল যেত অনেকটা কমে। কী জানি—অন্তত তাই মনে হয় আমাদের।

যাই হোক—বলছিলুম কল্যাণের কথা। কল্যাণ সেদিনও বিরক্ত হয়ে বিনয়ের দলকে তিরস্কার করছিল। বলছিল, 'তোরা অমন বেড়ালের মতো ছোঁক ছোঁক করে বেড়াস কেন বল্‌ তো? সবে তো ইস্কুল থেকে বেরিয়েছিস, কিছু দিন পড়াশুনো কর্‌ মন দিয়ে—তা নয়, দিনরাত ঐ সব আলোচনা ছাড়া কথা নেই। বিজয়া কেমন ক'রে আড়ে চেয়ে গেল, ললিতা মিছিমিছি কী রকম জানলা দিয়ে চেয়ে থাকবার ভান করে—এসবে তোদের দরকার কি? কথা কইবার ইচ্ছে হয় সোজাসুজি গিয়ে কথা তো কইলেই পারিস। ক্লাস-ফ্রেণ্ড্‌ তো।'

বিনয় বললে, 'কৌতূহল বুঝি শুধু আমাদেরই মনে করিস; ওদের কি কম —ভান করে শুধু। আমরা সোজাসুজি চেয়ে থাকি, ওরা আড়ে চায়।'

কল্যাণ আরও বিরক্ত হয়ে বলে, 'বেশ করে। তোদের কি? ওরাও পড়তে এসেছে তোরাও এসেছিস—অন্য ক্লাস-ফ্রেণ্ডের মতো ওদের দেখতে পারিস না কেন?'

ফট্‌ করে সুহাস বলে বসল, 'তুই পারিস?'

'কেন পারব না ? না পারবার কি আছে ?' বিস্মিত হয়ে তাকায় কল্যাণ।

'যা-যা। মুখে সবাই অমন বলতে পারে। পারিস গিয়ে আলাপ করতে—যেমন নতুন ছেলে এলে আমরা সহজে করি ? পারবি ঐ নতুন মেয়েটার কাছে গিয়ে কথা কইতে ?'

'নিশ্চয়ই পারি। কী হয়েছে ? মনে পাপ থাকলেই সঙ্কোচ আসে। আমার তো মনে পাপ নেই। কেন পারব না ?'

'কত বাজী ?' বিনয় বলে ওঠে।

কল্যাণ বললে, 'বাজী রাখতে চাই না, ওটা জুয়োখেলা। তবে আমি কাজটা ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কথাটা উঠেছিল এক নতুন-ভর্তি-হওয়া মেয়েটিকে নিয়েই। বেশ ফুটফুটে চেহারা—খুব ছেলেমানুষের মতো দেখতে। সতেজ সরল কৈশোরের ছাপ ওর মুখে চোখে—ওকে দেখলে তরুণ ছেলেদের চঞ্চল হবারই কথা।

কল্যাণ বসেছিল জানলার কাছে—হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী যেন মেয়েটার নাম ? রমা—না ?'

তারপর সটান রমার সীটের কাছে গিয়ে বললে, 'ভাই রমা, শুনেছি তোমার কাছে পেন্সিল-কাটা ছুরি আছে—দেবে একবার ?'

কলেজে ভর্তি হয়ে পর্যন্ত সে-ই যে বিশেষ-ক'রে ছেলেদের লক্ষ্য এবং আলোচনার উপলক্ষ হয়ে উঠেছে রমাও তা জানত। এবং মধ্যে দু-একবার যে আলাপের চেষ্টা চলে নি তাও না—সুতরাং এটাকেও সেই চেষ্টারই জের ভেবে রমার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল, কিন্তু কল্যাণের মুখের দিকে চেয়ে আসল সহজ ভাবটা চিনতেও ওর বিলম্ব হ'ল না। একটু হেসে ওর গলার হারের সঙ্গে আটকানো ছুরিটা বার ক'রে দিলে।

পেন্সিল কাটা শেষ ক'রে কল্যাণ ছুরিটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতেই বললে, 'তোমাদের সব ক'জনেরই শাড়ির আঁচল দেখি বেঞ্চির তলায় লুটোচ্ছে, একটু সাবধান হয়ে বসতে পারো না ? অকারণে ময়লা তো হয়ই—দুনিয়ার যত রোগের বীজাণুও ঐ সঙ্গে ঘরে যায়। ওটা আবার কী এমন ফ্যাশান !'

মেয়েরা অপ্রতিভ হয়ে কাপড় ঠিক করে বসল। রমা কিন্তু এই ছেলেটির সহজ ব্যবহারে খুশী হয়েছিল, সে আর সমীহ করে চলবার কোন কারণ খুঁজে পেলে না। চিমটি কেটে বললে, 'আপনাদেরও কোঁচা কম লুটোয় না—'

'সেটা আরও বেশি নিন্দার্হ—তাই বলে তোমরা কেন সে বদ্ অভ্যাসটা বহন ক'রে চলবে।'

জবাবটা নিজের সীটে ফিরে যেতে যেতেই দিয়ে গেল কল্যাণ।

সহপাঠীদের কেউ সেদিন বাহবা দিল, কেউ হ'ল ঈর্ষিত। কিন্তু সেই উপলক্ষ করেই এদের পরিচয়টা জমে উঠল দ্রুত।

কল্যাণ ছেলেটি কিছু অদ্ভুত। সে একটা স্কলারশিপ নিয়ে এসেছে, ভাল ছেলে ব'লে সবাই ওকে খাতির করত, কিন্তু ওর ব্যবহারে কোথাও কোন অহঙ্কার বা সঙ্কোচ ছিল না। সে ভাল-মন্দ সবাইকার সঙ্গেই সমানে মিশত, পড়াশুনোর ব্যাপারেও অক্লান্ত ভাবে সবাইকে সাহায্য করত। তবে একটা মুরুব্বিয়ানার ভাব ছিল ওর মজ্জাগত—যদিও ঠিক সেটা পিঠ-চাপ্‌ড়ানোর মতো অসহ্য কিছু নয়। অভিভাবকদেব মতোই স্নেহ মেশানো থাকত ওর ব্যবহারে ব'লে সেটা সকলে নির্বিবাদে মেনে নিত। লম্বা একহারা চেহারা, শ্যাম বর্ণ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—সর্বদাই অবিন্যস্ত থাকত। সেটাকে দুরস্ত করবার চেষ্টাও ওর বিশেষ ছিল না—করলেও থাকত কিনা সন্দেহ। চোখের চশমাটা ছিল পুরু, চশমা খুললে বিশেষ কিছু দেখতে পেত না। এক কথায় চেহারা নিয়ে গর্ব করবার মতো কিছু ছিল না ওর—অসাধারণত্ব তো নয়ই। শুধু চশমার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল চোখ দুটো বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিত। সাধারণত লেখাপড়ায়-ভাল ছেলেরা একটু যেমন আপন-ভোলা হয়—চোখের চাহনিতে ওর সে ঔদাসীন্য মোটেই ছিল না। বরং ও কাছাকাছি থাকলে সবাই অস্বস্তি বোধ করত—কখন কি দেখে ফেলে আর তিরস্কার করে এই ভয়ে।

রমার ছিল ঠিক উল্‌টো। ছেলেমানুষের মতো মুখ ওর—ছিপছিপে সুশ্রী গড়ন। বিনয় বলত dainty figure—fragile-ও বটে, ওর স্বভাবটাও ছিল হাল্‌কা—মিষ্টি ধরনের। লেখাপড়ায় যতটা সাধ ছিল, ততটা সাধ্য ছিল না, তাই কল্যাণের সাহায্য পেয়ে ও যেন বেঁচে গেল। ক্লাসে একদিনও পুরো নোট্‌ নেওয়া ওর ঘটে উঠত না—ফলে প্রায় প্রত্যহই কল্যাণের খাতা থেকে টুকে নিতে হ'ত, তার মধ্যেও বেশির ভাগ দিন কল্যাণই ওর খাতা টেনে নিয়ে লিখে দিত। কল্যাণের মতো বুদ্ধিতে ধার ছিল না রমার, প্রোফেসারদের কথাও সে যেমন ভাল বুঝত না, কল্যাণের কথাও বুঝতে পারত না। তার কারণ, ওদের বোঝাটা যেত লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে, রমার বোঝাটা চলত খুঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা ক'রে কল্যাণ যখন দেখত রমার দৃষ্টিতে শূন্যতা বা বিহ্বলতা এসেছে তখন সে চটে উঠত—গুরুজনের মতোই তিরস্কার করত, এমন কি এক-আধদিন বোধ হয় কান মলেও দিতে গেছে। কিন্তু রমা তাতেও ক্ষুণ্ণ হত না। ঈশ্বর তাকে যত নির্বুদ্ধিতাই দিন, মিথ্যা আত্মসম্মান-জ্ঞান দেন নি। সে সবিনয়ে এবং মধুর হাস্যে ওর তিরস্কার মেনে নিত, আর তাতে শেষ পর্যন্ত

ওরই জয় হ'ত। কল্যাণ আবার শুরু করত গোড়া থেকে।

অবশ্য শুধু রমাই নয়—ক্রমশ কল্যাণের আরও অনেকগুলি ছাত্রী জুটল। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মানসিক দৈন্য বা হ্যাংলামি না থাকায় সহপাঠিনীরা সবাই ওকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শিখল। আর বোধ হয় সেইজন্যেই রমার সঙ্গে কল্যাণের বন্ধুত্বটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেও সেটা কারুর চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকে নি, ওদের নিজেদের তো নয়ই। সম্পর্কটা সহজ বন্ধুত্বেরই ছিল আগাগোড়া।

এমনি ক'রেই চলল কলেজ-জীবন—হঠাৎ ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে উঠে কিছুদিন পড়বার পরই কল্যাণ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। প্রথমটা ওর খেয়াল মনে ক'রে রমা বিশেষ ব্যস্ত হয় নি, কিন্তু ক্রমে যখন এক এক ক'রে পনেরোটি দিন কেটে গেল তখন সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারল না। কল্যাণের বাবাও কোন খবর জানতেন না—ওঁরাই বার বার ফোন্ করতে লাগলেন রমার কাছে। কেন গেল এবং কোথায় গেল, কিছুতেই ভেবে পায় না ওরা। ইদানীং কিছুদিন ধরেই কল্যাণ একটু অন্যমনস্ক থাকত—এ কি তারই ফল? কে জানে। অথচ কল্যাণকে যে ওর বড় দরকার। এতটা যে দরকার তা এতদিন রমা বুঝতেই পারে নি, ওর জীবনের সঙ্গে সে যে এমন ক'রে জড়িয়ে গেছে, নিশ্বাসের মতোই রমার জীবনে সে যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, এ-রকম সন্দেহও কখনো করে নি রমা। কিন্তু এবার আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা চলল না। রমা খবরের কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দিল, 'বন্ধু, ফিরে না এসো—কোথায় আছ জানাও। তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

চিঠি এল সুদীর্ঘ সাতদিন প্রতীক্ষার পর। ঠিকানা নেই—পোস্টমার্ক বীরভূমের। তাতে লেখা ছিল, 'রমা—যে দেশে আছি সেখানে খবরের কাগজ চোখে পড়বার সম্ভাবনা নেই। কাল শহরে এসে দৈবাৎ পুরোনো কাগজখানা চোখে পড়ে গেল। চিঠি দেবার সময়ও নেই—ইচ্ছেও নেই। তোমরা ব্যস্ত হয়েছ সন্দেহ ক'রে এখানা লিখলাম।

'কিছুদিন ধরেই পড়াশুনো করার কোন প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছিলুম না। কী হবে এই এম. এ. পাস ক'রে বলতে পারো? হয় চাকরি, নয় আইন প'ড়ে ওকালতি করা, নয়ত বড়জোর অধ্যাপনা—এমনি আরও কয়েকটি ছাত্রছাত্রীর মাথা খাওয়া, অর্থহীন শিক্ষার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে; কিংবা বিলেতে গিয়ে একটা ডিগ্রি নিয়ে চাকরি ও বিয়ের বাজারে দর বাড়ানো—এই তো? তোমাদের অবস্থা আরও খারাপ। কেন পড়ছ তা জানো না—নারী-প্রগতি ও স্ত্রী-স্বাধীনতার একটা ভাসা-ভাসা কথা মনে আছে, এই পর্যন্ত। এম. এ. পাস

ক'রে বসে থাকবে কবে আই. সি. এস্. কিংবা আই. এম.এস্. পাত্র জুটবে এই ভরসায়। লেখাপড়া হয় না কিছুই, মাঝখান থেকে সাধারণ যে পাত্রের গলায় মালা দিয়ে সুখী হতে পারতে, তাদের সম্বন্ধে আসে মনের মধ্যে অবজ্ঞা—জীবন সম্বন্ধে আশা যায় বড় হয়ে। ফলে, পাত্র জোটে না—যৌবন এবং তার আনুষঙ্গিক যা কিছু হারিয়ে, বৃদ্ধবয়সে আধবুড়ো পাত্রের গলায় মালা দিয়ে জীবন যায় ব্যর্থ হয়ে। এই তো দেখি প্রায় ঘরে ঘরে। কিন্তু কেন? শিক্ষা বলতে ওটা বোঝায় না। এতবড় দেশের চল্লিশ কোটি লোক আজ মরতে বসেছে, কি ক'রে বাঁচবে তা জানে না। সেই বাঁচার মন্ত্র শিখতে হবে—শেখাতে হবে। দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল জাগছে জীবনের পথে। একদিন যখন এর হিসাব-নিকাশ হবে যখন সমস্ত জাতটা যাবে দেউলে হয়ে—তখন আমরা মুষ্টিমেয় একদল নরনারী শুধু দেশের এই জনতা থেকে দূরে সরে আছি বলেই বাঁচতে পারব না। সে বন্যায় সবই ভেসে যাবে। তাই দেশের সমস্যাটা আজ কোথায়—বাঁচবার বা বাঁচাবার আজও কোন পথ আছে কিনা সেইটে দেখতেই এখানে চলে এসেছি। বাবাকে বলে এলে তিনি আসতে দিতেন না, মুন্সেফের চাকরি হাতে ক'রে তিনি বসে আছেন, সেই সঙ্গে এক বন্ধুর কন্যা এবং হাজার কতক টাকা। গত দু-তিন-পুরুষ যে সঙ্কীর্ণ বাঁধা রাস্তায় চলেছে তার বেশি কোন রাস্তার সন্ধান তিনি রাখেন না, রাখতে চানও না। সুতরাং বিদায় নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি।

'এখানে আছি এক ডোম-পল্লীতে। আশেপাশে মুচি-নমঃশূদ্রদের দল। মদ আর যৌন ব্যাধিতে এরা ডুবে আছে। পেটে অন্ন নেই—পরনে বস্ত্র নেই। আছে শুধু ম্যালেরিয়া এবং কদাচার। আছে অপরিসীম অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। আজ সমস্ত শিক্ষার মোহ ঘুচিয়ে ফেলে একটা জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশের সমস্যা একটি মাত্র লোকই কিছুটা দেখতে পেয়েছেন, মহাত্মাজী, কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করি নি। যে মূঢ় আজও তাঁর কথা শুনতে পেলে না—সামনের ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে দেখতে পেলে না, তার জন্যে আজ দুঃখ হয়। আমিও যে শুনেছি তা বলতে পারি না, শোনবার চেষ্টা করছি মাত্র। কান পেতে আছি সেই বজ্রগর্জনের দিকে যা মহাপ্রলয়ের আভাস রূপে বেজে উঠবে একদিন।

'তোমাকে কী বলতে পারি রমা? কিছুই বলবার নেই। পারো তো তোমাদের জীবন এবং এই শিক্ষার কী উদ্দেশ্য—কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা—বোঝবার চেষ্টা ক'রো। হয়ত সে সময়ই পাবে না। তোমার বাবার হাতে বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার পাত্র আছে জানি; তোমার দিদির একটি বিলেত-ফেরৎ পাত্র জুটলেই একসঙ্গে দুটি কন্যাকে পাত্রস্থ করবেন। তিনি সেই জন্যই

তোমাদের কলেজে পড়াচ্ছেন।...চিঠি দেবার চেষ্টা ক'রো না। ঠিকানা দেব না—ঠিকও নেই কিছু, কখন কোথায় থাকি। বোলপুরের পোস্ট-মাস্টার আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁকে জানালে প্রয়োজনীয় সংবাদ ঠিক পৌছবে আমার কাছে। তবে তাঁর কাছেও ঠিকানা পাবে না। ইতি—তোমার বন্ধু।'

যদিও সহপাঠী তবু কল্যাণকে নাম ধরে ডাকতে রমার সঙ্কোচে বাধত। 'বন্ধু' নামটি তারই দেওয়া। এ নিয়ে বিদ্রূপ কল্যাণ কম করে নি—বলেছে যে, পুরুষ যে মেয়েদের চেয়ে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথাটা মেয়েরাই বেশি ক'রে জানে, তাই নাম ধরে ডাকায় ওদের এত সঙ্কোচ। তবু কল্যাণ যে ওর এই সঙ্কোচটুকু পছন্দ করে রমা তা বুঝত। আজ কল্যাণও সেই সম্বোধনটাই মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এ কী হ'ল। কল্যাণ কী বলেছে তা রমা বুঝতে পারলে না—বোঝা বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। শুধু এইটুকু বুঝলে যে, দেশ ও দেশবাসী-রূপ অন্ধকার এবং না-জানা একটা মহাসমুদ্র ওর কল্যাণকে গ্রাস করেছে, আর বোধ হয় কোনদিনই সে তাকে ফিরে পাবে না। ওর কিছুটা প্রভাব কল্যাণের ওপর এতদিনে বিস্তার করতে পেরেছে এমনি একটা গর্ব ছিল মনে মনে, আজ সেটা তো ভূমিসাৎ হ'লই—যে শক্তি আজ তার কাছ থেকে এমন ক'রে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত দেশমাতৃকা সম্বন্ধে মনে মনে একটা বেদনাতুর ঈর্ষার ভাবও অনুভব করতে লাগল।

তবু কল্যাণ হারিয়েই গেল, রমা অনেক চেষ্টা করেও খোঁজ পেলে না। শান্তিনিকেতন দেখতে যাবার ছল ক'রে নিজে বোলপুর গেল, কিন্তু ওখানকার ছোকরা পোস্ট মাস্টারটির কাছ থেকে কল্যাণের কোন খবরই বার করতে পারলে না। সেই স্বল্পভাষী যুবকটির বিনয়ের বর্মে ওর যৌবন, রূপ এবং রমণীয় মাধুর্যের সমস্ত-অস্ত্রগুলিই ঠেকে একে একে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

ফিরে আসতে হ'ল ওকেও। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে বন্ধুকে খুঁজে বেড়াবার মতো সময় এবং সুযোগ ওর যখন নেই তখন আর উপায় কি। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে ও বুঝল এবং নিশ্চিত ক'রে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে কল্যাণ কখন ওর সহপাঠীর পদ থেকে আর একটু বেশী অধিকার পেয়েছিল তা ও নিজেই এতদিন বুঝতে পারে নি। আজ আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়—কল্যাণকে ওর চাই-ই, সে ওর জীবনে অপরিহার্য, ওর আত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

এবার ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে নিজের নাম গোপন ক'রে—'বন্ধু,

দোহাই তোমার, ফিরে এসো। একদিন অন্তত দেখা ক'রে যাও, আমি আমার কথা না বলে আর থাকতে পারছি না।'

বিজ্ঞাপনের কাটিংটা পাঠিয়ে দিলে সেই পোস্টমাস্টারের নামে।

এবার জবাব এল দ্রুত। কল্যাণ লিখেছে—'আমার স্কুল-কলেজ মিলে সহপাঠী ও সহপাঠিনীর দল প্রায় দুশো। কই কারুরই তো আমার সম্বন্ধে এত আকুলতা দেখা যাচ্ছে না। তাইতে সন্দেহ হয় যে, তোমার মনে সেই পুরনো নাকি-কান্না—যাকে কবিরা বলেন ভালবাসা—তার একটা ছোঁয়াচ লেগেছে। সেইজন্যেই আর কোনদিন দেখা করব না। এখন যা সময়, তাতে ওসবের অবসর নেই যে শুধু তাই নয়—থাকা উচিত নয়। স্ত্রী-পুরুষের ঐ সম্পর্কটা আমাদের, বিশেষ করে বাঙালীর জীবনে বড় বেশি এসে পড়েছে, তাই তার পায়ে পদে পদে বাধা। হিন্দুস্থানী এবং উড়েরা স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে তোমাদের কলকাতাতে এসে কি-ভাবে টাকা রোজগার করছে। কিন্তু বাঙালীর ছেলেরা সে কথা ভাবতেও পারে না। বিদেশে চাকরি করতে গেলে আগে বাসা খোঁজে। তোমরাও আজকাল শরৎবাবুর নভেল আর সিনেমার দৌলতে বড্ড মেয়েলি হয়ে উঠেছো। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের চেয়ে তোমরা বেশী শক্ত বেড়ি রচনা করো।

'ওসব এখন থাক্—সামনে যে কাজ পড়ে আছে তার মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাকে খুঁজে নাও। কেন, পুরুষকে না জড়ালে কি মেয়েদের জীবনে কোন কাজ নেই—কোন সার্থকতা নেই?'

এই তিরস্কারে মর্মান্তিক আঘাত পেল রমা। পড়ায় মন দিল বেশী ক'রে। কল্যাণকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করার জন্যই যেন রোজ সিনেমাতে যেতে শুরু করল। শাড়ি ও প্রসাধনের ব্যয় বেড়ে গেল চতুর্গুণ। বার বার নিজের মনের কাছে আস্ফালন করতে লাগল যে এটা কল্যাণের নিছক স্পর্ধা। সাধারণ স্নেহ ও উৎকণ্ঠাকে সে অনায়াসে তার প্রতি ভালবাসা বলে গ্রহণ করল কি ক'রে? নিজের সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা তার? দেশের কাজের কতকগুলি বাঁধা বুলি আউড়ে নিরক্ষরদের মধ্যে গিয়ে বাস করলেই দেশের কাজ হয় না। চাষারা কোনদিন কোন দেশের স্বাধীনতা আনে নি। এনেছে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাই। শরৎবাবু ঠিকই বলেছেন, ঐ সব মদ্যপায়ী, অশিক্ষিত, অনাচার-গ্রস্ত ছোটলোকরা কোনদিন আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারবে না। মহাত্মাজী থেকে শুরু ক'রে ক্ষুদে মহাত্মা কল্যাণবাবুর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করলেও না।

কিন্তু তবু যেন সব ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত কাজ ও অকাজের মুহূর্তগুলো

ঝাঁকা ঝাঁকা ঠেকে। এ যে কী হ'ল তা ও বোঝে না। কিছুদিন পরে সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে বিস্তর বই কিনে এনে পড়তে বসল—লেনিন ও স্ট্যালিনের জীবনী, মার্কসবাদ, যা পেলে সব পড়ে শেষ করল কিন্তু তাতে ওর দেশের সমস্যা বা তার সমাধান-কোনটারই হদিশ পেল না। কিনলে গান্ধীজীর জীবনী, তাঁর বক্তৃতাবলী—পুরোনো 'হরিজন' বাঁধাই-করা চেয়ে এনে পড়ল। ওর মাথায় এ সব কথা ঢোকে না যেন কিছুতেই, তবু মন দিয়ে পড়ে। এমনি ক'রে বিস্তর সময় নষ্ট ক'রে এক সময় রমা হার মানল। আবার স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, দেশও নয় দেশবাসীও নয়, ওর মন পড়ে আছে নিজের সমস্যার ওপরেই। ওর প্রয়োজন একটি বিশেষ দেশবাসীকে। তার জন্যেই ও সব-কিছু করতে পারে—নইলে কিছুই না।

ইতিমধ্যে ওর বাবা মেয়ের রকম-সকম দেখে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ইঞ্জি-নিয়ার পাত্রটি ছিল হাতের কাছেই, রূপসী স্ত্রী এবং মোটা যৌতুক সবসুদ্ধ যায় দেখে তিনি এম. এ. পাসের মায়া ত্যাগ করতে রাজি হলেন। পরীক্ষার দিনের আগেই বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। রমা মজ্জমান ব্যক্তির মতো পরীক্ষারূপ তৃণগাছি আঁকড়ে ধরতে গেল—বললে, 'এই কটা মাস তো, পরীক্ষাটা অন্তত দিতে দাও।' কিন্তু ওর বাবা সে সব যুক্তি বাতিল ক'রে দিলেন। বললেন, 'পরীক্ষাটা বিয়ের পরেও দেওয়া যায়। এতদিনের পড়া, এই কটা দিনে কি এসে যাবে?'

রমা এবার চোখে অন্ধকার দেখলে। যেটুকু দ্বিধা ছিল সব চলে গেল। নিজের মনে যতদূর দৃষ্টি চলে একটি নির্মম নিরাসক্ত লোক ছাড়া আর কারুর স্থান সেখানে দেখতে পেলে না। পোস্ট-মাস্টারের জিম্মায় 'তার' গেল—'আমি বড় বিপন্ন। আত্মার এই মৃত্যু থেকে আমাকে কি বাঁচাবে না? তোমার কাছেই আমি নতুন ক'রে পাঠ নেব। তোমার কাজে টেনে নাও আমাকে। আর কোন দাবী নেই।'

'তার' পাঠাবার পরে তিনদিন কেটে গেল, কোন উত্তর নেই। বিয়ের আর এগারো দিন মাত্র বাকি—পাকা দেখার আর দুদিন। পাকা দেখার পর কথার খেলাপ করতে সে পারবে না, তাতে বাবাকে অপমান করা হয়। নিজেরও ঐ আশীর্বাদ নেওয়ার মধ্যে কোথায় একটা স্বাকৃতি থাকে—তারপর চুক্তিভঙ্গ করা অন্যায়। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ও অন্যমনস্কভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোচ্ছে এমন সময় চমক ভাঙল ওরঅতিপরিচিতএকটা হাতের ঝাঁকু-নিতে। কাঁধের ঠিক এই জায়গাটা ধরে ঝাঁকানি দেওয়া কল্যাণের বহুদিনের অভ্যাস, শুধু তাকে নয়—পরিচিত সবাইকেই সে এমনি ক'রে ঝাঁকানি দিত।

এতদিনের পর কল্যাণকে সত্যি-সত্যিই সামনে দেখে অকস্মাৎ রমার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। কথা কইতে গিয়ে ঠোঁটই কাঁপল শুধু—স্বর বেরোল না।

কল্যাণ ওর অবস্থা দেখে সবই বুঝল, একটু মুচকে হেসে ওকে টেনে নিয়ে গেল গোলদীঘির মধ্যে। তারপর ওরই মধ্যে যত দূর সম্ভব একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল, 'তার পর ?'

রমা ওকে জানত। কোনরকম মান-অভিমান করা বৃথা। সেন্টিমেন্টালিটির বিন্দুমাত্র ধার ধারে না কল্যাণ। তাই সে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'তোমাকে যা লিখেছি তার বেশি একটুও বলবার নেই। বিয়ে করা এখন আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাকে তোমার কাজে টেনে নাও।'

কল্যাণ প্রশান্ত মুখে ওর দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু আমার কাজের মুশকিল হচ্ছে এই যে, ওর প্রতি যার সত্যকার আকর্ষণ নেই সে ওর মধ্যে টিকতে পারবে না, সুতরাং ও চেষ্টা ক'রো না রমা, ও বৃথা।'

রমা ইঙ্গিতটা বুঝেও না বোঝবার ভান করলে। আর সে চেষ্টায় ওর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠল। বললে, 'কে বলেছে ওর প্রতি আমার আকর্ষণ নেই, তবে যেতে চাইছি কেন ?'

'যেতে চাইছ আমার জন্যে,' স্থির দৃষ্টি ওর মুখের ওপর রেখে কল্যাণ উত্তর দিলে, 'আমার সাহচর্যটা তোমার কাছে বেশী প্রিয় বলে। হয়ত আমিও এটাকে মেনে নিতে পারতুম—এদিকে যদি আমারও কোন লোভ থাকত। কিন্তু যে পথ আমি বেছে নিয়েছি, সেই পথই আমার সমস্ত মন অধিকার করে আছে, অন্য কোন কথা আমি ভাবতেও পারব না। তাই হয়ত কিছুদিন পরে তুমি হতাশ হবে, অথচ তখন আর তোমার ফেরবার পথ থাকবে না। এখন যেটা নিশ্চিত এবং ধ্রুব হাতের কাছে পাচ্ছ—সেটাকে ছেড়ো না রমা।'

অপমানে রমার কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বললে, 'নিজের সম্বন্ধে তোমার এত উচ্চ ধারণা রাখা ঠিক নয়। শুধু তোমার লোভে আমি ঘর-বাড়ি আত্মীয়-স্বজন, এমনকি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবকিছু ছেড়ে যাচ্ছি,.এত মূল্যবান তুমি নও। তোমার কাছে আমি প্রণয় ভিক্ষা করব না কোনদিন—ভয় নেই।'

কল্যাণ একটুও অপ্রস্তুত হ'ল না। বরং হেসে বললে, 'ওটা আমার নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নয় বন্ধু, মেয়েদের সম্বন্ধে ছোট ধারণার ফল। যে সব মেয়েই এদিকে এসেছে তাদের প্রায় কাউকেই শেষ পর্যন্ত রোম্যান্স না করে থাকতে দেখি নি। অথচ তারা সবাই ভাল ভাল মেয়ে—তারা টিকে থাকলে দেশের কত উপকার হ'ত।'

রমা উষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, 'ব্যতিক্রমও থাকে বই কি, তোমার চোখ নেই তাই দেখতে পাও না।'

একটুখানি চুপ করে থেকে কল্যাণ বললে, 'তাহ'লে এখনও তোমার দেশের কাজে নামবার ইচ্ছা আছে?'

রমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আছে।'

'কিন্তু কাজও তো বিস্তর আছে, কর্মক্ষেত্রেরও অভাব নেই, বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গেই বা থাকতে চাইছ কেন?'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে, তোমার সঙ্গে থাকলে আমার সম্মান হয়ত অক্ষুণ্ণ থাকবে এই ভরসায়। মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার যেমন ধারণা, পুরুষদের সম্বন্ধেও আমার সেই রকম। তাই অপরিচিত লোকের সঙ্গে থাকতে ভয় হয়। নইলে তোমার একটুখানি সাহচর্যের জন্য এমন ক'রে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি—এ কথা মনে ঠাঁই দিও না।'

কথাগুলো বলবার সময় শেষের দিকে সংযমের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রমার গলা কেঁপে গেল।

কল্যাণ আবারও একটু হাসল। বললে. 'তাহ'লে এই কথা তো? কোন-দিন তুমি আমার কাছে ব্যক্তিগত কোন স্নেহ আশা করবে না—আমার মন বা চিন্তার ওপর কোন দাবী-দাওয়া রাখবে না, এই প্রতিজ্ঞা করছ তো? একান্ত মনে কাজটাকেই তোমার ব্রত করবে—কেমন?'

এবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় ক'রে ফেলেছে রমা, সে উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ।'

'বেশ তাহ'লে চল উঠি। আমার একটু কাজ আছে, এটা সেরে সাতটার ট্রেন ধরতে হবে।'

রমা বিস্মিত হয়ে বললে, 'আজই, এখনই? একবার বাড়ি যাব না?'

'কী হবে আর বাড়ি গিয়ে?'

'কাপড়-জামা—'

'যেখানে যাচ্ছ—সেখানে লজ্জা নিবারণের মতো কিছু পাবে বৈকি। তার চেয়ে বেশি যেটা, সেটা তো বিলাস। তা ছাড়া, আমাদের এ কাজে কোন বন্ধন নেই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নেই—। সব সময় যিনি প্রস্তুত তিনিই কর্মী। যে-কোন কাজের জন্যে যাকে ভেবে দেখতে হয়—প্রস্তুত হ'তে হয়, তাকে দিয়ে কাজ চলে না, কাজের আড়ম্বর চলে।'

বাবা—ভাই-বোন—সংসারের চিরপরিচিত আবেষ্টনী। ওর ঘরের বই-খাতাগুলো তেমনি ছড়ানো রইল। শাড়ি-জামাগুলো গুছোনো হ'ল না। কাগজপত্রগুলো পর্যন্ত কি-ভাবে রইল তার ঠিক নেই। মানস-চক্ষে সবগুলোর

ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়েই রমা যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'আমার চিঠিপত্রগুলো যে নষ্ট করে আসা হ'ল না। তোমার চিঠিও যে রয়েছে তার মধ্যে—'

শান্ত কণ্ঠে কল্যাণ উত্তর দিল, 'কী হয়েছে তাতে? মহৎকর্ম কিংবা বিরাট সর্বনাশ যখন মানুষের সামনে থাকে, তখন ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। কোন কিছুই যেন তোমার জীবন ও চিন্তাকে বেঁধে না রাখে, জড়িত না করে—এই হ'ল কর্মব্রতের সবচেয়ে গোড়ার কথা।'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রমা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেশ তাই চলো।'

রমা তেমনি একবস্ত্রেই কলকাতা ত্যাগ করল। কলেজের খাতা ছিল কাছে, তারই একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বাবাকে চিঠি দিলে। লিখলে—'শ্রীচরণেষু, বাবা, আমি বিয়ে করতে পারলুম না। আমাকে কেন্দ্র ক'রে হয়ত অনেক আশাই আপনার মনে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আমার পক্ষে তার একটাও সফল করা সম্ভব হ'ল না। আমি চললাম দেশবাসীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে—পারব কি না জানি না। কোন লজ্জাকর কিংবা অসৎ কাজের দ্বারা কোন দিন আপনার পরিচয়কে বিড়ম্বিত করব না এটা ঠিক—কিন্তু আপনিও আমাকে খুঁজে বার করার জন্য কোন হাঙ্গামা করবেন না। আমার বয়স এখন তেইশ, সুতরাং স্বেচ্ছায় যা করতে চাই তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না—শুধু মানুষের চোখে ব্যাপারটার হয়ত অন্য অর্থ দাঁড়িয়ে আপনাকে অপদস্থ করবে। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—'

কিন্তু ওর কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে রমা তার মনের মধ্যে একটা শৈত্য অনুভব করে বৈকি! সব উত্তাপ যেন নিমেষে নিভে যায়। বোলপুর থেকে সতেরো-আঠার মাইল গোরুর গাড়ি করে যেতে হয়—বিজন পল্লীগ্রাম, ডোম আর মুচিই বেশি সেখানে। তাদের প্রত্যেকেই দুশ্চরিত্র এবং মদ্যপ। কোন নীতির ধার ধারে না তারা—তাদের জীবনে কোন সামাজিক বন্ধন নেই। পরিশ্রম কম ক'রে দিনরাত তাড়ি কিংবা পচাই খেলে যা হয়—দারিদ্র্যের সর্বশেষ ধাপে নেমে এসেছে। অথচ সে জীবনের জন্য কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই, পরিবর্তনের জন্য এতটুকু প্রয়াস নেই। চালে খড় নেই, পরনে বস্ত্র নেই, শয্যার মধ্যে খেজুর পাতার চ্যাটাই, বাসনের মধ্যে মাটির হাঁড়ি আর নারকেলের মালা। যৌন-ব্যাধিতে প্রত্যেকের আপাদ-মস্তক পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে বাস করতে হবে?

কল্যাণ একটু হেসে বললে, 'এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে দিতে হবে ভাষা

—বুঝেছ বন্ধু ? এদেরই মানুষ করে তুলতে হবে।'

তা হোক—কিন্তু আর কেউ নেই যে গ্রামে। কথা কইবে কার সঙ্গে ? থাকবে কোথায় ?

কল্যাণ যেখানে থাকে সেটা একটা ভাঙা ঘর, খানিকটা চালা ছিল, বাকিটা নিজেই খেজুর পাতা চাপা দিয়ে নিয়েছে। কার যেন একটা বাড়ি ছিল, তার পরিবারের অর্ধেক মরে বসন্তে, বাকি অর্ধেক কলেরায়। তারপর সে-ও সাপের কামড়ে মারা গেলে ঘরটা পোড়ো হয়েই ছিল—সম্প্রতি কল্যাণ দখল করেছে। সেখানে থাকে ওর একটা ছেঁড়া চ্যাটাই, খানকতক বই, খাতা, কলম, গোটাকতক হাঁড়িকুঁড়ি আর কিছু ওষুধ।

রমাকেও সেইখানেই নিয়ে গিয়ে তুললে। রমা সভয়ে বললে, 'যদি সাপে কামড়ায় ?'

'তা কামড়াতে পারে। তবে এরা বলে কি জানো, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। অদৃষ্টে লেখা না থাকলে সাপ কামড়ায় না। আমিও তো এতদিন রইলাম।'

'আমিও কি এই ঘরে থাকব ?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে রমা।

'নিশ্চয়ই। ঘর আর পাবো কোথায়। চারটি খড় যোগাড় করে দেব ও-বেলা, তার ওপর একটা চট পেতে নিলেই দিব্যি শোওয়া চলবে।'

'কিন্তু—এই এক ঘরে ?' মরীয়া হয়ে বলে রমা।

'আর ঘর কই ?' কল্যাণ ওর মুখের ওপর সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললে, 'তা ছাড়া তুমি যে স্ত্রীলোক সেটা ভুলবে বলেই তো এসেছ। এখানে আমাদের অন্য পরিচয় নেই, শুধু কর্মী। আমার পুরুষ-বন্ধু যারা আসে, এ অঞ্চলে যারা কাজ করছে, তারা তো এই চ্যাটাইতেই আমার পাশে শোয়। কই, তারা তো কোন আপত্তি করে না!'

তারপর হেসে ফেলে বললে, 'আর একটা কথাও মনে রেখো। তোমার রূপ এবং যৌবনের কথাটা তুমি এবং আমি যদি বা ভুলে যাই, এরা ভুলবে না। সুতরাং আমার কাছে থাকাই নিরাপদ। এদের ঐ পুরুষগুলোকে অনাহারে আর অত্যাচারে শীর্ণ দেখছ বটে, কিন্তু মদ পেটে পড়লে একেবারে মরীয়া হয়ে ওঠে। একটু সাবধানে থাকতে হবে বৈকি।'

রমা অভিভূতের মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এসব কথা সে বইতে যতই পড়ে থাক্, তার কোন বর্ণনার সঙ্গেই এই উদ্ভট জীবনের যেন মিল নেই। এমন কি রাশিয়ার কর্মীদের যে সব বিবরণ পড়েছে, তাও তো বোধ হয় এত ভয়ঙ্কর নয়।

হঠাৎ কল্যাণের যেন একটু সন্দেহ হ'ল। সে ঘরে এসে কাছে দাঁড়িয়ে আন্তরিকতার সুরেই বললে, 'তুমি কি তা হ'লে ফিরে যেতে চাইছ রমা? এখনও ভেবে স্থাখো, ব্যাপারটা এমন কিছু খারাপ দাঁড়ায় নি—এখনও হয়ত সব দিক বাঁচানো চলে। চুপিচুপি এখনও যদি তোমায় কলকাতায় রেখে দিয়ে আসি, তাহ'লে কেউ টেরও পাবে না—'

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে রমা উত্তর দিলে, 'না। যে পথ বেছে নিয়েছি, ভাল হোক মন্দ হোক সেই পথেই চলব।'

এ সম্বন্ধে অন্য কোন যুক্তির অবতারণা না ক'রে প্রশান্ত মুখে কল্যাণ চারটি খড়ের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু কাজটাই বা কি?

নাইট স্কুল নয়, স্বদেশী শিক্ষা নয়, সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টাও নয়—এমন কি হাসপাতালও নয়। কতকগুলো চাষের বই আনিয়েছে কল্যাণ—তাই থেকে ওদের কাছে পড়ে শোনায় আর ওদের ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কী ক'রে চষলে ভাল ফসল হয়—জল কম হ'লে কী করতে হয়—কেমন ক'রে পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে হয়—এই নিয়েই তার মাথাব্যথা।

রমার প্রশ্নের উত্তরে সে বিদ্রূপের সুরে বলে, 'লেখাপড়া? অক্ষর পরিচয়? এদের? তুমি ক্ষেপেছ রমা! না খেতে পেয়ে মরে গেল দেশকে দেশ—এখন সব চেয়ে বড় শিক্ষা এদের এইটে, যাতে করে চাষটা ভাল করতে পারে। অনাহার আর রোগ, মদ আর কুপ্রবৃত্তি—এইগুলোর আগে প্রতিকার করি, তারপর লেখাপড়ার কথা ভাবব।'

'কিন্তু এগুলোর প্রতিকার করতেও তো কিছু লেখাপড়া শেখানো দরকার—' রমা প্রতিবাদ করতে যায়।

কল্যাণ বলে, 'এখনও তার অনেক দেরি। এখন এই অবস্থায় যদি ইস্কুল খুলে বসো তো একটিও ছাত্র-ছাত্রী পাবে না তুমি। স্লেট-পেন্সিল দেখলে ওরা ভয় পায়। মোটামুটি স্যানিটেশনের একটা প্রথম পাঠ দিতে পারলে বেঁচে যাই—তাতেই কারুকে কর্ণপাত করাতে পারি না। কলেরার কাপড় পুকুরে কাচতে নেই একথা বললে এরা পাগল ভাবে।'

'সে-ও তো অশিক্ষারই ফল।'

'তা ঠিক। কিন্তু শিক্ষাটাকে এরা নিজেরাই বর্জন করেছে—সে দিকে প্রীতি আনতে সময় লাগবে। আমি একটু ডিরেক্ট মেথডেরই পক্ষপাতী। সব চেয়ে দুঃখের কথা কী জানো, এরা চাষ করেই খায় অথচ চাষের নিয়মগুলোও জানে

না। জলের অভাবে অর্ধেক বছর এই জেলাটায় চাষ হয় না, কিন্তু ওরা ধান বুনেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে। অথচ এমন একটা কড়াই আছে যা পাথরের ওপর ছড়িয়ে দিলেও কিছু ফসল আমদানি হয়—সে কথাটা এদের মুখেই শোনা—তবু এরা সে চেষ্টা পর্যন্ত করে না। তাতে প্রাণ-ধারণ তো হয়—নিদেন গোরু-বাছুরগুলো তো বাঁচে।'

রমার তবু দ্বিধা ঘোচে না। সে বললে, 'বেশ, তোমার যা কাজ তাই করো, আমি এদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করবো।'

ঈষৎ বিদ্রূপের আভাস ওর মুখে দেখা গেলেও কল্যাণ কোন প্রতিবাদ করলে না।

সেদিন আহার জুটল একেবারে তৃতীয় প্রহরে খানিকটা ক'রে ডাল-ভাতে আর ভাত। ডাল-ভাতের সঙ্গে তেল নেই, ঘিয়ের কথা তো কল্পনা করাও যায় না। এখানে নাকি সকলেই এমনি তিনটে চারটের সময় ভাত খায়, তাতে রাত্রের আহারটা বাঁচে। কল্যাণও সুবিধা বুঝে এই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তবে এদের মতো সকালে ভিজে ভাত খায় না, কিছুই খায় না সে। জুটলে কোন দিন কিছু খায়—নইলে একেবারে এই ভাত। রমার গলা দিয়ে এ খাদ্য নামে না—বিশেষত যখন মনে পড়ে কাল দুপুরেও সে দুটো মাছের তরকারি, আলুর দম, এঁচোড়ের ডালনা দিয়ে ভাত খেয়েছে—। তবু সে প্রাণপণে চোখের জল দমন করে খায়। কল্যাণ বেশ সহজে খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু —বরং ভাত একটু বেশিই খেলে সে। অন্যমনস্কভাবে এদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে করতে ফ্যান-সুদ্ধ ভাত, ডাল-ভাতে আর নুন দিয়ে অনায়াসে খেয়ে যাচ্ছে।

ওর দিকে আড়ে চেয়ে চেয়ে রমা লক্ষ্য করে দেখলে, কল্যাণ অনেক রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে। চুলগুলো ওর এমনিই ঝাঁকড়া, রুক্ষ থেকে থেকে জট পাকিয়ে গেছে। মুখের রঙ হয়ে গেছে তামাটে। তবু তার সেই কঠিন কৃশ মুখের মধ্যে, তার রুক্ষ ললাটের ভ্রূকুটির মধ্যে কী যে আকর্ষণ আছে আজও—তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পায় না রমা, শুধু মনে হয় একে হৃদয় না দিয়ে উপায় নেই—এর জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেও সুখ। সে দৃষ্টির নিবিড় ঔদাসীন্যের মধ্যে, চরম নিস্পৃহতার মধ্যে যেন কোথায় একটা সর্বস্ব-বলিদানের আদেশ লুকানো আছে—না দিয়ে উপায় নেই। ওর সমস্ত অন্তর একান্ত কামনায় উদ্বেল হয়ে উঠল, ভাতের গ্রাস সুদ্ধ হাতটা কাঁপতে লাগল থর-থর করে—

রাত্রে ওর ঘুম হ'ল না, তা বলাই বাহুল্য।

খড়ের ওপর চট বিছিয়ে শোওয়া—কিন্তু তাতেও বোধ হয় আটকাত না। যার জন্যে সে জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে, এই অদ্ভুত জীবন-যাত্রা, এই ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে এল—সেই লোকটি ওর থেকে বোধ হয় মাত্র চার হাত দূরে ঘুমুচ্ছে, অথচ তাকে স্পর্শ করবার পর্যন্ত উপায় নেই। ওর সেই রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাবার ইচ্ছা রমার দীর্ঘদিনের—আজ এই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে ওর সান্নিধ্য অনুভব করতে করতে সে ইচ্ছা আরও তীব্র হয়ে উঠল; তবু উপায় নেই, প্রাণপণে নিজের হৃদয়দৌর্বল্যকে দমন ক'রে সে কল্যাণের নিশ্চিন্ত ও নিয়মিত নিশ্বাসের শব্দের দিকে কান পেতে জেগেই রইল সারা রাত।

কিন্তু রমা কাজে নেমে বুঝল যে, এদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা কত নিরর্থক। ও বস্তুটার প্রয়োজনীয়তা ওরা বোঝে না, সে সম্বন্ধে কোন আগ্রহও নেই। যেন মনে হয় রমার নিজেরই গরজ। বহু চেষ্টা করেও সে তিন চারটির বেশি ছাত্র-ছাত্রী পেলে না। প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে নাইট স্কুল করার আশা তো ওর শূন্যে মিলিয়ে গেলই—ছোট ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেও বিশেষ ভরসা পেলে না। যে ক'টি ছাত্র আসে, তারাও প্রকাশ্যে বিড়ি টানতে টানতে আসে। ছ'বছরের ছেলে উলঙ্গ হয়ে ইস্কুলে এল—তারও হাতে বিড়ি, মুখে এক-এক-দিন তাড়ির গন্ধ ছাড়ে।

এধারে তো এই—তার ওপর বিদ্রূপে বিদ্রূপে রমা জর্জরিত হয়ে উঠল। কেউবা প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে যা ইঙ্গিত করে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কল্যাণ তাদের এত করে সৎপথে আনার চেষ্টা করে, দুর্নীতি সম্বন্ধে এত বক্তৃতা দেয়, অথচ শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলে না, একটা মেয়েমানুষ জুটিয়ে আনলে।

রমার মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে এ ইঙ্গিতে—সে নানারকম প্রতিবাদ জানাতে চায়—কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাসই করে না। নীরব অবিশ্বাসের হাসিতে ওকে আরও অপ্রতিভ, আরও আরক্ত করে তোলে। অত্যন্ত উষ্ণ হয়ে ও মধ্যে মধ্যে নালিশ করে কল্যাণের কাছে, কিন্তু কল্যাণ শুধু মুচকি মুচকি হাসে। বলে, 'খোশখবরের ঝুঁটোও ভাল—মন্দ কি!'

রমা যখন খুব রেগে যায় তখন কল্যাণ বলে, 'ওদের কীই বা শিক্ষা, ওরা এর চেয়ে বেশি কী জানে বলো। ওদের ওপর রাগ করা বৃথা।'

রমা তার ইস্কুল সম্বন্ধে মনে মনে হার মানলেও মুখে সে কথা জানাতে পারে না। তাহ'লে ওর এখানে কিছু কাজ থাকে না যে। কিন্তু লক্ষ্য করে যে, তার ক্লাসে না এলেও, মধ্যে মধ্যে কল্যাণ যখন সন্ধ্যাবেলা রামায়ণ মহাভারত

থেকে গল্প বলতে বসে তখন বরং বেশ ভিড় হয়—সবাই বেশ মন দিয়ে শোনে। এমন কি মাতালরা পর্যন্ত।

এই পুরুষগুলোকেই রমার ভয় করে। এদের সম্বন্ধে কল্যাণের ধারণাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রোগশীর্ণ, অনাহারে অপুষ্ট, তবু তাড়ি কিংবা পচাই পেটে পড়ার পর এমন হিংস্র এবং বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চায় ওরা রমার দিকে যে, ওর রীতিমত গা ছমছম করে। তার ওপর সবচেয়ে বিপদ কল্যাণকে নিয়ে—কোথায় কোথায় যে ঘোরে তার ঠিক নেই। প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে যায়, ফেরে ছটো-তিনটেয়। রৌদ্রে ঘুরে যেন ঝলসে আসে—তার ওপর না হয় খাওয়া, না হয় কিছু। আবার আহার সেরেই ও বেরিয়ে পড়ে, রাত দশটা-এগারোটার আগে ফেরে না। এক এক দিন রাত্রে আসেই না, সেই দিন-গুলোই সবচেয়ে ভয় করে রমার। সামান্য একটা আগড় আছে দোরে, ভাল ক'রে বন্ধ করা যায় না,—আর এই তো ভাঙা ঘর, সামান্য একটু আঘাতও সইতে পারবে না বোধ হয়।

আর তেমনি কি হয়েছে কল্যাণ! একটুখানি যত্ন করারও উপায় নেই। ওরই মধ্যে ওর নারী-জাতির সহজাত সংস্কারের বশে, রমা আহারে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করে। কোন দিন বা শাক তোলে বন থেকে, কোন দিন ডুমুর পাড়ে। ডাল সেদ্ধ না খেয়ে ডাল রান্না হয়, তরকারিও হয়। দিন-ছুই এই ভাবে যেতেই কল্যাণ সাবধান ক'রে দিলে, 'উহু—এর মধ্যে যেন গৃহস্থালির একটা আভাস পাচ্ছি! রান্নাতে তৃপ্ত করার মধ্যে আরামপ্রিয়তা আছে খানি-কটা, ওটা কর্মীর সবচেয়ে বড় শত্রু। আরামপ্রিয়তা থেকেই আলস্য আসে। সুতরাং প্রাণ-ধারণের জন্যে যেটুকু দরকার, তার বেশি—'

রাগে ক্ষোভে রমার চোখে জল আসে। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'এটা কি তার চেয়ে বেশি হ'ল বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে বৈকি। এই যে কোথা থেকে একটু তেলও যোগাড় করেছ দেখছি। শাক ভাজলে কিসে? এসব ভাল নয় রমা।'

অগত্যা এ আরামের ব্যবস্থাও বন্ধ করতে হ'ল।

আর একদিন—ছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর ঠিক বেলাছুপুরের সময় কল্যাণ ফিরল। ওর দৃষ্টি অবসন্ন, মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। সেদিকে চেয়েই রমা বুঝল ওর খাওয়া হয় নি। বৈশাখের খর রৌদ্র মাঠে অগ্নিবৃষ্টি করছে, তারই মধ্যে দিয়ে অস্নাত উপবাসী লোকটা কত মাইল সাইকেল চালিয়ে এল কে জানে। ও স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেল নিমেষে, ওর অন্তরের চিরন্তনী নারী সাড়া দিয়ে উঠল। সে উঠে এসে জোর ক'রে ওর হাত ধরে বসালো,

তারপর নিজের আঁচল দিয়ে ওর কপাল গলা মুখের ঘাম মুছে নিয়ে পাখার অভাবে একটা খাতা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। মিনিট-ছুই নির্জীবের মতো অবসন্নভাবে সে সেবা গ্রহণ করল কল্যাণ, সেটা তখন এত প্রয়োজন যে, নিষেধ করার ক্ষমতা পর্যন্ত ওর ছিল না, তারপর কিন্তু খাতাসুদ্ধ ওর হাতটা চেপে ধরল। কল্যাণের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন-বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। এখন চোখ খুলে হেসে বললে, 'হঠাৎ যেন নর-নারীর আদিম-সম্পর্কটা মাথা তুলে দাঁড়াল রমা। এ রকম তো কথা ছিল না।'

অপমানে, বেদনায় রমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা হ'ল। সে ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দিলে. 'মোটেই না, এটা হ'ল হিউম্যানিটেরিয়ান্ ইন্‌স্টিংক্‌ট্। যে কেউ থাকলেই করত।'

'না বন্ধু। পুরুষ-বন্ধুরা অন্তত করত না, এটা ঠিক।'

'না, তাও করত।' কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলল রমা, 'তোমার বড় সন্দিগ্ধ আর ছোট মন।'

ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল। কল্যাণ অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না, তা নয়। তবে কি জানো, এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই কর্মীর মনে চিরকালীন নারী জেগে ওঠে, তখন কাজটা যায় পিছিয়ে—রোম্যান্সটা হয়ে ওঠে বড়। রিস্‌ক্ নেবার দরকার কি।'

সুতরাং প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে হয় রমার। এক ঘরে বাস করে, মাত্র চার হাত ব্যবধানে রাত্রি কাটায়, তবু স্পর্শ করা তো দূরের কথা, একটু সেবা পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ ওর ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত অন্তর রমার আকুলি-বিকুলি করে, তন্দ্রাহীন চোখের পল্লব বেয়ে অশ্রান্তভাবে জল ঝরে পড়ত থাকে।

হঠাৎ একদিন কল্যাণ সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে এল। সেটা আগস্ট মাস—গুমোট গরমে আকাশসুদ্ধ যেন ভারী হয়ে আছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রমার বহু পরিবর্তন হয়েছে—জীবন সম্বন্ধে আশা ও আদর্শ সব কিছু গেছে ওর, তবু কল্যাণকে ছেড়ে ও না পারে নড়তে, না পারে মরতে, এখন শুধু এই অবস্থা। মানসিক জড়তা ও অবসাদে যেন ভেঙে পড়েছে, সেটা কোনমতে কল্যাণের কাছে গোপন রাখে।

তবু কল্যাণকে এমন অসময়ে ফিরতে দেখে ও বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে চাইল, 'কী ব্যাপার, এমন অসময়ে যে।'

কল্যাণ ওর পাশেই বসে পড়ে বললে, 'রমা, সর্বনাশ হয়েছে। গবর্ণমেন্ট গান্ধীজি, আজাদ, নেহরু, ওঁদের সব গ্রেপ্তার করেছে, ফলে চারিদিকে একটা

আগুন জ্বলে উঠেছে। জনসাধারণ তো বিপ্লবের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেই, আমাদের কয়েকজন কর্মীও সেই নেশায় মেতে উঠেছে। রজনী, ফণী, ওরা কেউ আর নেই। চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি চললুম। যদি আর না ফিরি—'

'তার মানে ?' অকস্মাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠল রমা।

'মানে, আমাকেও তো গ্রেপ্তার করতে পারে। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের নামে কাজ করছি, আমাকেও ঐ দলে ফেলা আশ্চর্য নয়। তাহ'লে তুমি যেমন ক'রে পারো কলকাতায় ফিরে যেয়ো। এখানে থাকা তোমার নিরাপদ নয় রমা—আমি আছি বলে এরা চুপ ক'রে আছে, ওরা শুধু আমাকেই ভয় করে।'

অভিভূত আচ্ছন্নের মতো রমা বললে, 'তার পর ?'

'তার পর আর জানি না। অত ভবিষ্যৎ কখনও ভাবি নি। যা উচিত মনে হয় তাই ক'রো। আমি চললুম।'

'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' আকুল হয়ে প্রশ্ন করে রমা।

'আমি যাচ্ছি ওদের ফেরাতে। এ আমাদের আদর্শ নয়—এতে আমাদেরই সর্বনাশ হবে—এইটেই বোঝাতে চেষ্টা করব ওদের—না হয় প্রাণ দিয়েও বাধা দেব।'

আর কোন প্রশ্ন ওঠবার আগেই কল্যাণের সাইকেল দূর মাঠের পথে মিলিয়ে গেল।

সারারাত উদ্বিগ্ন মুখে সেই অন্ধকারেই মাঠের দিকে চেয়ে বসে রইল রমা, কিছু দেখা যায় না, তবু প্রাণপণে চেয়ে থাকে। ওর ভেতরটা তো পাথর হয়ে গিয়েছিলই, বাইরেও যেন আজ আর কোন সাড়া নেই।···

একেবারে ভোরের দিকে দূরে কাদের দেখা গেল বিন্দুর মতো।

ক্রমে ক্রমে সেই বিন্দুগুলো বড় হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, মানুষই, অনেকগুলো মানুষ। কাকে যেন বয়ে নিয়ে আসছে। আর আসছে এ দিকেই।

সর্বনাশের পূর্বাভাস জেগেছিল রমার রক্তের মধ্যে, জেগেছিল ওর নিশ্বাসে। তবু ও ছুটে গেল।

ঝুলিয়ে আনছে ওরা কল্যাণকেই। সদর কলেক্টরির আগুন নেভাতে গিয়ে ভুল-ক্রমে পুলিসের হাতেই গুলি খেয়েছে, তারা অন্ধকারে বুঝতে পারে নি। চিন্তার কোন কারণ নেই, ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। গুলিটা বার ক'রে দিলেই—

কল্যাণ চোখ চাইলে যখন, তখন প্রথমেই চোখে পড়ল রমার মুখ ঝুঁকে

আছে ওর মুখের দিকে। অনিমেষ বজ্রাহত দৃষ্টি। আজ আর তার কোন সঙ্কোচ নেই, রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে আঙুল চালিয়ে জটগুলো শিথিল করবার চেষ্টা করছে সে, মাথাটা তুলে নিয়েছে নিজের কোলের ওপর।

কল্যাণ একটু হাসল। জড়িয়ে জড়িয়ে থেমে থেমে বলল, 'রমা, ভয় পেয়েছ, না? তুমি বড় অসহায় হয়ে পড়লে! কিন্তু তুমি অবশ্য বাড়ি ফিরে যেয়ো। বাবা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন, তুমি তো কোন ছোট কাজ কর নি। পারো তো বিয়ে করে সুখী হয়ো।...আমি বড় স্বার্থপর রমা—নিজের জন্যেই তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, হয়ত বা তোমার জীবনটাই নষ্ট ক'রে দিলুম।... আমি জানতুম যে এখানে তোমার দ্বারা কোন কাজ হবে না, এখানে তুমি আসছ আমার জন্যেই, তবু তোমাকে টেনে এনেছিলুম।—কেন, জান রমা?'

ভোরের আলোয় ওর বিবর্ণ রক্তহীন মুখের সেই একঝলক রক্তাভা পরিষ্কার দেখা গেল। সে আরও চুপিচুপি বললে, 'আজ আর লজ্জা করব না, স্বীকার করেই যাই,—আমিও তোমার সাহচর্য কামনা করেছিলুম মনের অবচেতনে। কঠোর হয়েছি, তপস্যা করেছি, তবু তোমাকে ভুলতে পারি নি রমা, কাছে রাখবার লোভও সামলাতে পারি নি।...ঈশ্বর আজ বোধ হয় সেই শাস্তিই দিলেন।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে শ্রান্ত কল্যাণ চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ।

কে যেন বললে কোথায়, 'ডাক্তার কেন এল না এখনো?'

আর একজন তার উত্তর দিলে, 'তিন মাইল পথ যাবে, খবর দেবে, তবে তো তিনি আসবেন—!'

কল্যাণ আবারও চুপিচুপি বললে, 'বাড়িতে ফিরে যেয়ো রমা, জীবনটা নষ্ট ক'রো না।'

তারপর যেন গভীর ক্লান্তিতেই ওর চোখের পাতা বুজে এল!

কে জানে এ ঘুম কিনা। নিশ্বাসের শব্দও যেন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু তখনও এসে পৌঁছন নি!

সামান্য পথ

সমস্তক্ষণই জেগে জেগে বই পড়েছি, হাতে ছিল বিলিতী ভূতের গল্প—ঘুম পাবার কথাও নয়, তবু বোধ করি দৈবের ষড়যন্ত্রেই, একেবারে শেষ মুহূর্তে কখন চোখ দুটি বুজে এসেছে—কিছুই টের পাই নি। আর অজস্র গল্পের

প্রথম তন্দ্রা বলেই হয়ত—এমন গভীর ভাবে ঘুমিয়েছি যে, জংসন স্টেশনের গোলমালেও ঘুম ভাঙে নি। একেবারে যখন চমক ভাঙল তখন পরের স্টেশন থেকেও ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম একটি সহযাত্রীকে, 'কী স্টেশন এটা?'

নাম বলতেও বুঝতে পারলাম না।

'জংসনের আর কত দেরি?'

'জকৃশুন্? উ তো কব্ চলা গিয়া।'

নাম্ নাম্। হুইস্ল্ দিয়েছে গার্ড, গাড়িও চলতে শুরু করেছে। ভাগ্যিস ছোট একটি অ্যাটাচি কেস ছাড়া আর কিছু ছিল না সঙ্গে—কোনমতে ঘুম-চোখেই চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম।

যাক বাবা—ভাগ্যিস হাত পা ভাঙে নি।

কিন্তু এ কোথায় এলাম। একেবারে ছোট্ট নগণ্য স্টেশন। জনপ্রাণী নজরে পড়ে না। আর তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা কেরোসিনের আলোও কি কোথাও জ্বালতে নেই।

ততক্ষণে উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় ঘুম ভেঙে গেছে ভালমতোই। তাকিয়ে দেখলাম টিকিট ঘরের খুপরি থেকে একটা আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে বটে। তবু ভাল, ওখানে অন্তত গাড়িটাড়িগুলোর হদিশ মিলবে।

নক্ষত্রের আলোতে চোখ তখনও অভ্যস্ত হয় নি, কোনমতে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সেই মাটির-সঙ্গে-মিশে-থাকা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে তো স্টেশন-ঘরের কাছে এলাম—কিন্তু ও হরি, এ কি। দোরে যে চাবি দেওয়া। টিকিটের খুপরি দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ঘরে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে বটে—যৎপরোনাস্তি কমানো আছে পল্‌তেটা, কিন্তু মানুষের কোন পাত্তা নেই। গাড়ি আসার সময়ও মাস্টারবাবু ছিলেন কিনা সন্দেহ—গার্ডের সঙ্গে অনেক সময় বন্দোবস্ত থাকে এসব ফ্ল্যাগ স্টেশনে, গার্ডই গাড়ি ছেড়ে দেন নিজের দায়িত্বে—আর থাকলেও গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে পড়েছেন।

তাই ত, এখন উপায়?

কোয়ার্টার আছে একটা, কিছু দূরে, কিন্তু সেখানেও আলো নেই। মাস্টার-বাবু (উনিই বোধ হয় টিকিটবাবু—এক এবং অদ্বিতীয়) ওখানে থাকেন কিনা কে জানে—হয়ত এই গ্রামেই বাড়ি, রাত্রে বাড়িতে চলে যান। সাধারণতঃ স্টেশনের পাশে দু-একটা খাবারের দোকান থাকে, 'দুধ দহি'র দোকান তো এখানে অনিবার্য কিন্তু আমারই অদৃষ্টক্রমে বোধ হয়, এখানে সে সব কিছুই দেখলাম না।

উত্তর প্রদেশের এই উত্তর দিকটায় আমি কখনও আসি নি এর আগে। এখানে পথ-ঘাট ট্রেন-বাস সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। এক্ষেত্রে কি করা উচিত, কাছাকাছি কোন গ্রাম থাকলেও না হয় গিয়ে রাতটার মতো আশ্রয় নেওয়া যেত কোন গৃহস্থের বাড়ি। তাও ডাকাত মনে ক'রে আশ্রয় দিত কিনা সন্দেহ।···সে যাই হোক—গ্রামও তো দেখা যায় না।···হয়ত আশে-পাশেই কোথাও আছে কিন্তু এমনই অন্ধকার যে মাঠে বনে গ্রামে সব একাকার হয়ে গেছে, বোঝবার কোন উপায়ই নেই।

অগত্যা এই প্ল্যাটফর্মেই ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম। যা নির্জন চারিদিকে—ভয় হতে লাগল—বাঘ টাঘ নেই তো? হায়েনা বা নেকড়ে থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া বসিই বা কোথায়। না আছে একটা বেঞ্চ, না আছে কিছু। স্টেশন ঘরের সামনে যদি একটা বাঁধানো ধাপ থাকত তো না হয় সেখানেই বসতাম, তাও যে নেই।

ইতস্তত করছি এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে সহসা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আপ কাঁহা যাইয়েগা বাবু?'

যেন মনে হল চারিদিকের অন্ধ আকাশই কথা কয়ে উঠল।

চমকে, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম, 'কে—কে—কৌন হ্যায়?'

এইবার লোকটিকে দেখা গেল। যদি বলি সেই তমিস্রঘন মহাশূন্য থেকেই লোকটি ছায়ামূর্তি পরিগ্রহ ক'রে প্রকট হ'ল—তাহ'লেও খুব ভুল বলা হয় না। এমনিই আকস্মিক আবির্ভাব সে লোকটির।

মিশ কালো রং, রেলের একটি নীলচে-কালো রঙের কোট গায়ে, পরনের ধুতিটাও বোধ হ'ল রঙীন—বড় বড় চুল এবং ঘন চাপ গোঁফদাড়ি। অথচ বৃদ্ধ নয়—মনে হ'ল মানসিকের চুল দাড়ি। সেই রকমই অযত্ন-বর্ধিত—এলোমেলো।

এতই কালো যে সেই অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের আলোতে চোখটা সয়ে এলেও, তার মুখ চোখ কিছুই ঠাওর হ'ল না। শুধু কপালে বোধ হয় একটা সাদা চন্দনের ফোঁটা—আর কথা কইবার সময় সাদা ঝকঝকে দাঁত মাত্র দেখা যাচ্ছিল।

সে লোকটি দু-হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে, 'হ্যম্ পোর্টার হ্যয় বাবু।'

'পোর্টার হ্যয়! কাঁহা গিয়া থা—একো আদমিকা পাত্তা নেহি মিলতা!' কিছুক্ষণ পূর্বের আতঙ্কের সঙ্গে রাগ মিশে দস্তুরমতো উষ্ণ হয়ে উঠেছি—প্রায় খিঁচিয়ে উঠলাম।

সে তখন পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে জবাব দিলে যে, সে গ্রামে তার ভাতিজার

বাড়ি খেতে গিয়েছিল। তাছাড়া এখন তার ডিউটি নেই।

কতকটা শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'বাপু এখান থেকে জংসন কতদূর হবে?'

'জংশন্?' সে মনে মনে হিসেব করে বললে, 'করীব সাত আট মিল হোগা বাবু সাব!'

সাত আট মাইল?

দমে গেলাম।

'তা বাপু যাবার গাড়ি কটায়?'

'গাড়ি এখন কোথায় বাবু—সেই ভোর চারটেয়।'

সর্বনাশ! আমি ওখান থেকে বড় লাইনের যে গাড়ি ধরব সে যে রাত তিনটেয়। এ গাড়ি না পেলে কাল বিকেল পর্যন্ত বসে থাকতে হবে।

ঘড়িটা দেখবার চেষ্টা করলাম। পকেটে একটা দেশলাইও নেই। টর্চটা ভেঙে গেছে সেদিন পকেট থেকে পড়ে গিয়ে, আর কেনা হয় নি। নক্ষত্রের আলোয় দেখা কি যাবে? ভাগ্যিস্ আধুনিক বাহারি ঘড়ি নয়—

যতদূর দৃষ্টি গেল—বোধ হয় রাত দশটা হবে। এখন থেকে চুপ ক'রে বসে থাকব? সাত আট মাইল বলেছে—মনে মনে হিসাব করলাম—হয়ত দশ মাইল হবে। এদেশের ডালভাঙা ক্রোশ। তাহলেও হেঁটে যেতে তিন ঘণ্টার বেশী লাগবে না। অর্থাৎ রাত একটার মধ্যে জংশনে পৌঁছে যাব। মিছিমিছি চব্বিশ ঘণ্টা মাটি করব?

না। সেই ভাল। এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে জবুথবু হয়ে সারারাত বসে থাকা কিছু নয়। তখন আমার জোয়ান বয়স—নিষ্ক্রিয়তাই সব চেয়ে খারাপ লাগত।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই লাইন ধরে যেতে হবে, না অন্য রাস্তা আছে? বাঘটাঘের ভয় নেই তো বাপু? কিংবা ডাকাত?'

সে একটু চিন্তা ক'রে জানালে যে, সে যতদূর জানে শেরটেরের ভয় নেই। ডাকুর কথাও তো শোনে নি।...কিন্তু আর একটা পথ আছে এই কোণা-কুণি মাঠের মধ্যে দিয়ে, সে পথ দিয়ে যদি যেতে পারি তো রাস্তা প্রায় আধা কমে যাবে।

বিলক্ষণ, তাহ'লে তো বেঁচে যাই। ঘণ্টাখানেক কি বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক হাঁটা কিছুই নয়।

'নিশ্চয়ই যাব।' যতদূর জানা ছিল হিন্দিতে উত্তর দিলাম, 'তা বাপু যদি-যেতে-পারি বলছ কেন? কোন খতরার ভয় আছে?'

'না, তেমন কিছু নয়। ঐ যে মাঠটা দেখছেন, ঐ মাঠের শেষে একটা

জঙ্গল পড়ে। পথ আছে কিন্তু সে ঐ জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই পথ। এমন কিছু লম্বা জঙ্গলও নয়—বড় জোর আধা মিল হবে। জঙ্গল পেরিয়ে আবার একটা মাঠ আছে এমনি, তারপরই জকৃগুন্।

'তা জঙ্গলে ভয়টয় কিছু আছে নাকি ?'

'না। তেমন কিছু নয়। থোড়া জঙ্গল। শেরটের কিছু নেই।'

'তবে ভয়টা কিসের ? ভূতের ?'

'সীয়ারাম বাবু। ভূত কোথায় ?'

তখন একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলি, 'তবে ব্যাপারটা কি খুলে বলই না বাপু। কেবলই তো বলছ তেমন কিছু নয়।'

'না। কী জানেন—বান্দরের বড় উপদ্রব বাবু। তাই বলছিলুম যে ওপথে যাবেন, না সিধা লাইন ধরবেন ?'

বানর।

হে ভগবান। লোকটা কি পাগল নাকি। আরে এই উত্তর অঞ্চলে বানর নেই কোথায় ?

খুব জোরেই হেসে উঠলাম।

'বানরের ভয়। বানর আমার কি করবে ? ব্যাগটা কেড়ে নেবে ? তা পারবে না। না হয় একটা গাছের ডাল-টাল ভেঙে নিচ্ছি।'

লোকটা যেন চটেই গেল একটু, 'আপনি বান্দরকে অত উড়িয়ে দেবেন না বাবু। লঙ্কার রাজা দশানন বান্দরকে গ্রাহ্য করে নি, কারণ কি সে বান্দর ধরে খেত—সেই বান্দরের কাছেই হেরে গেল। মারাও গেল ধরতে পারেন—বান্দরের সাহায্য না পেলে কি রামচন্দ্রজী ওদের মারতে পারতেন ?'

'না না। অগ্রাহ্য করব কেন ?' সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'তা ছাড়া আমি তো ওদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি না, ওদের সঙ্গে কোন শত্রুতাও নেই। আমি যাব আমার পথে, ওদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কি ?'

আর বাদানুবাদের অবসর দিলাম না।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে স্টেশন পেরিয়ে সেই পায়ে-চলা পথ ধরে রওনা দিলাম। এতক্ষণে অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে চারদিক। যে দিকটা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা ভুল হবার নয়—দিকচক্ররেখায় বনের কালো ছায়াটাও দেখতে পাচ্ছি। বেশ হন্ হন্ করেই হাঁটতে লাগলাম। যখন অত বানর আছে বনে তখন বাঘ নেই এটা ঠিক। বাঘ বা ঐ জাতীয় কোন হিংস্র জন্তু থাকলে অত বানর থাকতে পারত না।

সে পোর্টারটিকে, যখন আমি রওনা হই, তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখেছিলুম সেইখানেই। খানিক পরে যখন ফিরে তাকালুম—তার আর চিহ্নও নেই। যেমন বাতাস থেকে ফুটে উঠেছিল তেমনি বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

গাছের ডাল ভেঙে নেওয়া হয়ে ওঠে নি—কারণ পথে কোন গাছই পাই নি। ফসল-উঠে-যাওয়া রিক্ত মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘাস পর্যন্ত বিরল সেখানে। জঙ্গলে ঢোকবার ঠিক মুখে গোটা কতক বড় বড় মাটির ডেলা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরলুম। এখানকার মাটি প্রায় পাথরের মতোই শক্ত, গায়ে লাগলে আঘাত পাবে যে-কেউ। যদি সত্যিই রামচন্দ্রের অনুচররা খুব জ্বালাতন করে তো দুই একটা ছুঁড়ে এবং বাকি ছোঁড়বার ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে।

জঙ্গল এমন কিছু ঘন নয়। বাব্‌লা গাছই বেশি, দু-একটা অন্য কি গাছ আছে! আম গাছও আছে কিছু কিছু—মধ্যে মধ্যে এক এক জায়গায় অনেক গুলো করে। সেই সব 'পকেট'গুলো কিছু বেশী অন্ধকার, নইলে অন্য জায়-গায় রাস্তা ও তার দুপাশ বেশ ভালই দেখা যাচ্ছিল। এদেশের জঙ্গলে নিচে আগাছা থাকে না বলে খুব ঘন জঙ্গলকেও যথেষ্ট বনময় বলে বোধ হয় না।

অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। বেশ হন্ হন্ করেই চলেছি কারণ জঙ্গলটা যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। কতক্ষণই বা লাগবে, পাঁচ সাত মিনিট—বড় জোর দশ।

কিন্তু বানর কোথায়?

একটা কোন প্রাণীরও তো চিহ্ন দেখছি না। লোকটা খামকা ভয় দেখিয়েছে। বানর যতটা থাকা উচিত এদেশের গাছপালায়—ততটাই তো নেই। থাকলেও তারা ঘুমুচ্ছে। মনে মনে রাগ হ'ল লোকটার ওপর। আর একটু হ'লেই ভোগাচ্ছিল। বেশ বুঝতে পারলুম যে হঠাৎ এই 'শর্টকাট'টার কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মানুষের মনে অপর মানুষকে ভোগাবার যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকে সেই প্রবৃত্তি ওকে ধিক্কার দিয়ে ওঠায় ও এই 'কিন্তু'র জেরটা টেনেছিল।

বদমাইস পাজী কোথাকার!

আর একটু হলেই আরও মাইল পাঁচেকের ফেরে ফেলেছিল লোকটা!

কিন্তু এই সব কথা যখন ভাবছি, তখনও চলছি সমানেই—এটা ঠিক। আন্দাজে মনে হ'ল মিনিট দশেক কেটে গেছে বহুক্ষণ। যে 'রেট'-এ হাঁটছি দশ মিনিটে আধ মাইল কেন—এক মাইলই-পার হয়ে যাবার কথা। কত গজে মাইল হয় এদের! এ দেখছি সেই ডালভাঙা ক্রোশের প্যাঁচেই পড়েছি।

তবে—ভরসার মধ্যে এখনও আমার ক্লান্তি আসে নি একটুও। বেশ

অনায়াসেই চলেছি। সেই জন্য মনে অসন্তোষও জমে নি। কতটাই বা হবে—এখনই পেরিয়ে চলে যাব।

কিন্তু আরও অনেকক্ষণ হাঁটলাম। অন্তত আরও মিনিট দশেক। কই বনের শেষ কোথায়? দূর মাঠের আলোও তো দেখা যায় না।

আরও পাঁচ মিনিট।

না, এইবার হাঁপিয়ে গিয়েছি। ধূমপানের অভ্যাস নেই, নইলে অনেক আগেই হাঁপিয়ে পড়তুম।···থমকে দাঁড়ালুম একটু। ঘড়িটা দেখবার চেষ্টা করলুম—এত আলো নেই যে, ভালো বোঝা যায়। তবু মনে হ'ল এগারটা বেজে গেছে বহুক্ষণ। তার মানে অনেক হেঁটেছি। একটু কোথাও বসতে পারলে হ'ত, গাছতলায় বসব নাকি?···কেমন একটু যেন ভয় ভয়ও করে। যা নিস্তব্ধ থমথমে বন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একবার ফিরে তাকালুম।

পিছনের মাঠও যে কোথায় মিলিয়ে গেছে! কিছুমাত্র আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক কোন্ দিকে স্টেশন বা মাঠটা ছিল! চরিদিকে শুধু নিবিড় ঘন বন—প্রাণ-স্পন্দনহীন—নিস্তব্ধ!

এইবার একটা সংশয় এবং আতঙ্ক ধীরে ধীরে মনে দেখা দিল। পথ গুলিয়ে ফেলি নি তো? হয়ত কোন চক্রপথে অবিরাম ঘুরছি তাই বন আর শেষ হচ্ছে না।

সর্বনাশ! গোলকধাঁধায় পড়লুম নাকি!

লোকজনের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই যে চিৎকার ক'রে ডাকলে এসে উদ্ধার করবে। দিনের আলো না ফুটলে কোন উপায়ই হবে না। তাও কি হবে?

ভয়ে হতাশায় হাত-পা যেন ভেঙে এল। ডাক ছেড়ে খানিকটা কাঁদতে পারলে খুশী হতুম।

আচ্ছা—পথ ভুলই বা হবে কি করে? যতদূর মনে পড়ছে মাঠ ছেড়ে বনে ঢুকে এই একটি পথই দেখেছি, ডাইনে বাঁয়ে আর কোনদিকে হেলেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। আর কোন পথও তো ছিল না। তখন যেন মনে হচ্ছিল সোজা বনটাকে দ্বিধা-বিদীর্ণ করে রাস্তাটা চলে গেছে।

তবে?

এই সময় একটা সিগারেট কি অন্তত খানিকটা নস্যির অভাব খুব বেশি রকম অনুভব করতে লাগলুম। একটা কিছু নেশা করতে পারলে খানিকটা আশ্বাস পেতুম।

বসব নাকি? আর দাঁড়াতে পারছি না।

বসাই যাক। চেয়ে দেখলুম একটা আম-গাছের নিচেই দাঁড়িয়ে আছি। যাক, কাঁটা গাছ তো নয়—বেশ আরাম ক'রে ঠেস দিয়েই বসলাম।

কী অন্যায়ই করা গেছে—ঐ সামান্য একটু তন্দ্রার খেসারত যে এতখানি দিতে হবে তা কে জানত। নিদেন স্টেশনে বসে থাকলেও হ'ত, ভোরের গাড়িতেই চলে যেতুম। তবু সে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের জগৎ—এমন ভয়াবহ নির্জন বন নয়।

কী বিপদে পড়লাম এবং কেমন ক'রে এ থেকে অব্যাহতি পাব ভাবছি—বেশ একটু ব্যাকুল ভাবেই ভাবছি—তাই হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। তবে ঘুমুইনি এটা ঠিক, চোখও বুজি নি। কিন্তু হঠাৎ যেমন খেয়াল হ'ল যে এবার ওঠা দরকার, এর পর বসে থাকলে ঘুমিয়েই পড়ব, তাছাড়া বেরোবার চেষ্টা করা উচিত আর একবার—মুখ তুলে চারিদিকে তাকিয়ে—চমকে শিউরে উঠলুম।

এ কি!

আমার চারিদিকে, আমাকে ঘিরে—বহু দূর দূরান্তর পর্যন্ত যেখানে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, যতটা দৃষ্টি যায়—শত শত, সহস্র সহস্র—হয়ত বা লক্ষ লক্ষ বানর! নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তাকিয়ে আছে কিনা তা অবশ্য ঠিক দেখি নি, কিন্তু কেমন যেন আমার মনে হ'ল সেই মুহূর্তে—এরা আমার দিকে তাকিয়েই আছে।

এ কি, আমি চোখে ভুল দেখছি না তো?

এ কি মায়া, আমার আতঙ্কে কল্পনা করছি সবটা?

ভাল ক'রে চোখ মেলে চাইলাম—যতটা সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে। না—ভুল নয়। চিমটি কাটলাম নিজের পায়ে খুব জোরে—না, সমস্ত অনুভূতিই ঠিক আছে। ঐ তো একটার গা ঘেঁষে একটা—পর পর যেন নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র ব্যূহ রচনা ক'রে বসে আছে। একেবারে নিঃশব্দে—

কখন এল ওরা?

কোথা দিয়ে এল?

একটা গাছের ডাল নড়ার শব্দও তো পাই নি, পাই নি "ধুপ্‌" করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ। অথচ এত কাছে—ডাইনে বাঁয়ে সামনে, পিছনেও খুব সম্ভব, এক বিঘৎ নড়লেই গায়ে গা ঠেকবে।

কী বিপদ! এদের মতলব কি?

কামড়াবে নাকি? এতগুলো বানর—ইচ্ছে করলে নিমেষে টুকরো টুকরো ক'রে দিতে পারে। ভয়ে যেন বিবশ হয়ে এল সমস্ত স্নায়ু—হাত পা ঝিম্ ঝিম্

করতে লাগল।

আর অমন নিশ্চল হয়েই বা বসে আছে কেন? একটু কিচকিচ করলেও তো বাঁচতাম।

একটা অজানা ভয় যেন মৃত্যু-শীতল হিমস্পর্শ নিয়ে মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেল।

কী করব? কী করা উচিত?

এমন ক'রে বসে থাকলে পাগল হয়ে যাব যে!

হা-হা করে হেসে উঠলাম। যেন কতকটা নিজের মনে সাহস আনবার জন্যেই। তাছাড়া ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও দেখা বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল।

কিছুই হ'ল না কিন্তু। তেমনি নিশ্চল স্থির হয়ে বসে আছে। তেমনি একদৃষ্টে চেয়ে।

আচ্ছা ওগুলো পাথরের নয় তো? কিংবা মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে যেমন —অসংখ্য হরিণ—তেমনি কিছু নয়?

এগিয়ে যাবো নাকি? ঠেলে পথ ক'রে নিলে কি হয় ওদের মধ্যে দিয়ে?

অসীম সাহসে ভর ক'রে প্রাণপণ চেষ্টায় একবার মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম সামনের বানরটার কাছে। না, পাথরের তো নয়, ঐ তো চোখ পিট্ পিট করছে। তবু নিঃশ্বাসের শব্দ হয় না কেন? এতগুলো প্রাণীর নিশ্বাসের আওয়াজও তো কম হবে না।

না—যেতেই হবে আমাকে। আমি বিংশ-শতাব্দীর সভ্য মানুষ, বুনো বানরকে ভয় করব?

উঠে দাঁড়ালুম।

সে যে কী সাধনা, ঐটুকু দেহ নাড়বার জন্যে। কি চেষ্টায় যে সেটা সম্ভব হ'ল তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। শুধু আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুতে নড়াতে পারত না তখন, ভয় এমনই পেয়ে বসেছে আমাকে। উঠে দাঁড়াতে আরও অনেকখানি দৃষ্টিগোচর হ'ল। সর্বত্রই ঐ এক। কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নেই। প্রায় এক আকারের গোদা গোদা রূপী বানর। একটার গায়ে গা ঠেসিয়ে আর একটা।

এত বানর পৃথিবীতে আছে?

এগোবার চেষ্টা করলুম। একটা পা ফেললুমও—কিন্তু ওরা তেমনি নিশ্চল। এমন শান্ত নিস্পন্দ বিরোধিতা এর আগে আর কোথাও দেখি নি।

ঠিক ওদের গায়ে পা ঠেকাতে ভরসায় কুলোল না কিছুতেই। অথচ—

অথচ এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব কি ক'রে ?

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হ'ল। লোকটার কথা শুনলে কি ক্ষতি হ'ত আমার! এই দেশেরই লোক, সব জানে শোনে!

'হেই! এই যাঃ! হ্যাট্!'

মুখে গরু তাড়াবার মতো শব্দ করলুম। ফল পূর্ববৎ! মনে পড়ল পকেটের মাটির ডেলার কথা। দু-একটা ছুঁড়ব নাকি ? যদি রেগে সবাই মিলে আক্রমণ করে ?

করুক। না হয় মরেই যাবো। কিন্তু এ অবস্থা যে অসহ্য।

ছুঁড়লাম একটা মাটির ডেলা। আর একটা, আর একটা। পাগলের মতো যে ক-টা ছিল নিঃশেষ করলাম। পাগল হয়েই উঠেছিলাম বোধ হয়। কিন্তু কিছুই হ'ল না—এমন কি ঢিলগুলো গায়ে লাগার মতো শব্দও হ'ল না। আর ওরাও নির্বিকার।

আচ্ছা—ভূত নয় তো ? ভূতে ভয় দেখাচ্ছে ?

রাম নাম করব ?

'রাম, রাম, রাম।' বার কতক রাম নামই করলাম, বেশ চেঁচিয়ে।

এইবার ফল একটা ফলল। তবে যা আশা করেছিলাম তার বিপরীত।

হঠাৎ মনে হ'ল সেই বানর বাহিনী—বাহিনী না ব'লে বোধ হয় কটক বলাই উচিত—সেই লক্ষ লক্ষ বানর একসঙ্গে হেসে উঠল। নিঃশব্দ হাসি—মানুষের মতো। হয়ত তখন ভুল দেখেছি কিন্তু নিশ্চিত মনে হ'ল—ওদের সেই কোটি কোটি ঈষৎ হলদে দাঁত আধো-অন্ধকারে আমার দিকে চেয়ে বিকশিত হয়েছে এবং ওদের স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি বিদ্রূপ আর উপেক্ষার হাসি হাসছে। কিন্তু নড়ে নি কেউ, সংখ্যাও কমে নি—বরং মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই তারা বাড়ছে।

চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রাণপণে—এইটুকু শুধু মনে আছে। আর কিছু মনে নেই।

যখন আবার অনুভূতি ফিরল তখন দেখলাম একটা মাঠেই শুয়ে আছি। দূরে গ্রাম, রেলের লাইন, সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় ঐ সেই জংশন।

খানিকটা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম জ্ঞান আমার এমনি হয় নি। দুটি হিন্দুস্থানী লোক লোটা হাতে দাঁড়িয়ে, আমার মুখে মাথায় জল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম অনেক পিছনে সেই বনের রেখা।

'বাবুজী এখন কেমন বোধ করছেন ?'

সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী—তবু কী স্নেহ ও উদ্বেগ তাদের কণ্ঠে। মনে হ'ল প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

ঘাড় নেড়ে জানালাম, ভাল বোধ করছি। উঠে দাঁড়ালামও। ঐ যে য়্যাটাচি কেসটাও পড়ে আছে দেখছি।

'কেমন করে এমন হ'ল বাবুজী? এখানে এলেন কোথা থেকে? বাড়ি কোথায়? মূর্ছার অসুখ আছে না কি?' ইত্যাদি সহস্র প্রশ্ন। এ কৌতূহল স্বাভাবিক। রাগ হ'লেও যুক্তিতে সে রাগ দমন করলুম। সংক্ষেপে বললুম সব কথা।

বৃদ্ধটি যেন শিউরে উঠল, 'বাবুজী ঐ বনের মধ্যে দিয়ে আপনি এসেছেন? কী সর্বনাশ!'

'কেন বলো তো? কি আছে ও বনে?'

'মাফ কিজিয়েগা বাবু!' বুড়ো আর দাঁড়াল না, দু হাত তুলে, বোধ করি কোন দেবতার উদ্দেশে—হয়ত বা ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশেই, প্রণাম জানাল—তারপর দ্রুত গ্রামের পথ ধরল।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স যেটির, সে স্টেশনটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'ওহি জক্‌স্যন্ হায়, চলে যাইয়ে।'

সেও দ্রুত বৃদ্ধের পশ্চাদ্ধাবন করল। এত তাড়াতাড়ি চলে গেল ওরা যে, কিছুতেই আমি এই দুর্বল শরীরে ওদের আর ধরতে পারলুম না।

অগত্যা স্খলিত দুর্বল পদে জংশনের পথই ধরলুম। রহস্যটা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেল আমার কাছে। জংশনেও দু-একজনকে প্রশ্ন করেছি, কেউ বিস্মিত হয়েছে, কেউ নিরুত্তরে হাত তুলে প্রণাম ক'রে ওদেরই মতো সরে পড়েছে।

ঈশ্বরের লজ্জা

অনন্ত। সীমাহীন মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র ও গ্রহ, পরস্পরের সহিত কোটি কোটি যোজন ব্যবধান রচনা করিয়া বিরাজ করিতেছে। কোনটা সূর্যের দশ গুণ বড়, কোনটা বা লক্ষ গুণ। কোন নক্ষত্রের গ্রহ আছে—কেহ বা সঙ্গিহীন। কোথাও প্রাণীজগৎ আছে—কোথাও জীবলক্ষণ-মাত্র নাই।

এই মহাশূন্যের মধ্যেই অসংখ্য ভাগ আছে। তার মধ্যে কতগুলি স্বর্গ কতগুলি দেবলোক কতগুলি ব্রহ্মলোক আছে তাহার কোন হিসাবই মেলে

নাই নারদের। অথচ তিনি সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত শুধু ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন। ইচ্ছামাত্র গতি তাঁর, শূন্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া নারদ দিবারাত্র ঘুরিতেছেন; বাতাসের চেয়েও দ্রুত চলেন তিনি, রেডিও পরিচালিত রকেট বোমাও আজ পর্যন্ত তাঁহার মতো দ্রুত যাইতে পারে নাই। আর চলিতেছেন বা কত দিন! কত মন্বু গেল, কত কল্প গেল, তাঁহার চলার আর বিরাম নাই। তবু তো এই সৃষ্টিটার কোন হদিস মিলিল না। মনে মনে ধারণাও করা গেল না অনন্তটা কত বড়। তাই বিরক্ত হইয়া ইদানীং নারদও মাপজোখের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে যে জীবলোকগুলি তাঁহার ভাল লাগে, সেইগুলির মধ্যেই তিনি পালাক্রমে ঘুরিয়া বেড়ান।

পৃথিবীর উপর মহর্ষি নারদের প্রীতিটা একটু বেশী। মানুষ নামধেয় জীবগুলি তাঁহাকে বেশ মানে-গণে। তাহারা তাঁহাকে বিবাদের দেবতা করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার সম্মানার্থে ঝগড়া বিবাদ লড়াই তাহারা প্রায়ই করে। কিন্তু সম্প্রতি পৃথিবীতে আসিতে গিয়া আর একটু হইলে অমরত্ব প্রায় ঘুচাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহারই ষোড়শোপচার পূজার আয়োজনে আণবিক বোমা না কি একটা বস্তু পৃথিবীর মানুষগুলি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না। হঠাৎ সেই বোমাটি ফাটার ফলে কিছুক্ষণের জন্য মহাশূন্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে নানা উৎপাত শুরু হয়—নারদের গতিতেও গণ্ডগোল ঘটে। তিনি পড়ন্ত এরোপ্লেনের মতো তাল পাকাইতে পাকাইতে কোথায় একটা নিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন, অতিকষ্টে দৈব অনুগ্রহে এ যাত্রা সামলাইয়া লইয়াছেন।

তবে বাঁচিয়া গেলেও নারদ বিরক্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে আসিবার সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। এই ক্ষুদ্রকায় জীবগুলি কখন যে কি কাণ্ড করিয়া ফেলিবে তার ঠিক কি! তা ছাড়া ইহাদের একটা ব্যাপারে বড় কৌতুক বোধও করিতেছেন তিনি—কথাটা শ্রীভগবানকে না বলা পর্যন্ত শান্তি নাই। সেইজন্য আজ তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র পার হইয়া, অগণিত জন্ম-মৃত্যুর সীমারেখা ডিঙ্গাইয়া তিনি দ্রুততমগতিতে চলিয়াছেন। কোথায় কোন্ লোক হইতে অপূর্ব সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে, কোথায় কোন্ নক্ষত্র বর্ণনাতীত অপরূপ দ্যুতিতে উদ্ভাসিত, সে সবের দিকে আজ ভ্রূক্ষেপও নাই নারদের—লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে সাইকেলারূঢ় সঙ্গীতজ্ঞের গানের কলি যেমন মুহূর্তের জন্য আমাদের কানের কাছে বাজিয়া আবার দূরে মিলাইয়া যায়—তেমনিই এসব প্রভাবও আজ নারদের উপর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আজ আর কোনদিকে লক্ষ্য নাই। পার্থিব সময়ের হিসাবে মাপা যায় না

যেখানকার সময়ও দিনরাত্রি—এমনই একটা অংশে নিরাকার ঈশ্বর লীলাচ্ছলে আকার ধরিয়া উপযুক্ত ভক্তদের দর্শন দেন। ক্ষীরোদ-সাগরে অনন্তশয্যায় শয়ান্ মেঘ-নীলবর্ণ পরমপুরুষরূপেই নারদ তাঁহাকে দেখিতে ভালবাসেন, নারদের ইচ্ছায় সেই রূপেই তিনি প্রকাশিত হন। আজ নারদ এক মনে তাঁহার সেই রূপটি ধ্যান করিতে করিতেই ছুটিয়াছেন—হাতের বীণাযন্ত্রে মধ্যে মধ্যে ঘা দিয়া ওঙ্কারধ্বনি সৃষ্টি করিতেছেন—মুখে করিতেছেন স্তব।

অবশেষে এক সময়ে ঈশ্বরের দর্শন মিলিল। নারদের স্তব গান শেষ হইলে শ্রীভগবান প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাকে অভয় দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'সংবাদ কি বৎস?'

'সংবাদ একটু আছে বৈকি প্রভু। আচ্ছা, পৃথিবীর কথা মনে আছে আপনার?'

'পৃথিবী? সেটা আবার কি?' বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করেন ভগবান্।

নারদ আরও বিস্মিত হন—'পৃথিবীর কথা ভুলে গেছেন প্রভু। সেই যে সূর্য বলে একটা নক্ষত্রের চার পাশে ছোট্ট গ্রহটা ঘুরপাক খায়। সেই যেখানে কয়েকবার আপনার প্রত্যক্ষ বিভূতি প্রকাশ পেয়েছিল অবতার রূপে? সেখানকার প্রধান জীব হ'ল মানুষ। তাদের কথা ভুলে গেছেন এরই মধ্যে—তাদের ওপর তো আপনার দয়া একটু বেশীই ছিল প্রভু।'

নারদের কণ্ঠস্বর একটু ক্ষুব্ধ শোনায়। ভগবান আরও মধুর হাসেন। বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে—তা সেখানকার কি খবর?'

কিন্তু নারদের আর সেদিকে মন নাই। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা ঠাকুর, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে? ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে কিন্তু। যদিও আজ পর্যন্ত আপনার এবং আপনার সৃষ্টির কিছু হদিস পেলুম না, তবু মোটামুটি একটা ধারণা ছিল যে আপনি সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনারই অংশ। তা যদি হয় তা হ'লে আপনি এদের কথা ভুলে যান কি ক'রে? ঐ যে মানুষ নামধেয় ক্ষুদ্র জীব—ওরাও তো আপনারই অংশ!'

ঈশ্বর বলিলেন, 'নারদ, একটা উপমা দিই, তা হ'লেই বুঝবে। ঐ যে মানুষের কথা বলছ, ওদের তো ঐটুকু দেহ। ওরই মধ্যে যে রক্তস্রোত বইছে তাতে কত কোটি বীজাণু ঘুরে বেড়ায়, তার খবর রাখো? তুমি না রাখলেও মানুষ নিজে রাখে, এক রকম যন্ত্রও বানিয়েছে অণুবীক্ষণ ব'লে, তাতে করে দেখতেও পায়। ওরা জানে যে ঐ বীজাণুগুলো প্রতিমুহূর্তে ওদের দেহের মধ্যে বিচরণ করছে; কিন্তু তাই ব'লে কি ওরা সেটা অনুভব করতে পারে, না

প্রত্যেকটি বীজাণুকে চিনে রেখেছে ? ওদের দেহের মধ্যে যে আরও অতগুলো জীবিত প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে ওরা সচেতনও থাকে না অধিকাংশ সময়ে। তেমনি আমারও এই বিশ্বদেহে পৃথিবী আর তার মানুষ কতটুকু অংশ বলো। ঐ বীজাণুগুলোর চেয়েও ছোট নয় কি ? আমার পক্ষে কি ওদের হিসাব রাখা সব সময়ে সম্ভব ?'

তা বটে ! নারদ লজ্জিত হইলেন। কথাটা তাঁহারই ভাবা উচিত ছিল।

শ্রীভগবান প্রশ্ন করিলেন, 'সে কথা যাক গে—এখন তুমি কী বলতে এসেছিলে তাই বলো। ব্যাপার কি !'

'আর ব্যাপার কি ! ঐ তো ক্ষুদ্র পৃথিবী, আর তার ঐটুকু-টুকু প্রাণী, তারই দাপট কি কম ? আপনার ভক্ত নারদের দফা শেষ ক'রে দিয়েছিল আর কি !'

ভগবানও কৌতূহলী হইয়া উঠেন, 'কি রকম, কি রকম ? কী করেছে ওরা ?'

নারদ তখন আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ইতিহাসটা খুলিয়া বলেন। আকাশের বিদ্যুৎ তরঙ্গে গোলযোগ বাধার ফলে কী পর্যন্ত জব্দ হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা শেষ করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু এটা বলতেও আমি আসি নি প্রভু। আমি এসেছিলাম একটা মজার কথা বলতে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ বলে একটা দেশ আছে, খুব প্রাচীন দেশ—মানে পৃথিবীতে যতদিন মানুষ জন্মেছে ততদিন থেকেই ওখানে তাদের এক দল থাকে। ওখানেই আপনার বিভূতি অবতীর্ণ হয়েছে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী বার।'

ঈশ্বর বাধা দিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—মনে আছে আমার। বলো—'

নারদ কহিলেন, 'দেশটির মাটি এমন যে ওখানে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবটা একটু বেশী। ঈশ্বরকে ওরা সবাই মানে, পূজো-আচ্চাও করে। কিন্তু সেইটে কি ভাবে হবে এই নিয়ে ঐ দেশের লোকের মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেছে আর তারা তাই নিয়ে অহোরাত্র ঝগড়া বিবাদ করছে।'

'তাই নাকি ?' শ্রীভগবান একটু কৌতুক বোধ করেন, 'আর তার সঙ্গে ওদের ব্যবহারিক বা পার্থিব জীবনের সম্পর্ক কি ?'

'তাই কে বলে ! বিবাদ বিসম্বাদ চলছে অনেক দিন ধরেই, সম্প্রতি একেবারে রক্তগঙ্গা বওয়া শুরু হয়েছে। খুন-জখম, অগ্নিকাণ্ড, নারীহরণ, নারীর অপমান—এমন কোন পাপ নেই, ধর্মের নামে যা তারা করছে না।'

'এ কাজগুলো অবশ্য মানুষ আজ নতুন করছে না, ধর্মের নামে খুন-জখমও তারা শুরু করেছে অনেক দিন থেকেই—কিন্তু নারীহরণ-টরণগুলো ঠিক বোধ হয় এতদিন ছিল না। বিশেষ ক'রে ধর্মের নামে—এটা একটু নতুন বটে।'

'সে ভীষণ ব্যাপার ঠাকুর। দেশটা বুঝি যায়। আপনি একটু মন দিন এবারে।'

'তাই তো নারদ, ভাবিয়ে তুললে যে। আমার বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম এবং ঈশ্বরবাদ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হতে বসেছে ক্রমে—এখনও এই নিয়ে এত কাণ্ড! বলো কি!'

'বলি কি সাধে প্রভু। সব দেশেই ওটা কমেছে ঠিক, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় হয়েছে কাল। সব জায়গা থেকে এসে জড়ো হয়েছে বোধ হয় ভারতবর্ষেই। প্রভু, আপনি একবার যান—আপনি ভক্তবৎসল সবাই জানে, অথচ আপনাকে ডেকে ডেকেই তারা অমন বেঘোরে মরছে, আপনি একটা উপায় করুন!'

ঈশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও—দেখি কি করতে পারি।'

নারদ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মার এক নিমেষে চার যুগ কাটিয়া যায়—ঈশ্বরের এক নিমেষে অমন বহু ব্রহ্মার জীবনান্ত হয়। কিন্তু ভক্তবৎসল ঈশ্বর নারদের সুবিধার জন্য পার্থিব সময়ের হিসাবেই দেখা দেন। সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন ব্যাপারটা।

হ্যাঁ—দায়িত্ব তাঁহার একটা আছে বৈকি! বেচারী মানুষগুলি তাঁহার জন্যই কষ্ট পাইতেছে। তাঁহার বিভূতি পৃথিবীর নানা দেশে স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া নানারূপে প্রকাশ পায়, নানা ভাবে মানুষকে জীবনধর্ম শিক্ষা দেয়। মানুষের পক্ষে কি সম্ভব তাহার মূলটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঈশ্বরের আসল অস্তিত্ব অনুভব করা?

মানুষের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। মানুষের স্বভাব-ধর্ম কৌতূহলও তাঁহাকে পাইয়া বসিল। মন্দ কি, ব্যাপারটা দেখিয়া আসাই যাক না।

সব চেয়ে কৌতূহল হইল তাঁহার সেই মন্দিরগুলি দেখিবার—ভক্ত ভারত-বাসী যেখানে তাঁহাকে পূজা করে, ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হয়।

যে কথা সেই কাজ।

ঈশ্বর মানুষেরই দেহ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষের একটি বড় শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মানুষের দেহ বটে—তবু ইচ্ছামাত্রই তিনি এখানে আসিতে পারিলেন। দেহ ধারণ করিতে হইল এই জন্য যে নহিলে এখানকার আব-

হাওয়ার মধ্যে তাঁহার তেজময় দেহকে সংযত করিয়া আনা অসম্ভব।

ভগবান যেখানে উপস্থিত হইলেন সেটা একটা বড় মন্দির। ঠিক কোন্ সম্প্রদায়ের তাহা বুঝিতে না পারিলেও ভীষণ ভীড় দেখিয়া বুঝিলেন সেটা একটা বড় মন্দির, লোকের কথাবার্তার ভাবে বোঝা গেল যে ভিতরে মূর্তি আছে। মন্দিরের প্রবেশপথে সারি সারি দোকান—কোনটায় বা পূজার ফুল বিক্রী করিতেছে, কোনটায় বা সিঁদুর—বেশীর ভাগই মিষ্টান্নের। রাস্তায় পাণ্ডার দল যাত্রীদের যেন ছিঁড়িয়া খাইতেছে আর তেমনি কি ভিখারীরও উপদ্রব! কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভগবান গলদ্ঘর্ম হইয়া উঠিলেন।

কৌতূহলী হইয়া তিনি একটা দোকানের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। দূর হইতে যেগুলিকে সন্দেশ বলিয়া ভুল হইয়াছিল সেগুলি কাছে আসিতে দেখা গেল, শর্করার ডেলা। ভগবান একটু হাসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ ভাই—এ কি খাবার সব? এদেশে তো শুনেছি ভাল খাবার তৈরী হয়। তবে এমন দশা কেন সন্দেশের?'

দোকানদার বিস্মিত হইয়া তাকাইল, 'ও, আপনি নতুন বুঝি? বাইরের দোকান ভাল খাবার করে তার মানে ওসব যে বাবুরা খায়। এ পুজোর জিনিস এমনিই হয়। এখানে যা দেব যাত্রীরা তাই নেবে। আর ঠাকুর তো কথা বলে না! হিঃ-হিঃ—'

সিঁদুর যাহারা বিক্রয় করিতেছে তাহারা নাকি গাওয়া ঘিতে সিঁদুর গুলিয়া দিতেছে। ভগবান একটা খুরি তুলিয়া লইয়াই বুঝিলেন যে গোমাতা এ ঘিয়ের কাছ দিয়াও যান নাই! তুলার বীজ প্রভৃতি হইতে যে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়—এ সেই জিনিসই।

শেষ পর্যন্ত ফুলের মালার দোকান। একগাছি সরু মালা চার আনা। এক জন যাত্রী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'বাজারে যে এর সিকি দর—হ্যাঁ হে? কী বলছ?'

'এটা ত বাজার নয়—' ফুলওয়ালা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, 'মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন এখানে দরদস্তুর কী?'

মালাও কেনা হইল না, ভগবান শুধু হাতেই ভিতরে ঢুকিলেন। একজন পাণ্ডা তাঁহার পিছনে লাগিয়াই আছে, কোনমতেই তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই।

ভিতরে পেষাপেষি ভীড় দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, যাক—আর কিছু না থাক্, অন্তত ভক্তিটা আছে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে ভুল ভাঙিল। ভিতরে যাহারা আছে—পূজারীর দল—তাহাদের ভক্তির লেশ মাত্র নাই—তাহারা

বোধ হয় ধরিয়াই লইয়াছে যে ভিতরের প্রতিমা এক টুকরা পাথরই শুধু, এটা অর্থ উপার্জনের স্থান ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ভাবেই দেবী-মূর্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রীদের কাছ হইতে নানা কৌশলে অর্থ অপহরণ করিতে ব্যস্ত। আর যাহারা আসিয়াছে এত কষ্ট করিয়া, এত প্রতারিত হইয়া পূজা দিতে, তাহাদেরই বা সে ভক্তি, সে প্রীতি কই? প্রায় সবাই আসিয়াছে কিছু না কিছু প্রার্থনা করিতে। লোভের চেহারা তাহাদের সকলেরই চোখে মুখে প্রকট। ভগবান বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। যে পাণ্ডাটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে ব্যাকুল হইয়া ভীড়ের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল—যাত্রীকে আর দেখিতে পাইল না।

ভগবানকে দেখিবার উপায়ও ছিল না, কারণ তিনি এবার অশরীরী মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন; পাণ্ডাদের এত টানা-হ্যাঁচড়া তাঁহার সহ্য হইবে না। যাক—সেখান হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িলেন। এটা আগের মন্দির হইতে কিছু পৃথক ধরনের। ভিতরে দেব-দেবীর মূর্তি নাই। শুধু দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া যাত্রীরা পাশাপাশি বসিয়া উপাসনা করে। যাক—এটা অন্তত ভক্তির স্থান বটে, ভগবান মনে মনে ভাবিলেন। বাহিরে সে ব্যবসা বা পাণ্ডাদের কচকচি নাই—একটিই মাত্র ফুল ও ধূপের দোকান।

কিন্তু ভিতরে পা দিতেই তিনি অবাক হইয়া গেলেন। মন্দিরের মধ্যে লোক আছে বিস্তর, তবে, মোট তিনটি লোক আছে উপাসনার স্থানে, বাকী সকলেই অন্যত্র ব্যস্ত। এক পাশে স্তূপাকার আছে কতকগুলি লাঠি ও লৌহ-শিরস্ত্রাণ—যেন যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত। লোকগুলি একস্থানে জড়ো হইয়া দ্রুত অথচ নিম্নকণ্ঠে কি আলোচনা করিতেছে—আর একটু কাছে আসিতে বুঝিলেন রাজনৈতিক আলোচনা। কতকগুলি পুরোহিত-শ্রেণীর লোককে তালিম দেওয়া হইতেছে—ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে কেমন করিয়া সাধারণ অশিক্ষিত লোককে ক্ষেপাইয়া তুলিতে হইবে। এ সমস্তরই লক্ষ্য অপর সম্প্রদায়ের লোককে জব্দ করা। তাহারা নাকি বহুদিন হইতে ভাল চাকরি, ভাল জমি, ভাল ভাল ব্যবসাগুলি দখল করিয়া বসিয়া আছে—যেমন করিয়াই হউক তাহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে। পুরোহিতদেরও খুব উৎসাহ, যে সব লুঠপাট এবং নারীহরণের চিত্র কল্পনায় অঙ্কিত হইতেছিল তাহাতে তাহাদের দৃষ্টি লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে! লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যেসব উপায় আলোচিত হইতেছে তাহার দুই একটি কথা শুনিয়াই ভগবান শিহরিয়া উঠিলেন। হাঁ, ভগবানেরও শিহরণ ঘটিল! সেখান হইতে তাড়াতাড়ি গিয়া দাঁড়াইলেন

উপাসনারত ভক্তদের কাছে—এখানে তবু কিছুটা নিষ্ঠা আছে তো।

কিন্তু সেখানে গিয়াও হতাশ হইলেন। প্রত্যেকেরই তাড়া আছে, মন্ত্রগুলি পড়িয়া লইতেছে দ্রুত কোনমতে কাজ সারিবার জন্য। একজনের কান পড়িয়া আছে পিছনের যড়যন্ত্রের দিকে, সে সেখানে যাইতে পারিতেছে না বলিয়া বিরক্ত। আর একজন ভাবিতেছে তাহার কন্যার বিবাহের কথা, তাহার ঠোঁটই নড়িতেছে শুধু, মন্ত্রের দিকে মন নাই আদৌ। টাকা চাই যেমন করিয়াই হউক—ঈশ্বর কি দিবেন ? ঈশ্বরকে ডাকিয়া কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। আসলে তাহাকেই যোগাড় করিতে হইবে।…তৃতীয় ভক্তটি নিতান্তই অল্পবয়সী। তাহার ঠোঁটও নড়িতেছে না। সে শুধু অপর দুইজনের ভাবভঙ্গীকে নকল করিয়া যাইতেছে। আসল কথা, তাহার একটা সরকারী চাকুরি চাই—যিনি চাকুরি দিবার মালিক অর্থাৎ যাঁহাকে সে মুরুব্বি করিয়াছে, তিনি রোজ এখানে আসেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকেও এখানে আসিতে হয়।

মুহূর্ত-কয়েক দাঁড়াইয়া ভগবান সেখান হইতেও বাহির হইয়া পড়িলেন। আরও খানিকটা হাঁটিবার পর একটা গলির মোড়ে হৈ-চৈ শুনিয়া তাড়াতাড়ি সেদিকে গেলেন। কাছে গিয়া দেখিলেন আর কিছু নয়—কী একটা বারোয়ারী পূজা হইতেছে। স্থানাভাবে রাস্তারই খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া পূজা মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে গলির সমস্ত নোংরা জল যেখান দিয়া যায় এবং পথিকেরা যেখানে প্রাকৃতিক কার্য সারে সেই নর্দমার উপরেই আলপনা দেওয়া চৌকী পাতিয়া প্রতিমা বসানো হইয়াছে। রাস্তার উপরেই পুরোহিত বসিয়াছেন পূজা করিতে, নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণও সেইখানেই সাজাইতে হইয়াছে। প্রতিমা কী একটা দেবী মূর্তির—পূজাটাও আকস্মিক। কোন একটা রোগ উপলক্ষেই ভয়ে ভয়ে পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। বোধ হয় সেই জন্যই চাঁদা উঠে নাই—উপকরণ ও আয়োজন সামান্য। কোনমতে অল্প দামের কিছু ফল আসিয়াছে, মিষ্টান্নের বদলে বাতাসা। তা হোক—ভগবান মনে মনে ভাবিলেন, আন্তরিক ইচ্ছাটাই বড় কথা, টাকা ওঠে নাই, বেচারীরা কী করিবে ?

কিন্তু একটু পরেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। কর্তারা যেখানে বসিয়া আলোচনা করিতেছেন সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে শুনিলেন যে, মণ্ডপ সজ্জাতেই কয়েক শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাত্রাগানের বায়না দেওয়া হইয়াছে—সেটা আজ, কাল পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করিবে; তাহাতেও মোটামুটি খরচা আছে। এ ছাড়া কোন্ এক পল্লীর ব্যায়ামাগারকে টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা

কসরৎ দেখাইয়া যাইবে—ধর্মকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে শরীর-চর্চার প্রয়োজন। পাড়ার ছেলেদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই ও ব্যবস্থাটা করা হইয়াছে। তা ছাড়া—গত দাঙ্গাতে যে বকাটে ছেলেগুলির জন্য পাড়া বাঁচিয়াছে, যাহারা বেশী শত্রু হত্যা করিয়াছে তাহাদের ভাল করিয়া খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেটা কাল হওয়া চাই। বেশ খরচ হইবে—কারণ মদ এবং মাংসের আয়োজন আছে তাহাদের জন্য।

এই সব আলোচনা হইতেছে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল, 'ঠাকুর মশাই বলছিলেন যে, তিনখানা কাপড় দরকার তার জায়গায় একখানাও আসে নি, গামছা এসেছে মোটে একটি—কী করে হবে?'

একজন মাতব্বর ধমক দিয়া বলিলেন, 'ঐতেই চালিয়ে নিতে বলো। অত আর পেরে উঠছি না। এদিকে কত খরচ এখন মাথার উপর তার খেয়াল আছে? ওঁদের আর কি, খালি আদায়ের ফিকির—'

হতাশ হইয়া ভগবান সে গলি হইতেও বাহির হইয়া পড়িলেন। আরও খানিকটা চলিবার পর দেখিলেন একটা বড় রাস্তার ধারে ভীষণ ভীড়। গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কৌতূহলী হইয়া একটু উর্ধ্বে উঠিতেই দেখিলেন যে কোন একটি সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। শোভাযাত্রাটি ধর্মের সহিত জড়িত। বহুদিন পূর্বে তাঁহারই এক বিভূতি কোন্ সুদূর মরুভূমে আবির্ভূত হইয়াছিল নররূপে—তারপর সেই মহামানবেরই সন্তান-সন্ততির মধ্যে কে যেন যুদ্ধে মারা যায়, তাহারই শোকের স্মৃতিতে এই শোভাযাত্রা। যে ধর্মমত ইহারা মানিয়া চলে, যাহার মহিমা প্রচারে ইহাদের আগ্রহের অন্ত নাই—সে ধর্ম পৌত্তলিক নয়—নিরাকার পরম ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাস্য বলিয়া মনে করে, সেইজন্য পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর ইহাদের প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ, অথচ কবেকার একটি স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ঘটনাটার অভিনয় হইতে থাকে প্রতিবৎসর, মায় একটা নকল শবাধার পর্যন্ত ইহারা সঙ্গে রাখে। কোন প্রতীক উপলক্ষ করিয়া ধর্মের অনুষ্ঠানে এত আপত্তি, অথচ কয়েক শতাব্দী পূর্বের সমস্ত প্রতীকগুলিকে ধরিয়া আছে আজও—

শোভাযাত্রাটা শোকের, কিন্তু ভগবান দেখিলেন যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে শোকের চিহ্ন মাত্র নাই। আছে যেটা সেটা একটা বিদ্বেষের। এই উপলক্ষে একশ্রেণীর লোক জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতেছে অপর সম্প্রদায়ের লোকের বিরুদ্ধে। চোখে চোখে জিঘাংসা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে হিংসা। ইহারই মধ্যে কে কাহাকে ইট ছুঁড়িবে, কে কাহার পিঠে ছুরি বসাইয়া পুণ্য

অর্জন করিবে এবং ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিবে সেই সুযোগ খুঁজিতেছে। তাহারও পিছনে লোভের চেহারাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই লোকগুলি চলিয়া গেলে তাহারা যত প্রকার পার্থিব সুবিধা পাইবে তাহারই কল্পনা এই সদ্যজাগ্রত ধর্মবুদ্ধি ও ঈশ্বরপ্রীতিতে ইন্ধন যোগাইতেছে।

ব্যথিত ঈশ্বর একবার সারা দেশটার উপর তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। সর্বত্রই এই এক ছবি। মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিতেছে তাঁহারই নাম লইয়া। এক সম্প্রদায়ের নেতারা অপর সম্প্রদায়কে শাসাইতেছে ঈশ্বরের দয়ার ভরসায়। কেহ মন্দিরের মধ্যে দেব বিগ্রহের সামনে শপথ করিতেছে অপর ধর্মমতাবলম্বীদের বধ করিবার—কোথাও বা পুরোহিতের দল ধর্মগ্রন্থের উপর হাত রাখিয়া শপথ করাইয়া লইতেছে সেই একই কাজের জন্য। হত্যা, নারীহরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ—ঘুষ দেওয়া, প্রতারণা করা, যত-কিছু নীচ কাজ সবই চলিতেছে কিন্তু প্রত্যেকটার মধ্যেই তাঁহার নাম আছে। বিচারক ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায় করিতেছেন—বিবেককে সান্ত্বনা দিতেছেন এই বলিয়া যে তিনি তাঁহার ধর্মের জন্যই এই সব করিতেছেন। শাসকরা তাঁহাদের কর্তব্য ভুলিয়া সিংহাসনে বসিয়াই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যে তাঁহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের লোকেই যাহাতে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় এবং অপর ধর্মামতাবলম্বীরা যৎপরোনাস্তি জব্দ হয়। ধর্ম ও ঈশ্বর কোথাও নাই অথচ তাহারই জন্য যত কিছু অশান্তি—। মন্দির ও উপাসনাগারের চার পাশেই যেন বেশী অনাচার, বেশী পাপ। দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়াই যেন বেশী ষড়যন্ত্র, বেশী মামলা মোকদ্দমা। ঈশ্বর ও তাঁহার অংশ-স্বরূপ দেবদেবীদের প্রত্যেকেই ব্যবসায়ের জন্য কাজে লাগাইতেছে। এমনকি মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতেছে, একই ধর্মমতের মানুষকে ঈশ্বর-উপাসনায় বাধা দিতেছে তাও তাঁহারই নাম লইয়া—

ভগবান অন্যমনস্ক ভাবে পথ হাঁটিতে হাঁটিতে কোন্ এক পাড়ায় আসিয়া পড়িয়াছেন এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। সহসা দেখিলেন তাঁহার চারিদিকেই ধ্বংসস্তূপ—ঘরবাড়ি ভাঙ্গা, কোনটা বা পুড়িয়া গিয়াছে। গলিত অর্ধদগ্ধ অঙ্গারাবশিষ্ট শবদেহ ইতস্তত ছড়ানো। জীবিত প্রাণীদের মধ্যে কেবল শৃগাল কুকুর আছে সমস্ত পল্লীটাতে।

কিন্তু না—ঐ যে কাহারা আসিতেছে! একদল আর এক দল লোককে দেখাইতেছে এই সব! উহাদের কি দুঃখ হইয়াছে? না—আনন্দের হাসি যে! ভগবান কাছে আসিলেন। শুনিলেন একটি লোক বলিতেছে, 'সব আমরাই করেছি হুজুর। জ্যান্ত কাউকে রাখি নি, শুধু ছুঁড়িগুলোকে রেখেছি হুজুরদের জন্যে। আর যারা আমাদের ভগবানকে মানতে রাজী হয়েছে তাদেরই ছেড়ে

দিয়েছি। মেহন্নৎ বহুৎ হুয়েছে—বকশিশটা সেই মতো চাই।'

হুজুরের দল প্রসন্ন হাস্যে অভয় দিলেন।

ভগবান তাড়াতাড়ি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাঁহার পায়ের নিচে কি যেন ঠেকিল। চাহিয়া দেখিলেন একটি অল্পবয়সী মেয়ে রাস্তার ধূলার সহিত মিশিয়া পড়িয়া আছে। রোগে কিংবা অন্য কারণে মুমূর্ষু হইয়াছে বোঝা গেল না—তবে সে যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহা সেদিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

হয়ত অজ্ঞান হইয়া ছিল—ঈশ্বরের পায়ের স্পর্শে চমক ভাঙ্গিয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর বাহির হইতে চাহে না, অন্তিম আকুতি প্রাণপণ চেষ্টায় বাহির হইয়া আসে, 'ভগবান—তুমি কি নেই প্রভু? আর যে পারি না।'

ঈশ্বরের অশরীরী দেহ নিঃশব্দে আবার মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। মেয়েটিকে তিনি চিনতে পারিয়াছেন—সে আর কেহ নয় চল্লিশ কোটি সন্তানের জননী ভারতমাতা!

ভগবান বোধ হয় লজ্জাতেই তাহার কাছে পরিচয় দিলেন না।

বিচিত্র প্রতিযোগিতা

চৈতন্য চাকলাদারের গলিটা চওড়াতে মাত্র ষোল ফুট হলেও মর্যাদাতে কোন আশি ফুট রাস্তার চেয়ে কম নয়। এ গলিতে অনেক ভাল ভাল লোক থাকেন। একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দুজন উকীল, জনতিনেক বড় সরকারী চাকুরে, আর তার চেয়েও যা গর্ব করার মতো—একজন নামকরা কমিক-অভিনেতা এবং কোন ফার্স্ট ডিভিশন টিমের এক বিখ্যাত গোলকীপার! সুতরাং অনেক বড় বড় রোড বা স্ট্রীটও যে এই ক্ষুদ্র লেনটিকে ঈর্ষার চোখে দেখবে, এ আর আশ্চর্য কি!

গলি অবশ্য লম্বাতেও খুব বেশী নয়—হয়ত একশো গজ হবে বড় জোর—তবু এ রাস্তার মর্যাদামাফিক গলির দুই মুড়োয় দুটি বড় ক্লাবও ছিল। একটি হল 'জয়শ্রী স্পোর্টিং' আর একটি 'পাড়াশ্রী ইউনাইটেড'।

এক গলিতে যখন দুটি ক্লাব তখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে এটাও স্বাভাবিক। বাজে লোকেরা বলে, 'আড়াআড়ি' বা 'রেষারেষি' কিন্তু ওরা—মানে উক্ত দুই ক্লাবের মেম্বাররা এ দুটি শব্দ শুনলেই

চটে যায়। ওরা বলে 'স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা' বা 'হেলদি কম্পিটিশান' না থাকলে আর জীবন কি? কম্পিটিশানের অভাবই তো মৃত্যু। আমরা দু'দলের কেউই মার খাওয়ার দল নই—'বেঁচে থাকার, এগিয়ে যাওয়ার দল।'

ফলে, 'জয়শ্রী'র সরস্বতী পূজোয় থিয়েটার হলে 'পাড়াশ্রী'র পূজোয় জলসা কিংবা বায়স্কোপের আয়োজন করা হয়ে থাকে। জয়শ্রী যেবার শীতলা পুজোর ব্যবস্থা করে সেবার পাড়াশ্রী সর্বজনীন ঘেঁটুপূজোর আয়োজন করে এবং শীতলা পূজোতে যদি যাত্রা দেওয়া হয় তাহলে ঘেঁটুপূজোতে তরজা কবির লড়াই কিংবা পাঁচালী গান—আসবেই আসবে। ওরা ওদের ফাংসানে ইলেকট্রিক আলোর ওপর জোর দিলে এরা কোথা থেকে একগাদা য়্যাসিটিলিন ভাড়া করে এনে দিনের মতো আলো করে দেয়।

এই ভাবেই চলছিল বেশ কিন্তু এবার রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর হুল্লোড় শুরু হতে ওরা বড় ফাঁপরে পড়ল। কারণ এই ব্যাপারটাতে বৈচিত্র্য আনার উপায় বড় কম; আবৃত্তি, গান, নৃত্যনাট্য, অভিনয়—মোটামুটি এর বাইরে যাবার উপায় নেই। সর্বত্রই এই হচ্ছে, নিয়ে দিয়ে কে কত দামী 'আর্টিস্ট' আনতে পারে আর কে কত বড় সাহিত্যিককে সভাপতি করতে পারে—এর ওপরই প্রতিযোগিতা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আবার এদের বেশ একটু অসুবিধা আছে, কেননা, ছোট গলির মধ্যে দুটি ক্লাব, চাঁদা তোলার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। একই সঙ্গে দু'দল চাঁদা চাইলে সাধারণ দাতারা যা দেবার দু'ভাগ ক'রে দেন। টাকার অভাব, স্থানের অভাব, কর্মীর অভাব। অন্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতা হলেও আগুপিছু ক'রে করা হয়—এটা প্রায় এক সময়ই করতে হবে, বড়জোর এক সপ্তাহের কি দশ দিনের তফাত করা যেতে পারে। বৈশাখ থেকে না হয় জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত টানা যায়—আষাঢ়, শ্রাবণ টানলে দুর্নাম হবে। সভাপতি নিয়েও হাঙ্গামা। ফাল ভাল সাহিত্যিকদের টানটা বিদেশের ওপর, পরের পয়সায় দেশ ভ্রমণ, ভাল খাওয়া-দাওয়া চলে তাতে। পাড়াঘরে গলিঘুঁজির সভাতে আসতে চান না তাঁরা।

কী করা যেতে পারে—অর্থাৎ বাজে লোকদের ভাবায় সাধারণ রেষা-রেষিতে না নেমে কিভাবে হেল্‌দি কম্পিটিশনে চৈতন্য চাকলাদার লেনের গৌরব বৃদ্ধি করা যায়—এই আলোচনা করতে ঘন ঘন দুই ক্লাবের যুক্তবৈঠক আহ্বান করা চলতে লাগল; কিন্তু সে বৈঠকেও বিশেষ কিছু মীমাংসা হ'ল না। ইতিমধ্যে গলির পুঁচকে ছেলের দল 'পিছিয়ে যাওয়ার যাত্রী সংঘ' নাম দিয়ে কোন এক বড় কাগজের একজন ছোট সাব-এডিটরকে সভাপতি ক'রে গলির মধ্যেই তেরপল পেতে সভা সেরে ফেলল। সে খবর আবার ফলাও করে

উক্ত কাগজে ছাপাও হয়ে গেল। কী বিপদ! এখন এরা তাহলে করে কি?

অনেক চিন্তার পর—অর্থাৎ পঁচিশে বৈশাখ পেরিয়ে গেলে এক সময় ঠিক হ'ল যে এইসব অসুবিধার মধ্যেই ওদের করতে হবে এটা। নইলে পাড়ার ও ক্লাবের প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। সবাই সেরে ফেলল প্রায়, আর এটা যখন জাতীয় কর্তব্যের মধ্যেই পড়ছে—তখন বেশী চিন্তা ক'রে লাভ নেই। এই মাসেই করা হবে, তবে সাতদিনের তফাতে। কে কী করবে তা অপর দলকে বলবে না, সম্পূর্ণ 'সারপ্রাইজ' দেওয়া হবে বা চমক লাগানো হবে। চাঁদাটা খালি যুক্তভাবে তুলে সমান ভাগ ক'রে নেবে দু'দল। তাতে যা হবার, যতদূর যা হবার তাই হবে। এতে ক'রে সুবিধা—কে বেশী তুলল, কে কম তুলল তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা ও মনঃপীড়ার কারণ থাকবে না, পাড়ার লোকরাও বিব্রত হবে না।

এ মীমাংসায় সবাই খুশী হল। একজন শুধু ক্ষীণকণ্ঠে প্রস্তাব করতে গিছলেন যে 'দু'দলে মিলেই তাহলে বড় ক'রে ফাংশান করা হোক' কিন্তু তাতে সকলেরই দেখা গেল প্রবল আপত্তি। তাতে নাকি হেলদি কম্পিটিশানের ব্যাঘাত হয়।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন রইল, কে আগে আর কে পরে করবে। কেউই নিজের অগ্রাধিকার ছাড়তে রাজী নয়। অনেক টানাহেঁচড়ার পর একজন প্রস্তাব করলেন যে, দুই ক্লাব মিলিয়ে যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ মেম্বার তার মত জিজ্ঞাসা করা হোক।

এ প্রস্তাব অনেকেরই মনোমত হ'ল। খোঁজ করতে করতে তেমন মেম্বারও একজন বেরিয়ে গেল—বোঁচা। বোঁচার বয়স সাত—তার চেয়ে কুদে মেম্বার দুই ক্লাবে একজনও নেই। সে অবশ্য জয়শ্রীর মেম্বার—পাড়াশ্রীর কর্তাব্যক্তিরা সেজন্যে একটু ক্ষুণ্ণই হলেন এবং ওর মধ্যেই ফিস্‌ফিস্ ক'রে সংকল্প করলেন পরস্পরকে সাক্ষী রেখে যে অতঃপর ওঁরা একটি এক বছরের ছেলে ও খোঁজ ক'রে একটি একশো বছরের বুড়োকে মেম্বার ক'রে নেবেন, দুদিকই বাঁধা থাকবে, কে জানে কাকে কখন দরকার হয়।

সে যাই হোক, আপাতত বোঁচার অধিকার চ্যালেঞ্জ করা চলে না। তাছাড়া বোঁচা যে এ মীমাংসার উপযুক্ত অধিকারী সে বিষয়েও সকলে নিঃসন্দেহ। কারণ সে বয়সে ছোট হলেও জ্ঞানে কারোর চেয়ে খাটো নয়। ফুটবল ও ক্রিকেটের জগৎ তার নখদর্পণে। আশ্চর্য স্মৃতিশক্তিও। এ সম্বন্ধে কারোর কিছু জানবার প্রয়োজন হলে নিঃসঙ্কোচে তাকে প্রশ্ন করতেন সবাই। এম-সি-সির কোন্ খেলোয়াড় কি রঙের পর্দা ভালবাসেন তা থেকে শুরু ক'রে কলকাতার

বিখ্যাত ব্যাক ভাছু গোঁসাইয়ের কটা বেড়াল বাচ্চা—এসব তার কণ্ঠস্থ।

এ-হেন বোঁচার সামনে সমস্যাটা উপস্থাপিত করা মাত্র সে এক কথায় মীমাংসা ক'রে দিলে ; বললে, 'আরে—এ তো খুব সোজা, টস করুন না।'

তখন সবাইকে মানতেই হ'ল যে এটা খুবই সোজা এবং তাদের সকলেরই মনে পড়া উচিত ছিল।

অতঃপর একটা আধুলি যোগাড় ক'রে কেলোদাকে দিয়ে টস্ করানো হ'ল। কেলোদা নাকি সাতখানা পাড়ার মধ্যে টস্-এর মাস্টার। জয়শ্রী হেড্ নেবে না পাড়াশ্রী হেড্ নেবে, এ নিয়েও একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেটা বেশীদূর গড়াতে পারল না। বোঁচা ছুটো আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'আপনাদের ছুই সেক্রেটারী ধরুন একটা ক'রে—আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি কে হেড্ আর কে টেল।'

আঙুল ধরাতে জয়শ্রীই হেড্ পেলে। তাতে ক'রে একটা চাপা গুঞ্জন যে না উঠেছিল তা নয়, যে, যেহেতু বোঁচা জয়শ্রীর লোক সে ইচ্ছে করে ওদের হেড্টা পাইয়ে দিলে,—তবে সে গুঞ্জনে কর্তারা কেউই কর্ণপাত করলেন না। কেলোদা সাড়ম্বরে সকলের সামনে টস্ করলেন এবং তার ফলে পাড়াশ্রীই পেল অগ্রাধিকার। বোঁচা 'আনফেয়ার মীনস্' বা অন্যায় উপায় অবলম্বন করেছিল কিনা—এ ক্ষোভ আর পাড়াশ্রীর কোন মেম্বারের মনে রইল না।

এরপর ছুই পক্ষই চুপচাপ। আলোচনা হয়, কমিটি বসে—সব ক্লাব-ঘরের দরজা জানলা বন্ধ ক'রে। 'ইন-ক্যামেরা' মিটিং না কি বলে ওকে। মেম্বারদের সব শপথ করানো হয়েছে যে এই মিটিং-এ কি আলোচনা হয়েছে তা কোন মেম্বার ঘরের বাইরে আলোচনা করবে না—এমন কি অপর মেম্বারদের সঙ্গেও না।

যথারীতি এমনি গুটিকতক 'ইন-ক্যামেরা' মিটিং-এর পর এবং একত্রে তোলা চাঁদা ভাগ ক'রে নেওয়ার পর বেশ কয়েকদিন কাটলে জয়শ্রীর 'অনি' প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও জয়েন্ট সেক্রেটারীগণ, ভাইস প্রেসিডেন্টগণ ও মেম্বাররা পাড়াশ্রীর চিঠি পেলেন : আগামী শনিবার বেলা চারটার সময় পাড়াশ্রীর সভা ; সভাপতি কবি-মহেশ্বর দাশরথি রায় ; স্থান—সাদার্ণ এভিনিউ, 'রবীন্দ্রসরোবরের প্রবেশ পথের সম্মুখস্থ বাস-স্টপ।'

চিঠি পেয়ে এঁরা বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। ওদের সভায় খুব লোক হবে না এটা সত্যি কথা, এ তো আর জয়শ্রীর ব্যাপার নয়—তবু একটা বাস-স্টপে, রাস্তার ওপরে সভা আহ্বান করা—এ যেন বড্ডই বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

প্রবীণ কবি দাশরথি রায় মশাই আসছেন, এ তো তাঁরও অপমান।

নাঃ, ওদের আর মানুষ করা গেল না।

তবু, যাই হোক না কেন, পাড়াশ্রীকে জব্দ করার একটা সহজাত ইচ্ছা জয়শ্রীর সব সভ্যদের মনেই সুপ্ত থাকবে—এটা স্বাভাবিক। সুতরাং আবারও রুদ্ধদ্বার মন্ত্রণা-অধিবেশনে স্থির হ'ল যে, এ ক্লাবের সকলে সেদিন তো পাড়াশ্রীর সভাতে যাবেই—পাড়ার সকলেই (মেম্বার নির্বিশেষে) যাতে যান সেজন্য এরা খুব সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকবে। কোথায় ওরা জায়গা দেয়—তা দেখে নেবে এরা।...

তারপর যথা সময়ে ও যথা নির্দিষ্ট দিনে জয়শ্রীর সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক—যুগ্ম-সম্পাদক—কোষাধ্যক্ষের দল একেবারে দল বেঁধেই গিয়ে হাজির হলেন। পাড়ার আর কারা যাবেন না যাবেন এখনও জানা যায় নি। কিন্তু একটা বাস-স্টপের পক্ষে এই ক'জনই তো যথেষ্ট। পেভ্‌মেন্টের সবটা জুড়ে সামিয়ানা খাটালেও বড় জোর দুশো আড়াইশো লোক বসতে পারবে তার নিচে। এরাই তো যাচ্ছে ত্রিশ-চল্লিশজন।

কিন্তু সেই বিশেষ বাস-স্টপটিতে পৌঁছে বিষম ঘাবড়ে গেলেন তাঁরা। এই প্রথম ঘাবড়ে গেলেন এ যাত্রায়। কোথায় সভা আর কোথায় সামিয়ানা? গোটা পেভ্‌মেন্ট আর তার সামনের রাস্তা যেমন পড়ে ছিল তেমনি পড়ে আছে। বাস-স্টপ-এ সাধারণত যা দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তা-ই ছিল, বাস আসতেই উঠে চলে গেল তারা।

সভা কোথায়?

বোকা বানাল নাকি তাঁদের পাড়াশ্রীর দল?

কিন্তু আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়! মে মাস, তা-ও তো শেষ হতে চলেছে। তবে?

তাঁরা বোকা সেজেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইতে লাগলেন পরস্পরের মুখের দিকে। কী করবেন, এক্ষেত্রে কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফিরে যাবেন না আর একটু দাঁড়িয়ে থাকবেন তাও স্থির করতে পারলেন না।

এইভাবে মিনিট চার-পাঁচ কাটবার পর তাঁদের মনে হ'ল যে কাছ থেকে কেমন একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে। খুবই কাছে কোথাও থেকে। যেন বেশ কিছু লোক চাপা গলায় কথা বলছে—

আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ একসময় মনে হ'ল তাঁদের মাথার ওপরের শিরীষ গাছটা থেকে যে পরিমাণ আধ-শুকনো ফুল আর পাতা খসে পড়ছে সেটা

ঠিক স্বাভাবিক নয়—একটু অস্বাভাবিক রকমের বেশী।

কথাটা মনে হতে হতেই কে একজন চাইলেন যেন ওপর দিকে—

সঙ্গে সঙ্গেই 'আঁক্' ক'রে একটা বিস্ময়সূচক চিৎকার ক'রে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

আর তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ওপর দিকে চেয়ে বাকী কজনও তেমনি আঁতকে চেঁচিয়ে উঠে তেমনি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন। বিস্ময়েই তাঁদের সকলকার কথা হরে গেল যেন।

দেখলেন তাঁরা—শিরীষ গাছে শুধু ফুলই নয়, ফলও ধরেছে। অসংখ্য ফল। সে ফল আর কিছু নয়, জুতো-পরা জোড়া জোড়া পা।

অর্থাৎ পাড়শ্রীর রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সভার আয়োজনটা হয়েছে এই বাসস্টপের এই প্রসারিত বিপুল শিরীষ গাছটিতে।

এঁদের আঁতকে ওঠা চিৎকারেই সম্ভবত ওপরওয়ালাদের চোখ পড়ল নিচের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কলরব ক'রে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন, আসুন, দাদারা আসুন। চলে আসুন ওপরে, আপনাদের জন্যে বেস্ট সীট সব রেখে দিয়েছি। সভাপতির পাশের মোটা ডালটিই রাখা হয়েছে আপনাদের জন্যে। কোন ভয় নেই, চলে আসুন।'

আর প্রায় তখনই সড়াক ক'রে ওপর থেকে লম্বা একটি বাঁশের মই নেমে এল। সম্ভবত ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বড় মই—এই সভার জন্যে না-বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

তবু এঁরা নীরব। মই বেয়ে গাছে উঠে সভার শোভাবর্ধন করার মতো উৎসাহ এঁদের মধ্যে বিশেষ দেখা গেল না।

'কী দাদারা—চেপে গেলেন যে! ফুটবল সিজন-এ এ কাজ তো করতেই হয়। গাছে চড়া তো আর নতুন নয়। ফুটবলের জন্য যা পারেন কবিগুরুর জন্যে তা পারেন না?'

এঁরা কী জবাব দেবেন ভেবে ঠিক করার আগেই হুস করে এক ট্যাক্সি এসে গেল। পাড়াশ্রীর ড্রামাটিক সেক্রেটারী অতনু নন্দীর সঙ্গে তা থেকে নামলেন কবি-মহেশ্বর দাশরথি রায়।

'আসুন স্যার, এই যে, এই মই বেয়ে উঠে পড়ুন—'

হাত ধরে মৃদু একটু টান দিলেন অতনু নন্দী।

প্রস্তাবটা শুনে বলা বাহুল্য কবি-মহেশ্বরেরও চক্ষু স্থির। তিনি থপথপে অথর্ব মানুষ, জীবনে কখনও খেলাধুলো করেন নি—গাছে-টাছে চড়তে তিনি

পারবেন না, ও মই বেয়ে তো নয়ই। তাতে সভাপতি তাঁকে না করা হয় সেও ভাল।

তিনি সাফ জবাব দিয়ে গেলেন।

কিন্তু তাঁর সে জবাব শুনছে কে? অতনু নন্দী তো ছিলেনই, ততক্ষণে সড়সড় ক'রে নেমে এসেছেন আরও দু'চারজন পাড়াশ্রীর কর্তাব্যক্তি, তাঁরা 'না না কোন ভয় নেই, আমরা আছি কী করতে, গায়ে আঁচ লাগতে দেব না স্যার আপনার' ইত্যাদি বলতে বলতে আগুপিছু করে একরকম টেনেই তুলে নিলেন মই দিয়ে—এবং তিনি ওপরে ওঠামাত্র মইটি আবার সরিয়ে নিলেন। তার মানে—কবি-মহেশ্বরের ইচ্ছা থাকলেও নেমে পালাবার আর পথ রইল না।

এই হ্যাঙ্গামে এঁদের—কিনা জয়শ্রীদের ওঠা হ'ল না ওপরে। তখন আর মই নামানো যায় না, যদি সভাপতি পালান সেই ফাঁকে? এঁদের অবশ্য ওঠ-বার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু তাই বলে চলেও গেলেন না; সেই গাছের গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে। লাউড স্পীকার তো রয়েছেই—সভাতে যোগ দেবার কোন অসুবিধে নেই। কত দূর কী হয় দেখাই যাক না। যথা-দস্তুর সভা শুরু হল। সভাপতিবরণ, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, সভাপতিকে মাল্য-দান প্রভৃতির পর ন্যাড়া মিত্তিরের উদ্বোধন সঙ্গীত, ঝুনু মল্লিকের আবৃত্তি ও চীনেবাদাম মজুমদারের কৌতুকাভিনয়ের পরই সভাপতি মশায়ের অভিভাষণ আরম্ভ হল। কারণ সভার উদ্যোক্তারা বুঝেছিলেন যে, জোর করে সভাপতিকে যদি বা ধরে রাখা যায়, কিন্তু পরে আর কাজ করানো যাবে না, যে রকম নার্ভাস হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ—হয়তো এবার অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবেন।

কবি-মহেশ্বর বারকতক কেশে গলা সাফ ক'রে অভিভাষণ শুরু করলেন, 'সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,—পড়ে যাব না তো?—আজ আমরা যে পবিত্র কর্তব্যের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি—পড়ে যাব না তো?—সে কর্তব্য শুধু পবিত্রই নয়, আনন্দদায়কও বটে। এ আমাদের—পড়ে যাব না তো?—বলতে গেলে জাতীয় কর্তব্য। কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—পড়ে যাব না তো?—তাঁর কীর্তির দ্বারা আমাদের জাতিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে—পড়ে যাব না তো?—প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। তাঁর কাছে—পড়ে যাব না তো?—আমাদের ঋণের অবধি নেই। তিনি—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল সভাপতির অভিভাষণ। এর মধ্যে অন্ততঃ বার-আশি তিনি ঐ অর্ধস্বগত প্রশ্নটি করলেন নিজেকে, কিংবা ভাগ্যকে, কিংবা আশপাশের সভ্যদের। বলা বাহুল্য এই স্বগতোক্তিটি খুব নিম্নস্বরেই কর-ছিলেন দাশরথিবাবু, কিন্তু মুখটা মাইকের কাছে থাকায় শ্রোতাদের শোনবার

কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না। এমন কি, পাড়াশ্রীর কর্মসচিব বকুল মাইতি যে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে অনুনয় করলেন, যাতে তাঁরা অভিভাষণের রিপোর্ট থেকে ঐ অর্ধস্বগত প্রশ্নটি বাদ দেন দয়া ক'রে—সেটা পর্যন্ত জয়শ্রীর এঁরা শুনতে পেলেন!

ঠোঁটের কোণে এঁদের সকলকারই একটি মধুর হাসি ফুটে উঠল। কতকটা যেন সস্নেহ প্রশ্রয়েরই হাসি।

ছেলেমানুষ ওরা, যা করেছে তা করেছে—তার জন্য তাঁরা অন্ততঃ কোন দোষ ধরবেন না, বা আলোচনা করবেন না—তাঁদের হাসির ভাবটা হ'ল এই।

এইবার জয়শ্রীর পালা।

তাঁরা কী করবেন তা তাঁরাও সাবধানে গোপন ক'রে রাখলেন। সরকারী টপ্-সিক্রেটের মতো চাউর হওয়ার উপায় ছিল না, এমনি কড়া মিলিটারী ডিসিপ্লিন ওঁদের।

তবে টেক্কা যে দেবেন পাড়াশ্রীর ওপর তা কে না জানে!

সেই টেক্কাটাই কেমন হবে—কতখানি 'ডাউন' দেবেন তাঁরা পাড়াশ্রীকে সেটা জানবার জন্য পাড়াশ্রীরা ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন—তবু জানা গেল না।

অবশেষে সেই দিনটি এল। অনেক বিনিদ্র রজনীর অবসানে—অনেক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর।

নিমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছল জয়শ্রীর।

কিন্তু এ কী? তাঁরাও যে বাস-স্টপেই নিমন্ত্রণ করেছেন! তবে সাধারণ কোন স্টপ নয়—ঘাঁটি। ন'নম্বর বাস যেখান থেকে ছাড়ে সেইখানেই বিশেষ স্টপটিতে যেতে বলা হয়েছে রবীন্দ্রানুরাগী সুধীদের!

এই! তাহলে ওরা আর নতুন কিছু ভাবতে পারলে না!

সকলে হেসেই খুন হলেন প্রথমটা। হাসি থামলে সভাপতি পাকদমন পাকড়াশী একজনকে ডেকে বললেন, 'এই বঙ্কা, দেখে আয় তো ওখানের গাছটা কত বড়, আর কেমন! ওখানে খুব বড় গাছ তো দেখেছি বলে মনে হয় না!'

কিন্তু বঙ্কাকে যেতে হ'ল না শেষ পর্যন্ত, ওকে বাঁচিয়ে দিল খোদন, সে ব'লে উঠল, 'পাকু কাকা—কিন্তু গাছ হ'লে শেষের এই লাইনটা লিখবে কেন? সভায় যোগদানেচ্ছু সুধীবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটা সাত মিনিটের মধ্যে আসিবেন—নহিলে সভায় যোগদান সম্ভব হইবে না। এর মানে কি? গাছ তো আর পালায় না? ওরা বাস রিজার্ভ করে নি তো?'

খোদনের মানব-জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে এই সুগভীর জ্ঞান ও গভীরতর

অন্তর্দৃষ্টি দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন।…সত্যিই তো, গাছ হলে এমন কথা লিখবে কেন?

পাকদমন বললেন, 'খোদন, আসছে বারে তোকেও একটা ভাইস প্রেসিডেণ্ট ক'রে নেব—দেখিস!'

একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠেছিল যে ওরা এত টাকা পেলে কোথায়—কিন্তু সেটাকে কেউ তত আমল দিলে না। সরকারী চাঁদার ভাগ ছাড়াও নিজেরা চাঁদা তুলতে পারে, সেটায় তো কোন আইনের বাধা নেই। তাছাড়া ওদের দলের পাঁচু শীল একাই একশ—একুশ বছর বয়সে বাপের বড় কাগজের দোকানের মালিক হয়ে বসে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।

কিন্তু দেখা গেল ওরা অর্থাৎ জয়শ্রীরা এ ব্যাপারেও আর একচোট টেক্কা দিয়েছে। রিজার্ভ করার ঝামেলায় আদৌ যায় নি।

'বাস রিজার্ভ করব কোন্ দুঃখে। এতগুলো লোক উঠে বসলেই তো রিজার্ভ! তারপর আর উঠবে কে? কোথায়ই বা উঠবে? এক ট্রিপ যাওয়া আর এক ট্রিপ আসা—এর মধ্যেই আমরা সভা সেরে ফেলব। ব্যস্ ফিনিশ!'

'কিন্তু তাতেও তো কম যাবে না!' একটু দমে গিয়েই যেন প্রশ্ন করলেন পাকদমন পাকড়াশী।

'দেখা যাক্' সংক্ষেপে বললেন ওদের সভাপতি। হাসলেনও একটু মুচকে। বেশ রহস্যময় হাসি।

সে হাসির অর্থ বোঝা গেল আর একটু পরেই। সভাপতি বরণের সময়।

সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়েছেন এই ট্রিপের দুই কন্ডাকটর, উদ্বোধক হলেন ড্রাইভার স্বয়ং। তাঁর সামনে এমন ভাবে মাইক দেওয়া হয়েছে, যাতে গাড়ি চালাতে চালাতেই তিনি ভাষণ দিতে পারেন।

খোদন উত্তেজিত হয়ে পাকদমনের কানে কানে বললেন, 'উঃ, কী বুদ্ধি দেখেছেন। কন্ডাকটররা এখনই মনে মনে লেকচার ভাঁজছে, টিকিট বিক্রীর কথা মনে আছে ওদের! অর্ধেক টিকিট নেওয়াই হবে না। সব গুলিয়ে যাবে। আর ও ড্রাইভার ভেবেছেন কোন স্টপে থামবে আর! এ তো অর্ধেক খরচেই রিজার্ভ হয়ে গেল ওদের!'

তার মধ্যে অতনু নন্দী গলাটা বাড়িয়ে বললে, 'শুধু কি তাই? শুনছি যে যদি কোন ইন্‌স্‌পেকটর ওঠেন, তখুনি তাঁকে বিশেষ অতিথি ক'রে নেওয়া হবে। তারপর আর তিনি টিকিট দেখতে চাইবেন কোন্ লজ্জায়!'

সভা চলতে লাগল। ভালই চলল সভা। রাস্তার দু'পাশে লোক জড়ো হয়ে গেল, গান আর আবৃত্তি শুনতে। এবং এখন ওরা আপসোস করতে

লাগল একটা নৃত্যনাট্য ব্যবস্থা করে নি বলে। না হয় আর একটা ট্রিপই লাগত।

'উঃ, খেড়ে জমালে তো!' জয়শ্রীর একজন ফিসফিস করে বললেন।

'হিট্! সুপার হিট্!' জবাব দিলেন তিনি গম্ভীর বিমর্ষ মুখে।

সভা ভাঙতে নামবার সময় অতনু আর থাকতে পারলেন না—জিজ্ঞাসা করলেন এ দলের পাঁচু শীলকে, 'আচ্ছা এ প্ল্যানটা এসেছিল কার মাথায় বলুন তো!'

'বোঁচার।' সংক্ষেপে উত্তর দিলে পাঁচু।

সেইদিনই পাড়াশ্রীর বিশেষ অধিবেশনে স্থির হল যে, অতঃপর যেমন ক'রেই হোক বোঁচাকে এ দলে ভাঙিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে যদি ভাইস-প্রেসিডেণ্টের সংখ্যা পনেরো থেকে যোল করতে হয়—সেও ভাল।

পাকদমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উহুঁ, আমার একটা য়্যামেণ্ডমেণ্ট রইল। যদি প্রেসিডেণ্ট হয়ে ও এ দলে আসতে চায়—সে ভি আচ্ছা! আমি সানন্দে আমার পোস্ট ছেড়ে দেব! মোদ্দা আনা চাই-ই ওকে!'

সবাই 'চিয়ার' 'চিয়ার' বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

মিথ্যার মূল্য

অনেক বছর আগের কথা অবশ্য। এক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশকের বইয়ের বোঝা নিয়ে ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরছিলাম। একে বলে ক্যান্‌ভাসিং ক'রে বেড়ানো। হেড-মাস্টার মশাই, সেক্রেটারী—অবস্থা বিশেষে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার—এঁদের ধরে এই বইয়ের কিছু কিছু পাঠ্য করানো, এই কাজ। পাঠ্য হ'লে ছেলেরা কিনবে, বিক্রী হবে, সেইটেই প্রকাশকের লাভ। মানে লাভ হবার কথা। কিন্তু এই ক্যান্‌ভাসিং-এর প্রতিযোগিতা হ'তে হ'তে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে—তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাভ হওয়া কঠিন। পাঠ্য করার আগে খরচা আছে, পাঠ্য করার পরও কম নয়। চার-পাঁচখানি বই ইস্কুলকেই দিয়ে আসতে হয়—সেক-শ্যানের অজুহাতে, বই ধরানো হবে কি না তার কোন নিশ্চয়তা না পেয়েই। তারপর 'পুয়োর-স্টুডেণ্ট'-এর ধুয়া তো আছেই। মাস্টার মশাইদের ভাগ্নে ভাইপোরাও থাকবেন—এও তো জানা কথা।

এ ছাড়া ঘুষ ব'লেই ঘুষ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে অপকৃষ্ট হচ্ছে বুকলিস্ট ছাপিয়ে দেওয়া। সে আজকাল দু'খানা বই ধরালেও ছাপিয়ে দেয় শুনেছি—

একই ইস্কুলের জন্য একই সেসনে চার-পাঁচজন প্রকাশক চার পাঁচ রকম পুস্তক তালিকা ছাপিয়ে দিয়েছেন—এমনও শুনেছি। অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছ থেকেই পুরো প্রকাশিত বইয়ের নমুনা নেওয়া হয়েছে। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সব বই ধরিয়ে দেব। এই সব বই পুরনো বাজারে এসে আগে বিক্রী হয়—তবে প্রকাশ-করা বই বেচতে পান। এ ছাড়া, লাইব্রেরীর আলমারী কিনে দেওয়া, ঘড়ি কিনে দেওয়া থেকে শুরু ক'রে সেক্রেটারীর স্ত্রীর বাউটি গড়িয়ে দেওয়া—এ সবও নাকি আছে। অবশ্য, মন্দ লোকে কত কি বলে, তাতে কান দিতে নেই।

যা বলছিলুম—ক্যানভাসিং-এর কথা।

আমি সেবার ঘুরছি কলকাতারই আশেপাশে—মানে বাস-এর পথ ধরে ধরে যত দূর যাওয়া যায়। খাস কলকাতায় খোদ মালিকদের ঘুরতে হয় গাড়ি ক'রে—তার সময়েরও ঠিক নেই, ভোর থেকে রাত বারোটা। আমরা এক মাসের মাইনে করা ভাড়াটে লোক—আমাদের দ্বারা এ হাটে ছুঁচ বেচা সম্ভব নয়। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয় এখানে।

আমাদের ফার্মের ম্যানেজার এক দিন রুট ঠিক ক'রে পরের দিন কোন্ পথ ধরে কোন্ কোন্ ইস্কুলে যাব তার তালিকা ঠিক ক'রে দিচ্ছিলেন। তার মধ্যে একটা ইস্কুলের কথায় বললেন—'যান—তবে এখানে কিছু হবে না। এ ইস্কুলের হেড-মাস্টার বড় সাংঘাতিক লোক (আসলে অন্য একটি বহুপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন—সেটা এখানে বলা কি ঠিক হবে ?) আজ পর্যন্ত একখানা বইও ধরানো যায় নি। ঐ রেকমেণ্ডেড্ লিস্টএ আছে, বিক্রী হয় না একখানাও। বছর বছর স্পেসিমেন যায়। কেবল বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে যান' —কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।'

'কী নাম ভদ্রলোকের ?' এমনিই, অলস কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম। এত দিন এত লোক যা পারে নি—আমি তা পারব—এমন ধৃষ্টতা ছিল না। এ লাইনে ক'বছর ঘুরে বুঝেছি—হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—এ বড় কঠিন ঠাঁই।

ম্যানেজার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'নাম ?···দাঁড়ান, মনে করি—হ্যাঁ, দিব্যেন্দু চৌধুরী।···আর বলবেন না, মাষ্টার ঐ নামেই—পড়ানো তো কচু—ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লেখে আপিসে বসেই—ক্লাসে গিয়ে আগে সেইগুলো শোনায়, ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে কেমন লাগল—আবার তাদের দিয়ে মুখস্থ করিয়ে—পড়া ধরার মতো—শোনে। পড়াবে কখন বলুন ? ইস্কুলসুদ্ধ ছেলের লাফিং স্টক! নেহাৎ সেক্রেটারীর গুরু বংশ, তাঁর স্ত্রী নাকি এর বাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—তাই চাকরি কিছুতেই যায় না।'

শুনলুম এই পর্যন্ত। তখনও কোন বিশেষ মতলব কিছু মাথাতে যায় নি।

ম্যানেজারের কাছ থেকে তালিকা ও টাকা বুঝে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কলেজ স্ট্রীটে এসে পড়লুম। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিংএ পুরনো বই দেখা বহু-কালের অভ্যাস—সেই মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একখানি কাগজের মলাটের বই নজরে পড়ল 'গানের অঞ্জলি' লেখক—শ্রীদিব্যেন্দু চৌধুরী বি. এ, বি. টি।

বইটা টেনে নিয়ে উলটে দেখলাম। গোটা পঞ্চাশেক অখাদ্য গান দিয়ে বই ছেপেছেন। ছেপেছেন অবশ্যই নিজের খরচে—ঠিকানা ঐ ইস্কুলেরই—প্রকাশিকা মালতী চৌধুরী, বুঝলাম, ওঁর স্ত্রী বা কন্যা। যা-তা কাগজে যেমন তেমন ক'রে ছাপা—বিক্রী হয় নি একখানাও (ইস্কুলের ছাত্র ও মাস্টার মশাইদের যা গছিয়েছেন তা ছাড়া)। সম্ভবতঃ দপ্তরী অধৈর্য হয়ে সব স্টক ওজন দরে বেচে দিয়েছে—কারণ আরও অনেকগুলি ঐ বই দেখলুম, মধ্যে মধ্যেই গোঁজা রয়েছে।

দাম-দস্তুর ক'রে নগদ এক আনায় একখানা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলুম। এখনকার হিসেবে ছ পয়সা।

পরদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস-এ ক'রে যেতে যেতে উল্টে দেখলুম—কবিতাগুলো একটাও কবিতা হয় নি। ছন্দ নেই, অর্থ নেই, কল্পনা নেই, এ এক বিচিত্র জিনিস।

পড়তে পড়তে যেন রাগ ধরে গেল।

তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম—রও! এই অস্ত্রেই তোমাকে জব্দ করব।

গেলুম স্কুলে। হেডমাস্টার ডেকেও পাঠালেন, দেখাও করলেন। বেঁটে-খাটো একটি লোক। আধময়লা কাপড়-জামা পরনে। নিতান্তই সাধারণ চেহারা, দেখলে কবি তো নয়ই—শিক্ষক বলেও মনে হয় না। মনে হল, গুড়ের দোকানে খাতা লিখলেই এঁকে মানাতো ভাল।

এমনি কথাবার্তা ভাল। কৃত্রিম বিনয়েরও অভাব নেই। বই রাখলেন খান-কতক। 'একটু দেখবেন, স্যার?' 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখব বৈকি, বিশেষ চেষ্টা করব।' যেমন বাঁধা-গৎ বিনিময় হয় তারও ত্রুটি হ'ল না।

তারপর বিদায় নেবার পালা।

ওঁর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝলুম, উনি অন্য কাজে মন দিতে চান। "লীভ দ্য ম্যান অফ বিজনেস টু হিজ বিজনেস"—সেই ভাব।

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে অধিকতর বিনয়ের সঙ্গে বললুম, 'যদি কিছু মনে না করেন স্যার—আপনার নামটা জানতে পারি? আমরা একটা লিস্ট মেনটেন

করছি হেডমাস্টার মশাইদের।'

মিটিমিটি হাসতে হাসতে—অর্থাৎ একটি অনন্যসাধারণ পরিচয়ের বোমা ফাটাচ্ছেন যেন, এই ভাবে—বললেন, 'শ্রীদিব্যেন্দু চৌধুরী।'

আমি ভ্রূ দুটো যৎপরোনাস্তি কুঁচকে যেন কী ভাবলুম। বললুম, 'মাপ করবেন, একজন বিখ্যাত কবি আছেন এই নামে—ইন এনি কেস—আপনি নন তো?'

'হেঁ-হেঁ—বিখ্যাত কি না জানি না, তবে এ অধীন কিছু কিছু কাব্যচর্চা ক'রে থাকে।'

'মাই গড্!' বিরিঞ্চিবাবার সেই ব্যারিস্টারের অনুকরণে শব্দ দুটো উচ্চারণ ক'রে যেন ধপ ক'রে আবার চেয়ারটায় বসে পড়লুম।

'আপনিই সেই কবি! দিব্যেন্দু চৌধুরী! ওঃ!' আবারও সেই মিটিমিটি আত্মপ্রসাদের হাসি। বললেন, 'কেন, আমার নাম শুনেছেন না কি কোথাও?'

'নাম শোনা! কী বলছেন! আমার কত দিনের ড্রীম আপনাকে দেখব। আমি আপনার কত বড় ভক্ত আপনি জানেন না। উঃ—কী ইমাজিনেশ্যন! সত্যি বলছি, কিছু মনে করবেন না, ইমাজিনেশ্যনের এ বিস্তৃতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নেই। আপনার কবিতার লাইন আমার মুখস্থ, শুনবেন?—

আকবর থেকে ওই রাজা উমিচাঁদ
বড়লোক সব মাটি হয়ে গেছে মাটিতে
প্রেয়সী তোমার শৃগালের মতো হাসি,
বাঁকা চাঁদ হেরি তোমার নয়ন দিঠিতে।

সোজা ইমাজিনেশ্যন! সোজা কথা? কই, কেউ লিখেছে? আকবর থেকে উমিচাঁদ। আর শৃগালের মতো হাসি। কেউ জানেই না—লিখবে কি? আমি নিজে দেখেছি—এই যে এই সেদিনই মৌরীগ্রামে গিয়ে দেখেছি—শেয়ালের হাসি কি মিষ্টি! না, এ ইম্পসিবল্, আপনি এইভাবে নিত্য ভ্রাজারী ক'রে যাবেন।'

অকস্মাৎ মুখ চোখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভদ্রলোকের। সোজা হয়ে বসে বললেন, 'কপাল, বুঝলেন, স্রেফ কপাল। বড়লোকের ছেলে হয়ে জন্মেছেন, বড়লোকে বড়লোকে মুখ শোঁকাশুঁকি। অমনি ইংরেজি তর্জমা হয়ে গেল—নোবেল প্রাইজ এসে উঠল সিন্দুকে। আমাদের অমন মুরুব্বী কে আছে বলুন?'

আর কতক্ষণ বলতেন, তা জানি না। বোধ করি কি দরকারী কাজ বাকী ছিল—দপ্তরী এসে দাঁড়াতে মনে পড়ল। তাকে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'সব সময় তোমাদের তাগাদা। যাও, দেখছ না এখন একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা

কইছি। আর বলবেন না ভাই, ঐ যে বলছিলেন না জ্ঞানারী—ড ওয়ার্ড।
আপনি কি করেন? ও, আপনিও লেখেন টেখেন? তাই তো বলি। দাঁড়ান
—আপনাব কাজটা সেরে নিই।'

এই বলে উঠে আলমারি খুলে একটি ফাইল বার ক'রে আনলেন। চুপি-চুপি ষড়যন্ত্রকারীর ভঙ্গীতে বললেন, 'তা হলে বলি, লিস্ট আমাদের হয়ে গেছে, আজই ছাপতে যাবে। বড় বিরক্ত ক'রে ব্যাটারা বুঝলেন, ধরপাকড়—ছ্যাঁচড়ামি। তাই অনেক আগেই ছেপে ফেলি আমি—কেউ মানে কোন মেম্বার বলতে এলে বলি—সে তো হয়ে গেছে, খুব দুঃখিত—আসছে বারে একটু সময়ে বলবেন। তা দাঁড়ান, আপনিও যখন একজন লেখক—লেখকের কাছে এসেছেন, আপনার ইজ্জৎটা রাখতে হবে বৈকি। কেটে বসিয়ে দিচ্ছি আপনার বইগুলো।'

দেখলুম, নিজের চোখেই। যে যে বইগুলো উনি রেখে ছিলেন আমার কাছ থেকে, সেই সব ক্লাসের সেই বিষয়ে অন্য যে বইয়ের নাম ছিল তা কেটে আমাদের ফার্মের বইয়ের নাম লিখে নিলেন, লেখকের নাম—সব নিখুঁত।

তারপর প্রসন্ন হেসে বললেন, 'হল?'

আমি হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নেবার একটু ভঙ্গী করতেই উনি বুকে চেপে ধরলেন একেবারে।

* * * *

এর সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। আরও দূরের কটা ইস্কুল ঘুরে বাস-এ ফিরছি। একটা মোড় থেকে আর একটি নিরীহগোছের লোক উঠলেন, ময়লা কাপড়-চোপড়, গোলা গোলা চেহারা। আমাকে দেখেই যেন কেমন উশখুশ করে উঠলেন। আমি প্রমাদ গুণলুম ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গী দেখে কিন্তু এক একটা লোকের মুখ দেখেই মনে হয় না যে—লোকটা বক্তা হবে? অনর্থক গায়ে পড়ে অপরিচিত লোকের সঙ্গে বকবক করতে করতে যায়—বাস-এ, ট্রাম-এ—ট্রেনে? দেখেন নি? আমার দুচোখের বিষ। বাজে বকুনি যত, গভর্ণমেন্টকে গাল, কে কোথায় ঘুষ খায়, মেয়েদের পোশাক, টকি হাউসে ভিড়—এমন প্রসঙ্গ নেই, যা নিয়ে নিজের মতামত আপনার কানে ঠেসে পুরে দেবে না। আমি সেই আশঙ্কা করেই প্রাণপণে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলুম। আড়ে চেয়ে দেখলুম বরানগরের কাছাকাছি একটা স্টপে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। আগের সে গায়েপড়া হৃদ্যতা ভাবের গন্ধও নেই চোখে মুখে কোথাও—দৃষ্টি কঠিন, মুখ অন্ধকার।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—

দিব্যেন্দু চৌধুরী।

ভক্তকে দেখে প্রসন্ন হয়ে আলাপ করতে আসছিলেন—আমি চিনতে পারলুম না। ফিরিয়ে দিলুম।

সর্বনাশ।

আসলে আমার মনে অন্য একটি দুশ্চিন্তা ছিল। তারাদাসদা আমাকে চেপে ধরেছেন—তাঁর দু'খানা বই নিয়ে এই শেষ দিন কটা একটু ঘুরে আসতে। বাস ভাড়া জলখাবার বাবদ যা লাগে তা তো দেবেনই—উপরন্তু এই সাত দিনের জন্যে ত্রিশটি টাকা দেবেন পারিশ্রমিক। তখনকার দিনে—আমি বলছি ১৯৩৫/৩৬-এর কথা—ত্রিশ টাকার মূল্য অনেক।…অথচ আমার কোম্পানীও ছাড়তে চাইছেন না, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রিতে'। বলছেন—এই কটা দিন একটু ঘুরুন বেশ জোর দিয়ে। তাতে দোষ হ'ত না—দুটোই একসঙ্গে যদি সারা যেত। তারাদাসদা বলছেন, ডায়মণ্ডহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে যেতে। এঁরা বলছেন নৈহাটি ব্যারাকপুর—রিষড়া শ্রীরামপুর—এই দিকে ঘুরতে।

আসলে এই দুই প্রান্তকে কি ক'রে মেলাব? কোম্পানীকে কি ক'রে বোঝাব যে, যে পথে একবার গেছি সে পথে গেলে বোঝা যেত কে কেমন কাজ করেছে—এই সবই ভাবছি! এর মধ্যেও ফাঁক থেকে যাচ্ছে একটু, যদি ব'লে বসে, 'তা হলে হাওড়া মেদিনীপুর ঘুরুন।'

এই সমস্যাটা নিয়েই তোলাপাড়া করছিলুম বলে—আর বাজে বকুনির ভয়ে—প্রাণপণে বাইরে বাইরে চেয়ে থেকে অপরিচিত লোকের গায়ে-পড়া হৃদ্যতা এড়াতে চাইছিলুম। নইলে, চেয়ে থাকলে হয় তো একটু পরেই চিনতে পারতুম। কিন্তু সে তো হ'ল—এখন কি করা যায়?

যাব আবার?

যেতেই হবে, নিজের গরজেই যেতে হবে। ম্যানেজারকে বড় গলা ক'রে বলেছি যে অপরের বই কাটিয়ে এতগুলি বই ধরিয়েছি—তিনি সংশয় প্রকাশ করতে বলেছি, 'বেশ তো, ফলেন পরিচিয়তে, দেখুন না, লিস্ট বেরুক।' এখন যদি সব ভেস্তে যায়?

কিন্তু এমনই দৈব। সেই দিনই পড়ে গিয়ে পা মচকে গেল—দুটো দিন বেরুতেই পারলুম না।…মহা মূল্যবান দুটো দিন। ম্যানেজার মালিক হায় হায় করছেন। তারাদাসদা তাঁর স্বল্পাবশিষ্ট চুল ছিঁড়ছেন—কিন্তু আমার উপায় নেই। তৃতীয় দিনে একটু যাবার মতো অবস্থা হতেই ছুটলুম সেই মহাকবির দরবারে। এই দুটো দিন এবং তিনটি রাত ভেবে পথ পেয়েছি একটা। এখন

ভেবে দেখছি, সে দিন আদৌ যে চিনতে পারি নি, সে-ই ভাল হয়েছে। খানিকটা পরে, 'ও মশাই চিনতে পেরেছি। আরে আপনি! আমি অতটা—' এ সব বলে আলাপ ঝালাতে গেলে হিতে বিপরীত হ'ত।

গেলাম। আমাকে দেখে কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল। আপন মনে কাজই করছেন, যেন দেখতেই পান নি।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললুম, 'স্যার।' কাজ থেকে মুখ না তুলেই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বলুন।'

'সে দিন স্যার—আপনার ওপর খুব চটে গিয়েছিলুম। সে দিন আপনি যখন বাসে যাচ্ছিলেন।'

এবার মুখ তুললেন। কিন্তু তখনও দৃষ্টি বিষাক্ত। 'সে দিন তো আমাকে চিনতেই পারলেন না।'

'কে বললে? চিনেই তো মুখ ঘুরিয়ে নিলুম।'

'সে কি!' কলম হাত থেকে খসে পড়ল ভদ্রলোকের। মেঘও অনেক কেটেছে কালো মুখের। সে জায়গায় কৌতূহল স্পষ্ট।

'সে কি?' আবার প্রশ্ন করলেন।

'না, মানে—সে রাগের অর্থ নেই। কিন্তু তখন সত্যিই খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। মনে হ'ল আপনার মতো মহাকবি বাস্-এ যাবেন সাধারণ লোকের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে! তারপর অবিশ্যি ভেবে দেখলুম—করবেনই বা কি! আমার রাগ করাটাই ছেলেমানুষি। দেশের সরকার যদি প্রতিভার মূল্য না দেয়, দেশের লোক যদি দেশগৌরবকে না চেনে—আপনি আর কি করবেন!'

'বলুন! আপনিই বলুন আমি কি করব? তা হলে আমার কোথাও যাওয়াই হয় না। ঐ যে সময় নষ্ট হয়—নিজস্ব গাড়িতে গেলে সে সময় একটু কবিতার কথা ভাবাও তো যায়।'

বেশ তেতে উঠেছেন এবার ভদ্রলোক। আমি আরও তেতে উঠলুম। 'যায় না!…যে লিখতে পারে—

তব কুন্তলের প্রান্ত হ'তে শান্ত মেঘ
পড়িছে ঝরিয়া,
ক্লান্ত আমি প্রিয়া মোর, ভ্রান্ত পথে যায় বুঝি
জীবন চলিয়া—

এমন একটা জিনিস নষ্ট হওয়া মানেই তো ন্যাশানাল লস্!…তা কি করবেন বলুন—সেই ফিরদৌসীর ভাষায় বলতে হয়: রাজা যদি হইতেন রাজার কুমার, মণিময় তাজ শিরে দিতেন আমার।'

ভদ্রলোক অভিভূত হয়ে গেলেন।

'এ লাইন আবার কোথা থেকে পেলেন মশাই? এ যে আমার কুড়ি বছর বয়সের লেখা।...নাঃ, আপনি আমার সত্যিই অনুরাগী পাঠক!'

তারপরই মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল তাঁর।

'আমি কিন্তু আপনার উপর বড্ড অবিচার করে বসে আছি। ইস—'

বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে উঠল একবার। 'আপনি কোন্ দিক দিয়ে গেলেন, আমাকে কত ওপরে তুললেন। আমি এ দিকে আপনার উপর রাগ করে শোধ তুলতে গেলুম। ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত ক'রে বসে রইলুম!'

'কবিরা তো চিরশিশু স্যার!' তবু মরীয়া হয়েই চালিয়ে যাই। সর্বনাশ তো যা হবার হয়েই গেছে।

'এই। আপনিই ঠিক ধরেছেন। আমার মধ্যে একটা ইটারনাল শিশু আছে।...আমি কি করেছি জানেন, আমাদের তো বুকলিস্ট ছাপা হয়ে গেছ্‌ল —আমি সেই দিনই এসে আপনাদের বইয়ের নাম উঠিয়ে নতুন ক'রে লিস্ট ছাপতে দিয়েছি, নিজের খরচে। দেখবেন, এই দেখুন প্রুফ, ফাইন্যাল প্রুফ এসে গেছে, স্পেশাল চার্জ দিয়ে এক দিনে কম্পোজ করিয়েছি—'

এই বলে ড্রয়ার থেকে প্রুফের তাড়াটা বার ক'রে দেখালেন।

অর্থাৎ ছাপা এখনও হয় নি। কতকটা আশ্বস্ত হয়েই বললুম, 'আমি কিন্তু এতে খুব তৃপ্তি পেলুম স্যার!'

'কেন, কেন?' হাসি-মুখেই প্রশ্ন করলেন।

'এতেই প্রমাণ হ'ল যথার্থ কবি-হৃদয় আপনার। কবিরা ইমোশানে ইমপাল্‌সে কাজ করবে না তো কি হিসেব ক'রে ক'রে চলবে, রাগ পুষে রাখবে মনে!'

'মশাই আপনি গুণী লোক, নিজে লেখক, তাই একথা বললেন। কটা লোক ভাবে এ সব কথা? অন্য লোক হলে আমার ওপরেই চটে উঠত।'

অতঃপর মাথা চুলকে বললুম, 'তা হ'লে এটার—মানে প্রুফটার কি হবে?'

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন অকস্মাৎ।

'হবে—কী আবার হবে। এই—।'

দু'হাতে ধরে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ভদ্রলোক—সম্পূর্ণ প্রুফের তাড়াটা।

আমি আরও একটু মাথা চুলকে বললুম, 'তা হলে বলি—কত খরচ পড়েছে বললে আমার ফার্মই ওটা দিয়ে দিত।'

'ক্ষেপেছেন! ও আমি অন্য খাতে খাইয়ে দেব। এ আমার অনুগত প্রেস,

বিস্তর কাজ পায়—তাকে যা বলব তাই করবে।...আপনি যে আমাকে একটা মস্ত অন্যায় থেকে রক্ষা করলেন,—এত বড় একটা অবিচারের অপরাধ মাথায় চেপে থাকত নইলে—এই জন্যই আমি কৃতজ্ঞ। ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন, রাগ ক'রে বসে থাকেন নি।'

আসবার সময় উঠে আবার গাঢ় আলিঙ্গন করলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে এসে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

পূর্ণকুম্ভ

হ্যাঁ—পূর্ণ কুম্ভই বটে। তবে পুণ্যের নয়—দুঃখের। এমন কি প্রায়শ্চিত্তেরও বলতে পারেন।

কী বললেন?...পাপটা কি? পাপ না হ'লে প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

সর্বনাশ! পাপের অভাব কি?

প্রধান পাপ দুটি। এক নম্বর: আমার আত্মীয়স্বজনরা সকলেই কোনমতে দুশো আড়াইশো টাকা রোজগার করেন অথচ তাঁদের বৃহৎ পরিবার—আর আমি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আপনাদের আশীর্বাদে সাড়ে ছশো টাকা মাইনে পাই—পরিবারও ছোট। দুই: তাঁরা কলকাতায় কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকেন আর আমি এলাহাবাদে ফাঁকা জায়গায় বেশ ভাল একখানা বাড়িতে বাস করি। অবশ্য এত কাল আমিও যে কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে অমনি একটা অন্ধকার ফ্ল্যাটে খাঁচায়-পোরা-বানরের মতো বাস ক'রে এসেছি সেটা তাঁরা ভুলে গেছেন। আজ তো মাত্র বছর-চারেক হ'ল বদলি হয়ে এলাহাবাদে এসেছি এবং সাহেবের কৃপায় একটি ভাল কোয়ার্টার পেয়েছি। কিন্তু সেইটেই যে মস্ত অপরাধ। বিশেষ ক'রে এলাহাবাদ এমন একটা শহর যে প্রায়ই বহু লোকের রাজধানী-যাতায়াতের পথে এটা পড়ে এবং সুখ-সৌভাগ্যটা দেখে গিয়ে গল্প করা চলে। যাঁরা আসেন—আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্ব এমন কি বন্ধুবান্ধব জানা-শোনা (তাঁদেরও ঐ ঐ)—দয়া করে এখানেই নামেন, স্নানাহার করেন, তদুপরি টাঙ্গা ভাড়া নিজের গাঁট থেকে দিয়ে তাঁদের দ্রষ্টব্য স্থান দেখাতে হয়, নৌকো ভাড়া দিয়ে ত্রিবেণীতে স্নান করাতে হয়—সুতরাং অধিক বলা বাহুল্য —ফিরে গিয়ে সবিস্তারে আমার 'সচ্ছল' অবস্থার গল্প ক'রে বাকি সকলের ঈর্ষাকে জাগ্রত করা তো তাঁদের কর্তব্যের মধ্যেই। বিশেষ ক'রে অতিথি এলেই বঙ্গললনারা আহার্য্যাদির ব্যাপারে বেসামাল হয়ে পড়েন। 'ওমা, এই দিয়ে কি

বাইরের লোককে খেতে দেওয়া চলে···হ্যাঁ গা—ভাল মাছ পেলে না? কাটরাতে একবার পাঠাবে নাকি জগদেওকে—? যদি একটু মাটন পাওয়া যেত!···তোমরা তো খসরুবাগ যাচ্ছই, আসবার পথে চক থেকে একটু মিষ্টি দই এনো। এ যা খোট্টার দেশের দই—এ কি ওঁরা খেতে পারেন?' ইত্যাদি—ফলে যাঁরা আসেন তাঁরা ভাবেন এই বুঝি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান। তাঁরাও সেই ধারণাটা আবার যথাস্থানে পৌঁছে দেন। এমনি ক'রে পাপ বেড়েই যায়।

কিন্তু পাপ যতই জমা হোক—প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ এতকাল মেলে নি কোন মতেই। আমার যাঁরা সত্যিকার আত্মীয়-স্বজন তাঁদের অধিকাংশই—'সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী' না হোন—বড়বাবুও কেউ নন। সকলেই কোনমতে সংসার চালাতে ব্যস্ত ও বিব্রত। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলে না প্রায় কারুরই। সুতরাং তাঁদের হাওয়া খেতে যাবার মতো বাড়তি পয়সা থাকে না। এমন কি বোনাসের টাকা যা আসে মধ্যে মধ্যে—তার চেয়ে বেশী দেনা সেই ভরসাতেই ক'রে রাখা হয়—এঁরা শুধু চিনির বলদের কাজ করেন মাত্র। আর এমন কিছু দরের মানুষ নন যে দিল্লী যাতায়াত করার প্রয়োজন হবে পরের পয়সায়। অতএব ঈর্ষাতুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?' প্রশ্ন করা ছাড়া উপায় ছিল না এতকাল।

এমন সময় এল এই কুম্ভ। পূর্ণকুম্ভ।

এর কথা আলাদা। এ ঘটনা আলাদা। এ সম্বন্ধে হিসেব-নিকেশও আলাদা।

বিশেষ ক'রে এবারের যোগে এমন সব যোগাযোগ ঘটেছে যা নাকি গত একশো বছরের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কথাটা যদি বা না জানা থাকত, সরকার বাহাদুর সবিস্তারে বিজ্ঞাপন করছেন। জানাচ্ছেন যে কোন-মতে এসে পড়তে পারলে আর কোন অসুবিধা নেই। স্নানের যা সুব্যবস্থা তাঁরা করছেন—হর্ষবর্ধনের আমলের পর আর কখনও তেমন হয় নি।

সুতরাং যেতেই হবে। ভগ্নিপতির ভাই অথবা ভায়রাভাইয়ের মামাকে ধরে যদি রেলের পাস পাওয়া যায় তো ভালই, নইলে বালা আছে হার আছে, ইনস্যুরেন্সের পলিসি আছে, বাঁধা দিলেই যাওয়া-আসার খরচ পাওয়া যাবে। আর, বিশেষ ক'রে সেখানে থাকা-খাওয়ার যখন এক পয়সা খরচ লাগছে না—অমুক তো আছেই—তখন আর এ সুযোগ ছাড়া কি ঠিক?

বহুদিন আগে থেকেই চিঠি আসতে শুরু হয়েছিল। গৃহিণীর মুখ ভার—

আমার মুখ শুকনো। অথচ উপায়ই বা কি? কেউই আমাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন নি, সুবিধে অসুবিধের কথাও জানতে চান নি—শুধু জানিয়েছেন যে তাঁরা অমুক অমুক তারিখে এসে পৌঁচচ্ছেন অতএব নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যেন গিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকি।...বারণ করব? সে কি সম্ভব? তবু পরীক্ষা-স্বরূপ একবার সে ক্ষীণ চেষ্টাও করলুম কিন্তু তার উত্তরে আর এক শুষ্ক চিঠি এল যে তাঁদের যাত্রা বন্ধ হবে না, আমি যেন অনুগ্রহ ক'রে কোন ধর্মশালা-টালায় একটা ঘর ঠিক ক'রে রেখে স্টেশনে অপেক্ষা করি—স্টেশনে যাতায়াতের গাড়িভাড়া তাঁরা পৌঁছেই দিয়ে দেবেন। আশা করেন যে এটুকু উপকার অন্তত করতে পারব।

তা তো বটেই—চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ লোক যেখানে আসছে, আর মোট যেখানে চার পাঁচটি ধর্মশালা, সেখানে এটুকু উপকারে অসুবিধা কি?

অতএব সে চেষ্টা পরিত্যাগ করলুম। যে বাংলোয় আমি থাকি তাতে আমার ভাগে (অর্ধেকে থাকেন এক মাদ্রাজী পরিবার—তাঁদেরও বহু লোক আসছে) মোট চারটি ঘর। স্ত্রীকে নিয়ে এক 'কাউন্সিল অব য়্যাক্‌শ্যন্' বসানো গেল। স্থির হ'ল আমার শোবার ঘর আমি ছাড়ব না—কারণ আমার অফিসের বহু কাজ করতে হয় সেখানে বসে—বরং ড্রয়িং রুমের দামী ফার্নিচার কিছু এনে সেখানে রাখা চলতে পারে, আর বাকি একখানা ছোট ঘরে আমার স্ত্রী ও দুই পুত্র কন্যা থাকবেন। এই দুটো ঘরে যতটা আসবাব ধরানো যেতে পারে ধরিয়ে অবশিষ্ট ছাদে চট চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হবে এবং ড্রয়িং রুম ও বড় শোবার ঘরটা একদম খালি ক'রে দেওয়া হবে। তাতে যে ভাবে থাকতে পারেন থাকুন—আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আরও স্থির করলুম স্টেশনে যাওয়া হবে না, তাতে আত্মীয়রা রাগই করুন আর গোসা-ই করুন। পাঁচ সিকের টাঙ্গা ভাড়া তিন টাকায় উঠেছে—ক্রমে আরও উঠবে। তাছাড়া কোন্ ট্রেন কখন আসবে তা যখন কেউই জানে না, তিন চার পাঁচ ঘণ্টা লেট্ তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (শেষের দিকে ১৭/১৮ ঘণ্টাও কেউ ধরত না)। তখন কাঁহাতক সময় নষ্ট করব? যিনি বা যাঁরা বাড়ি চিনে আসতে পারেন আসুন—নইলে অন্য যে ব্যবস্থা হয় ক'রে নেবেন তাঁরাই—আমাদের দায়িত্ব কি?

তবু—প্রথম স্নানের আগেই দুটি ঘরে জনসংখ্যা দাঁড়াল মোট তেইশ—ছেলেপুলে নিয়ে। আরও বিপদ, প্রথম যাঁরা এসেছিলেন পরমানন্দে দুটি ঘরই দখল ক'রে হাত পা মেলে বসলেন এবং আমার 'খোলা' বাংলোর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু তার পরের দিন আর একদল এসে পৌঁছতে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যাই হোক—তবু কোনমতে সে দিনটাও কাটল

—বহু তকরারের পর মুখগুলি যথেষ্ট ব্যাজার ক'রে তাঁরা দুঘরের তল্পী গুটিয়ে একটা ঘরে সংহৃত ক'রে নিলেন। কিন্তু ধুন্ধুমার বেধে গেল তারপর যখন আর এক দল ক'রে আসতে লাগলেন। বেগতিক দেখে আমি ব্যবস্থা করলুম নিজের ঘরে চাবি দিয়ে ভোরবেলাই অফিস যাবো এবং স্ত্রীকে বললুম দূর থেকে টাঙ্গা আসতে দেখলেই সে যেন নিঃশব্দে পাশের মাদ্রাজী বাড়িতে সরে যায়।—অবশ্য তার ঘরেও চাবি দিয়ে।

কিন্তু আধুনিক বাংলায় একথাও অনস্বীকার্য যে—স্থানের সমস্যাটাই সব নয়। প্রথম অসুবিধাটা মিটে যেতে সকলেই পুনপৌনিক ঘোষণা শুরু করলেন যে 'যদি হয় সুজন তবে তেঁতুল পাতায় ন-জন।'—ঘর না জোটে দালান আছে, এমন কি উঠোনও আছে—রাস্তার চেয়ে তো ভাল। কত লোক তো স্রেফ রাস্তায় শুয়ে আছে। দু-একজন অযাচিত উপদেশ দিলেন, এই বেলা খান-দুই ত্রিপল যেন ভাড়া ক'রে এনে রাখি, এর পর তাও পাওয়া যাবে না। আরও যদি লোক আসে, ঘরদালানে তো তিল-ধোবার ঠাঁই নেই, আর এটা তো ঠিক যে গলাধাক্কা দেওয়া যাবে না—তখন সত্যিই বাগানে তাঁবু ফেলা ছাড়া উপায় কি? ইত্যাদি—। কিন্তু আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। রাস্তাতেই থাকুন আর লাটপ্রাসাদেই থাকুন, খাওয়াটা যে চাই সে সম্বন্ধে কারও কোন উদ্বেগ দেখা গেল না, অর্থাৎ সেটা যে আমার দায়িত্ব তা যেন বেদ-বাইবেলের মতোই শাশ্বত সত্য। সংক্রান্তিটা কোনমতে চালানো গিয়েছিল, চূড়ামণি যোগের স্নান সেরেই গৃহিণী নোটিশ দিলেন যে তাঁর হাত একবারে খালি, আমি যেন আজই 'কিছু ব্যবস্থা' করি।

'সে কি গো?' এটা একেবারেই যে ভেবে দেখি নি তা নয়, কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি? সত্যিই যেন আকাশ থেকে পড়ি, 'মোটে তো মাসের আঠার দিন আজ!'

'তা আমি কি করব বলো! লোক কতগুলি খাচ্ছে বলো দিকি? দুবেলা পঁয়ত্রিশ দুগুণে সত্তর। আমি কি আশমান থেকে এনে যোগাব?···না কি দ্রৌপদীর থালা আছে আমার কাছে?'

যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আমিই বা কি করি? এই তো কলির সন্ধ্যা। এখনও আসল স্নান—অমাবস্যার স্নানই বাকি!

আমাকে নিরবে তাঁর ঝঙ্কার সহ্য করতে দেখে গৃহিণী বোধ করি একটু নরম হলেন, কিছু কোমলকণ্ঠে বললেন, 'তুমি আর কি করছ! আমাদের হরিকেশববাবুর কথা ধরো দিকি। ঐ তো পত্রিকা অফিসের চাকার—দেড়শো দুশো টাকা মাইনে পান ভদ্রলোক। কোনমতে দুখানা খোলার ঘরে মাথা

গু জে থাকেন—তাতেই সতেরজন এসে উঠেছে। কাল ওঁর স্ত্রী এসেছিলেন আমার কাছে বালা বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করতে। বলে আমিই কোথায় কী বাঁধা দিতে যাই তার ঠিক নেই—আমার কাছে এসেছেন উনি।'

'তুমি কি বললে?'

'বললুম পোদ্দারের দোকানে যেতে—তা নইলে কেউই এখানে দিতে পারবে না। কী হিন্দুস্থানী কী মাদ্রাজী সকলেরই তো এক অবস্থা।'

তা বটে!

তবু একথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া চলত যে অবস্থানের অবস্থাটা এক হ'লেও আতিথ্যের ব্যবস্থাটা এক নয়। মাদ্রাজী পাঞ্জাবী বিহারী—কোন দেশের লোকই বাঙালীর মতো অবাঞ্ছিত অতিথির আহারের ব্যবস্থায় এতটা 'আদিখ্যেতা' করেন না। বরং খরচা কমিয়েই ফেলেন। কিন্তু এসব কথা বলে কোনই লাভ নেই—লোকসান আছে। যেটুকু শান্তি এখনও আছে সেটুকুও যাবে।

বরং রসিকতা ক'রে বলি, 'দ্রৌপদীর থালা পাওয়া কঠিন কিন্তু দ্রৌপদীর পদ্ধতিতে যদি আয়টা পাঁচ গুণ ক'রে ফেলতে পারো তো মন্দ হয় না।'

গৃহিণী আবারও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'ওসব ন্যাকামো করবার আমার সময় নেই। আমি মরছি নিজের জ্বালায়—উনি বসলেন রসিকতা করতে। রস উছলে উঠছে একেবারে!'

অগত্যা চেপে যেতে হয়। যত জ্বালাতন ওঁরই। ঠাকুর চাকর আছে—আর একটি বেড়েছে এই ক'দিনের জন্য—তাতেও উনি জ্বালায় মরছেন আর আমাকে যে নিজের ঘর থেকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে সেটা কিছু নয়!

কিন্তু রাগ অভিমানেরই বা সময় কই। টাকা চাই এখনই।

পোস্ট অফিসে ক'টা টাকা ছিল দুর্দিনের জন্যে। তাই থেকে আড়াইশো টাকা এনে গৃহিণীর হাতে দিয়ে বললুম, 'এইতেই চালাতে হবে এই ক'টাদিন।'

'ও মা এতে কী হবে? এ তো পাঁচ দিনের খরচ। জিনিসপত্র দিন দিন যেরকম দুর্মূল্য হচ্ছে—পাঁচদিন চললে হয়। এতগুলি তোমার গেস্ট আসবে যখন জানোই, আগে থাকতে মালপত্র কিনে স্টক করা উচিত ছিল!'

আবারও অনেক কষ্টে চুপ ক'রে থাকতে হ'ল। অতিথি সব আমার তরফের নয়—তাছাড়া তিনিও যেমন জানতেন আমিও তেমনি জানতুম; এমন শুভ খবরটা আগে জেনেও চুপ ক'রে ছিলুম এ অভিযোগের কোন কারণ নেই। এতগুলি প্রাণীর চাল-ডাল-ঘি-তেল-আটা-ময়দা-আলু কিনে রাখতে

গেলেও আর একটা বাড়ি ভাড়া করতে হ'ত—ইত্যাদি অনেক কথাই বলা চলত, কিন্তু বলব কাকে? শুধু শুধু মেজাজ খারাপ ক'রে লাভ কি?...

অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে পরের দিন অফিসে গেলাম। ভোর বেলা এক গ্লাস (কাপ সব ভেঙেছে) কড়া চা ও খানিকটা পুলটিশ (হালুয়ার অপভ্রংশ—আমার খোকা এই নাম দিয়েছে পদার্থটার) খেয়ে অফিস যেতে হয়, তারপর বাড়ি থেকে ভাত যাবার কথা কিন্তু সে যে কখন যাবে তার ঠিক নেই। চাকরের সময় হওয়া চাই তো! বাড়ির কর্তাকে খাবার পৌঁছানো-রূপ অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় কাজ ছাড়াও তো ঢের কাজ আছে তার! অফিসের ধারে-কাছে কোন দোকান নেই—কারণ এটা 'সিভিল লাইন্‌স্‌'। সাইকেল-পিওন পাঠানো চলত কিন্তু রাস্তাঘাটে এত ভীড় যে একবার কাউকে বাইরে পাঠালে তিন ঘণ্টার আগে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই। তাতে অফিসের কাজের ক্ষতি হয়। গতকাল এই পুলটিশ খেয়েই সারাদিন কাটাতে হয়েছে—আজও হয় তো তাই হবে। আরও কতদিন এ ভাবে কাটাতে হবে তা জানি না। অমাবস্যার স্নান না ক'রে যে কেউ নড়বেন না, এ নোটিশ আগেই পেয়েছি। তার পরেও কি খালি হবে?.. আর খরচ—হে ভগবান!...কী কুক্ষণেই এখানে বদলি হয়েছিলাম।

কিন্তু ভগবান বোধ করি স্থানে থেকেই কানে শুনলেন, সবে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে যাচ্ছি (আজকাল সব অফিসেই বোধ হয় এ কর্মটা নিজেদের ক'রে নিতে হয়!)—বেয়ারা এসে সেলাম ক'রে জানালে, ছোট সাহেব ডাকছেন।

ছোট সাহেব অর্থাৎ শাম্বমূর্তি। তাঁর আবার কী চাই?

আরও বিরক্ত মুখে গিয়ে ঠেলা-দরজা খুলে তাঁর ঘরে ঢুকলুম।

'আমাকে ডেকেছেন?'

শাম্বমূর্তি বসতে ইসারা ক'রে বললেন, 'মিঃ চৌধুরী, বড় বিপদে পড়েছি! আজই একজনকে মোরাদাবাদ যেতে হবে,—ওখানকার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার জোয়ালাপ্রসাদের হার্ট য়্যাটাক্ হয়েছে, তাঁর ডেপুটি জোন্‌স্‌-এর মোটর য়্যাক্‌সিডেণ্টের খবর তো পরশুই পেয়েছি—এইমাত্র টেলিফোন এসেছে, নিজে থেকে চার্জ বুঝে নিতে পারে এমন একজন এফিসিয়েন্ট লোক যাওয়া চাই—অন্তত যতদিন না জোয়ালাপ্রসাদ একটু সুস্থ হচ্ছে। দিল্লী থেকে চক্রবর্তীকে আনিয়ে নিতে পারি কিন্তু তারও স্ত্রীর অসুখ শুনেছি, এখনই কি আসতে পারবে?'

কম্‌প্লিমেণ্টটা আমার প্রাপ্য বলেই মনে করি তবু বিনয় দেখিয়ে বললুম,

'আমি কি পারব ? বরং নটরাজন্‌কে—'

'না না—'প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে শাম্বমূর্তি, 'নটরাজনের কাজ নয়। আপনি যদি পারেন তা হ'লেই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু পারবেন কি ?'

পারব ? পা বাড়িয়ে বসে আছি! বলে কি লোকটা!

কোনমতে অন্তরের উল্লাস চেপে রেখে উদাসীন ভাবে বললুম, 'পারতেই হবে। অফিসের ইন্টারেস্ট সবার আগে।'

শাম্বমূর্তি বললেন, 'অলরাইট। আমি এখনই আপনার বার্থের ব্যবস্থা করছি। আজই বিকেলের গাড়িতে যেতে পারবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই।'

বলা বাহুল্য, বাড়িতে ফিরে গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

'বাঃ, বেশ ত! খুব আক্কেল তো তোমার। আমাকে এই আতান্তরে ফেলে সরে পড়ছ! এমন স্বার্থপর তুমি ?'

'ঐ নাও! এ কি আমি শখ করে যাচ্ছি ? অফিসের কাজ—সাহেবের হুকুম। না গেলেই চলবে না। একজনের হার্ট য়্যাটাক আর একজনের য়্যাকসিডেন্ট—কী করব বলো। চাকরি তো আগে!'

'ঢের হয়েছে। এই চোদ্দ বছর ঘর করছি—তোমাকে আর আমি চিনি নি ? পুরো ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে এই বোঝাটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি হাওয়া খেতে চলেছ! বেশ তো যাও না—আমার কি, আমিও যেদিকে দুচোখ যায় সরে পড়ব।'

কিন্তু তা হোক। তাঁকে আমিও এতকালে ঢের চিনেছি। ঘর-সংসার ফেলে 'যে-দিকে দুচোখ যায়' চলে যাবার মানুষ নন তিনি। তাছাড়া—'এ রোষ রবে না চিরদিন!'

গম্ভীর মুখে অপটু হাতে বাক্স গোছাতে চেষ্টা করতেই তিনি আর থাকতে পারলেন না—বিনাবাক্যে বাক্সটা টেনে নিয়ে দরকারী জিনিস সব গুছিয়ে দিলেন। মায় শিশিতে ক'রে ঈষবগুলের ভূষি, সুপুরি মশলা কিছুই ভুল হ'ল না। লেপ তোশক টানাটানি ক'রে হোল্ডঅলটাও গুছিয়ে বেঁধে দিলেন অর্থাৎ অর্ধেক সন্ধি তখনই হয়ে গেল। বাকি অর্ধেকটা হ'ল একেবারে যাত্রার সময় —আর থাকতে না পেরে অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে যখন বললেন, 'খুব সাবধানে থেকো। গাড়িতে না ঠাণ্ডা লাগে। মাফ্‌লারটা ওভার কোটের পকেটেই রইল।'

সবে শান্তিতে চার পাঁচটা দিন মোরাদাবাদে কাটিয়েছি—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো চিঠি এল—'তোমার শোবার ঘরটিও কাল খুলে দিতে হ'ল। তোমার বাঁকুড়ার কুটুম্বের দল এসে হাজির হলেন—এগারো জন। কোথায় জায়গা দিই বলো? সত্যিই তো আর পথ দেখিয়ে দিতে পারি না। একটা ঘর খালি থাকতে—কী-ই বা বলি তাঁদের? যাই হোক তোমার বিছানাটা গুটিয়ে রেখেছি, যদি এর ভেতর ফিরে এসো তো সিঁড়ির চাতাল ভরসা, একটা লোকের মতো বিছানা পড়তে পারবে। এখন সেখানে জগদেও আর শিউশরণ শুচ্ছে, ওরা অন্য কোথাও তখন মাথা গুঁজে থাকবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুসংবাদ বটে!

আমার কুটুম্ব মানে ওঁয়ার আত্মীয়। নিশ্চয়ই তাই—কারণ বাঁকুড়ায় আমার কোন আত্মীয় আছে বলে তো আমার জানা নেই। ওঁর আত্মীয় বলেই আমার শোবার-ঘর খুলে দিয়ে আমার জন্যে সিঁড়ির চাতাল ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মেয়ে-মানুষ জাতটাই এমনি বটে। বাপের বাড়ির লোক এল তো, ব্যস! মাথা খারাপ হয়ে গেল। ছোঃ! ঐ একটা ঘরও বাঁচিয়ে রাখা গেল না? টাকার ব্যবস্থা করবার সময় শুধু আমি—বাড়িতে বা সংসারে আর আমার কোন অধিকার নেই!

চিঠির শেষে আরও একটি খোস্ খবর ছিল—'তোমার দেওয়া টাকা ফুরিয়ে প্রায় দেড়শ টাকা ধার হয়ে গিয়েছিল—কাল আমার নামে যে কটি টাকা ছিল পোস্ট অফিসে সব তুলেছি। কিন্তু তাতেও তো কুলোচ্ছে না। তুমি কবে নাগাদ ফিরতে পারবে? যদি পয়লার মধ্যে না ফেরো তো অফিসে চিঠি লিখে দিও, পয়লা তারিখেই যেন মাইনের টাকাটা আমাকে পাঠিয়ে দেয়!'

তা দেব বৈকি! তার কম আর নেশা জমবে কেন! সারা মাসের মাইনেটি উনি দয়া ক'রে পাঁচ দিনে খরচ করবেন, তারপর মর্ শা—তুই!

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল চিঠিখানা পড়ে। এমনিই অদৃষ্ট বটে। কোথায় এই কঠোর বিরহ-দশায় কান্তার প্রণয়-লিপি পড়ে প্রাণ জুড়িয়ে যাবার কথা, না আমার সারা দেহে-মনে কে যেন আরও বেশী ক'রে বিষ ছড়িয়ে দিলে!

থাকুন তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে—যেখান থেকে পারেন খাওয়ান। আমি ওর মধ্যে নেই।...ফিরবও না—টাকাও পাঠাব না। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলুম।

কিন্তু আসল লড়াইটা যে আমার ভাগ্যের সঙ্গে সেটাই ভুলে গিয়েছিলুম। চরম মারটা এল একত্রিশে জানুয়ারী—জোয়ালাপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে অফিসে দেখা দিলেন এবং হেসে বললেন, 'যান আপনি, আপনাকে আর

অনর্থক আটকাবো না। এই যোগের সময় বাড়ি ঘর ফেলে এসেছেন—আপনার যা মনের অবস্থা বুঝতে পারছি তো?'

আনন্দে বোধ করি আমার মুখ কালিই হয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বেগ এনে বললুম, 'কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি করলেন কেন? যদি আবার রিল্যাপ্‌স্‌ করে?'

'না না—সে ভয় নেই। খুব সিরিয়াস্‌ কিছু তো হয় নি। ডাক্তার প্রথমটা অকারণেই ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া আমি খুব সাবধানেই আছি। আর জোন্‌স্‌ও হাসপাতাল থেকে পরশু ছাড়া পেয়েছে—দু-একদিনের মধ্যেই জয়েন করবে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।'

শুধু তাই নয়, ট্রেনে ফেরার অসুবিধা হবে বলে তিনি এয়ার প্যাসেজ বুক করিয়ে দিলেন। আমি যে তাঁর অসুখের খবর পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছিলুম, এর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পয়লা ফিরলুম। পথ-ঘাট প্রায় বন্ধ—গাড়ি-ঘোড়া এমন ঘুরিয়ে দেবার ব্যবস্থা যে কুড়ি মিনিটের পথ পৌঁছতে পৌনে দু ঘণ্টা লাগল। বিরক্তির অন্ত নেই। মন তো যথেষ্ট বিরূপ হয়ে ছিলই এখানে এসে ভীড়ের ব্যাপার দেখে আরও বেশী বিরূপ হয়ে উঠল। বাড়ির দোরে নেমে মনে হ'ল এ কার বাড়িতে এলুম? আমার সাধের ফুলগাছগুলি নিশ্চিহ্ন—তার ওপরে খড় বিছিয়ে আর চট্‌ টাঙিয়ে ডেরা-ডাণ্ডা পড়েছে। কতক লোককে চিনি, কতককে কখনও দেখেছি এর আগে বলে মনে পড়ল না।

সবচেয়ে—গৃহিণীর টিকিও দেখতে পেলুম না। রিকশা থেকে নেমে 'জগদেও' 'জগদেও' ক'রে হেঁকে হেঁকে গলা প্রায় যখন ফাটিয়ে ফেলার উপক্রম করেছি তখন হঠাৎ কোথা থেকে তিনি একবার সেই জনারণ্যে আবির্ভূতা হলেন চকিতের জন্যে। 'ও, তুমি এসেছ—বাঁচলুম। একটা পয়সা হাতে নেই—সুরয-প্রসাদ ধার দিচ্ছে তাই—নইলে কী যে করতুম।...একেবারে সিধে ছাদে চলে যাও, সিঁড়িতে একটা ছোট্ট ক্যাম্প-খাট পেতে তোমার বিছানা ক'রে দেবে এখন জগদেও। তোমার বাক্সটাও সেই খাটের নিচে রাখবে, বুঝলে? স্নানের জল-টল সব ছাদেই পৌঁছে দেবে—এ যা অবস্থা হয়েছে, সাক্ষাৎ নরককুণ্ডু, নিচে আর তুমি কোথাও যাবার চেষ্টা ক'রো না।'

ব্যাস! পরমুহূর্তেই তিনি অদৃশ্য।

ছেলেমেয়ে দুটোকেও দেখতে পেলুম না। কোথায় গেছে কে জানে। তাদের দিকে কী আর নজর দেবার সময় আছে তাদের মায়ের?

যাই হোক অতি কষ্টে তো জগদেও এসে উদ্ধার ক'রে নিয়ে গেল

সিঁড়ির চাতালে। আগেকার প্রশস্ত সিঁড়ি, কাজেই চাতালটিও লম্বা-চওড়া। একটি ছোট্ট মিলিটারী ক্যাম্প-খাট বেশ ধরে। মনে পড়ে গেল এটি যুদ্ধের পর ডিস্‌পোজাল থেকে কিনেছিলাম। আমার অবশ্য মনে ছিল না—গৃহিণী কিন্তু খুঁজে বার করেছেন ঠিক। নিজেদের বাপের বাড়ির স্বার্থে মেয়েদের মাথা অসম্ভব খুলে যায়।

স্ত্রী যদিও নিচে নামতে বারণ করেছিলেন তবু স্নানাদি সেরে একবার নামলুম। যা বর্ষা নেমেছে—ছাদের সিঁড়ি স্থানটিও খুব আরামদায়ক নয়। এই শীতে বর্ষা, সমস্ত মন খিঁচড়ে দেবার পক্ষে এই টুকুই যথেষ্ট।

নামবার উদ্দেশ্য অবশ্য আর একটাও ছিল। আমাকে স্থানচ্যুত করে গৃহিণী তাঁর যে সব আত্মীয়দের ঢুকিয়েছেন তাঁরা কেমন সেটাও দেখা প্রয়োজন। কিন্তু ভীড় ঠেলে এসে দোরের কাছ থেকে উঁকি মেরে যা দেখলুম তাতে মনে হ'ল গুরুজনের নির্দেশটা অমান্য করা ঠিক হয় নি। নিচে না নামাই উচিত ছিগ। ডিসটেম্পার করা দেওয়াল পানের পিচ ও শীতকালীন কফে ইতি-মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, নতুন ড্রেসিং টেবিলে চুন মোছার চিহ্ন, আমার কাজ করার ছোট সেক্রেটারিয়াট টেবিলটায় ভিজে জামা ও কাঁথা শুকোচ্ছে। ভাল ভাল দামী আসবাব লণ্ডভণ্ড—কাগজপত্রের যা অবস্থা হয়েছে তা ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতেও পারলুম না একবার সেদিকে চেয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল তাদের পরিণাম আশঙ্কা ক'রে।

নিঃশব্দেই সরে আসছিলুম কিন্তু সে দলের যিনি কর্তা—বেঁটে-খাটো টাক-মাথা ভদ্রলোকটি, মেঝেতে আমারই কার্পেটখানি পেতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন —হঠাৎ আমাকে দেখে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স-কলরবে অভ্যর্থনা জানালেন, 'এই যে বাবাজী এসো এসো—উঁহু, অমন ক'রে পালিয়ে গেলে চলবে না। বসো—অবশ্যি কোথায়ই বা বসবে—তা হোক। আমরা তো তোমার পর না, বিশেষ আপন যে। তোমায় দেখেই চিনেছি। তুমিই আমাদের অরুণ বাবাজী তো? দ্যাখো এমনিই অন্তরের টান। চোখে কখনও দেখি নি কিন্তু তাতে কি চেনা আটকায়? বাবাজী, দেখাশোনা নেই তাই। সম্পর্কটা খুবই কাছাকাছি। তোমার শ্বশুর মশাই আমার পিসিমার আপন দেওয়রপো। বুঝলে এবার?'

বুঝলুম না—বোঝবার চেষ্টা করবার মতো মনের অবস্থাও নয়। বিয়ের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন জ্যাঠ্‌শাশুড়ীর খবর শুনেছি বলে মনে পড়ল না। কিন্তু সেই ভীড়ে গোলমালে ও মানসিক অবস্থায় তলিয়ে বোঝবার মতো উদ্যমই বা কোথায়? শুধু এইটুকুই মনে হ'ল যে এঁদের বাড়ি বাঁকুড়ায়

লিখেছিলেন গৃহিণী। কিন্তু সে রকম টান তো কোথাও খুঁজে পেলুম না। মরুক গে, তাঁর আত্মীয় তিনি বুঝবেন।

কোনমতে মুখের কাষ্ঠহাসি বজায় রেখে একটা ছুটো প্রণাম সেরে আবার নিজের কোটরে ফিরে এলুম···

পরের দিন সকালে উঠেই অফিসে পালালুম কিন্তু তবু এর ভেতরেই একটা জিনিস নজর এড়াল না যে গৃহিণীর এই আত্মীয়দের জন্য আহারাদিরও যেন একটু বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের তো সেই সনাতন হালুয়া নামধারী পুলটিশ বরাদ্দ কিন্তু ওঁদের ঘরে যে জলখাবার গেল তার সঙ্গে দেখলুম কিছু পেঁড়াও আছে। আবার জগদেওর মুখে শুনলুম যে ওঁরা মাছ ছাড়া খেতে পারেন না বলে আর কারুর জন্যে না হোক—ওঁদের জন্য এই ছুর্দিনেও মাছ আনানো হচ্ছে, বহু ছুঃখে, বহু আয়াসে।

তা হবে বৈকি!

হালুয়ার থালা স্পর্শ করতেও প্রবৃত্তি হ'ল না। কোনমতে চা-টুকু গলাধঃকরণ ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। যদিও পরে রাস্তায় এসে অনুতাপ হ'তে লাগল—গৃহিণী তো ত্রিসীমানাতেও ছিলেন না, কাল থেকে পরমব্রহ্মের মতোই ছুর্লভ হয়ে রয়েছেন, রাগটা দেখতেও পেলেন না,—মিছিমিছি আমিই খালি পেটে বেরুলাম। সারাদিনে আর কিছু হয়ত জুটবেও না।

গৃহিণীর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা হ'ল একেবারে পরের দিন ন-টা নাগাদ। তখন সবাই স্নানে চলে গেছেন, বাড়ি খালি। শুধু আছে ক্লান্ত ঝি চাকর, আমার ছেলেমেয়ে এবং আমরা ছুটি প্রাণী।

রাত্রি জাগরণে আরক্ত চক্ষু, পরিশ্রমে শীর্ণা প্রেয়সীকে দেখে ছুঃখ হবার কথা কিন্তু আমার উষ্মা শতগুণে বেড়েই গেল। সেদিন অফিস বন্ধ, সুতরাং পালানোরও কোন সুবিধা নেই—এই স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা, নিরানন্দময়, নরকসদৃশ বাড়িতেই আটক থাকতে হবে—উপায় কি!

গৃহিণী বিনা ভূমিকাতেই বললেন, 'হ্যাঁ গা—আমরা চান করতে যাবো না?'

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলুম, 'তোমার খুশী হয় যেতে পারো। চাকরবাকরদের যদি সময় হয় তো দয়া করে একটু গরম জল দিতে বলো—আমি বাড়িতেই স্নান সারব।'

'তা তো বলবেই। আমি খালি তোমার বাড়িতে বাঁদীগিরি করতেই এসেছিলুম, না? ক-দিনে হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল বাবা। ওঁরা এসে চান ক'রে পুণ্যি সঞ্চয় ক'রে যাবেন তার জন্যে আমি ধনে প্রাণে মলুম অথচ এখানে

থেকেও আমার একটা ভুব হবে না। বেশ, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় তাই করো। আমার আবার বার-তিথি, আমার আবার দিনক্ষণ!'

'তোমার যে আত্মীয়দের সেবা করছ এত ক'রে, তাঁদের পুণ্য হচ্ছে তো। তাতেই তোমারও কিছু হয়ে যাবে। পুণ্যবানের সেবা করলেও পুণ্য হয়।'

আমার কণ্ঠে বিদ্রূপের সঙ্গে যে কিছু জ্বালাও ছিল সেটা আমি স্বীকার করি। তবে তাতে উপকারও হ'ল বৈকি! কোথায় গেল গৃহিণীর শ্রান্তি আর কোথায় গেল অবসন্নতা। তিনি ফোঁস ক'রে রুখে উঠলেন, 'আমার কিসের আত্মীয়? চোদ্দ পুরুষের আত্মীয় আমার! আমার কে এসেছে তাই শুনি? এক তো দাদার শাশুড়ীরা তিনটি প্রাণী, তা তাঁদের তো ঘরে ঠাঁই দিতে পারি নি—এই শীতে বর্ষায় বাগানে পড়ে রয়েছেন। বলি কী দরকার বাবা—যার বাড়ি যে খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, তারই আত্মীয়দের ক্লেম আগে। আর সইমা—? তা সে তো তোমাদেরও দূর সম্পর্কে আত্মীয় হয় বাবা!···আমার আর কে আছে তাই শুনি? তোমারই তো সাতগুষ্টি!'

'বটে!' এই ক'দিনের সমস্ত বিষ গল্‌গল্‌ ক'রে বেরিয়ে এল, 'আর ঐ যাঁদের জন্যে আমার ঘরখানি খুলে দিয়েছ—জামাই-আদরে রাজ-আদরে কদিন ধরে বসিয়ে খাওয়াচ্ছ—তাঁরা?'

'অ! ওঁরা আমার আত্মীয়? তাই আদরে খাওয়াচ্ছি? আমার কোন চোদ্দপুরুষের লাউখোলা সেটা শুনি? জেনে রাখি।···তোমার নিকট-আত্মীয়, পাছে পরে তোমার বদনাম হয় সেই জন্যেই আমার অত করা। নইলে আমার কি স্বার্থ। আমি বুঝি আমার আত্মীয়দের জন্যে ঘর খুলে দিয়ে তোমাকে বার ক'রে দিয়েছি! বেশ বিচার বটে। বাঃ!'···ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।

কী রকম হ'ল?

সোজা হয়ে উঠে বসি। বলি, 'আমার কিসের আত্মীয়? ঐ বুড়োটা তোমার—কে যেন—হ্যাঁ মনে পড়েছে, তোমার বাবার জ্যাঠাইমার ভাইপো হয় না?'

'তোমার বাবার জ্যাঠাইমার ভাইপো হয়—আমার কে?'

'সে কি! কাল আমাকে স্পষ্ট বললেন ভদ্রলোক, ওঁর পিসিমার সাক্ষাৎ দেওর-পো ছিলেন আমার শ্বশুরমশাই!'

'পোড়া-কপাল আমার বাবার! ঐ রকম আত্মীয়? আর হ'লেও আমি ঝ্যাটা মেরে বিদেয় করতুম। তোমার আপনার লোক বলেই দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করছি!'

'রোস-রোস। ব্যাপারটা কি বলো দিকি। তুমি ওঁদের চেন না?'

'সাতজন্মে কখনও দেখি নি, তা চিনব কি?'

'সে কি ?...তবে অমনি অচেনা লোককে ঘর খুলে দিলে ?'

'তা আমি কি জানি। এসে তোমার নাম ক'রে বললে, অমুক কোথায় ? আমার চিঠি পায় নি ? কী সর্বনাশ !...এখন জায়গা নেই বললে আমরা কী করব। আমাদের তাহ'লে আগে লেখা উচিত ছিল।...সে কী রাগারাগি। তারপর আমাকে ডেকে বললে, বৌমা আমরা ওর পর না—খুবই আপন। আমার পিসিমার নিজের দেওরপো ছিলেন তোমার শ্বশুরমশাই। ওর ঘরটাই খুলে দ্যাও—সে কিছু মনে করবে না।'

'তা আমার ঘর যে চাবি দেওয়া আছে তাই বা বলতে গিছলে কেন সাত-তাড়াতাড়ি ?'

'আমি বলতে যাবো কেন ? তার আগেই ঘুরে দেখে তালা টেনে শিউ-শরণকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে গেছে।'

'কী সর্বনাশ ! এ যে জালিয়াতি !' কী বিশেষণে এ আচরণকে অভিহিত করব তা ভেবে পেলাম না। জালিয়াতি শব্দটাই আগে মনে এল।

এক মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। তখমই আবার কাউন্সিল অব্ য়্যাকশন্ বসানো গেল ··· এখন কি কর্তব্য ?

আমি বললুম, 'ফিরুক সঙ্গম থেকে। যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেব।'

গিন্নী চিন্তিত মুখে বললেন, 'কিন্তু দ্যাখো সে আর একটা কেলেঙ্কারী ! সব জানাজানি হয়ে যাবে—হাসাহাসি করবে সবাই। আমাদেরই বোকা বলবে—এ অবস্থায় হয়ত সকলেই এমনি বোকা বনত কিন্তু এখন তো চোরের দায়ে ধরা পড়ব আমরা। তা'ছাড়া চান তো হয়েই গেল—এখন আর একদিন দু'দিনের জন্য গোলমাল ক'রে লাভ কি ? এবার যাবেই তো—আজ নয় কাল।'

'আমরা' নয়—উনিই বোকা বনবেন—এই ওঁর ভয়। কিন্তু এতদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ঐকতান বেজেছে তাকে আর নষ্ট করতে চাইলাম না সত্য কথা বলে। তার চেয়ে কিল খেয়ে কিল চুরি করা ঢের সহজ।

সুতরাং চিরকাল সব স্বামী যা ক'রে এসেছেন আমিও তাই করলাম—তাঁর মতেই সম্মত হলাম।

স্নান সেরে দেড়টা-দুটো নাগাদ একে একে সবাই ফিরতে শুরু করলেন।

বাগানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আহারাদি সেরে স্টেশনের দিকে যাবেন এই ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সম্বন্ধীর শ্বশুরবাড়ি থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটি বিধবা—দুজনেরই অমাবস্যার উপবাস। কর্তব্যবোধে একবার তবু

স্মরণ করাতে গেলাম কথাটা—'কাল বরং দুটি ভাত মুখে দিয়ে গেলেই তো হ'ত। কতদিনে পৌঁছবেন তার ঠিক কি। আপনারা তো আবার গাড়িতে খাবেন না।'

সম্বন্ধীর শাশুড়ী যিনি, গৃহিণীর মাউই-মা—তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না বাবা—কাল থেকে ভিড় আরও বাড়বে। খুব শিক্ষা হয়েছে কুম্ভে চান করতে এসে, শরীর গেল, মালপত্র অপ্‌চ—এখন ভালয় ভালয় গুরুর কৃপায় ফিরতে পারলে বাঁচি। আর মেয়েটারও যা হাল হচ্ছে—ভিড় কাটিয়ে না দিলে ও একটা শক্ত অসুখে পড়বে।'

মেয়েটা অর্থাৎ আমার স্ত্রী। কৃতজ্ঞ-চিত্তে চুপ ক'রে রইলাম। গৃহিণীও তাড়াতাড়ি খানিকটা পানফলের আটার হালুয়া ক'রে মিষ্টি আনিয়ে ওঁদের খাইয়ে দিলেন। যত ঝামেলা কমে।

যাঁরা ঘরে ছিলেন অর্থাৎ প্রথম স্নানের পূর্ব থেকে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে একদল শ্রীপঞ্চমীর পরে যাবেন আগে থেকেই ঘোষণা ক'রে রেখেছিলেন, বাকি যাঁরা তাঁদের মধ্যেও ছোট একদল আহারাদির পরই স্টেশন রওনা হয়ে গেলেন। যখন যে ট্রেন পান—তাঁরা স্টেশনেই অপেক্ষা করবেন। বাকি আর এক দলের মুরুব্বী যিনি, তিনি আমার সাইকেলখানা সংগ্রহ ক'রে স্টেশনে গেলেন। উদ্দেশ্য যাওয়ার সুযোগ-সুবিধে খোঁজ করা। এখনই না গেলেও শীগগিরই যে যাবেন—সে আশ্বাস প্রকারান্তরে দিয়ে দিলেন।

শুধু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোন ব্যতিক্রম দেখলাম না সেই বাঁকুড়ার আত্মীয়দের। একেবারে দেখলাম না তাও বলা যায় না—একটু যেন বিরক্তই। গৃহিণীর কাছে শুনলাম—সঙ্গমে যাওয়ার গাড়িঘোড়া ব্যবস্থা ক'রে দিই নি বলেই তাঁদের এই বিরক্তি। সকালে একটু রাগই করেছিলেন।

কিন্তু যাওয়া? না—সে রকম কোন কথাই তোলেন নি।

অগত্যা গুটি গুটি নেমে এসে নিজের ঘরের সামনেই অবাঞ্ছিত অতিথির মতো সসঙ্কোচে দাঁড়াতে হ'ল। সেই ভদ্রলোক তেমনি প্রশান্ত মুখেই তামাক টানছেন বসে। আহারাদি বোধ করি ভালই হয়েছে—নিরতিশয় তৃপ্তির ছাপ।

'এই যে বাবাজী এসো। আহারাদি হয়েছে?' সৌজন্যের কোন অভাব এ পক্ষে অন্তত নেই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তারপর মরীয়া হয়েই বলে ফেলি, 'আপনাদের তো বোধ-হয় আজ যাওয়াই সুবিধা। কাল থেকে তো আরও ভিড় বাড়বে।'

'আজ?...তুমি ক্ষেপেছ বাবাজী! সে স্টেশন তো শুনছি লোকে

লোকারণ্য—সকাল থেকেই অনেকে জমছে। তোমার মতো চালাকের তো অভাব নেই।···হেঁ হেঁ···। না—এখন দশ-বারোদিন আর ও চেষ্টাই করব না। আর আমাদেরও তেমন তাড়া নেই। এলাহাবাদ শহরটা তো ভাল ক'রে দেখাই গেল না ভিড়ের চোটে। একটু ঘুরে-ফিরে দেখি—সে হবে'খন—তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না। বরং ওঁরা সরে পড়লে আমরা ঐ ঘরটায় চলে যাবো—একটু হাত-পা মেলে থাকা যাবে। তুমিও তোমার ঘরে ফিরে আসতে পারবে।···ওঁরা কি যাবেন ? মাস খানেক ধরে যে পরের ঘাড়ে বসে রয়েছেন—সে বিবেচনা আছে।'

আবারও তেমনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে হুঁকোয় টান দিতে শুরু করলেন।

রোমন্থন

ফণীকে নিয়ে আর আমি গল্প লিখবো না মনে করেছিলাম। কারণ যে কটা গল্প লিখেছি, তাতে তার চেহারার বর্ণনাটা হুবহু দেওয়ায় সে একটু ক্ষুণ্নই হয়েছিল। অনেক দিনের বন্ধু এবং দুঃসময়েরও বটে—তাকে আঘাত দিয়ে কি লাভ ?

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, বামুনদির কথা বলতে গেলে ফণীর কথাও আপনিই এসে পড়বে। কারণ এই বামুনদিটিকে আবিষ্কার করাই বোধ হয় ফণীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলি।

আমার গৃহিণী গেছেন কাশীতে হাওয়া বদল করতে। কাশীতে যাওয়াই সুবিধা, কেন না আমি বরাবর থাকতে পারব না, আর তাঁর ঝক্কি পোয়ানো যার-তার কাজ নয়। সে গন্ধমাদন বইতে হ'লে বোধ করি মহাবীরও রণে ভঙ্গ দিতেন। একমাত্র লোক ফণী, পরোপকারটা তার নেশাও বটে পেশাও বটে। পরোপকার না ক'রে সে থাকতে পারে না, না করতে পেলে ক্ষুণ্ন হয়। আর কোন বৃত্তি বা কাজও নেই অবশ্য, পৈতৃক যৎসামান্য যা আছে, তাতে কায়-ক্লেশে চলে যায়, আর তাইতেই সে খুশি। বিবাহ করে নি, কারণ পরোপকার করতে করতে আর ফুরসুত মেলে নি। সুতরাং পয়সা রোজগারের তাগিদও কম। এখন পরের বেগার দিতে না পারলে বেচারী নিজেকে বেকার ও অসহায় মনে করে এটাও ঠিক।

আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ—অবশ্য ভাল কোন্ কালে ছিল তা জানি না—তবে এবার একটু বেশী খারাপ। সুতরাং দিনরাতের একটি ঝি এবং দিন-

রাত ফরমাশ খাটার জন্যে ফণী হাজির থাকা সত্ত্বেও আমার দিদি চলে আসার প্রস্তাব করায় তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। দিদি সঙ্গে গিয়েছিলেন পনেরো দিনের কড়ারে—ছ'মাস কেটে যাওয়ায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ঘরে তাঁর বৌ আছে, এই ছ'মাসে হয়ত সমস্ত সংসারটাই সে আয়ত্ত ক'রে নিলে, ফিরে গিয়ে পূর্বের কর্তৃত্ব আর ফিরে পাবেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া তিনি না হ'লে সংসার চলবে না একটি দিনও—এই যে একটা ধারণা অনেক কষ্টে ছেলেদের কাছে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন—সেটাও হয়ত এতদিনে ফুটো হয়ে যাওয়া বুদ্‌বুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সুতরাং ব্যস্ত তিনি হতে পারেন বৈকি! শুধু ব্যস্ত নয় পুরো ছুটি মাস কেটে যাবার পরও আমার 'ইনি' যখন ঘরে ফেরবার কোন কথাই তুললেন না তখন দিদি রীতিমত কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিলেন।

অগত্যা তাঁকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। কিন্তু সমস্যা এই যে রাঁধে কে? ফণী ভয়ে ভয়ে একবার বলতে গিয়েছিল যে, 'এখন তো একটু সুস্থ হয়েছেন, ঝি যোগাড়টোগাড় দিলে নিজের মতো ছুটো ফুটিয়ে নিতে পারবেন না?' তার উত্তরে আমার গৃহিণী এক ঝঙ্কারে তাকে ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন, 'এই ছ'মাসে যেটুকু বল পেয়েছি, এখন আগুন-তাতে গেলে তো সেটুকু আবার চলে যাবে। যে-কে সেই। তাহলে চেঞ্জে এসে লাভ কি? আপনি একটা রান্নার লোক দেখুন।'

এখনকার দিনে কোন 'লোক' দেখাই অত সহজ নয়। গিন্নী চারদিকে খবর পাঠালেন, ডাক্তার মৈত্র, ডাক্তার ব্যানার্জি থেকে শুরু ক'রে মেহবুবনগর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপ্যাল মিস্ সান্যাল পর্যন্ত সবাইকার কাছেই এস-ও-এস গেল। কিন্তু তাঁদের অত গরজ কি? তাঁরা ধীরে সুস্থে খোঁজ করতে লাগলেন। সবাই দূরে থাকেন—রিকশা ভাড়া ক'রে না গেলে ওঁয়ার পক্ষে তাগাদা করা সম্ভব নয়। ফণী বেচারী হাতের কাছে থাকে—তারই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শেষে দিদি রওনা হবার দিন অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে সকাল থেকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে সন্ধ্যার কিছু আগে কোথা থেকে এই বামুন দিদিটিকে ধরে নিয়ে এল সে।

বামুনদিদি এসে দাঁড়াতে সকলেই বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে শুধু চেয়ে রইলাম।

নাঃ! ফণীর আবিষ্কারের বাহাদুরী আছে।

বামুনদিদির বয়স ষাট থেকে আশির মধ্যে। বয়সকালে হয়তো মহিলা রূপসীই ছিলেন, এখন চেহারার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সে চিহ্ন খুঁজে বেড়াতে

হয়। শুষ্ক শীর্ণ দেহ, বাতে সমস্ত অঙ্গ বেঁকেচুরে গেছে—এমন অবস্থা যে, দাঁড়ালে বা চললে মনে হয়, অঙ্গগুলি সকলেই পরস্পরের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চাইছে যথাসম্ভব। অষ্টাবক্রের কথাটা শুনেই এসেছিলাম এত দিন—এইবার প্রত্যক্ষ করলাম।

বগলে একটি কাঁথায় জড়ানো বিছানা। নেড়ামাথায় ভিজে গামছা পাট করা—তার ওপর বসানো এক পুঁটলি, হাতে দড়ি বাঁধা একটা সহস্র টোল খাওয়া ঘটি এবং একটি কমণ্ডলু। সেই অবস্থায় বেঁকেচুরে হাঁটতে হাঁটতে আসছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু তার জন্য মানসিক প্রসন্নতার অভাব নেই, এখানে পৌঁছেই অদন্ত মুখে একগাল হেসে বললেন, 'এই এসে গেলাম।'

এসে তো গেলেন কিন্তু কতটা কি কাজে লাগবেন সে বিষয়ে আমার স্ত্রীর রীতিমত সংশয় উপস্থিত হ'ল। তিনি সেই সুরেই প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনার যা শরীর দেখছি, পারবেন রান্না সব করতে?'

আবারও সেই বিশুদ্ধ দন্তহীন হাসি।

'ক'জনের রান্না আপনার?'

'ক'জন আর, জন-দুই ধরুন।'

'হে—! আট-দশজনের রান্না এখনও আমি তুলে দিতে পারি সুয্যি মাথার উপর উঠবার আগেই।'

গৃহিণী আশ্বস্ত হলেন। বামুনদিও বিছানা-পুঁটলি নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসলেন।

আর ফণী বেচারী নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সন্ধ্যা হ'তেই বামুনদি হাঁক দিয়ে বললেন, 'কই গো একটু তেল ছান।'

'কী তেল?' গৃহিণী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

'মাথার তেল। আবার কি! ঐটেই আমার একটু বেশী খরচ। গায়ে মাথার তেল হ'লেও হয়—না হ'লেও হয়। চারবার চান করতে হয় যে আমাকে, আমার আবার মাথা গরমের ধাত কিনা। ভোরে একবার দুপুরে একবার এই সন্দের একবার, রাত দশটায় একবার। কোন কোন দিন ঘুম না হ'লে রাত একটা দেড়টাতেও করতে হয়।'

'তা প্রত্যেকবারেই মাথায় তেল দেন নাকি?'

'ওমা, তা দিতে হবে না? মাথা-গরমের ধাত যে!'

গৃহিণী তেলের শিশি দেখিয়ে দেন—'ঐ যে কুলুঙ্গিতে আছে নারকেল তেল।'

'আ আমার পোড়া কপাল! আমি আবার নারকেল তেল মাখতে পারি

না। ঐ বাপু তোমার একটু গন্ধ তেলই দিও—কতই বা মাখবো, এই তো আমার ন্যাড়া মাথা।'

গৃহিণী ফণীকে চুপি চুপি বললেন, 'ও দাদা—এ যে পাঁচবার ক'রে গন্ধ তেল মাখতে চায়।'

ফণী বললে, 'কী আর করা যাবে বৌদি, টানাটানি করলে যদি সরে পড়ে? কত কষ্টে ধরে আনলুম বোঝেন তো?'

জোঁকের মুখে নুন পড়লো। গৃহিণী আগুন-তাতের ভয়ে গন্ধ তেলের শিশিটি বার করে দিলেন।

স্নান ক'রে এসেই বামুনদির এক হাঁক, 'ও ঠাকুর, উনুন কটা?'

ঠাকুর অর্থাৎ ফণী। ফণী একটু ভয়েই বললে, 'উনুন?...উনুন তো একটাই, বলেন তো আর একটা যোগাড় করে দিতে পারি—'

'উহু। ওতে আমার চলবে না।...আজ রাত্তিরের মতো চালিয়ে নিচ্ছি ছুটোতেই। কিন্তু কাল সকালে বাবু আর একটা যোগাড় ক'রে এনো একটাতে আমার রান্না হবে, একটাতে তোমাদের—আর একটা চা জলখাবার টুকি-টাকি। হ'ল ডালটাও করে নিলুম। একে আমার মাথা গরমের ধাত, আমি তো আর বারোটা পর্যন্ত হাঁড়ি হেঁশেল নিয়ে বসে থাকতে পারব না।'

তারপরই আবার সেই বিমল হাসি, 'তুধ কত করে নাও বৌদি?'

'তুবেলা এক সের নিই। একটু বেশীই নিচ্ছি—শরীর সারাতেই তো আসা, ওতে কিপ্পনতা করলে চলবে কেন?' আমার স্ত্রী কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললেন।

'কাল থেকে মরুকগে ঐ দেড় সেরই নিও।...সকাল বেলাটা চা খেয়েই চালিয়ে নিই—বিকেলে একটু ঘন তুধ না হলে চলে না। পোড়া এক আপিংয়ের নেশা ক'রে মরেছি—ওটুকু আমার চাই।'

আমার গৃহিণী ও ফণী পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। আমি ইচ্ছা করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। আমি সেই দিনই গিয়েছি—আমার এসবে থাকবার দরকার কি?

খানিক পরে ঘন তুধের ধাকাটা সামলে নিয়ে আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'সকালে আপনি কি জলখাবার খান বামুনদি?'

'হ্যাঁ। আমার আবার জলখাওয়া...যা হবে তোমাদের লুচি পরোটা তাই দিও, নইলে গোটাকতক মিষ্টি আনিয়ে দিও—ওসবে-আমার কোন ঝোঁক নেই। সকাল থেকে তিনটি কাপ চা হ'লেই আমার হ'ল। তবে ঐ ভাতের পর একটু মিছরির জল খাওয়ার অভ্যেস আছে—তা সে কতই বা খরচ।... ভাতও আমি খুব কম খাই বৌদি, সে দিক দিয়ে আমাকে রেখে লাভ আছে,

তিন ছটাক বড় জোর এক পো চালের ভাত—তার সঙ্গে একটু ডাল আর পোস্ত—এই হ'লেই আমার চলে গেল। তাও না দাও ক্ষতি নেই—একটু গাওয়া ঘি দিও, দুখানা ভাজা একটু আলু ভাতে, শেষ পাতে একটু দই কি দুধ, তাতেই আমি সোনাহেন মুখ ক'রে খেয়ে নেব। তবে হ্যাঁ—যেমন অল্প খাবো, যা-তা চাল আমার চলবে না। একটু সুগন্ধি আতপ আমার জন্যে আনিও বাপু।'

আবারও নিঃশব্দে তেমনি হাসেন বামুনদি। প্রসন্ন উদার হাসি।

বলা বাহুল্য আমার স্ত্রী নিঃশব্দেই এসব পরিপাক করলেন, না করে উপায়ও নেই। শরীর খারাপ তাঁর—দুদিন আগুন-তাতে গিয়ে এই দু'মাসের সব খরচ যদি বরবাদ হয়ে যায় তো সেটা বেশী লোকসান।

সুতরাং পরের দিন থেকে সগৌরবে তিনটে উনুনে প্রত্যহ আধমন ক'রে কয়লা পুড়তে লাগলো। তেল ঘিয়ের এমন ছড়াছড়ি শুরু হ'ল যে নর্দমা দিয়ে গড়াতে লাগলো তা; তাতেও নিস্তার নেই, জল এক ঘটিও তিনি তুলবেন না—কারণ তিনি তো ঝি নন। কুটনো কুটতে পারবেন না তা আগেই বলে দিয়েছিলেন—তাঁর নাকি হাত কাঁপে। বাটনাও তাই। ফলে ঝিকে হামেহাল তাঁর পিছনেই থাকতে হয়। আমাদের কাজে তাকে আর এক মিনিটও পাবার জো রইলো না। বামুনদি'র আবার এমন পোড়া মন—ডালই হোক, আর দুধই হোক—চড়ালে আর মনে থাকতো না। পুড়ে পোড়া গন্ধ ছাড়লে, তবে তাঁর হুঁশ হ'ত। তার ফলে প্রত্যহ দুবেলা পোয়া-দেড়েক দুধ বৈশ্বানরের ভোগে যেত এবং দুবার ক'রে ডাল রাঁধতে হ'ত—নইলে আমার স্ত্রীকে বসে থেকে মনে করিয়ে দিতে হ'ত যে—'ডাল হয়ে এল—এবার নামান!'

তবু দিন চার-পাঁচ এমনি ভাবেই চলল—কিন্তু তার পরই এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন বামুনদি। আর তাতেই তাঁর জীবনের একটা রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

আমাদের বাড়ির সামনে একটি কুয়া ছিল। তার ওপাশে ছিল কয়েক ঘর কুমোর এবং রজক। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করে সাইকেল রিকশার কারবার ধরেছিল। সস্ত্রীক রিকশা মেরামত করে এবং ভাড়া খাটায়। এই সব নিয়ে হৈ-হল্লা লেগেই থাকতো। সন্ধ্যের সময় নেশাও চলত একটু-আধটু··· সুতরাং সে হল্লা ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে রাত বারোটা-একটা বেজে যেত প্রায়ই। বাঁধানো কুয়াতলাটাই ছিল সাধারণ চণ্ডীমণ্ডপ গোছের—সেই চত্বরে বসেই আড্ডা চলত, আর চলতো তামাক। খাটিয়াও পড়ত দু-একটা রাত্রি বেলা।

আড্ডা যখন, বিশেষ নেশাখোরের আড্ডা—তখন খোশ গল্পের সঙ্গে

ঝগড়াঝাঁটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে থাকার কথা। আর থাকতও তাই, আমাদের ওটা গা সওয়াই হয়ে গিয়েছিল। সেদিনও শুরু হয়েছিল অতি সাধারণ ভাবেই —ঝগড়ু কুমোর কিঞ্চিৎ রসাশ্রিত হয়ে তার বেরাদারদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে ওর স্ত্রী মুনিয়া ঝেঁঝে উঠলো, 'চুলহা সুলুক গৈল, অভি তক্ সৌদা নাহি আয়ল। বড়া পণ্ডিতজী বন্ কর বড়বড়াৎ হাউঅন্। যা পইলে সৌদা লি আওয়া!'

'তু কাহে নাহি যাতু। কাল হামার জেবা সে যো আট আনা চৌরি কইলু, ওহি সে সৌদা কিন লি আওয়া!' ঝগড়ু মেজাজের মাথায় জবাব দিলে।

'দেখা, দশ আদ্‌মিকে বীচমে হাম্‌কে চোর মত কহল করনা।' মুনিয়া রণ-রঙ্গিণী বেশে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'পৈসা লেলা কাহে? হম অলবত্তে কহব।'

মুনিয়া ছুটে গিয়ে রান্না ঘর থেকে হাতাখানা করায়ত্ত করলে, 'অব চোরি-কে বাৎ মুহসে নিকালি তো কনচুলসে পিটৎ পিটৎ নশা ছুটা দেইব।'

'হমহু লাতিয়াৎ লাতিয়াৎ হোশ বিগড় দেইব!'

'খিয়াকে বখৎ মালিক নহি—লতিয়াকে বখৎ গোসাই বন্‌হিয়ে।' মুনিয়াও সমান তেজে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

'দেখা, আউর বোলা জিন্। হমার নশা ভয়ল বা! অব উঠিলা তো তুহার হাড্ডি চুর চুর কর ডালিলা!'

আমরা বারান্দা থেকে এই নাটক উপভোগ করছি, বামুনদিও বসে ছিলেন পা ছড়িয়ে,—হঠাৎ কি হ'ল বামুনদি তড়বড়িয়ে উঠে পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটলেন নিচে। রাস্তা পেরিয়ে কুয়াতলায় পৌছতে পৌছতে থানের আঁচলটাও জড়িয়ে নিয়েছেন। আমরা হাঁ হাঁ করতে করতে এই কাণ্ডটি ঘটে গেল—বাধা দেবার অবসরই হ'ল না।

একেবারে ঝগরুর সামনে গিয়ে তেমনি অষ্টাবক্রভাবে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বললেন, 'দেখো, আজকাল আর ওসব দিন নেহি হ্যায়। কথায় কথায় বৌকে ধরে ঠেঙানো নেহি চলে গা।...আজকাল ডাইভোস বিল পাস হুয়া হ্যায়।...ও আর তোমার ঘর নেহি করেগা।'

তারপর মুনিয়ার বাহুমূলটা ধরে এক হেঁচ্‌কা টান দিয়ে বললেন, 'এই বৌ চলে আয়। আমি কাল তোকে ফজিরেই উকীলের বাড়ি লে জায়গা। মকদ্দমা করকে উস্‌কে তালাক দেকে তুই আর একটা সাদী কর লেগা।'

প্রথমটা সকলেই হকচকিয়ে গিয়েছিল, মুনিয়াও তাই। তারপরই এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'আর এ বুঢ়ীমা, হামার সঙ্গে হামার

আদমীর বাত হচ্ছে, তুমি থাকবে কেন এর মধ্যে। হামি কি মুসলমান আছে যে তাল্লাক দোব।...বহুৎ বদ্ আছে তুমি বুড়ীয়া।'

ততক্ষণে ঝগড়ুও টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বারান্দায় আমরা আছি—আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললে, 'দেখিয়ে বাবুসাব হামরা আছি হামাদের লিয়ে—এ বুড়ী কেন কথা কইবে। হামরা বোড়লোক না হতে পারি, হামাদের ভী ইজ্জৎ আছে। হামার আওরৎকে এ বাহার ক'রে লিয়ে যেতে চায়—কেতনা বুরী বাৎ আছে বলুন তো। দেখা মহল্লাকে দশ্ আদমী, হাম জাঁয় কহা থৈ, কী বেজায় কহা থৈ।'

বাকী যারা ছিল আশেপাশে তারাও ততক্ষণে রুষ্টমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাবগতিক দেখে আমাদের মাথাগরম বামুনদিরও বোধ করি মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তিনি পা পা ক'রে পিছিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন ; মুখটা গোঁজ ক'রে বললেন, 'আ মর—বলে যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর! বলি ভাতারের নাতি ঝ্যাঁটা খেয়ে মরছিস্, আইন হয়েছে—ড্যাং ড্যাং ক'রে ডাইভোস ক'রে বেরিয়ে যা। তা নয়!'

আমার স্ত্রী মৃদু অনুযোগ করলেন, 'কী বলেন বামুনদি, স্বামী স্ত্রীর নেশার ঝোঁকে ঝগড়া হয়েছে তাই বলে স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবে?'

'কেন যাবে না!' বামুনদি জ্বলে ওঠেন একেবারে, 'লাথি খেয়ে পড়ে থাকবে নাকি! আমাদের সময় মুখপোড়ারা আইন করে নি যে। নইলে দেখিয়ে দিতুম আমাদের মিন্সেকে।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ান তিনি।

'কী বলব বৌদি, ন বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, সে মিন্সের তখন তিরিশ বছর বয়েস। একটা বৌ খেয়েছে তার আগে, বাড়িতেই ছিল একটা ঝি—তাকে নিয়ে ঘর সংসার পেতে বসল। রোজগার নেই পাতি নেই, ধান ভানা, গরুর কাজ সব করাত আমাকে দিয়ে, আর উঠতে বসতে লাথি—কেঠো পায়ের লাথি খেয়ে এক একদিন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতো। মাকে বললে মা শুধু কাঁদত আর বলত, কী করবি বল মা, হিন্দুর বিয়ে, এ তো আর ফেরাবার নয়। মিনসে বেঁচে থাকত তো দেখিয়ে দিতুম—এই বয়সেও মামলা ক'রে ডাইভোস নিয়ে তবে ছাড়তুম। কী বলব মিনসে মরে গেল তাই।'

বলতে বলতে বামুনদির কোটরগত দুই চোখের কূল ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল।

আমার স্ত্রীর চোখেও জল এসে গিয়েছিল। আমি একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলুম, 'আপনার স্বামী কদ্দিন মারা গেছেন বামুনদি?'

বামুনদি আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'সে হ'ল অনেকদিন ভাই। ন বছরে বিয়ে হয়েছে, ষোল বছরে বিধবা হয়েছি। সেও হ'ল আজ তিন কুড়ি বছরের কথা।'

বামুনদি আর দাঁড়ালেন না। মাথায় একটু গন্ধ তেল রগড়ে কলের নিচে গিয়ে বসলেন।